সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ডব্লিউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৫।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

পঞ্চম ভাগের সূচী।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	ইতিহাস—রচনার প্রণালী	শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	১৯
২।	উপসর্গের অর্থ বিচার (২)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১২
৩।	উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা	শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ	২৩২
৪।	গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৪৪
৫।	গৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাম্রশাসন	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৬৪
৬।	চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ...	... ...	৮১
৭।	চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী (২ দফা) ...	... ...	১৭৩
৮।	চণ্ডীদাসের পুঁথি সম্বন্ধে মন্তব্য	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৮৪
৯।	জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	২৯৪
১০।	দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গলকাব্য	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	১
১১।	দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু	২৯২
১২।	ধোয়ী কবির পবনদূত	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৮৭
১৩।	পাঁচালিকার ঠাকুরদাস ...	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২০৫
১৪।	রঘুনাথের অশ্বমেধ পঞ্চালিকা ...	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	১৩৮
১৫।	বঙ্গীয় সমাচার-পত্রিকা (কালানুসারী ইতিবৃত্ত)	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	২৪৬
১৬।	বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ ..	শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম এ	২২৩
১৭।	বাঙ্গালা পুথির বিবরণ ..	শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	২৮১
১৮।	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ...	... ...	৭১, ১৯৭
১৯।	বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ ...	শ্রীকালিদাস নাথ	২৭০
২০।	শীতলা-মঙ্গল ...	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২৭
২১।	স্ত্রীকবি মাধবী ...	শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী	১৫৯
২২।	হরি ও সোম ...	শ্রীরসিকলাল ঘোষ	১৫
	সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-বিবরণ ...		।/০ হইতে ২॥/০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য।

দ্বিজ রামচন্দ্র একজন সৎকবি, তাঁহার দুর্গামঙ্গল কাব্যের কতিপয় কবিতা আমার নিকটে বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি এই কাব্যের বিষয়টী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণের গোচরে আনয়নের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি।

এই কাব্য খানি প্রাচীন, কিন্তু 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'-লেখক স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য' নামক গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার বিষয় কিছু উল্লেখ করেন নাই, সম্ভবতঃ এই পুস্তকখানি উক্ত দুই গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নাই। এই কাব্যখানি গোয়ালন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত হম্‌দম্‌পুর পোষ্ট আফিসের অধীন মূলঘর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে হস্তলিখিত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে চাপা পড়িয়া ছিল, বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আমি তাঁহার নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছি। এই পুস্তকখানি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপ কিংবা ত্রিবেণী হইতে নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী হইয়াও ইহার ভাষা বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ১৭৪২ শকাব্দে বাচস্পতি মহাশয় ৭১ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, যদি তিনি পাঠ্যাবস্থায় ২৫ বৎসর বয়সে এই গ্রন্থখানি নকল করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে ১২৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

এই কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র আপন জন্ম সময় অথবা গ্রন্থ-রচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। এই গ্রন্থের লেখা হইতে যাহা অনুমান করা গিয়াছে, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল।

কবিবর রামচন্দ্র তাঁহার কাব্যের মধ্যে এক স্থানে ফিরিঙ্গী ও ফরাসী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ;—

"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস।
দেখে কাঁপে কায়, যায় জীবনের আশ॥"

এখানে ফিরিঙ্গী শব্দে পোর্ত্তুগীজ, আর ফরাস অর্থে ফরাসী অথবা ফিরিঙ্গি-ফরাস্ বলিতে শুধু ফরাসী জাতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, উহা ঠিক বুঝা যায় না। এই কাব্যের কোথাও ইংরেজ্ কিংবা ইংরেজ রাজত্বের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত যে ভাবে যবন শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাতে এই কাব্যখানি যে মুসলমান রাজত্বের সময়ে ফরাসীদিগের বঙ্গদেশে আগমনের পর বিরচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। মুসলমান সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অধিকার-কালে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখন অর্থাৎ * ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দন-নগরে কুঠী স্থাপন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান, সময় হইতে ২২৫ বৎসর অথবা উহার ২। ১ বৎসর পরে এই কাব্যখানি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। উক্ত দুই পংক্তি পদ্য ও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় দুর্গামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র অন্নদামঙ্গল-প্রণেতা কবিবর ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ উভয়েই যদিও সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, তথাপি পরস্পরের ভাষার অনেক তারতম্য আছে। কবিবর রামচন্দ্রের রচনা ভারতচন্দ্রের রচনার ন্যায় সুমার্জ্জিত নহে। আর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১১১৯ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ১৮৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন †। তিনি যদি অনুমান ৩০ বৎসর বয়সে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে ১৫৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্নদামঙ্গল প্রণীত হইয়াছিল। অতএব এই কাব্য যে অন্নদামঙ্গল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না। কবিবর রামচন্দ্র দুর্গামঙ্গল কাব্যের মধ্যে যেরূপে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল ;—

"গরিটি সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম, তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন, গৌরী-গুণ করিল রচন॥"

অন্য একস্থলে লিখিয়াছেন ;—

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, মেদন-মল্লানুরাগ, তার মধ্যে হরিনাভি গ্রাম।
তাতে কবি নিজ বাসে, শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাষে, দ্বিজ কুলে রামচন্দ্র নাম।"

অপর একস্থলে লিখিত আছে ;—

"হরিনাভি ধাম, দ্বিজ বিনোদরাম, তাহার তনয়াসুত।
পাঁচলী প্রবন্ধে, কহে রামচন্দ্রে, সদাই বিনয়যুত।"

* "সায়েস্তা খাঁ তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৪ খৃঃ হইতে ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করেন। তাহার সময়ে ফরাসীরা চন্দন নগরে (১৬৭৩ খৃঃ) এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় কুঠী স্থাপন করেন।"

(রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ৪১ পৃঃ)

† "ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ইনি ১১১৯ সালে (১৭১২ খৃঃ) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'ভুরস্থট' পরগণার মধ্যে পাঁড়ুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।" (শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত চরিতাষ্টক)

এই সকল লেখা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র অনুমান ২২৩ কি ২২৪ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ হরিনাভি গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের মুখুর্য্যে কি মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম গোপাল মুখুটী, পিতার নাম রামধন মুখুটী। ইঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে কবিবর রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। তাঁহার মাতামহ দ্বিজ বিনোদরামও হরিনাভিতেই বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বলেন, "পূর্ব্বে জাহ্নবী হরিনাভির পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত ছিলেন, এখন মজিয়া গিয়াছেন, উহার সামান্য চিহ্নমাত্র আছে।" কবির পরিচয় এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, এই কাব্যের 'দুর্গামঙ্গল' নাম কেন হইয়াছে? শাস্ত্রবাক্যে ও হিন্দুধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ কবিবর রামচন্দ্র বঙ্গসমাজে পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমীব্রতের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমীব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য কাব্যের দুর্গামঙ্গল নাম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি হস্তলিখিত পুঁথির পাতার ১১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত প্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি শ্রীহর্ষ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় 'নৈষধ-চরিত' নামে প্রসিদ্ধ মহাকাব্য রচনা করেন। কবিবর রামচন্দ্র ঐ বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের উপাখ্যান মহাভারতে যেরূপ আছে, শ্রীহর্ষ মনোহর কল্পনার সাহায্যে উহাকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কবিবর রামচন্দ্র উহার উপর আর একটু কল্পনা ও তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র সম্বলিত করিয়া 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের অবয়ব গঠন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ নলদময়ন্তীর বিবাহ-বর্ণন করিযাই 'নৈষধ-চরিত' শেষ করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত কবি 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যে নলোপাখ্যানের সমুদয় অংশই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদাচার এবং হিন্দুরীতিনীতিপরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে স্বধর্ম্মে আকর্ষণ করাই 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। 'নৈষধ-চরিত'-প্রণেতা যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, বোধ হয় তখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, শ্রীহর্ষ উহার একটি চিত্র 'নৈষধ-চরিতের' ১৭শ সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কলির মুখে নাস্তিক ও বৌদ্ধগণের যুক্তি এবং দেবগণের মুখে আস্তিক ও হিন্দুগণের যুক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলি বলিতেছে*,—কোনও বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারের নিমিত্ত যাহা সৎবস্তু তাহাই ক্ষণিক, এই অনুমান দ্বারা জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন। আর বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র কর্ম্ম, তিন বেদ, মীমাংসা শাস্ত্র, ভস্ম দ্বারা তিলক,

---

"কেনাপি বোধিসত্ত্বেন জাতং সত্ত্বেন হেতুনা। যদ্বেদমর্ম্মভেদায় জগদে জগদস্থিরম্॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী তন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্। প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবো জল্পতি জীবিকাঃ॥
শ্রুতিস্মৃত্যর্থবোধেষু নৈকমত্যং মহাধিয়াং। ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী॥

এ সমুদয় বিবেকপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের জীবিকার উপায় মাত্র। মহাবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের শ্রুতি স্মৃতির অর্থ গ্রহণ বিষয়ে ঐকমত্য হইতেই পারে না, কেননা ব্যাখ্যা-বুদ্ধিবলের অপেক্ষা করে, যাহা সুখকর ব্যাখ্যা, উহা কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। মৃত ব্যক্তি পরলোকে গিয়া স্বকীয় কৃতকর্ম্ম স্মরণ করে, তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম পরলোকেও তাহার অনুসরণ করে, শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, এ সকল ধূর্ত্ততামূলক কথায় কাজ নাই। সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী চাটুবাদকুশল পাণ্ডবদিগের কবি যে ব্যাস তাঁহার কথায়ও শ্রদ্ধা করা উচিত নহে; যেহেতু পাণ্ডবেরা যাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, তিনিও তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা যাহাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়াছেন। কলি এইরূপ বহু তর্কের দ্বারা আস্তিক মত-খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উহার উত্তরে ইন্দ্রাদি দেবগণও অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকবি শ্রীহর্ষ ইচ্ছা করিয়াই যেন ঐ সকল যুক্তিকে তত দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন নাই। দেবগণ বলিতেছেন,—হে নাস্তিকগণ! পুত্রেষ্টিযাগ করিলে যে পুত্র জন্মে, ইহা ত সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহাদ্বারাও কি তোমাদের সন্দেহ নিরাস হইতেছে না? বেদোক্ত জল ও অগ্নি পরীক্ষা দিতে যে প্রত্যয় উহাই ত তোমাদের নাস্তিকী বুদ্ধিকে গলহস্ত প্রদান করিয়া নিষ্কাশিত করিতেছে, অতএব তোমাদিগকে ধিক্। কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্মদৈত্যাদি ভূতযোনি আশ্রয় করিয়া যে গয়া-শ্রাদ্ধ যাচ্ঞা করে, সকল দেশেই ত এ প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহাতে বিশ্বাস কর না কেন? নাম ভ্রমে কোন ব্যক্তিকে যমদূতেরা যমসদনে উপস্থিত করিলে, যম তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন, সেই ব্যক্তি পুনরায় স্বদেহে উপস্থিত হইয়া জীবনলাভ করতঃ প্রতিবেশিদিগের নিকটে যে যমলোকের কথা বলে, তাহাতেও কি তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস হয় না * ? দেবগণ এইরূপ অনেক যুক্তি নাস্তিক ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী কলির নিকটে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কবিবর রামচন্দ্র ওরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর বিতর্ক বর্ণনা না করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, কি মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। প্রকারান্তরে হিন্দু সাধারণের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পরে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

মৃতঃ স্মরতি কর্ম্মাণি মৃতে কর্ম্মফলোর্ম্ময়ঃ। অন্যভুক্তৈ মৃতে তৃপ্তিরিত্যলং ধূর্ত্তবার্ত্তয়া ॥
পণ্ডিতঃ পাণ্ডবানাং স ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ। নিনিন্দ তেষু নিন্দৎসু স্তুবৎসু স্তুবতাং সকিং ॥"
"পুত্রেষ্টিশ্যেনকারীরী মুখাঃ দৃষ্টফলা মুখা। নবঃ কিং ধর্ম্ম সন্দেহ সন্দেহ জয় ভানবঃ ॥
জলানলপরীক্ষাদৌ সম্বাদো বেদবেদিতে। গলহস্থিত নাস্তিক্যাং ধিক্ ধিয়ং কুরুতে নতে ॥
যাচতঃ স্বং গয়া শ্রাদ্ধং ভূতস্যাবিশ্য কঞ্চন। নানাদেশে জনো পজ্ঞাঃ প্রত্যেষিন কথাঃ কথং ॥
নীতানাং যমদূতেন নাম ভ্রান্তেরুপাগতৌ। শ্রদ্ধৎসে সংবদন্তীং ন পরলোককথাং কথং ॥"

(নৈষধচরিত ১৭শ সর্গ)

দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল।

নল শরীরে কলির প্রবেশ।

"কলির হইল বশ, ত্যজে ধর্ম্ম কর্ম্ম রস,
বিষম স্বভাব ভাবে ভূপ।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্রোধ, ধর্ম্ম পথ কৈল রোধ,
কামে চিত্ত মজে নল ভূপ॥
মুড়ায় মাথার কেশ, দেব কর্ম্মে সদা দ্বেষ,
পিতৃলোকে নাহি দেয় জল।
বলে ভণ্ড যত দ্বিজ, মিথ্যা কর কার পূজো,
প্রবঞ্চনা করয়ে কেবল।
মরা মাতা পিতা তরে, ভ্রমে লোক শ্রাদ্ধ করে,
সে কেবল বুঝিবার চুক।
মদনমঙ্গল গীত, শুনে সদা আর্দ্রচিত,
প্রজার হিংসায় নাহি সুখ॥
রাজার পাপেতে রাজ্য, বিষম হইল কার্য্য,
ধর্ম্ম নাহি মানে প্রজাগণে।
ব্রাহ্মণ আচার ভ্রষ্ট, পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র,
বেদপাঠ করে শূদ্রগণে॥
স্বামীনিন্দা করে ভার্য্যা, কামিনী হইল পূজ্যা,
পরভাবে জনক জননী।
মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা, ভ্রষ্ট নষ্ট সর্ব্বজনা,
কুলবধূ নীচেতে গামিনী॥
গোহিংসা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, চৌর্য্য কর্ম্মে সদা চেষ্টা,
ব্রাহ্মণের যবন আচার।
যাগ যজ্ঞ সদা হীন, ধর্ম্মে রসবীর ক্ষীণ,
শূদ্রের তপস্যা ব্যবহার॥
নব বধূ ঘরে আসি, শাশুড়ীকে করে দাসী,
সুত পিতায় নাহি দেয় অন্ন।
ব্রাহ্মণে বেচয়ে দুগ্ধ, পরদারে সদা মুগ্ধ,
নাহি বাছে জাতিভেদ ভিন্ন॥
বিষম হইল নীত, দেখি কলি হরষিত,
সমুচিত ফল দিব নলে।

দ্বিজ রামচন্দ্র কয়, গৌরী গুণ সুধাময়,
রহ মন চরণ-কমলে ॥

উদ্ধৃত কবিতায় যে মস্তক-মুণ্ডন, দেবকর্ম্মে দ্বেষ, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে অবিশ্বাস প্রভৃতি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা কোন্ কোন্ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে এক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত বৌদ্ধভিক্ষু ও ভেক-ধারী বৈরাগীগণ মস্তক মুণ্ডন করেন, পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন না। কিন্তু এক বৌদ্ধ ভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দেবকর্ম্মে দ্বেষ করিতে দেখা যায় না। আবার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এমতও অনেকে বিশ্বাস করেন না। কবি বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন, তাহাও অনুমান করা দুরূহ। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—

'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবপ্রিয়,
মহেন্দ্র সমান ক্ষিতিপতি।'

এখানে বৈষ্ণব অর্থে যদি বিষ্ণুর উপাসক বা বিষ্ণুভক্ত এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় শাক্ত কবি মহাত্মা চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ভেকধারী বৈরাগীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, যখন এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তখন সাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ছিল না।

কাব্যের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় একরূপ বর্ণিত হইল, এখন এই কাব্যের উপাখ্যানাতিরিক্ত ঘটনা, নায়ক, নায়িকা, রস, গুণ, দোষ, রীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

নিষধনগরের অধিপতি রাজা বীরসেন সন্তান না হওয়ায় দুঃখিত। প্রতিদিন মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র বর প্রদান করিলেন, কিন্তু বর দিয়াই তাঁহার মনে চিন্তা হইল, সর্ব্বগুণান্বিত কোন্ ব্যক্তি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবে। একদা কুবেরপুত্র জয়ৎসেন স্বীয় প্রিয়তমা চন্দ্রমালার সহিত কৈলাসশিখরে মহাদেবের কাননে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় মহাদেব পার্ব্বতী সহিত সেখানে উপস্থিত, তিনি কুবেরপুত্রের চপলতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কৈলাসে অবস্থানের যোগ্য নহ, যেহেতু তুমি পাপে আসক্ত, অতএব ভূতলে গিয়া জন্ম পরিগ্রহ কর।" অভিশাপ শ্রবণে কুবেরপুত্র কাঁদিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে পার্ব্বতীর দয়া হইল, তিনি জয়ৎসেনকে বলিলেন, 'বাছা ভয় নাই, তুমি ভূমণ্ডলে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, তোমার কীর্ত্তি ভুবন-বিখ্যাত হইবে।' চন্দ্রমালাকেও বলিলেন, 'সতি? তুমি পৃথিবীতে জন্মিয়াও নিজ পতি প্রাপ্ত হইবে, তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমার ব্রত প্রকাশ করিও।' তাহার পর জয়ৎসেন ও চন্দ্রমালা যথাক্রমে নিষধদেশে ও বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। নলোপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং বাহুল্যভয়ে এখানে উহার সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম না। মহাভারতে আছে, দময়ন্তীর গর্ভে নলের ইন্দ্রসেন নামক

পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 'দুর্গামঙ্গলে' আছে, নলের জয়ন্ত নামে পুত্র ও চন্দ্রমুখী নামে কন্যা জন্মিয়াছিল; জয়ন্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নল ও দময়ন্তী কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

এখন মহাভারতে ও নৈষধচরিতের সহিত এই কাব্যের কল্পনাগত যে সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, উহার কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। নলোপাখ্যানে আছে, বিরহাতুর নল বনমধ্যে স্বুবর্ণের ন্যায় সুন্দর কতকগুলি হংসকে দেখিয়া উহার একটী ধরিয়াছিলেন*। নৈষধকার শ্রীহর্ষ স্বীয় কল্পনার সাহায্যে হংসগণের মধ্যস্থ একটী মাত্র স্বুবর্ণময় হংস তাহাদের স্বাভাবিক বিচরণস্থল কেলি-সরোবরে ক্রীড়া করিতেছিল, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন†। এই হংসই নলরাজার বিবাহের ঘটক। কেন যে হংসের স্বুবর্ণময় দেহ হইয়াছে, তাহাও কবি হংসের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন‡। কবিবর রামচন্দ্র এ স্থলে কল্পনা সঙ্গিনীর প্রিয়বন্ধু শ্রীহর্ষেরই অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন;—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সরোবর-তীরে। অপূর্ব্ব হংসের মালা খেলা করে নীরে॥
লোহিত চরণ চঞ্চু স্বুবর্ণের পাখা। সরোবরে খেলা করে নিরমল রাকা॥
হংস দেখি আনন্দিত নৃপসুত সুখে। অল্পে অল্পে এক হংস ধরিল কৌতুকে॥"

আবার হংসের সহিত প্রথম কথোপকথনে কবি রামচন্দ্র শ্রীহর্ষের কথাগুলির প্রায় অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। নল হংসকে ধরিলে হংস বলিতেছে,—

"আমার দুঃখের কথা নাহি দিতে ওর। পক্ষিজাতি বটি কিন্তু বহুপোষ্য মোর॥
জনক জননী জরাগতিশক্তিহীন। নবীনপ্রসূতা বধূ অতি অল্পদিন॥
খুঁটে না খাইতে পারে যমক শাবকে। আমার বিহনে সবে বাঁচিবে কি শোকে॥ §
কাতরে কহিছে হংস শুন মহারাজ। আমাকে বধিলে তোমার কিবা হবে কাজ॥
দেখিয়া স্বুবর্ণপক্ষ যদি বধ পাছে। এ হেন স্বুবর্ণ তোমার কত পড়ে আছে॥
সশৈল কানন পৃথ্বী তব অধিকার। লইতে আমার সোণা কিবা উপকার ¶॥

* "স দদর্শ ততো হংসান্ জাতরূপ পরিষ্কৃতান্। বনে বিচরতাং তেষামেকং জগ্রাহ পাণিনা॥"
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

† "পয়োধি লক্ষ্মীমুষি কেলিপল্বলে বিরংসুহংসীকলনাদসাদরম্।
স তত্র চিত্রং বিচরন্তমন্তিকে হিরণ্ময়ং হংস মবোধি নৈষধঃ॥" (নৈষধচরিত ১।১১৭ শ্লোক)

‡ "স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥" (নৈষধচরিত ৩।১৩ শ্লোক)

§ "মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্ অহোবিধে ত্বাং করুণা রুণদ্ধি ন॥" (নৈষধচরিত ১।১৩৫ শ্লোক)

¶ "ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ সমীক্ষ্য পক্ষান্মম হেমজন্মনঃ।
তবার্ণবস্যেব তুষারশীকরৈঃ ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্॥" (নৈষধচরিত ১।১৩০ শ্লোক)

হংস দময়ন্তীর নিকটে গিয়া নলের রূপ গুণের বর্ণনা করিলে, দময়ন্তী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং যাহাতে নল নরপতি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, তজ্জন্য হংসকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখানে কবি রামচন্দ্র যে যে স্থলে নৈষধকারের কথার অনুকরণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই মনোহর বোধ হয়, অন্যান্য স্থলে শ্রীহর্ষের ন্যায় নায়িকার মনের গভীর আবেগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দময়ন্তী বলিতেছেন;—

"তোমারে করিয়া সাক্ষী করিলাম পণ। সঁপিলাম তাঁর কাছে যৌবন জীবন॥
সেই নরপতি যদি নাহি পাই স্থির। নাহি যদি মিলে মোরে ত্যজিব শরীর॥
আপনি দেবেন্দ্ররাজ মোর কাছে আইসে। করিলাম সত্য নাহি যাব তার পাশে॥
সময় বিশেষে কবে মনোযোগ রয়। অসময়ে কহিলে বিফল পাছে হয়॥
যদি মুখ তিক্ত থাকে নাহি থাকে ক্ষুধা। সকল বিরস লাগে যদি খায় সুধা॥
ক্রোধের সময় কিংবা অন্য মনে থাকে। হেনকালে মোর কথা না কহিবে তাঁকে॥
স্বকার্য্য হইলে হংস কহে অতঃপর। পূর্ণ হবে অভিলাষ পাবে তাঁর বর॥"

এই স্থলে নৈষধকার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন নিম্নে টীকায় ঐ কয়টী কবিতা উদ্ধৃত করা হইল *।

মহাভারতে আছে, স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ এই চারি দেবতা নলের রূপধারণ করিয়া উপবেশন করিলে একাকৃতি পঞ্চপুরুষ বিলোকনে দময়ন্তী সন্দেহে আকুল হইয়া দেবগণের শরণাগত হইয়াছিলেন। পরে দেবগণ দময়ন্তীর কাতর-প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলে দময়ন্তী নলের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন †। এ স্থলে নৈষধকার

---

* "অনৈষধায়ৈব জুহোতি তাতঃ কিং মাং কৃশানৌ ন শরীরশেষাম্।
ইষ্টে তনূজন্মতনোঃ স নূনং মৎপ্রাণনাথস্তু নলস্তথাপি॥
তদেকদাসীত্বপদাদুদগ্রে মদীপ্সিতে সাধু বিধিৎসুতা তে।
অহেলিনা কিং নলিনী বিধত্তে সুধাকরেণাপি সুধাকরেণ॥
শুদ্ধান্তসন্তোষনিতান্ততুষ্টে ন নৈষধে কার্য্যমিদং নিগাদ্যম্।
অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা॥
ত্বয়া নিধেয়া ন গিরো মদর্থাঃ ক্রুধা কদুষ্ণে হৃদি নৈষধস্য।
পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস॥
ধরাতুরাসাহি মদর্থযাচ্ঞা কার্য্যা ন কার্য্যান্তরচুম্বিচিত্তে।
তদার্থিতস্যানববোধনিদ্রা বিভর্ত্ত্যবজ্ঞাচরণস্য মুদ্রাম্॥
বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে তস্মাত্ত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বসিদ্ধ্যোঃ কার্য্যস্য কার্য্যস্য শুভা বিভাতি॥"

(নৈষধচরিত ৩।৭৮-৮০, ৯৩-৯৬ শ্লোক)

† "তান্ সমীক্ষ্য ততঃ সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষাকৃতীন্ স্থিতান্। সন্দেহাদথ বৈদর্ভী নাভ্যজানন্নলং নৃপম্॥
শ্রুতানি দেবলিঙ্গানি তর্কয়ামাস ভারত। দেবানাং যানি লিঙ্গানি স্থবিরেভ্যঃ শ্রুতানি মে॥
তানীহ তিষ্ঠতাং ভূমাবেকস্যাপি ন লক্ষয়ে। সা বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ॥"

শ্রীহর্ষ দময়ন্তার সখীরূপে সরস্বতীকে স্বয়ম্বরস্থলে আনয়ন করিয়া সুন্দর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন*। বাঙ্গালা মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন, দময়ন্তীর প্রার্থনায় দেবগণ স্ব স্ব চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনিমিষ নয়ন, স্পন্দহীন দেহ এবং অঙ্গের ছায়া না দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তত্তৎ চিহ্ন-বিহীন নলকে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন†। কবিবর রামচন্দ্র নৈষধকারের অনুকরণ করিতে গিয়া সরস্বতীর পরিবর্তে ভগবতী কাত্যায়নীকেই দময়ন্তীর সখীরূপে স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন, যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা গেল—

"বাসব বরুণ বহ্নি যম চারিজনে। ভীমের তনয়া প্রতি কোপ আছে মনে॥
যথায় বসিয়া আছে নল নরপতি। বসিল দেবতা তথা নলের আকৃতি॥
একাকৃতি পঞ্চ নল বসিয়া সভায়। দেখিয়া ভীমের কন্যা হইল বিস্ময়॥
একাকৃতি পঞ্চ নল সভা মধ্যে বসি। ভাবিত হইল বড় হেরিয়া রূপসী॥
কারে দিব বরমাল্য কেবা হবে নল। বুঝিতে না পারি আমি কে করিল ছল॥
শ্রবণে কহেন তার হরের গৃহিণী। কি লাগিয়া অন্যমনা হইলা স্বজনি॥
পৃথিবীমণ্ডল মাঝে নাহি যার ছায়া। কখন সে নল নহে দেবতার মায়া॥
সভা মাঝে বিরাজে নরেন্দ্র দক্ষ মুখে। মাল্যদান কর সখি পরম কৌতুকে॥"

এতক্ষণ এই কাব্যের কল্পনাগত বিষয় সকল বিবৃত হইল। সংপ্রতি এই কবির বর্ণনা-শক্তি ও ভাষার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। কবি রামচন্দ্রের রচনায় মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই ত্রিবিধ গুণই দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলি আদিরসে পরিপূর্ণ—সুতরাং ইচ্ছানুসারে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। মাধুর্য্য-গুণ-বিশিষ্ট বর্ণনা যথা,—

"এক দিন সখী সঙ্গে, দময়ন্তী মনরঙ্গে,
পুষ্প-বনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গন্ধে অলিকুল,
গন্ধবহ গমন-বিশেষ॥

শরণং প্রতি দেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত।
নিশম্য দময়ন্ত্যাস্তৎ করুণং পরিদেবিতম্।
যথোক্তঞ্চক্রিরে দেবা সামর্থ্যং লিঙ্গধারণে॥" (মহাভারত বনপর্ব্ব।)

* "সাক্ষাৎ কৃতাখিল জগজ্জনতা চরিত্রা তত্রাধিনাথমধিগত্য দিবস্তথা সা।
উচে যথা স চ শচীপতিরপ্যধায়ি প্রাকাশি তস্য ন চ নৈষধকায়মায়া॥" (নৈষধচরিত ১৩শ সর্গ।)

† "বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ। আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়ন যে স্পন্দহীন কায়া। অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিলা তবে এ চারি অমর। নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥"
(কাশীরামদাসের মহাভারত—বনপর্ব্ব।)

পাতিয়া অঞ্চল পাঁতি, তুলে পুষ্প নানা জাতি,
কেহ দিল খোপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা, গাঁথে হার কোন বালা,
কোন সখী তুলিল অশোক॥
কোন সখী গিয়া তুলে, মল্লিকা মালতী ফুলে,
হার গাঁথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল,
কোন সখী সখীরে সাজায়॥
বদ্ধ ছিল হংস সত্যে, হেনকালে গেল মর্ত্ত্যে,
উপনীত দময়ন্তী কাছে।
হংস হেরি রাজকন্যা, সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা,
ধরিতে ধাইল পাছে পাছে॥"

ওজোগুণের সামান্য উদাহরণ যথা,—

"উপনীত হইল গিয়া গড়ের দুয়ার। মাতঙ্গ তুরঙ্গ বাঁধা হাজার হাজার॥
শেফাই সঙ্গীন চড়া পাহারা ফটকে। কাওয়াজ্ আওয়াজ্ ঘন ধড়কে ধড়কে॥
কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস্। দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥
ঘন ঘন গোলা ছোটে চোটে ফাটে মাটী। ক্ষণেকে ক্ষণেকে জয়ঢাকে মারে কাটী॥
দ্বিতীয় গড়েতে গিয়া দেখে নরপতি। দুয়ারেতে দ্বারপাল বসিয়া সংহতি॥
রাহুত মাহুত কত শত রজপুত। বিষম ভীষণ কায় শমনের দূত॥
মাথায় পাগড়ী টেড়ি লাল কালা পীত। সঘনে মোচড়ে গোঁফ জুলপী-শোভিত॥
জবা জিনি দুই আঁখি আসবে আকুলি। গভীর বচন সদা অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি॥
কটি-ধটি-ধরা যোড়া করে তলোয়ার। ঢালি পাকি খেলে কেহ ঘুরাইয়া ঢাল॥
ঘন ঘন ফেলে লড় ঘুরায় মুদ্গর। মালশাটে ফাটে মাটী ভেঙ্গে হয় চুর॥
গগনে উড়ায় বাঁশ ঘন ঘন লোফে। কিলাকিলি হুড়াহুড়ী পরস্পর কোপে॥
ক্রমে ক্রমে সাত খানা করিল পশ্চাৎ। পুরী মাঝে উপনীত হইল নরনাথ॥"—

প্রসাদগুণের উদাহরণ যথা,—

"নিদ্রাচ্যুত রূপবতী, নিকটে না দেখি পতি,
দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
রাজ্ঞীর কম্পিত তনু, রাহুগ্রস্ত যেন ভানু,
শুকাইল সরস হৃদয়॥
আছিলাম একসাথ, কোথা গেলে প্রাণনাথ,
ভয়ে প্রাণ স্থির নহে ধড়ে।

শরীর হইল ক্ষুণ্ণ, চারি দিকে দেখি শূন্য,
মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে॥
ডাকে রামা অবিশ্রান্ত, কোথা গেলে প্রাণকান্ত,
শান্ত কর দেখা দিয়ে মোরে।
ক্ষমা কর পরিহাস, যায় হে জীবন আশ,
মরি আমি কানন ভিতরে॥"

কাব্যের গুণের কথা বলা হইল। এখন ইহার দোষের কথা কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে ২।৪টী ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হয় যথা,—

১—প্রসব হইল কন্যা শরদের কান্তি।
২—দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
৩—মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
৪—পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র।

উদ্ধৃত স্থলসমূহে "প্রসব, বিস্ময়, মোহ" প্রভৃতি বিশেষ্য পদগুলি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। "পূর্ণিত" এই পদটী ব্যাকরণদুষ্ট। কারণ পূর্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে, পূরিত আর পূর্ণ এই দুই পদ হইবে। এতদ্ভিন্ন এই কাব্যে অশ্লীলতাদোষও যথেষ্ট, তবে এই কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের স্থলবিশেষের বর্ণনার ন্যায় কুত্রাপি অনবগুণ্ঠন আদিরসের অবতারণা করেন নাই। অনেক স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ কবিতাগুলি অনাবশ্যকীয় আদিরসে কলুষিত করা হইয়াছে। আর এই কাব্যের নায়িকা দময়ন্তীকে অত্যন্ত তরলমতির ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বিরহে অধীর হইয়া কোকিল ভ্রমর প্রভৃতির উপর বড়ই মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিয়াছেন, সে তিরস্কারের বর্ণনা অতি দীর্ঘ এবং উহার ভাষাও অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং লজ্জাজনক, এ সমুদয়ই নৈষধকাব্যের অনুকরণের ফল।

বলা বাহুল্য এই কাব্য আদিরস-প্রধান। ইহাতে গৌণভাবে করুণরস প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এই কাব্যের নায়ক নল। অলঙ্কারশাস্ত্রে ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরললিত নামে যে চারি শ্রেণীর নায়কের বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে নল ধীরপ্রশান্ত নায়কের লক্ষণাক্রান্ত। কবি নায়কের চরিত্র বেশ কোমল ও উদারতা পূর্ণ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি কোন অবস্থায়ই আপন মহত্ত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। নল দেবগণের দৌত্যভার গ্রহণপূর্ব্বক বিদর্ভরাজের অন্তঃপুরে গিয়া দময়ন্তীর নিকট দেবগণের প্রার্থনা জানাইলে তিনি কোন প্রকারেই উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। তখন নল বলিতেছেন,—

"ঈষৎ হাসিয়া নল কহিছে বচন। অতি অনুচিত কথা কহ কি কারণ॥
ইহলোকে যাগযজ্ঞ ব্রত লোক করে। কামনা সবার অন্তে স্বর্গভোগ পরে॥
শত অশ্বমেধ ফলে হয় বজ্রধারী। তাহার রমণী হবে মান ভাগ্য করি॥"

নল যাঁহার লাভের আশায় ব্যাকুলভাবে দ্রুতগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক বিদর্ভ নগরে

গমন করিতেছিলেন, দেবগণের দৌত্যকার্য্যে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সেই একমাত্র প্রিয়তমা দময়ন্তীর নিকটে দেবতাদের অসমক্ষে ঐরূপ অকপটভাবে প্রার্থনা করা অতি মহত্ত্বের পরিচায়ক। এই কাব্যের নায়িকা দময়ন্তী,—তিনি স্বীয়া নায়িকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দোষের মধ্যে বড় প্রগল্‌ভা, যে সকল কথা সখীদের নিকটে বলিতে গিয়াও লজ্জায় মস্তক নত করা উচিত, তিনি অনায়াসে হংসের নিকটে ও দৌত্যকার্য্যে ব্রতী নলের নিকটে সেই সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সখীগুলি আবার ততোঽধিক নির্লজ্জ। নলের বিরহে দময়ন্তীর ভাবান্তর দর্শনে তাহারা উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে এমন ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল যে, তাহাদের বয়সের অযোগ্য ঐ সকল কথা পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুর্গামঙ্গল-কাব্য-রচয়িতা একজন কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই কাব্যে অনুপ্রাস, উপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারযুক্ত পদ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। এই প্রকার উৎপ্রেক্ষাকে মালারূপিণী উৎপ্রেক্ষা বলা যাইতে পারে। যথা,—

"সভা মধ্যে আসিয়া বসিল গুণাকর। তারকার মাঝে যেন শোভে শশধর॥
পতঙ্গ উদয়ে যেন পতঙ্গ লুকায়। গরুত্মান্-মাঝে গরুত্মান্ শোভা পায়॥
গর্দ্দভ নিকটে যেন তুরঙ্গের শোভা। মক্ষিকা নিকটে যেন গুঞ্জে মধুলোভা॥
ছাতারিয়া মাঝে যেন খঞ্জনের নৃত্য। প্রভুর অগ্রেতে যেন শোভা পায় ভৃত্য॥
খদ্যোতের তেজ লুপ্ত হয় দিবাভাগে। কুরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ কুক্কুরের আগে॥
নলের তেজেতে সবে হইল বিবর্ণ। রাঙ্গ মাঝে রূপা যেন পিতলে সুবর্ণ॥
কাচ মাঝে হীরা যেন স্ফটিকে মুকুতা। শেকুল কণ্টক মাঝে মালতীর লতা॥
সারসের শোভা ক্রৌঞ্চ কুমুদের মাঝে। রাজহংস শোভা পায় কাদম্বসমাজে॥
হেন্তাল কানন মাঝে শোভে নারিকেল। গাবের নিকটে যেন শোভা পায় বেল॥
গ্রহরূপ সভামাঝে শোভা পায় নল। রামচন্দ্র কহে দুর্গা পদে দেহ স্থল॥

এই কাব্যের বর্ণনায় ছন্দের চাতুর্য্যও নিতান্ত অল্প নহে। পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গপয়ার, চৌপদী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দ এই কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত ছন্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই কাব্যে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীসমাজের একটী সুন্দর চিত্র আছে। এখানে দময়ন্তীর বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান সময়ের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় আচার ব্যবহারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। আলিপনা দেওয়া, জলসাধা, গায়ে হলুদ, আইবড়-ভাত, চেদিরাজ বসুর পূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সাতপাক প্রদক্ষিণ প্রভৃতি সমুদয়ই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ছিল। যথা,—

"প্রভাতে উঠিয়া, হুলাহুলী দিয়া,
চলিল সহিতে রাণী॥
হুলাহুলী মুখে, রমণী কৌতুকে,
হেমঘট কার করে।
তৈল গুয়া পান, করিতে সম্মান,
চলে প্রতিবেশী ঘরে॥
আলিপনা দিয়ে, হেমঘট লয়ে,
জোড়-করে রাণী কয়।
কৃপা করি সবে, মোর বাড়ী যাবে,
দময়ন্তী-পরিণয়॥
গৃহস্থের নারী, ঘটে দিল বারি,
লৈল তৈল গুয়া পান।
হর্ষে রাজরাণী, লয়ে সয়া পানী,
নিজালয়ে পরে যান॥"

জলসাধার কথা শেষ হইল, বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"কদলীর তরু আরোপিল আগে আগে। বসাইল দময়ন্তী তার মধ্যভাগে॥
সাতপাক প্রদক্ষিণ করি রামাগণে। স্নান করাইল পরে মহাহর্ষ মনে॥
মঙ্গল আচার রমণীর কোলাকুলি। বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি জয় হুলাহুলি॥
দিবা অবসানকালে লগ্ন উপস্থিত। নলের বরণ করে নৃপতি ত্বরিত॥
বরণ করিয়া নলে লৈল নিজালয়। প্রাঙ্গনের মাঝে নল পীঠোপরি রয়॥
কুলবধূ কুলকন্যা লইয়া নৃপরাণী। বরণ করিতে যায় করে হেম ঝারি॥
ধুতূরার ফলখণ্ডে প্রদীপ জ্বালিয়া। কোন সহচরী লইল মাথায় তুলিয়া॥
গুড় চাল্ দিল অঙ্গে ঝালি ঝাড়া পাত। বাঁধিল নলের মন দময়ন্তী সাথ॥
বরণ করিয়া নিছাইয়া ফেলে পান। কোন কোন সহচরী পাক দিল কাণ॥
রাজার রমণী তবে খান মনকলা। নলের নিকটে দময়ন্তী লয়ে গেলা॥
সাতপাক ভ্রমি পরে নাড়িল ছায়নী। বদল করিয়া মাল্য করিল ছাড়নি॥
বর কন্যা দোঁহাকে আনিল সভামাঝে। রতির সহিত যেন অনঙ্গ বিরাজে॥
সতিল গঙ্গার জল কুশ দূর্ব্বা ফল। আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আর জল॥
দধি দুগ্ধ মধুর সহিত মধুপর্ক। বসন ভূষণ দিল যেন তুল্য অর্ক॥
অভয়ার প্রীতে রাজা কন্যা দান করে। শেষে নল দময়ন্তী চাহে পরস্পরে॥"

বিবাহ শেষ হইল, এখন বাসর ঘরের রঙ্গরসের কথার দুই চারি পংক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে বিশেষ কোন অশ্লীলতা নাই, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাসরঘর একপ্রকার

নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলারা এখন বড় আর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে চান না। অর্দ্ধ-শিক্ষিতারাও অনেক পরিমাণে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। এখন অনেক প্রসিদ্ধ স্থান হইতেও নব-পরিণেতা অক্ষত কর্ণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। আজকাল যাহা কিছু আছে, ইহার পরবর্ত্তী কবিগণের এ বিষয়ে লেখনী পরিচালনের বোধ হয় কিছুমাত্র সুযোগ ঘটিবে না। যাহাহউক "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বাক্যের অনুরোধে পূর্ব্বতন বাসরঘরের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনামাত্র উদ্ধৃত হইল।

"অন্তঃপুরে নারীগণ করয়ে কৌতুক। রাজার রমণী আসি দিলেন যৌতুক॥
ক্ষীরখণ্ডা ভোজন করয়ে দোঁহে মিলি। বাসরে বসিয়া বর কন্যা করে কেলি॥
কুসুম-শয্যায় নল জাগে বিভাবরী। কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী॥
আপনি রসিক নল তাহে রসকূপ। রসিকা সহিত রসে ভাষে নলভূপ॥
রসিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুঁটি। কোন কোন সহচরী দিল কাণলুটি॥
কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বূল পূরিয়া। কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া॥
রমণী যুবতী যত রসিকা সাগর। নল রাজা রসে ভাষে বিবাহ বাসর॥
এইরূপ নল রাজা জাগিল রজনী। বিরচিল রামচন্দ্র ভাবিয়া ভবানী॥"

এইখানেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

---

* এই প্রবন্ধ প্রায় মুদ্রিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় মেট্রপলিটান্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কবির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—"প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিণাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ৪ ভাই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৮৩ বৎসর হইবে। জয়ঘোষ নামে ইঁহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন। এই জয়ঘোষের পৌত্র এখন জমিদার। বাখরগঞ্জে তাঁহার জমিদারী আছে। জয়ঘোষের উৎসাহে যে সকল কবিতাগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে গৌরীবিলাস, দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তী), মাধবমালতী (মালতীমাধব) প্রভৃতি কাব্য প্রধান। এই সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। যদি কেহ তাঁহার গুরু রামচন্দ্রের কোন যাত্রা শুনিতে চাহিত, তাহা হইলে জয়ঘোষ তাহার বাটীতে আলোক প্রভৃতির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। রামচন্দ্রও যাত্রা উপলক্ষে কাহারও নিকট হইতে কিছু লইতেন না। প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের কাল হইয়াছে।" লোকের কথা ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দ্বিজ রামচন্দ্র নামক প্রবন্ধে দুর্গামঙ্গল গ্রন্থের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র-পাঠে উহা ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে পত্রের ১টী স্থলে সন্দেহ আছে, যাহাহউক, যদি এই পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে উহার ভূমিকায় অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকারের যথার্থ আবির্ভাব-কাল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

হরি ও সোম।

সংস্কৃত শাব্দিকেরা একই শব্দের অনেকার্থ প্রকাশ-স্থলে ‘শব্দশক্তি’ স্বীকার করিয়াছেন। এই শব্দদ্বারা এরূপ অর্থ প্রতীতি হউক, এ প্রকার ইচ্ছার নাম শব্দশক্তি। তাঁহারা এই শক্তিকে ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করেন। সংযোগাদিদ্বারা নানার্থ শব্দের অন্যতম অর্থের বোধ হইয়া থাকে। অনেকার্থধ্বনীমঞ্জরীতে—

"হরিরিন্দ্রো হরির্ভানুর্হরির্বিষ্ণুর্হরির্মরুৎ।
হরি সিংহো হরির্ভেকো হরির্বাজী হরিঃ কপিঃ।
হরিরংশুর্হরির্ভীরুর্হরিঃ সোমো হরির্যমঃ।
হরিঃ শুক্রো হরিঃ সর্পঃ স্বর্ণবর্ণো হরিস্মৃতঃ॥"

হরি শব্দের যে পঞ্চদশটি অর্থ লিখিত আছে, সেই সকলের একটির সহিত অপরটির যথাক্রমে কোন ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে কি না, অথবা কোন একটি মূলীভূত তাৎপর্য্যের ক্রমিক ভাববিকাশদ্বারা যথাক্রমে সকলগুলি অর্থেরই উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ নির্দ্ধারণ সম্ভবপর কি না, তাহা আমাদিগের শাব্দিকেরা অনুসন্ধান না করিয়াছেন, এমন নয়। প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগে শব্দ-ব্যুৎপাদিত করিবার জন্য তাঁহারা যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, পাণিনি, কাতন্ত্র প্রভৃতি ব্যাকরণই তাহার সাক্ষী; কিন্তু তাঁহাদের এতদ্বিষয়িণী চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই; তাঁহারা তদবধারণে অসমর্থ হইয়াই ঈশ্বরেচ্ছার উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। কৃতী সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য শব্দসমূহ বৃক্ষাদির ন্যায় রূঢ় জ্ঞান করিয়া কলাপসূত্রে কৃদন্ত শব্দের ব্যুৎপাদন করেন নাই। হরণার্থ "হৃ" ধাতু হইতে "হরি" শব্দ ব্যুৎপাদিত হইলেও, পাপনাশন শঙ্খচক্রধর হরির ধাত্বর্থের সহিত ভেকবোধক হরির যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহার তত্ত্ব তাঁহারা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কোন একটি শব্দের এক অর্থের সহিত অন্য অর্থের সাদৃশ্য দেখিয়া, সেই সাদৃশ্যের সিদ্ধান্তের চেষ্টা না করিয়া, তাহা যে ভাবের ক্রমবিকাশের ফল, ইহা শাব্দিকেরা কোনরূপে স্বীকার করেন না। আমরা জনৈক মৈথিল কবির রচনায় দেখিতে পাই,—

"হরি গরজল, হরি শুনল,
হরিক সবদ শুনি হরি চললাহ,
হরি বাটে ভেঁটল, হরি হরি গিরল,
হরিক প্রতাপে হরি বচলাহ।"

অর্থাৎ,—আকাশে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ভেক ডাকিতে লাগিল, ভেকের শব্দে সর্প (ভোজনার্থ) পথে যাইতে যাইতে ময়ূরের দেখা পাইল, ময়ূর সর্পকে গ্রাস করিল, এইরূপে ময়ূরের প্রতাপে (সর্পের আক্রমণ হইতে) ভেক রক্ষা পাইল।

উপরি উক্ত কবিতায় হরি শব্দের আকাশ, ভেক, সর্প ও ময়ূর এই চারিটি অর্থ একটি মূলীভূত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? আকাশের মেঘ-

গর্জ্জনই সেই মূলীভূত কারণ। মেঘ-গর্জ্জন হইতেই ভেকের ডাক, সর্পের আহারান্বেষণ-চেষ্টা, ময়ূর কর্তৃক সর্পনাশ ও ভেবের রক্ষা কল্পিত হইতে পারে'। ইহাই কি এ স্থলে ভাব-বিকাশের প্রণালী? এইরূপ রচনা পরিহাসপর হইলে, সকলে ইহার রসাস্বাদন করিয়া আমোদিত হইয়া থাকেন; কিন্তু ইহা শব্দার্থের উৎপাদক ও বিকাশক হইলে পণ্ডিতেরা ইহাকে আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থভাগের তৃতীয় সংখ্যায় যে হরিনামের শব্দতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, সে প্রবন্ধে তিনি হরি শব্দের সর্ব্ববিধ অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ইহার হরিদ্বর্ণ, সোম, অশ্ব ও বিষ্ণু এই চারিটি অর্থের ক্রমিক সম্বন্ধ এবং হরিদ্বর্ণের তাৎপর্য্যার্থের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া হরিদ্বর্ণকেই হরি শব্দের ঐ চতুর্ব্বিধ অর্থের মূলীভূত কারণরূপে স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেকার্থ-ধ্বনিমঞ্জরীতে এক স্বর্ণবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও হরি শব্দে হরিদ্বর্ণও বুঝায়। যথা মেদিনী,—
"বাচ্যবৎপিঙ্গহরিতোঃ"।

বটব্যাল মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সোমলতা হরিদ্বর্ণ। ইহার তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। গ্রন্থে সোমলতার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে অংশুমান্, রজতপ্রভ, কনকাভ ও বিচিত্রবর্ণমণ্ডলচিত্রিত এই কয়েকটি বিশেষণে বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। ইহাদের একটিও হরিদ্বর্ণ জ্ঞাপক নহে; সুতরাং প্রমাণ ভিন্ন সোমের হরিদ্বর্ণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বৈদ্যক শাস্ত্রে সোম ওষধিরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ওষধি শব্দে জ্যোতির্লতা ও ফল-পাকান্ত বৃক্ষাদি বুঝায়। রাত্রিকালে যে সকল লতা উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, সে সকলকে জ্যোতির্লতা কহে। সবুজবর্ণের অন্ধকার রাত্রিতে দীপ্তি কবির কল্পনায়ই শোভা পায়। সোম শব্দের নানার্থ। যথা হেমচন্দ্র,—

"সোমস্ত্বোষধীতদ্রসেন্দুষু,
দিব্যৌষধ্যাং ধনসারে সমীরে পিতৃদৈবতে,
বসুপ্রভেদে সলিলে বানরে কিন্নরেশ্বরে।"

যে সোমের রস পানীয়, সেই সোম "এক প্রকার খর্ব্বাকার বৃক্ষ" নহে, উহা লতা; এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয় না। ভট্টিকাব্যের টীকায় "সোমরসং সোমলতানিষ্কৃষ্টং যজ্ঞীয়ং পানীয়-বিশেষং" সোমরসের এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সোমলতার পঞ্চদশটি পত্র। চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির ন্যায় সোমলতারও ক্ষয়-পক্ষে প্রতিদিন এক একটি পত্রের ক্ষয় হইতে থাকে, এবং বৃদ্ধি পক্ষে প্রতিদিন এক একটি পত্রের উৎপত্তি হইতে থাকে। চরকসংহিতায় ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"সোমনামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ,
স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ।"

সোমের (চন্দ্রের) ন্যায় পক্ষভেদে হ্রাস বৃদ্ধি আছে বলিয়াই এই লতার নাম সোম হইয়াছে।

থাকিবে। সোমলতা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। ইহাদের মধ্যে অংশুমান্, ঘৃতগন্ধ, রজতপ্রভ, কদলীকন্দবৎকন্দ, মুঞ্জবান্, লশুনপত্র, চন্দ্রমা ও কনকাভ, এই অষ্টবিধ সোম জলে জন্মে। কতিপয় জাতীয় সোম বৃক্ষে জন্মে; ইহারা বৃক্ষাগ্রে অহিনির্ম্মোকবৎ লম্বমান দৃষ্ট হয়। অপরাপর জাতীয় সোম বিচিত্র বর্ণসমূহে চিত্রিত। সর্ব্বজাতীয় সোমেরই পঞ্চদশটি পত্র; সকলই ক্ষীরকন্দ ও লতাবৎ। মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, হিমালয়, পারিযাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতে এই সকল সোমের জন্ম। চন্দ্রমা-সোম সিন্ধুনদে শৈবালবৎ ভাসমান দৃষ্ট হয়। মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ সোম সিন্ধুনদেও পাওয়া যায়। ত্রৈষ্টুভ-পাংক্ত, জাগত ও শাক্বর প্রভৃতি সোম কাশ্মীরে ও ক্ষুদ্রমানস-সরোবরে পাওয়া যায়। গ্রন্থে এরূপই যজ্ঞীয় বা ওষধিরাজ সোমের বিবরণ দৃষ্ট হয়। সোমলতা ভারতবর্ষের কোথাও জন্মে কিনা, তাহা আমি অবগত নহি। শুনিয়াছি, কাশ্মীরে অদ্যাপি সোমলতা পাওয়া যায়; কিন্তু এই কথাটি কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

বটব্যাল মহাশয় প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা সোমের পরিবর্ত্তে পুতিকা (পুঁইশাক) ব্যবহার করেন, তাহাই এখন 'সোমলতা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" পরলোকগত রমানাথ সরস্বতীও তদীয় ঋগ্বেদ-সংহিতার এক স্থলে "সোমাভাবে পুতিকামভিষুনুয়াৎ" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"ষড়বিংশব্রাহ্মণেও মীমাংসাশাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পূতিকা (পুঁইশাক) বিধান আছে।" পুতিকা (পুত্তিকা) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র মক্ষিকা। "পুতিকা" না হইয়া ইহা "পুঁতিকা" হইলে, ইহার (১) পুঁইশাক, (২) পুতিকরঞ্জলতা এবং বিড়ালী, এই ত্রিবিধ অর্থ অভিধানে দৃষ্ট হয়। অভিধানে "সোমপুত্তিকা" নামেও একটি শব্দ আছে; ইহার অর্থ,—"পুতিকরঞ্জলতা যজ্ঞে সোমলতার প্রতিনিধি হইয়া থাকে"—এরূপ লেখা আছে। পুঁইশাক কোন ক্রমেই সোমলতার অনুকল্প হইতে পারে না। "পুতিকা ব্রহ্মঘাতিকা", ইহা জানিয়াও কোন ব্রাহ্মণ পুঁইশাক ব্যবহার করিবেন কি? কুসুমফুল, শ্বেতকলমী, শ্বেতবেগুণ ও পুঁইশাক ভোজন করিলে বেদপারগ দ্বিজও পতিত হন, ইহাই স্মৃতির শাসন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"কুসুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পুতিকাং তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজ॥"

সোম দেবতার পানীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সোম সোমলতার রস না অমৃত তাহাই বিচার্য্য। যজ্ঞীয় সোমরস দেবভোগ্য অমৃতের অনুকল্প কিনা তাহাও বিচার্য্য। বটব্যাল মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন যে, "ইন্দ্র একজন উৎকৃষ্ট নিরাকার দেবতা"। হরিহর ইন্দ্র নিরাকার হইয়াও সোমলতার রসপানের লোভে প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় ঘোড়ায় বা রথে চড়িয়া অনিবার্য্যবেগে কিরূপে যজ্ঞস্থানে আগমন করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—"ইন্দ্র কি বাস্তবিকই তীব্র সোমরস চুমুক দিয়া পান করিতেন বলিয়া সে কালের ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন? কদাচ নহে।" আমি বুঝি যে,—আবাহনই ইন্দ্রের আগমন;

বিসর্জ্জনই ইন্দ্রের গমন; সংস্কার-সিদ্ধতার জন্য এইরূপ আবাহন-বিসর্জ্জনাদির প্রয়োজন আছে; ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, গঙ্গাজলে গঙ্গার আবাহন। আমি বুঝি যে,—দেবতা মন্ত্রাত্মক, তাঁহার বাহনও মন্ত্রাত্মক, আবাহন-বিসর্জ্জনাদি উপাসকের সংস্কারসিদ্ধি, দেবতার সোমরসাদি-পান উপাসকের চিত্তশুদ্ধি বা প্রয়োজন-সিদ্ধি। দীক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই এইরূপ ধারণা।

যদি হরি শব্দে বাস্তবিকই যথাক্রমে হরিদ্বর্ণ, সোম, ইন্দ্রের বাহন অশ্ব এবং যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে বুঝাইত, তাহা হইলে বেদেই হউক, কি কোন সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থেই হউক, হরি শব্দের এইরূপ ক্রমিক অর্থজ্ঞাপক প্রয়োগ অবশ্যই থাকিত। বটব্যাল মহাশয় এতদ্বিষয়ের এরূপ প্রয়োগ উদ্ধৃত করেন নাই। বটব্যাল মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"মাদক' হরি চিরকালই গানের উদ্দীপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মনে করেন, যে বস্ত্রহরণ বা পাপহরণ করাই হরির 'হরিত্ব', তাহা নহে। বস্ত্রহরণ ও পাপহরণ দুইটিই আমার মতে কল্পনামাত্র। হরির হরিত্ব বাস্তবিক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের মূল।"

গানের উদ্দীপনেই যদি হরির "হরিত্ব" প্রকাশ হইত, তাহা হইলে অষ্টাঙ্গযোগের কোন সার্থকতা থাকিত না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হরণার্থ "হৃ" ধাতু হইতে হরি পদ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং—

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ।"

হরি রুদ্ররূপেই যে কেবল সংহার করেন, তাহা নহে, পালনেও দণ্ডনীতির আবশ্যকতা আছে। অনুলোমক্রমে প্রকৃতির বিকৃতিই সৃষ্টি, আর বিলোমক্রমে লয়-সাধনই ক্রমিক মুক্তি। এই মুক্তি উপাস্য দেবতার কৃপাসাপেক্ষ। এইরূপ কৃপাই ভক্তের সম্পত্তি। সোমরসের মত্ততায় উদ্দীপন হয়, বলিয়া যদি হরির "হরিত্ব" হইত, তাহা হইলে কেহই বোধ হয় ধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিতেন না। হরির পাপহরণ-রূপ কার্য্য উপাসকের একমাত্র ভরসা, ইহাতেই উপাস্য ও উপাসকে সম্বন্ধ এবং এই নিমিত্তই উপাসক শোকদুঃখ উপেক্ষা করিয়াও একমাত্র হরিপাদপদ্ম ভরসা করিয়া থাকেন।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

ইতিহাস-রচনার প্রণালী।

ইতঃপূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহার এক স্থলে উল্লেখ ছিল—"সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। বেগবতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্ব্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন একদিকে তাঁহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিকৃষ্টতর মানব-চরিত্রও সেইরূপ তাঁহার রসময়ী কবিতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কবিতা প্রায়ই উদ্ভাবনা উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। উহা বিমল স্রোতস্বতীর ন্যায় যেরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ আবেগময় হইয়া থাকে। * * * বাল্মীকি বা হোমর যাহা দেখেন নাই, কল্পনাবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু বাল্মীকি বা হোমর কাব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। সভ্যতার আদিম অবস্থা মানুষকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর কবিত্বময় করে।" এইরূপ সারল্যময় ভাব, এইরূপ প্রতিভা, এইরূপ কল্পনার জন্য আমরা সমাজের আদিম অবস্থায় সরল ও স্বাভাবিক কাব্য দেখিতে পাই। সমাজ যত উন্নত হয়, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও ইতিহাসাদির তত উন্নতি হইতে থাকে।

কিন্তু প্রাচীন সমাজে কবিতার প্রাধান্য থাকিলেও যে, ইতিহাসের উৎপত্তি হয় নাই, এমন নহে। প্রাচীন সময়েও হিরদোতস্, থুসিদাইদিশ, জেনোফন্ এবং লিবি প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা যে সকল ইতিহাস লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের গৌরব বর্ত্তমান সময়েও অন্তর্হিত হয় নাই। যাহাহউক, সাধারণতঃ প্রাচীন সময়ে লোকের হৃদয় কবিত্বের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কবি কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া, যে সকল বিষয় সজ্জিত করেন, উত্তরকালে ঐতিহাসিক তৎসমুদয় হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের প্রতিভাবলে যে দুই মহাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক তাহা হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাচীন স্তর উদ্ঘাটন করিলে, আমরা কাব্যের মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হই। দরিদ্র মুকুন্দরামের সংগীতের সহিত তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের ইতিবৃত্ত জড়িত রহিয়াছে। আদি কবি কৃত্তিবাসের গ্রন্থের বিশ্লেষণ করিলেও, সেই সময়ের বাঙ্গালীচরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীনকালে যাঁহারা ইতিহাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যুক্তিপ্রণালীর সন্নিবেশে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগের উপর প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। জ্ঞানসংগ্রহে

ইউরোপের আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের যেরূপ সুযোগ আছে, গ্রীস বা রোমের ঐতিহাসিক-দিগের যেরূপ সুযোগ ছিল না। হিরদোতস্ যে সময়ে আবির্ভূত হয়েন, থুসিদাইদিস্ যে সময়ে পিলোপনিসসের যুদ্ধের বর্ণনায় ব্যাপৃত থাকেন, জেনোফন্ যে সময়ে দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণে স্বকীয় লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দেন, সে সময়ে সমাজ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন হয় নাই; রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে লোকে অধিকতর জ্ঞান লাভ করে নাই; রাজ্যের বিবিধ শৃঙ্খলা বা বিপ্লব লোকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই; বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের পথ তাদৃশ সুগম হইয়া উঠে নাই; বিবিধ স্থানের জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপপরিচয়েরও তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই। ক্রমে সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন সময় অপেক্ষা আধুনিক সময়ে সংসারের সমস্ত বিষয় জানিবার অধিকতর সুযোগ ঘটিয়াছে। বাণিজ্যের বিস্তার হইয়াছে। অধিকাংশ দেশ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গন্তব্য পথ নিরাপদ ও সুগম হইয়াছে। বিভিন্ন জনপদের জ্ঞানী ব্যক্তি-দিগের সহিত আলাপপরিচয়ের সুবিধা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করাও অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের পক্ষে এই সকল সুযোগ অল্পলাভজনক নহে। প্রাচীন কালের ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এ সকল সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ জ্ঞানসংগ্রহে ও বহুদর্শিতালাভে আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা এক দিকে যেমন অধিকতর প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ মার্জ্জিত ভাব ও দূরদর্শিতায় আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের নিম্নগণ্য হইয়া-ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসের সহিত আধুনিক ইতিহাসের লিপিপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ এই বুঝা যায় যে, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যেমন বৈজ্ঞানিকভাব, দার্শনিক তত্ত্ব ও মার্জ্জিতলিপিকৌশলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ সেইরূপ প্রতিভায়, উদ্দীপনায় ও সারল্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আধুনিক সময়ে জ্ঞানলাভের যেরূপ সুযোগ হইয়াছে, প্রাচীন সময়ে সেরূপ ছিল না। প্রাচীনকালে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ সর্ব্বত্র জ্ঞানবিস্তারে তৎপর থাকে নাই। বিজ্ঞানের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন জনপদ সকল একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে নাই। জ্ঞানরাজ্যের অধিনায়কগণ পরস্পরের মনোগত ভাবের আদানপ্রদানের তাদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রাচীনকালে যাঁহারা জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, উদ্ভাবনা ও গবেষণায় যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগকে বহু কষ্টে মিশর প্রভৃতি দেশে যাইতে হইত। তাঁহারা সেই সকল জ্ঞানচর্চ্চার স্থানে অভীষ্ট বিষয়সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা দার্শনিক, ধর্ম্মযাজক, কবি প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন এবং স্বদেশীয়দিগকে আপনাদের বহুকষ্টলব্ধ বহুমূল্য বিষয়ের পরিচয় দিতেন। স্বদেশীয়গণ তাঁহাদের গুণের সম্মান করিতে কখনও বিমুখ হইত না। যাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের

প্রভাবে, যাঁহাদের অপরিসীম স্বার্থত্যাগে, যাঁহাদের সংগৃহীত জ্ঞানে স্বদেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে এবং স্বদেশীয়গণ নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহারা স্বদেশে আধুনিক কৃতবিদ্য লেখকগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতেন। হিরদোতস্ আপনার ইতিহাস পাঠ করিয়া সমগ্র গ্রীশে জয়পত্রে শোভিত হইয়াছিলেন। পিলোপনিসাসের যুদ্ধে এথেন্সের সৈনিকগণ সিসিলিতে পরাজিত হইলে বন্দীদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। যে সকল বন্দী এথেন্সের প্রসিদ্ধ কবি ইউরিপাইদিসের কবিতার আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিল, তাহারা মৃত্যুমুখে পাতিত হয় নাই। বিজেতারা এথেন্সের প্রসিদ্ধ কবিকে সম্মানিত করিবার জন্য এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছিল।

প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক কবি প্রভৃতি এইরূপে সম্মানিত হইতেন। কল্পনার প্রাধান্য-সময়েও ইতিহাসের সম্মান এইরূপ অক্ষুণ্ন ছিল। এখন সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর সহিত যেরূপ দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নানাগ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইতেছে, সেইরূপ ইতিহাসও সাহিত্যক্ষেত্রে স্থানপরিগ্রহ করিতেছে। পাশ্চাত্যশিক্ষায় এখন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের মধ্যে ইতিহাস প্রভৃতির অনুশীলন হইতেছে। সাহিত্য-সংসারের কর্ম্মবীরগণ কেবল কল্পনারাজ্যে বিচরণ না করিয়া প্রকৃত ঘটনার আলোচনাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। এখন বঙ্গীয় সাহিত্যের যেরূপ অবস্থান্তর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় লিপিপ্রণালীর আলোচনা বোধ হয় অসাময়িক বলিয়া বোধ হইবে না।

শ্রোতার মন আপনার দিকে আকর্ষণ করা যেমন বাগ্মীর প্রধান কর্ত্তব্য, সেইরূপ মানবজাতির শিক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ সত্যের সম্মান রক্ষা করা ঐতিহাসিকের প্রধান কার্য্য। ইতিহাসলেখক যে বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে সেই বিষয়টি পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। তিনি পক্ষপাতের বশীভূত হইবেন না, অতিরঞ্জনদোষ প্রকাশ করিবেন না, কোন বিষয় অস্পষ্টভাবে রাখিবেন না, বা কোন বিষয়ে সত্যের সীমা অতি-ক্রম করিয়া, চাপল্যের পরিচয় দিবেন না। ঐতিহাসিক সর্ব্বক্ষণ ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া, কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন। তিনি আপনার বর্ণনীয় চিত্রে কল্পনার প্রশ্রয় দিবেন না। তাঁহার গন্তব্যপথ যেরূপ সরল, সেইরূপ আবর্জ্জনাশূন্য হইবে। তিনি এরূপ ধীরভাবে এবং এরূপ অপক্ষপাতে অতীত ঘটনাবলী ও লোকচরিত্রের বর্ণনা করিবেন যে, পাঠকের হৃদয়ে যেন মানবপ্রকৃতির প্রকৃত ও সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়।

কেবল কতকগুলি ঘটনার সন্নিবেশ ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাঁহারা কেবল সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঘটনাবলীর তালিকা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা ইতিহাসের তত্ত্বজ্ঞ নহেন। প্রকৃত ইতিহাস লোকসমাজের দর্পণস্বরূপ। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের সূক্ষ্ম-দর্শিতার বিস্তার করা, এবং মানবের কার্য্যপরম্পরা সম্বন্ধে পাঠকের বিচারশক্তির উন্মেষ করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহা যেমন জাতীয় জীবনের পরিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য

করে, সেইরূপ সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধেও আমাদিগকে নানা উপদেশ দিয়া থাকে। সুতরাং ইতিহাস কথা-গ্রন্থ নহে। ইহাতে কল্পনাচাতুরী বা অতিবর্ণনার উচ্ছ্বাস দেখাইতে হয় না এবং অলঙ্কারচ্ছটায় সত্যকে আচ্ছাদিত করিবারও প্রয়োজন ঘটেনা। ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যই ইহার প্রধান অলঙ্কার।

ঐতিহাসিককে সর্ব্বাগ্রে বর্ণনীয় বিষয়গুলির মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিতে হয়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক যে বিষয়ে ইতিহাস লিখিবেন, তাহা যেন অসম্বদ্ধঘটনায় পরস্পর পৃথক্ হইয়া না পড়ে। ইতিহাসে কোন বিশেষ প্রণালী অনুসারে সমস্ত ঘটনাগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইবে। ইতিহাসবর্ণিত বিষয় যেন সমগ্রভাবে পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত হয়। একখানি সুচিত্রিত আলেখ্য সমগ্রভাবে দর্শকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে তাঁহার যেমন তৃপ্তিলাভ হয়, একসূত্রে গ্রথিত, পরস্পর সুশৃঙ্খলভাবে সম্বদ্ধ বিষয়েও পাঠকের সম্মুখে সমগ্রভাবে উপস্থিত হইলে তাঁহার জ্ঞানপিপাসার সেইরূপ পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। উপদেশসংগ্রহ বা আনন্দলাভ, পাঠকের ইতিহাসপাঠের যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন, ঘটনাবলীর একটী সুশৃঙ্খলা ও সম্পূর্ণ ভাব মনোমধ্যে উদিত না হইলে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

যে সকল ইতিহাসে সমগ্র জাতি বা সমগ্র সাম্রাজ্যের বিবরণ বর্ণনীয় হয়, সেই সকল ইতিহাসে, বিভিন্ন সময়ের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা বা একতা রাখা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সুনিপুণ ঐতিহাসিক এই দুঃসাধ্য বিষয়েও কৃতকার্য্য হইতে পারেন। বিভিন্ন প্রকৃতির ঘটনাগুলি একত্র করিতে যদিও গোলযোগ উপস্থিত হয়, তথাপি ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যে সকল প্রধান ঘটনার মধ্যে বিসৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে একতা রাখা যাইতে পারে। রাজবংশের ইতিহাসে প্রত্যেক রাজার রাজত্বেই পরম্পরসম্বদ্ধ ঘটনা থাকে। বিশেষ লক্ষ্যানুসারে উহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে একটী শৃঙ্খলা দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসূত্র হইতে কিরূপে ঐ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত কিরূপে উহার সন্নিবেশ হইবে, তৎসমুদয়ের বিচার করিলে আমরা সমগ্র বিষয়ের মধ্যে একটী ধারাবাহিক শৃঙ্খলা রাখিতে পারি। ভারতবর্ষের পরস্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলি অধিকারপূর্ব্বক একটী বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বপ্রধান হইয়া, সেই সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করা সম্রাট্ অকবরের লক্ষ্য ছিল। বিভিন্ন জনপদজয়েই হউক, রাজপুতদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনেই হউক, ধর্ম্মমত প্রচারেই হউক, বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি সমদর্শিতা প্রকাশেই হউক, সমগ্র ঘটনার মধ্যেই তাঁহার এই অসীম আত্মপ্রাধান্যের ভাব নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসূত্র হইতে কি রূপে এই আত্মপ্রাধান্য ভাবমূলক ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে, পরবর্ত্তী ঘটনাস্রোতে এই বিষয়ের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে আমরা মোগলরাজত্বের ইতিহাসে ধারাবাহিক শৃঙ্খলা দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার সম্প্রসারিত করা এবং একটী বিশাল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা রোমকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রোমকেরা অবিচ্ছিন্ন ভাবে যে শক্তির পরিচয়

দিয়াছিল, এবং যে কার্য্যপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহাই লিবিকে বহুবিধ বিভিন্ন প্রকৃতির ঘটনাবলীর মধ্যেও, রোমের ইতিহাসে একতা রাখিতে সমর্থ করিয়া তুলিয়া ছিল। রাজশক্তির সমক্ষে প্রজাশক্তির প্রাধান্য রক্ষা করা ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রধান লক্ষ্য। ইংলণ্ডের লোকে ঐ লক্ষ্যানুসারেই আপনাদের শক্তির বিনিয়োগ করিয়াছে। জনসাধারণ আপনাদের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছে, তদ্দারা গ্রীণ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন।

মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, রাজনৈতিক বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। ইতিহাসলেখককে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা করিতে হয়। প্রথম গুণটী না থাকিলে এই সমালোচনা সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত ও সমীচীন হয় না। রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার সময়ে দ্বিতীয়টির আবশ্যকতা দেখা যায়। রাজনৈতিক বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা এবং রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় জানিবার সুযোগ না থাকাতে প্রাচীনকালের ইতিহাসলেখকগণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে আপনাদের অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের ভূয়োদর্শিতা যেরূপ সীমাবদ্ধ, উপকরণও সেইরূপ অল্প ছিল। তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগকে সন্তোষিত করিবার জন্য ইতিহাস রচনা করিতেন। ভিন্নদেশবাসীদিগের সহিত তাহাদের কোনও সংস্রব ছিল না। অধিকন্তু এখন যেমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তেমন ছিলনা। এই সকল কারণে আমরা গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের নিকটে উক্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ জানিতে পারি না। গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সম্পত্তি, রাজস্ব ও সৈনিক বল কি রূপ ছিল, কি কি সূত্রে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত আর কি ভাবে একরাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের অসম্পূর্ণ বিবরণ গ্রীসের প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়।

বর্ণনা-কৌশলের পরিচয় দেওয়া ঐতিহাসিকের অন্যতম প্রধান গুণ। ইতিহাসের বর্ণনা যেরূপ সরল ও সুন্দর, সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্বাভাবিক হইবে। ঐতিহাসিক লিপিকুশল হইলে এ বিষয়ের উদ্দীপনা প্রকৃতি গুণের যথোচিত পরিচয় দিতে পারেন। এই গুণ দেখাইতে হইলে ঐতিহাসিক যে বিষয়ের ইতিহাস লিখিবেন, সেই বিষয় প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিবেন। সমগ্র বিষয়টী যেন তাঁহার নখদর্পণে প্রতিফলিত হয়। কোন্ স্থানে কোন্ ঘটনার সন্নিবেশ করিতে হইবে, ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কি রূপ শৃঙ্খলা রাখিতে হইবে, এক ঘটনা হইতে আর এক ঘটনার উৎপত্তি স্থলে কি রূপে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে, তাহা যেন ইতিহাসলেখকের মনে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকে। এইরূপে সমগ্র বিষয় আয়ত্ত করিয়া, ইতিহাসলেখক বর্ণনাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিবেন। পাঠমাত্র যেন

বিষয়টী একখানি সুস্পষ্ট আলেখ্যের ন্যায় পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে পতিত হয়। এই গুণ না থাকিলে ইতিহাস কোনও অংশে পাঠকের সন্তোষজনক বা শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে না। বর্ণনা কোন্ স্থলে সংক্ষিপ্ত, কোন্ স্থলেই বা বিস্তৃত করিতে হইবে, ঐতিহাসিক সাবধানে তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। পাঠকও অযথাস্থলে বর্ণনার অতি বিস্তৃতিতে বিরক্ত এবং প্রয়োজনের স্থলে বর্ণনার সংক্ষিপ্তভাবে অপরিতৃপ্ত না হয়েন।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বর্ণনাবৈচিত্র্যে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ইতিহাসলেখকদিগের ঐতিহাসিক বিষয়ঘটিত বর্ণনা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনার অনুকরণ করিয়া মেকিয়াবেল, দেবিকা, ফাদার পল প্রভৃতি ইতালীয় ঐতিহাসিকগণ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আধুনিক কালে ফ্রান্সের ইতিহাসলেখকগণ এইরূপ ঐতিহাসিক বর্ণনায় স্বদেশের সাহিত্য সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে গিবন প্রভৃতি প্রধান ঐতিহাসিকগণ এই পথের পথিক হইয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বর্ণনার সময়ে ঐতিহাসিক আপনার অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইবেন না। তাঁহার রচনা যেরূপ গভীর ভাবপূর্ণ, সেইরূপ পরিমার্জ্জিত এবং কোমলত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত হইবে। উহা নিম্নশ্রেণীর লোকের ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দে ভারাক্রান্ত বা গ্রাম্যতাদোষে কলুষিত হইবে না। উহার কোন স্থলে রহস্যঘটিত তরলরসময়ী কথার প্রয়োগ থাকিবে না। ফলতঃ ইতিহাসের ভাষা যেরূপ সরল সেইরূপ গম্ভীর হইবে। উহা কখনও লালিত্য বা মাধুর্য্যে বিসর্জ্জন দিবে না। উহা অগ্রে বা পশ্চাতে, দক্ষিণে বা বামে কখনও হেলিয়া পড়িবে না। রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা রাজ্ঞীর ন্যায় উহা সর্ব্বদা আপনার গাম্ভীর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিবে।

ঐতিহাসিক যখন আপনার ইতিহাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়গুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন, তখন তিনি তৎসমুদয় সম্বন্ধে উপযুক্তস্থলে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকিবেন না। অভিমত প্রকাশের সময় তাঁহাকে অপক্ষপাত বিচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য এবং তাঁহার বিচারশক্তি ও পক্ষপাত-শূন্যতা এই সময়ে যেন পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হয়। তিনি পাঠককে রাজ্যশাসনপ্রণালী ও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত পরিচিত করিবেন। পাঠক তাঁহার নিকটে রাজ্যের সৈনিকবল, রাজস্ব প্রভৃতির বিষয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের সহিত সম্বন্ধ অবগত হইয়াছেন। এই সকল বিষয়ের সহিত লোকচরিত্র সম্বন্ধেও পাঠকের জ্ঞানলাভ হইয়াছে। পাঠক সমুদয় বিষয় আপনাদের সম্মুখে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে আপনি মতামত নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঐতিহাসিককে সবিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে হয়, তাঁহার অসঙ্গত বাক্যে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, তাঁহার পক্ষপাতে পাঠক তৎপ্রতি হতশ্রদ্ধ না হয়েন, বা তাঁহার চাপল্যে পাঠকের বিরক্তি না জন্মে, ঐতিহাসিক তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

ঐতিহাসিককে অনেক সময়ে বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণ করিতে হয়, এবং কোন প্রধান

ঘটনার মূল-নির্ণয় এবং প্রকৃতিনির্দ্দেশের সময়ে ইতিহাসলেখক ভিন্ন ভিন্ন মত সংগ্রহ করিয়া উহার সঙ্গতি অসঙ্গতি দেখাইতে পারেন। ঐতিহাসিক ঈদৃশস্থলে সবিশেষ ধীরতা প্রকাশ করিবেন। অপরের মত সমর্থন বা মতখণ্ডন সময়ে আত্মম্ভরিতা বা আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়ে ঐতিহাসিকের চিরন্তন সম্মান ও মর্য্যাদা নষ্ট হয়। ঐতিহাসিক উত্তম পুরুষকে প্রাধান্য না দিয়া, সংযতভাবে অধম পুরুষের অনুসরণ করিবেন। স্বদেশের ইতিহাস-প্রণয়ন কালে ঐতিহাসিক যেন অনুচিত স্বদেশ ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া না পড়েন, স্বদেশীয় লোকের চরিত্র-বর্ণনায় বা স্বদেশের সহিত অপর দেশের তুলনায় তিনি প্রশান্তচিত্ত বিচারকের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। ঐতিহাসিক দার্শনিক ভাবে বিষয়-বিশেষের আলোচনা করিতে পারেন। দার্শনিক ভাবের সহিত নীতির সংযোগ থাকা উচিত। ঐতিহাসিক নীতির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি যখন যে বিষয়ের বর্ণনা করুন না কেন, ধর্ম্মমূলক সুনীতি যেন তাঁহার নিত্য সহচরী হয়। নীতিজ্ঞানে পাঠকের হৃদয় উন্নত করা এবং তাঁহাকে সংসারের উৎকৃষ্টতর বিষয়ের দিকে প্রবর্ত্তিত করা ইতিহাসের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক এই উদ্দেশ্য সাধনে মনোযোগী হইবেন।

চরিত্রাঙ্কন ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহা যেমন কষ্টসাধ্য, সেইরূপ ইহা ইতিহাসের গৌরবজনক। চরিত্রাঙ্কনে ঐতিহাসিকের লিপিচাতুর্য্য ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রাঙ্কনকালে পরস্পর বিরোধী অনেক বিষয় উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল বিরোধী বিষয়ের মধ্যে চরিত্রের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতে হয়। ইহা যদি কোন স্থলে অতিরঞ্জিত হয়, তাহা হইলে লেখকের লিপিকৌশল ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ফলতঃ যাহাতে মানব-চরিত্র উজ্জ্বলরূপে পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত হয়, সুনিপুণ ঐতিহাসিক তদ্বিষয়ে সবিশেষ কৌশল প্রকাশ করিবেন। তাঁহার রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল, সেইরূপ মাধুর্য্য ও লালিত্যগুণবিশিষ্ট হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রকার অস্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিবেন এবং অনুচিত ও অযথা স্থানে সন্নিবেশিত অলঙ্কারে রচনার সৌন্দর্য্যহানি না হয়, তদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবেন। প্রাচীন কালের দুইজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সালাষ্টী এবং তাসিতাস্ উভয়েই ইতিহাসের এইরূপ রচনায় পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরকালে গিবন প্রভৃতিও ইহাতে অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় নির্দ্দেশে ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। তিনি আপনার বর্ণনীয় ঘটনা সুস্পষ্ট এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত সুসম্বদ্ধ করিবার জন্য, অব্দ, মাস বা তারিখের উল্লেখ করিবেন; কিন্তু ঐতিহাসিক যদি কেবল সময় নিরূপণে ব্যাপৃত থাকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুণপনা প্রকাশ হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পর শৃঙ্খলা থাকিবে। এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ঘটিয়াছে বলিয়াই যদি ঐতিহাসিক কেবল সময়নিরূপণপূর্ব্বক

উহার তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে পাঠককে যেরূপ ক্লান্ত, সেইরূপ বিরক্ত হইতে হয়। ফলতঃ ইতিহাসলেখক ঘটনামালা পরস্পর সুসম্বদ্ধ করিয়া সময়নির্দ্দেশপূর্ব্বক উহা পাঠকের সম্মুখে প্রকাশ করিবেন।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে যে সকল অলঙ্কারে সজ্জিত করিতে যত্নশীল হইতেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে একটী বিষয় আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, ইতিহাস-বর্ণিত কোন প্রধান ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। এইরূপ বক্তৃতায় ঐতিহাসিক ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের উদ্ঘাটন করেন। সাধারণকে ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং বিভিন্ন দলের মতামত নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। থুসিদাইদিস্ এইরূপ বক্তৃতাপ্রণালীর সমর্থক। তিনি স্বকীয় ইতিহাসে এইরূপ বক্তৃতায় যথোচিত উদ্দীপনার পরিচয় দিয়াছেন। অন্যান্য গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকও আপনাদের ইতিহাসে এইরূপ বক্তৃতার সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতা প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগের বাক্যবিন্যাসকৌশল এবং ওজস্বিতা ও লালিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় স্থল। কিন্তু বাক্‌বিভূতিতে হৃদয়গ্রাহী হইলেও, উহা ইতিহাসে সন্নিবেশিত করা তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। লেখক এইরূপ স্থলে সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। তিনি ঐ সকল বক্তৃতা পল্লবিত ও অলঙ্কার-ছটায় সুশোভিত করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। ঈদৃশ বিষয় কল্পনার লীলাক্ষেত্র কাব্য প্রভৃতিতে স্থান পাইতে পারে। ইতিহাসের ন্যায় প্রকৃত ঘটনামূলক বিষয়ে ইহা সন্নিবেশিত না করাই ভাল।

ইতিহাস লিখিতে হইলে কি কি বিষয় দৃষ্টি রাখা উচিত, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। আমাদের দেশে এখন ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইয়াছে। কাব্য-নাটক-প্লাবিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কেহ কেহ ইতিহাসের সম্মান-রক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা যেরূপ গবেষণা-কৌশলের পরিচয় দিতেছেন, ইতিহাসের প্রকৃতির দিকে সেরূপ দৃষ্টি রাখিতেছেন না। সর্ব্বপ্রথম কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে যে ত্রুটী ঘটিয়া থাকে, আমাদের সাহিত্য-সমাজে ঐতিহাসিকদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। ভাষা, শৃঙ্খলা এবং বর্ণনা প্রভৃতিতে ইঁহাদের তাদৃশ নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ইঁহাদের গ্রন্থে অতিরিক্ত স্বদেশপ্রেম এবং অত্যধিক অহং-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা ঘটনাগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করিতেছেন, কিন্তু বর্ণনাবৈচিত্র্য বা শৃঙ্খলার অভাবে ঐ সকল ঘটনার বিবরণ নিরতিশয় নীরস হইয়া পড়িতেছে। ইঁহারা বৈদেশিক ইতিহাস লেখকদিগের মতামত এত উদ্ধৃত করিতেছেন যে, তৎসমুদয় দ্বারা কেবল গ্রন্থগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে মাত্র। ইহাতে এই ফল হইতেছে যে, পাঠক এক স্থানে পরস্পর বিরোধী মতসমূহ স্তূপাকারে সজ্জিত দেখিতেছেন। উহা তাঁহাদের মানসপটে সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় অঙ্কিত হইতেছে না। বস্তুতঃ ঐতি-হাসিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের ন্যায় পাঠকও উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই সকল ত্রুটী দূরীভূত হইলে, আমাদের মধ্যে ইতিহাসের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে। আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-

দিগের নিকটে ইতিহাস শিখিতেছি। আমাদিগকে ইতিহাস-রচনার প্রণালীও তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকদিগের সহিত গিবন্ বা গ্রীণ্ প্রভৃতি যদি আমাদের অভিনব ইতিহাস-লেখকগণের পথপ্রদর্শক হয়েন, তাহা হইলে অনেক সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শীতলা-মঙ্গল।

ঋতু-বসন্তের আবির্ভাবে আমাদের দেশে বসন্তের আবির্ভাব হয়। এই রোগের উপদ্রব উপশান্ত করিবার জন্য এখনও অনেকানেক হিন্দুগৃহে শীতলার পূজা ও শীতলার স্তব কবচাদি পাঠ হইয়া থাকে। চণ্ডী মনসা প্রভৃতির মহিমাপ্রকাশক যেমন বাঙ্গালা কাব্য-গান প্রচলিত আছে, শীতলাদেবীরও সেইরূপ কাব্য-গান আছে, অনেকের গৃহে সেই গানও হয়। চণ্ডী রামায়ণাদির ন্যায় শীতলার গানও খোল, মন্দিরা ও নূপুরের তালে গীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ "শীতলা-পণ্ডিত" নামক এক সম্প্রদায়ের লোক এই শীতলার গান গাহিয়া থাকে। বসন্তে মড়ক হইলে কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে বার-ইয়ারীতে শীতলাপ্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয় এবং সেই স্থানে পক্ষ বা অষ্টাহকাল "শীতলার গান" দেওয়া হয়। সাধুভাষায় এই গানের নাম "শীতলা-মঙ্গল"। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতির যেমন কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা আছে, প্রচারাভাবে এবং একমাত্র শীতলা-পণ্ডিতগণের আয়ত্তাধীন থাকায় শীতলা-মঙ্গলগুলির তাদৃশ প্রতিষ্ঠা নাই। আমরা অদ্য এই অপ্রতিষ্ঠিত শীতলা-মঙ্গলগুলির কাব্যাংশ এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শীতলা-দেবীর উল্লেখ পুরাণ ও তন্ত্র উভয়বিধ শাস্ত্রেই আছে। অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা শীতলার আরও একটু বিশেষত্ব আছে; তিনি রোগাধিষ্ঠাত্রী ও রোগোপশমনকর্ত্রী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও স্থান পাইয়াছেন। মনসা বিষহরি বটে এবং সর্পবিষপ্রভাব ও সর্পভয়-নিবারিণী হইলেও আয়ুর্ব্বেদে বিষচিকিৎসাপ্রকরণে মনসার উল্লেখ নাই; কিন্তু বসন্তরোগ-চিকিৎসাপ্রকরণে আয়ুর্ব্বেদে শীতলার উল্লেখ বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলা পৌরাণিকী দেবতা বলিয়া কেবল আমাদের দেশে নহে, ভারতের অন্যত্রও পূজা পাইয়া থাকেন, কাশীর ন্যায় প্রাচীন সহরেও দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলার এক প্রাচীন মন্দির আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আর কোথাও "শীতলার গান" বৎ কিছু আছে কি না, জানিনা। আমাদের দেশে এই সর্ব্বত্র পূজিত দেবতাটীর মহিমাপ্রকাশক এই কাব্যাত্মক

গানগুলির উপাখ্যানগুলি সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতে ব্রতকথার ন্যায় কোন "কথা" বর্ত্তমান আছে কি না তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এস্থলে শীতলা সম্বন্ধে একটু শাস্ত্রীয় বিবরণ দিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে। স্কন্দপুরাণের কোন্ খণ্ডে আছে, তাহা জানা যায় না; তবে ভাবপ্রকাশে মসূরিকা-চিকিৎসায় যে স্থলে (২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগে) শীতলা-স্তবাদি পাঠের ব্যবস্থা আছে, সেই স্থলে শীতলাষ্টকের নিম্নে লিখিত আছে,—

"ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকসমাপ্তম্।"

ইহা হইতে কাশীখণ্ডের নাম পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ৯৩০ শকের হস্তলিখিত পুঁথি ও কাশীতে মুদ্রিত কাশীখণ্ডের যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে এবং বটতলার মুদ্রিত বাঙ্গালা কাশীখণ্ডে শীতলার নাম গন্ধও দেখিলাম না। কাশীতে দশাশ্বমেধঘাটে যে শীতলা-মন্দিরের উল্লেখ করা গিয়াছে, কাশীখণ্ডে দশাশ্বমেধ বর্ণনায় তাহারও কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। শীতলা-পূজার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত এবং পুরোহিত মহাশয়েরা সাধারণতঃ যে শীতলাষ্টক বা শীতলাস্তব পড়িয়া থাকেন, তাহা স্কন্দ-পুরাণোক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এই পৌরাণ-তান্ত্রিকী দেবতার ধ্যান পিচ্ছিলাতন্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে;—

"শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসন্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জ্জন্যাপূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈঃ ক্ষিপন্তীম্॥
দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি শূর্পাং কণকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্।
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপপ্রশমনকরী শীতলা ত্বাং ভজামি॥"

তন্ত্রের ধ্যান এই। পুরাণে ধ্যান বলিয়া কিছু নাই, তবে শীতলাষ্টক নামে স্কন্দপুরাণোক্ত যে স্তবের কথা বলিলাম, তাহা হইতে জানা যায় যে কার্ত্তিক শিবকে প্রশ্ন করিতেছেন;—

"ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥"

শিব উত্তর দিলেন,—

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
* * *
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্॥"

আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝা গেল, পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত শীতলারও যে রূপ, যে বসন, যে ভূষণ, যে বাহন, স্কন্দপুরাণোক্ত শীতলারও সমস্তই

অবিকল তাই। কেবল পিচ্ছিলার শীতলা কেবল বিস্ফোটকনাশিনী আর স্কান্দ শীতলা বিস্ফোটক ব্যতীত গলগণ্ড ও অন্যান্য দারুণ গ্রহরোগও নাশ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু স্কান্দে শীতলা-দেবীর এক সূক্ষ্মমূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি ধ্যাতার নাভিহৃন্মধ্যে অবস্থিত ও মৃণালতন্তুসদৃশী।

* * *

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥

* * *

যস্ত্বামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥"

অনেকানেক পৌরাণিক দেবতার মূলরূপ বৈদিক শাস্ত্র খুঁজিলে পাওয়া যায়। শীতলার সেরূপ কিছু পাওয়া যায় কি না, জানি না। আমি নিজে বৈদিক শাস্ত্রের সহিত পরিচিত নহি, তবে বিশ্বকোষকার নগেন্দ্র বাবু অথর্ব্ব বেদোক্ত "তক্মন্" শব্দের অর্থ "শীতলা" লিখিয়াছেন। অথর্ব্ববেদে ১।২৫।১, ৫।২১।১, ৪।১।৯, ৬০।১৬।৬, ১৯।৩৪।১০, ১১।২।২৬, ২০।১, ৩৯।১ প্রভৃতি স্থলে "তক্মন্" শব্দ আছে। Sacred books of the East নামক ইংরাজী গ্রন্থমালার মধ্যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্লুমফিল্ড (Dr. Morice Bloomfield) অথর্ব্ববেদের যে আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অথর্ব্ববেদের অধিকাংশের অনুবাদ আছে। তাহাতে তিনি "তক্মন্" শব্দের অর্থ "জ্বর" করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ১।৫।২২।৩ শ্লোকের অনুবাদ হইতে জানা যায়—"The takman that is spotted covered with spots, like reddish sediment, then thou! (oh plant) of unremitting potency drive away down below" ইহার spots like reddish sediment যদি হাম বসন্ত বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হামবসন্তাশ্রিত জ্বর এরূপ বলিলেও বলা যায়, কিন্তু তদধিষ্ঠাত্রী শীতলা বুঝায় না।* যাহা হউক, বেদে আমি পণ্ডিত নহি, সুতরাং ও অনধিকার-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু এস্থলে আর একটা বলিতে বাধ্য হইতেছি। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০২ সালের দুই খণ্ড সমীরণের ৭০৫ পৃষ্ঠায় "শীতলাপূজা প্রকৃত কি?" ইতি শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। বহু গবেষণায় ক্ষিতীন্দ্র বাবু শীতলার মার্জ্জনী কলসোপেতা, শূর্পালঙ্কৃতমস্তকা মূর্ত্তির রূপক ভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শীতলা দেবী পরিচ্ছন্নতার আধার। তিনি শীতলার মৃণালতন্তুসদৃশী সূক্ষ্মমূর্ত্তি ও জলমধ্যে পূজার বিশেষত্ব হইতে ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া এবং তৎসঙ্গে আপোমার্জ্জনের মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে বৈদিক শাস্ত্রে যিনি "অপ্ দেবী নামে স্তুতা হইতেন, তিনিই পুরাণকারের হস্তে শীতলা

---

* শীতলার অর্থই বসন্ত; সুতরাং তক্মন্ শব্দের শীতলা অর্থ করিলে ভ্রম হয় না। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নানাস্থানে বসন্তের পরিবর্ত্তে শীতলা শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়।—প° সম্পাদক।

হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিশ্বকোষের "তক্ষন্‌" ক্ষিতীন্দ্র বাবুর "অপ্‌দেবী" এই উভয় বৈদিক আরাধ্যের মধ্যে কে যে শীতলা হইয়াছেন, তাহার মীমাংসা যাঁহারা বেদ পুরাণের বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের জানাই রহিল।

এই স্থলে আরও একটী কথা বলিতেছি। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে আমাদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে আছে যে, যেখানে যেখানে ধর্ম্ম-মন্দির দেখা যায়, সেই সেই স্থানেই শীতলার অবস্থান যেন স্বতঃসিদ্ধ এবং যেখানে যেখানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবালয় আছে, সেই সেই স্থলে হারিতী দেবীর অবস্থানও যেন স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুদেবী শীতলা ও বৌদ্ধদেবী হারিতী উভয়েই ব্রণব্যাধিনাশিনী। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে শীতলা ও হারিতীর অভেদত্ব কল্পিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনেক ডোমাচার্য্যের কথা পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে এক্ষণে যাহারা "শীতলা পণ্ডিত" নামে খ্যাত তাহারাও ডোম জাতীয়। ডোম শীতলা-পণ্ডিতেরা কেবল যে শীতলার গানই গাহে, তাহা নহে, শীতলার পূজাদিও করে এবং বসন্তচিকিৎসা করিয়া থাকে।* আমরা প্রায় দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র শীতলা প্রতিমা হস্তে মন্দিরা বাজাইয়া গান করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক গৃহস্থবাড়ীতে এই কলিকাতা সহরেও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও শীতলা-পণ্ডিত। শীতলা ব্রাহ্মণপূজ্যা পৌরাণতান্ত্রিকী দেবতা, তন্ত্রপুরাণোক্ত বীজমন্ত্রাদি সহকারে ইহার পূজা হয়। এমন দেবী কিরূপে ডোমের ন্যায় নীচসেব্যা হইলেন, তাহাও বড় কৌতূহলজনক বটে। এ কৌতূহল মিটাইবার কোন ঐতিহাসিক প্রকৃষ্ট প্রমাণ সম্ভবতঃ দিতে পারিব না, তবে ডোমাচার্য্য বৌদ্ধগণের ও শীতলা-পণ্ডিতের ডোমজাতীয়ত্ব, হারিতী ও শীতলার ব্রণনাশিনীত্ব, ধর্ম্ম ও লোকেশ্বরাদির মন্দিরে শীতলা ও হারিতীর নিত্যাবস্থান ইত্যাদি হইতে আমরা যদি এরূপ অনুমান করি যে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিমাত্র ভগ্নদশায় যখন হারিতী প্রভৃতি দেবতার পূজা বিশেষরূপে প্রচারিত ও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সেই সময়ে যে ডোমাচার্য্যগণ হারিতী দেবতার পূজাদি করিতেন, তাঁহারা দ্বিতীয়বার হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে হারিতীকে হিন্দুপরিচ্ছদে আবৃত করিয়া শীতলারূপে এবং আপনারা শীতলা-পণ্ডিতরূপে অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, একবারে অসঙ্গত হয় না। ইহার পোষকতায় একটী ক্ষীণযুক্তি আমরা দিতে পারি। শীতলাপণ্ডিতের পূজিতা শীতলা প্রতিমা, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মার্জ্জনীকলসোপেতা সূর্পালঙ্কৃতমস্তকা, রাসভস্থা, দিগ্বাসা, শ্বেতাঙ্গী দেবী মূর্ত্তি নহে, শীতলাপণ্ডিতগণের শীতলা করণচরণহীন সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র। ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের

* কলিকাতা বাগবাগানের ডোমপাড়ায় শীতলাপণ্ডিত ৺ বাণেশ্বর পণ্ডিত বসন্তচিকিৎসার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ডিপ্লোমা পাইয়াছিল।

প্রতিমা বলিলে বলা যায়। এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খ নির্ম্মিত হইতনের কৌটার ন্যায় বা পেরেকের মাথার ন্যায় টোপতোলা যে বসন্ত-চিহ্ন লাগান থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্ম্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোপ-তোলা পেরেক চিহ্নের যেন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন শীতলাপণ্ডিতেরা, সর্ব্বত্র এইরূপ প্রতিমার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদিযুক্ত পদ্ধতিতে পূজা করে না। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে এরূপ প্রতিমারও এক্ষণে ব্রাহ্মণ-পূজকের ও সমন্ত্রক পূজার অভাব নাই।* তবে সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে এরূপ শীতলা প্রতিমার সেবক ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীতে অতি হীনমর্য্যাদ হইয়া থাকেন। আমার অনুমান এইরূপ যে, ডোম প্রতিমার শীতলা বৌদ্ধ হারিতীর হিন্দু সংস্করণ ও ডোমাচার্য্য বৌদ্ধহারিতীসেবকগণ কালে শীতলাপণ্ডিত হইয়া আবার পূর্ব্বকালের ডোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌরাণিক শীতলার সহিত ডোমের শীতলার এককালে সম্ভবতঃ কোন সম্পর্ক ছিল না, পরে হিন্দুপ্রভাবে একে অন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল প্রতিমার আকার স্বতন্ত্র রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিপ্লবে সামাজিক পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর উপাসনা মধ্যেও যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহা অসম্ভব। শীতলাপূজা ব্রাহ্মণের সহিত ডোমের সমানাধিকার কেন হইল, তদুত্তরে ইহা অপেক্ষা আমার বুদ্ধিতে আর কোন যুক্তি উঠে না।

শীতলার দেবীত্ব সম্বন্ধে আমার আর বলিবার কিছু নাই। এক্ষণে শীতলামঙ্গলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শীতলা-মঙ্গলের এ পর্য্যন্ত চারিটী পালার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই চারিটী পালাই একখানি বৃহৎ গ্রন্থের অংশ, এক কবির রচিত নহে। এই চারিটী পালা চারিখানি স্বতন্ত্র কাব্য। ইহার মধ্যে গোকুল পালা বা কৃষ্ণবলরামের শরীরে বসন্তাবির্ভাবের উপাখ্যান ও বিরাট পালা বা মৎস্যদেশে বিরাট রাজ্যে বসন্তাবির্ভাবের উপাখ্যান নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক একজন কবির রচিত, আর রাজা চন্দ্রকেতুর পালার ও রঘুনাথ দত্তের পালার উপাখ্যান দৈবকীনন্দন-কবিবল্লভ কর্ত্তৃক রচিত। নিত্যানন্দের বিরাটপালা আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—জাগরণ পালা (ইহারই মধ্যে নিমাই জাতির পালা নামে আর এক ক্ষুদ্র পালা আছে) এবং হেমঘট-তোলা পালা। নিত্যানন্দের বিরাট-পালার "জাগরণ পালা" বটতলায় ছাপা হইয়া গিয়াছে। অন্যগুলি এখনও ছাপা হয় নাই।

নিত্যানন্দের গোকুল-পালার একখানি পুঁথি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। গত সংখ্যার সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় যে বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ১৮৩ সংখ্যায় এই পুঁথি খানিরই উল্লেখ আছে। দৈবকীনন্দনের দুইখানি কাব্যের মধ্যে আমি কেবল চন্দ্রকেতু রাজার পালার একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। রঘুনাথ দত্তের পালার অস্তিত্ব এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

* এই কলিকাতার আহীরীটোলা, জোড়াসাঁকো, বাগ্‌বাজার প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণসেবিত ডোম-প্রতিমানুরূপ শীতলা-মন্দির আছে।

১। দৈবকীনন্দনের শীতলা-মঙ্গল।

রাজা চন্দ্রকেতুর পালা।

এই পালার যে পুঁথিখানি আমি পাইয়াছি, তাহার বয়ঃক্রম অধিক নহে। থানা গড়বেতার অন্তর্গত রাধানগরনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ১২৫৭ সালের ২০এ কার্ত্তিক সোমবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় এই পুঁথির লেখা শেষ করিয়া চিন্তামণি নামক এক শীতলা-পণ্ডিতের ব্যবহারার্থ তাহাকেই বিক্রয় করেন।* পুঁথিখানির বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরেরও পুরাতন না হইলেও এই কাব্যের রচনাকাল নিতান্ত আধুনিক নহে। কাব্যের ভাষা ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, ইহা ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে।

এই পুঁথিখানির আকার ১৪ পাতা। ইহার কবিতার সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। ইহার রচয়িতার পরিচয় এই কাব্যের মধ্য হইতে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে,—

"পূর্ণ হাট বসাইল, বসাইতে না পাইল,
বিধি তাতে হইল বৈমুখ।
শনি গৃহ হৈল পীড়া, সেই হতে লক্ষীছাড়া,
বিবস্ত্রা রাণীর যেন দুখ॥
পিতামহ পুরোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম,
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম,
কতকাল হস্তিনানগরে॥
তস্য সুত শ্রীগোপাল, মান্দারণে কতকাল,
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।
শ্রীবল্লভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত,
হরি বল পাপ গেল দূরে॥"

এই কবিতা কয়টীতে কবির উর্দ্ধতন চারি পুরুষের এবং বাসস্থানাদির পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু কবির নাম ও উপাধির পূর্ণাঙ্গ পাওয়া গেলনা। কবির বংশতালিকা এইরূপ,—

বৃদ্ধ প্রপিতামহ	...	...	ঈশ্বর (পুরোত্তম বা পুরুষোত্তম ?)
প্রপিতামহ	...	...	শ্রীচৈতন্য
পিতামহ	...	...	শ্যাম
পিতা	...	...	শ্রীগোপাল
কবি	...	...	শ্রীবল্লভ (বা) দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ।

* আমি এই চিন্তামণির এক বংশধরের নিকট হইতেই এই পুঁথিখানি পাইয়াছি।

কবির পিতামহের বাস হস্তিনানগরে ছিল। এই হস্তিনানগর বলিতে কোন্ গ্রাম বুঝিতে হইবে, তাহা জানিনা। কবির পিতা কিছুদিন মান্দারণে থাকিয়া শেষে বৈদ্যপুরে বাস করেন। সম্ভবতঃ কবিও এই স্থানে ছিলেন। আর একস্থলে আছে,—

"শীতলার পদরজঃ সদা করি ধ্যান।
দৈবকীনন্দন কবিবল্লভে গান॥"

এই ভণিতাটী হইতে আমরা কবির সোপাধিক পূর্ণ নামটী পাইতেছি। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের নানাস্থানে

(১) "গোবিন্দ ভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লভ।"
(২) "শীতলা চরণতলে, শ্রীকবিবল্লভে বলে,
সংসার সাগরে কর পার।"
(৩) "শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত।"
(৪) "শ্রীকবিবল্লভ রস গায়।"

ইত্যাকার কেবল উপাধিমাত্র ব্যবহারে ভণিতা-যোগ করিয়া গিয়াছেন।

কবি দৈবকীনন্দন বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তাহার প্রমাণ আছে,

(১) "শ্রীবল্লভ তার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত"
(২) "গোবিন্দ ভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লভ।"
(৩) "শ্রীকবিবল্লভে গান গোবিন্দে ভকতি।"

ইত্যাদি কিন্তু তিনি চৈতন্যসম্প্রদায়ীছিলেন কি না সন্দেহ, কারণ একস্থলে দেখিতে পাই;—

"শ্রীকবিবল্লভে গান সেবিয়া ঈশ্বর।
পাষণ্ড বৈষ্ণবার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥"

চৈতন্যসম্প্রদায়ী হইলে "বৈষ্ণব" শব্দটীকে তিনি এ ভাবে ব্যবহার করিতে পারিতেন না বা পাষণ্ড বৈষ্ণবেরও (কেবল বৈষ্ণবনামধারী হইলেই যাহারা মহিমান্বিত মনে করে তাহাদেরও) প্রতি ওরূপ শাপ প্রদান করিতে পারিতেন না।

কিন্তু আর এক স্থলে আছে,—

"শ্রীকবিবল্লভে গায়। রাখিবে রসিক রায়॥"

এই রসিকরায় শ্রীকৃষ্ণ না নবরসিকদলের রসিক রায়? যাহা হউক, এ সকলই আছে, কিন্তু কোথাও কবির জাতিপ্রকাশক কোন কথাই পাওয়া গেল না। কবির জাতির ঠিক হইল না।

কবি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত, এক্ষণে কাব্যানুসরণ করা যাউক। কাব্যখানির আরম্ভ এইরূপ,—

অথ শীতলা-মঙ্গল লিখ্যতে।

"ত্যজিয়া কৈলাস গিরি, উর মাতা মহেশ্বরী,
নায়েকেরে করিতে কল্যাণ।

তোমার চরণতলে, কাতর সেবকে বলে,
তব পায় লক্ষ পরণাম ॥
দেবতা না পায় মর্ম্ম, কশ্যপের যোগে জন্ম,
ধর দেবী মহীতুল্য নাম।
বিষম বসন্ত বল, বধিলে রাবণদল,
প্রথমে পূজে রঘুরাম ॥
রূপের তুলনা দিতে, না দেখি ত্রিজগতে,
ব্রহ্মা আদি কহিতে নারিল।
নারদ পূজিল পায়, রতন নূপুর পায়,
পদতলে নিবেদি সকল ॥
কি কব রূপের ছন্দ, একত্র করিয়া বন্ধ,
অমাবস্যা তাহাতে জড়িত।
মধ্যদেশ হরি জিনি- হরিন্যবসনামর্দ্ধনি, (?)
দশন ভুবন যে খণ্ডিত ॥
চৌষট্টি বসন্ত সঙ্গে, উরিলে পরম রঙ্গে,
নানাদেশ বুলেন ভ্রমিয়া।
বিষম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল,
লোকে দেহ বসন্ত যাইয়া ॥
মা, তুমি যারে কর বিড়ম্বনা।
কাষ্ঠ জিনি কলেবর, কর তারে জর জর,
অঙ্গে কর উএর নাদনা ॥
দেবতা অসুর নর, মৃগ পক্ষ জলচর,
সর্ব্বঘটে তব অধিকার।
শীতলা চরণতলে, শ্রীকবিবল্লভে বলে,
সংসার-সাগরে কর পার ॥”

মঙ্গলাত্মক বাঙ্গালা কাব্যগুলির উৎপত্তি প্রায়ই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য দেবতার স্বপ্নাদেশে হইয়া থাকে, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সবগুলিই স্বপ্নাদেশে লিখিত, কিন্তু এই শীতলামঙ্গল খানির উৎপত্তি সেরূপ নহে। কবির কাব্যারম্ভের মুখবন্ধের প্রথম কবিতাটীই নায়কের অর্থাৎ যাঁহার যত্নে গান দেওয়া তাঁহারই কল্যাণ কামনা করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, কবি কোনও শীতলা-ভক্তের বা শীতলা পণ্ডিতের অনুরোধে এই কাব্য রচনা করেন। নায়ক-গায়ন-বায়নের (নায়ক—যিনি গান দেন বা যাঁহার অনুগ্রহে কবি রচনা করেন; গায়ন—গায়ক, যিনি কবির কাব্য গান করেন; বায়ন—বাদক, যিনি গানের সময় গায়কের সহিত বাজাইয়া থাকেন) প্রতি দেবদেবীর কৃপাপ্রার্থনা সে কালের কবিকুলের পক্ষে নূতন ব্যাপার নহে, কিন্তু

এস্থলে কাব্যারম্ভের প্রথম কবিতাতেই সেই বিষয়ের ব্যবস্থা করায় যেন বিশেষ ভাবপ্রকাশক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে শীতলা-দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি কেবল "কশ্যপের যোগে জন্ম" এই অর্দ্ধচরণ মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণে শীতলার স্তব থাকা প্রসিদ্ধ হইলেও আমরা তাহাতে কিছুই পাই নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ষষ্ঠী মনসার উৎপত্তির কথা আছে, কিন্তু শীতলার নামগন্ধও নাই। যতদূর জানি, তাহাতে মৎস্য, বায়ু, অগ্নি ও বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণাদিতেও কিছু নাই, সুতরাং কবির কথামত আমরা শীতলাকে এখন কশ্যপাত্মজা বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। কবি দেবীর রূপবর্ণনাত্মক যে কয়টী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা তিনিই একা বুঝিয়া গিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ বা পাঠকবর্গের বুঝিবার জন্য তন্মধ্যে একটী কবিতাও পরিষ্কার ভাবব্যঞ্জক হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন কবি একটী মহা অদ্ভুত কথার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার লেখনীর একটী খোঁচায় বাল্মীকির কাব্যের, এমন কি ভগবানের রামাবতারের সমস্ত মহিমাই হরণ করিয়াছেন—"বিষম বসন্ত বল, বধিল রাবণদল, প্রথমে পূজে রঘুরাম।" বাল্মীকি রাবণ মারিবার জন্য ভগবানকে রামচন্দ্র করিয়াছেন, কৃত্তিবাস হনুমানকে দিয়া মৃত্যুবাণ হরণ করাইয়াছেন, আর দৈবকীনন্দন রামচন্দ্রকে দিয়া শীতলাপূজা করাইয়া বসন্ত পীড়ায় সদলে রাবণকে মারিয়াছেন। কবি-কল্পনা এমন না হইলে বিচিত্রা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে কেন?

তাহার পর কবিবল্লভ শীতলাকে মর্ত্ত্যলোকে স্বপূজা-প্রচারার্থ চিন্তিতা করিয়া তুলিয়াছেন;—

"ঈশ্বরী বলেন শুন পাত্র জ্বরাসুর।
তব তুল্য পৃথিবীতে কে আছে অসুর॥
সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার।
মনুষ্য গৃহেতে পূজা না হয় আমার॥

মা শীতলা বসন্ত রোগাধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার পরামর্শদাতা কাজেই জ্বরাসুর। জ্বর ও আবার অসুর! আয়ুর্ব্বেদমতেও পৃথিবীতে বাস্তবিকই আর কোন প্রবল রোগাসুর নাই। জ্বরাসুরও বলিল,—

"আগে শীত আরম্ভ পশ্চাতে মাথা ব্যথা।
চৌদ্দপ্রহর জ্বরভোগ আমি করি তথা॥"

চৌদ্দপ্রহর অর্থাৎ দেড়দিন জ্বরভোগের পর প্রায়ই বসন্ত দেখা দেয় এবং মাথাব্যথা সহ শীতযুক্ত জ্বরই বসন্তাবির্ভাবের লক্ষণ বটে। তাহার পর জ্বরাসুর মার আক্ষেপ শুনিয়া বলিল,—

"চৌষট্টি বসন্তে মাতা ডেক্যা আন তুমি।
পূজার বিধান কথা বল্যা দিব আমি॥"

মা মনুষ্যগৃহে পূজা খাইবার আশয়ে চৌষট্টি বসন্তকে ডাকাইলেন। তাহারাও আসি নিজ নিজ প্রভাব জানাইয়া স্ব স্ব উপস্থিতি জ্ঞাপন করিল। এই স্থলে কবি চৌষট্টি বসন্তে লক্ষণ ও জীবদেহে তাহাদের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আর উদ্ধৃত করিবা আবশুক নাই, কবিরাজ ডাক্তার মহাশয়গণ সে কয়টা কবিতা পড়িলে বরং উপকা পাইবেন। তাহার পর,—

"বসন্ত আনিয়া দেবী কহেন জরাসুরে।
কার দেশে পূজা লবে বলহ আমারে॥
জরাসুর বলেন পূজার সব হেতু।
চন্দ্রবংশ নরপতি নাম চন্দ্রকেতু॥
* * * *
অবসন্ত অনেক মনুষ্য সেই পুরে।
চল সেই দেশে পূজা লইবারে॥"

তাহার পর অনেক পরামর্শ হইল। জরা অগ্রে গিয়া জ্বর ঘটাইবে, তাহার পর ম শীতলা অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপ স্থির হইল ;—

"জ্বর বলে বসন্তে মা দিবে পাঠাইয়া।
দিগম্বরী বেশ ধর ই-বেশ ছাড়িয়া॥"

পাত্রের পরামর্শে মা শীতলা দিগম্বরী বেশ ধারণ করিলেন। সে বেশে, এলোচুল আভরণত্যাগ, দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান, বিভূতিভূষণ, কক্ষে চৌষট্টি বসন্তের ঝুড়ি, হাতে নদি প্রভৃতি ছিল, বয়সও অশীতিপরা হইয়াছিল, তবে বিশেষত্ব ছিল একটা,—

"বামহাতে ছেল্যা মুণ্ড উল্লূকবাহন।" এবং
"গাদা হইল বলদ বসন্ত ছালা তায়॥"

কবির এ কল্পনা কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিনা। উল্লূক-বাহনের কথা কোথা নাই। দ্বিতীয় চরণের "গাদা" অর্থে "একত্র" বা "গর্দ্দভ" দুই করা যায়।

মা শীতলা এইরূপে এই বেশে চন্দ্রকেতু রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে জরাসুরের তত্বাবধানে বাহন ভূষণাদি সমস্ত রাখিয়া শীতলাদেবী বৃদ্ধার বেশে বসন্তে চুপড়ি মাত্র কক্ষে লইয়া নগর দর্শনে গমন করিলেন। নগরের নাম কবি দেন না বা তাহার বিশেষ বর্ণনাও কিছু করেন নাই। শীতলা প্রথমেই নগরান্তিকে পুষ্করিণীতীরে কুলবতী রমণীগণকে দেখিলেন। তাহারা,—

"জরতী দুখিনী দেখি মুখ করে বাঁকা।"

কাজেই শীতলা চটিলেন,—

"শীতলা বলেন ঘুচাইব সোনা শেঁকা॥"

তাহার পর শীতলা নাগরিক বালকগণকে সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিতে দেখিলেন, কিন্তু,—

"নাহি দেখি কার মুখে বসন্তের চিন।"

শীতলা ভাবিলেন,—

"তিল মুগ মসুর ছাওয়ালে যদি দিব।
নৃপতি সভায় পূজা কেমনে পাইব॥"

কিন্তু ইহা ভাবিয়াই যে মা শীতলা একবারে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নয়, কবি বলিতেছেন,—

"ছাওয়ালে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।"

এই দয়াই যে মা "শীতলার অনুগ্রহ" তাহা আর না বলিয়া দিলেও বুঝা উচিত।

তাহার পর শীতলা রাজার সভায় গিয়া উপস্থিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তুমি কে? কেন আসিয়াছ? শীতলা বলিলেন,—আমার বাড়ী শান্তিপুর, আমার সাতটী গুণবান্ পুত্র ছিল। দেশে অকালে বড় আকাল হইল, তাহার উপর বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। সকলে আমার স্বামীকে শীতলা পূজা করিতে বলিল। স্বামী শিবপূজা বিনা অন্য দেবতার পূজায় কোনমতে সম্মত হইলেন না। তিন দিনের মধ্যে শীতলার কোপে সাতটী পুত্র মরিল। তোমার রাজত্বেও অনেক অবসন্ত লোক দেখিতেছি। এই বলিয়া শীতলা, বসন্তে দেশের কত ভয়ানক অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করিলেন এবং ইহাও বলিলেন,—

"পশ্চিমেতে যার গায় নাহি হয় গুটি।
অপাক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটী॥"

শীতলার এই অতিশয়োক্তি টুকু সত্য না হইলেও সরস বটে। অবশেষে বলিলেন, তোমারও শত পুত্র আছে, তাহাদের কল্যাণার্থ শীতলার পূজা কর। তাহার নিজ অনুগত অনুচর জ্বরাসুরেরও একটা ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"তার পর জ্বরাসুর বড় মহাতেজা।
পুত্রের কল্যাণে রাজা কর তার পূজা॥"

রাজা উত্তর করিলেন,—

"নৃপতি বলেন বুড়ী হয়্যাছ অজ্ঞান।
কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান॥"

তখন শীতলা শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। রাজা শিব শিব বলিয়া কর্ণে হাত দিলেন। এই স্থলে রাজোক্তির মধ্যে এক নূতন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বড় কৌতুককর ও কিছু ইতিহাস-মিশ্রিত;—

"শিবনিন্দা শ্রবণে শুনিয়া নৃপবর। শিব শিব বলিয়া দুই কর্ণে দিল কর॥
জীব জন্তু অনেক বাড়য় অবনীতে। অবনীতে না সহে ভার লাগিল কান্দিতে॥

আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেবনিরঞ্জন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেবতা তিনজন ॥
মড়া কান্ধে করিয়া বুলএ অবনীতে। কহেন উলূক মুনি ত্রিদেব সাক্ষাতে ॥
তিলমাত্র আপোড়া পৃথিবী ঠাঞি নাই। ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞি ॥
উলূকের কথা শুনি দেব ত্রিলোচন। বাম উরুভাগে কৈল ধর্ম্মের শাসন ॥
বিষ্ণু হৈল কাষ্ঠ তাতে ব্রহ্মা হুতাশন। বাম উরুভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন ॥
জন্ম জরা মৃত্যু যার নাই ত্রিভুবনে। হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণে ॥"

কবির উল্লিখিত এই নিরঞ্জন ঠাকুরটী কে? ইনি কি দুঃখে মরিলেন? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরই বা সে জন্য পিতৃ মাতৃদায় কেন? তাঁহারা মড়া কাঁধে করিয়া ঘুরিতে গেলেন কেন? পৃথিবীতে অদগ্ধ স্থানেই বা তাঁহার দাহ ব্যবস্থা কে দিল? উলূক মুনিটিই বা কে? আর শেষে মৃত নিরঞ্জনকে দাহ করিবার জন্য বিষ্ণুকে কাষ্ঠ ও ব্রহ্মাকে হুতাশন হইতে হইল। ত্রিলোচন বামউরুতে দাহ স্থান দিলেন,—ইহারই বা ব্যাপার কি?—কিছুই সহজে বুঝা গেল না! নিরঞ্জন শব্দটী হইতে ইহার মধ্যে কোন বৌদ্ধসংশ্রব নিরূপণ করা যাইতে পারে কি না তাহা বৌদ্ধতত্ত্বাভিজ্ঞগণ মীমাংসা করিবেন।

যাহা হউক, তাহার পর রাজা বলিলেন,—

"কেবা কার পুত্রবধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা ॥"

সুতরাং পুত্রের কল্যাণার্থে বা তোমার অনুরোধে—

"জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অজ্ঞান বুড়ী এথা হৈথে দূর ॥"

কাজেই শীতলা বুড়ী চটিয়া গেলেন, রাগে নয়ন দুটী লাল হইয়া উঠিল; এমন সময় জরাসুর আসিয়া দেখা দিল।

শীতলা ক্রোধে জরকে চন্দ্রকেতুর সর্ব্বনাশ করিতে আদেশ দিলেন। জর বিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। জর হাটে, বাজারে, গৃহে, কুটীরে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত ফুটিল। জাতি বিশেষে, কর্ম্মচারী বিশেষে মা শীতলা বিভিন্ন প্রকার বসন্ত নিযুক্ত করিলেন।

তাহার পর রাজার রাজত্বে লোকজন, হাতী ঘোড়া, পশু পক্ষী মরিয়া উজাড় হইল। শেষে রাজার উনসত্তরটী পুত্রও মরিল। রাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তবু রাজা পূজা করিলেন না, বরং—

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিত আমি তার না লব প্রসাদ ॥"

ঠিক কথা! রাজা প্রকৃত মামলাবাজ বটে, প্রবলের সঙ্গে লড়িতে হইলে হারিয়া হারানই পরামর্শসঙ্গত বটে। তাহার পর শিবগুণানুকীর্ত্তন করিয়া রাণীকে প্রবোধ দিলেন, শিবেরই শরণ লইতে বলিলেন—এবং নিজেও দিবারাত্রি কুশাসনে বসিয়া শিবারাধনা

করিতে লাগিলেন। শিবশিরে শত কলসী ঘৃতমধু ঢালিয়া শিবচরণে সহস্রপদ্ম উৎসর্গ করিয়া রাজা পূজা করিলেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভোলানাথের প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, তিনি অনেক পার্ষদকে ডাকিয়া, কোথায় কোন ভক্ত কি বিপদে পড়িয়াছে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিবল্লভ শিবের এই পার্শ্বচরটীর এক নূতন নাম দিয়াছেন,—নন্দী, ভৃঙ্গী গণেশাদি পুরাণ প্রচলিত শিবানুচরগণকে উপস্থিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

কবি কল্পিত এই শিবানুচরের নাম "ভীমক্ষেত্র,"—

(১) "ভীমক্ষেত্রে ডাকিয়া বলেন পশুপতি।"

(২) "শুন ভীমক্ষেত্র তুমি আমার বচন।"

তাহার পর ভীমক্ষেত্র মহাশয় খড়িপাতিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত শীতলার বিবাদে চন্দ্রকেতুর বর্ত্তমান অবস্থা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া শিবকে জানাইলেন। শিব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বদলবল সংগ্রহ করিলেন,—চৌদ্দ-লোকপতি, পঞ্চাশহাজার দানা ও একলক্ষ ভূত জড় হইল। কবি এই দলের সেনাপতি-গোছের একজনের পরিচয় দিয়াছেন,—

"নেকা টেঁকা মেঘনাদ বিষম মূরতি।"

তৎপরে সকলে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। বসন্ত দূর করিবার জন্য,—

"মেঘনাদ আসি করে বিষম গর্জ্জন।"

এই মেঘনাদের কাব্যোচিত রূপকাবরণ ছাড়াইয়া যদি "মেঘের নাদ" এইরূপ একটা কিছু ধরা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় বসন্তকালে মেঘ গর্জ্জনাদি দ্বারা পৃথিবীতে তাড়িত সঞ্চার ও পরোক্ষে বৃষ্টিপাত ইত্যাদিতে বসন্তোপদ্রব শান্ত হওয়ার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়, ইহা অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। যাহাহউক শীতলা সে গর্জ্জন শুনিয়া একটু শিহরিলেন, জ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"প্রেত ভূত দানা সঙ্গে আইল শূলপাণি।
আর কি পুজিবে চন্দ্রকেতু নৃপমণি॥"

পাত্র পরামর্শ দিয়া ভূতের গাত্রে "ভূতমুখা" বসন্ত ফুটাইতে বলিলেন এবং নিজে শিবানুচর বলিয়া শিবজ্বর হইয়া দেখা দিলেন। "ভূতমুখার" প্রভাবে ভূতেরা "মড়াকাঠ" হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া শিবের কাছে গিয়া জানাইল,—

"বসন্তে ফাটিয়া মরি না দেখ নয়নে।"

শিবের মস্তিষ্কে তখন বড়ই গোল বাধিয়াছে। তিনি ভক্তের বিপদ দূর করিতে আসিয়া স্বদলে বিপদে পড়িয়াছেন, কাজেই কোন কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতেছে না। কবি বলিতেছেন,—

"ভূতগণের কথা শিব না করে শ্রবণ।"

এদিকে শিব আসিয়া বড় কিছু করিতে না পারায়, রাজা ভাবিলেন "বাম হৈল্য ত্রিলোচন", কাজেই

"রাণীর সহিত যুক্তি করে নরপতি।"

রাণী কাঁদিয়া বলিলেন, উনসত্তরটী পুত্রকে শীতলা অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব কনিষ্ঠ পুত্রকে কোথাও লুকাইয়া রাখ। রাজা সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,—

"রাজা বলে শুন কথা। সূর্য্যসনে মোর মিতা॥"

অতএব উভয়ে সূর্য্যারাধনা করিলেন। সূর্য্য আসিলেন, রাজারাণী তাঁহার হস্তে পুত্রকে অর্পণ করিলেন, সূর্য্যও মিত্রপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজার অবশ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় কিছু জ্ঞান ছিল বলিতে হয়। সংক্রামিত ব্যাধিপ্লাবিত স্থান ত্যাগ ও বসন্তাদিরোগে সূর্য্যরশ্মি যে উপকারী তাহা বোধ হয় তিনি বুঝিতেন, তাই এই ব্যবস্থা করিলেন। কবি এই রূপকার্থ জানিতেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ইহা হইতে এইরূপ সূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব নিষ্কাশিত করিলে ব্যাখ্যা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

ওদিকে রাজপুত্র সূর্য্যসারথির তত্ত্বাবধানে রহিলেন। শীতলার টনক নড়িল। জ্বরাসুর পলায়িত শীকার খুঁজিতে লাগিল। দেবীর আজ্ঞায় পদ্মা বা কমলা গণিয়া স্থান বলিয়া দিলেন। জ্বরাসুর সেখানেও বসন্ত পাঠাইতে বলিল। বড় বড় বসন্তেরা মাথা হেঁট করিল, ক্ষুদ্র সূর্য্যমণি উঠিয়া শীতলার গুয়া পাণ লইল। সূর্য্য সারথিই রাজপুত্রকে রাখিয়াছেন, সুতরাং বসন্ত গিয়া আগে তাঁহাকেই ধরিল। জ্বর শিবজ্বর পাইয়া বসিল। সারথি শয্যাগত হইল। সূর্য্যের রথ আর চলে না। সৃষ্টি যায়। সূর্য্যদেবের চাকুরীর ভয় হইল, তাহার উপর তাঁহার গৃহিণী ছায়া আর এক গোল বাধাইলেন, তিনি বলিলেন,—

"দুহিতা যমুনা যম তনয় তোমার।
তেজময়ী পাছে ছুঁহে করেন প্রতিকার॥"

কার্য্যেই সূর্য্যদেব ভীত হইলেন এবং আশ্রিত মিত্রপুত্রকে এক পদ্মের ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন। সূর্য্যমণি বসন্ত তখন সূর্য্যলোকে রাজপুত্রকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। দেবী আবার চিন্তিত হইলেন। কমলা আবার গণিলেন। এবার শিশিরা বসন্তকে পদ্মবনে পাঠান হইল। শীতলা তাহার আস্ফালন শুনিয়া নিজ গলা হইতে শতেশ্বরী হার দিলেন। বসন্ত লাগিতেই সমস্ত পদ্ম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু পদ্ম বলিল,—

"পদ্ম বলে শরণাপন্নে যদি ছেড়্যা দিব।
তবে কি আমারে হর মস্তকে ধরিব॥"

আমরা দেখিতেছি, শরণাগত রক্ষার্থ কবি পদ্মে যে সাহস ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রতিফলিত করিয়াছেন, দেবতা সূর্য্য ও দেবী ছায়াতেও তাহা রাখিতে পারেন নাই, বোধ হয় শিবেও নাই।

যাহা হউক রাজপুত্র কিন্তু আশ্রয়দাতার বিপদ আর অধিক ভারী করিয়া তুলিতে মনন

করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পদ্মের মৃণাল ধরিয়া পাতালে প্রস্থান করিলেন এবং বাসুকীর কোলে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

আবার গণনা, আবার সন্ধান। এবারে উঞ্জানিয়া মুঞ্জানিয়া দুই বসন্তভ্রাতা অগ্রসর হইল। ইহাদের প্রভাবে সর্পের অতি দুরবস্থা হইল,—

"মনুষ্য শরীরে হৈলে ত্যাগ করে বোল।
সর্পের শরীরে হৈলে সেহ ছাড়ে খোল॥"

বাসুকীপুত্র বসন্তপীড়ায় কাতর হইয়া পিতাকে অনুযোগ করিল এবং সর্পকুলের দুঃখ জানাইল। তখন—

"সর্পের করুণা শুনি চিন্তিত বাসুকী।
প্রাণ দিয়া শরণাপন শিশু যদি রাখি॥"

তৎপরে শিবি রাজার কথা অর্থাৎ শ্যেন-কপোতসংবাদ স্মরণ করিয়া বাসুকী স্বগণ রক্ষার্থ রাজকুমারকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বর্ণরেখা পর্ব্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন; বসন্ত ভ্রাতৃদ্বয় কাজেই ফিরিয়া আসিল। শীতলা ভাবিলেন,—

"নীলকণ্ঠপ্রিয়াতাত তথি কেবা যায়।"

নীলকণ্ঠের প্রিয়ার পিতার গহ্বরে অর্থাৎ পর্ব্বতগহ্বরে কে যাইবে? কিন্তু বসন্তের বাজারে অভাব কি? এবার শিখরিয়া বসন্ত গুয়াপান লইল। এই বসন্তের প্রভাবে স্বর্ণরেখা পর্ব্বত গলিয়া সুবর্ণরেখা নদী হইয়া গেল। রাজপুত্র আর বাঁচিতে পারিলেন না। তিনিও বসন্তে ফাটিয়া মারা গেলেন।

এই রাজকুমারের পত্নী চন্দ্রকলা পিতৃগৃহে ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, পতির মৃত্যু হইয়াছে। ভূমিকম্প, উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি প্রভৃতিতে শীতলা কতকটা তৃপ্তিলাভ করিলেন, কিন্তু—

"ত্রৈলোক্যতারিণী মাতা মনেতে ভাবিল।
ভালমন্দ চন্দ্রকলা কিছু না জানিল॥"

অতএব—

"বামকরে পাতি দক্ষিণ করে নড়ি।　　রাজকন্যার স্থানে চলিল দেবী বুড়ী॥
যেখানে বসিয়া আছে রাজার কুমারী।　　বিদুর বাড়ীকে যেন গোবিন্দ ভিখারী॥"

তাহার পর বলিলেন,—

"হেদে গো রাজার কন্যা আসি আশীর্ব্বাদে। একাদশী করয়াছি পারণ সজ্জা দে॥"

তখন—

"সুবর্ণ থালায় চাল কড়ি বড়ি নঞা।　　ঈশ্বরী সাক্ষাতে কন্যা দাণ্ডাইল গিয়া॥
ঈশ্বরী কহেন কন্যা রহি তব কাছে।　　ঊনসপ্ত ভাণ্ডর তোমার বসন্তে মরেছে॥
পশ্চিম পর্ব্বতে তোমার মরিয়াছে পতি।　　কেমনে পারণা লব শুন গুণবতী॥

পূর্ব্বের তপন যদি পশ্চিমে উদয়। তথাচ আমার বাক্য মিথ্যা নাহি হয়॥”

তাহার পর শীতলা বোধ হয় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং

“এত বলি তেজময়ী হৈল অন্তর্ধান। জানিল রাজার কন্যা স্বপ্ন যে বিধান॥”

তাহার পর,—

অনুমৃতা হতে সেই চন্দ্রকলা যায়। আম্রশাখা ভাঙ্গি সতী হরিগুণ গায়॥

* * * * * *

রাজকন্যা সতী হৈল ঈশ্বরীর বোলে। রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ ঘন বলে॥
কৌষিকী রাজার রাণী সমাচার পেয়্যা। ধরিল কন্যার গলে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
রাজরাণী বলে বাছা কি বুদ্ধি তোমার। ভাণ্ডারে সকল ধন কর অধিকার॥
গৃহিণী হইয়া বাছা থাক মোর ঘরে। কেনবা অনাথ করে যাইবে আমারে॥”

এইস্থলে আমরা একটু ঐতিহাসিক কথা পাড়িব। কবির সময়ে অনুমৃতা হওয় প্রবল ছিল, কিন্তু পিতামাতা অনুমরণকামা কন্যাকে ধনলোভ প্রভুত্বলোভ দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। যদিও বেণ্টিঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সর্ব্বত্রই অনুমরণ-প্রথা বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাৎকালিক কোন কাব্যে তাহার এরূপ বর্ণনা দেখা যায় না, বিশেষতঃ কোন কবি নিজ কাব্যের নায়িকাকে অনুমৃতা করিয়াছেন, এরূপ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। কবিবল্লভ অনুমরণকামা চন্দ্রকলার মস্তকে আম্রপল্লবাদি দিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার সমকালে এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন, পুরাণজ্ঞানহীনের নিকট এরূপ বর্ণনা আশা করা যায় না। এ তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বর্ণনা। তাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও পুরাণজ্ঞানহীন বলায় তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত তাহার কাব্যে যে সকল পৌরাণিকী কথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কোন পুরাণের বর্ণনার সহিত সুসঙ্গত নহে, তবে শুনিয়া শুনিয়া লোকের ধারণাবশতঃ যেরূপ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ জ্ঞান হইতেই কবি পৌরাণিক প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

তাহার পর চন্দ্রকলা মাতাকে বলিলেন,—

“রাজকন্যা নিবেদিল জননীর পাশে। পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে॥
অল্প বয়সে যার প্রাণনাথ মরে। সে বড় অজ্ঞান থাকে মা বাপের ঘরে॥
দিনে দিনে হয় তার নহলী যৌবন। মা বাপের হয় ঐরি বিধির লিখন॥
সে দুঃখ পাবার তরে রাখিবে আমারে। নীলকণ্ঠহার কেবা রাখিতে চায় ঘরে॥”

কবির “পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে” এই চরণটির সরল মাধুর্য্যের তুলনা হয় না। তাহার পর চন্দ্রকলা যেরূপে মাতাকে প্রবোধ দিয়াছেন, তাহা নারীকুলের শিক্ষণীয়। নীলকণ্ঠহার সম্বন্ধে কবি যে কথা বলিয়াছেন, সেরূপ একটা প্রবাদ এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বোধ হয় যে “নীলম্” নামক রত্ন (অর্থাৎ নীল মণি) সকলের অদৃষ্টে শুভদায়ক হয় না, এজন্য সকলে সাহস করিয়া “নীলম্” গৃহে

রাখিতে চায় না। এই নীলকণ্ঠহার অর্থে তদ্বৎ কোন রত্নালঙ্কার বা নীলমণির হারও হইতে পারে।

তাহার পর চন্দ্রকলা পতির মৃতদেহ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া—

"দীঘল কুন্তলে সতী দুটি পদ ছাঁদে। বদনে বসন দিয়া বিধুমুখী কাঁদে॥
প্রেমের পশরা কান্ত ছিলে মোর সনে। সুখের হাটে দাগা বিধি দিল এত দিনে॥"

ইহার পর সতী আর কাঁদিল না, অনুমৃতা হইবার আয়োজন করিতে লাগিল। শীতলা আবার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে দেখা দিলেন। তথন—

"ব্রাহ্মণী দেখিয়া দণ্ডবত কৈল সতী। ঈশ্বরী বলেন হও জনম এয়তি॥
এত শুনি চন্দ্রকলা শীতলারে বলে। তব বাক্য মিথ্যা হল্য মৃতপতি কোলে॥
শীতলা বলেন কন্যা কহি তব ঠাঞি। আমার বচন মিথ্যা কভু হবে নাঞি॥

* * * * *

অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য শুন রূপসিনী। আমা আশীর্ব্বাদে তুমি হবে রাজরাণী॥

তাহার পর শীতলা চন্দ্রকলার পতির প্রাণদানার্থ একটা ছল পাতিয়া বলিলেন,—

"ঘরে আছে নাতিটী নাহিক মোর সাথ। পাতি বৈতে কাঁকালেতে ধরিলেক বাত॥
তব প্রাণনাথে যদি বাঁচাইতে পারি। পাতি বৈতে দিবে মোরে বলগো সুন্দরী॥
সতী বলে পতি যদি প্রাণ দান পাব। সত্য সত্য পাতিটি বহিতে আমি দিব॥"

মহিমাপ্রচারের জন্য শীতলা অনর্গল মিথ্যা কহিতে প্রস্তুত, রাজার সম্মুখে একবার সাত পুত্রের মরণের পরিচয় দিয়াছেন, এখানে আবার নাতির কথা বলিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদার ন্যায় কবিবল্লভের শীতলা দুদিক্ বাঁচাইয়া পরিচয় দিতে পারেন না। তাহার পর চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া শীতলা কাপড়ের কাণ্ডার দিয়া মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে প্রাণদান দিলেন, এবং কোলে করিয়া চুম্বন করিলেন। তাহার পর—

"রাজকন্যার সত্য মাতা বুঝিবার তরে। দিলেন বসন্ত পাতি বহিবার তরে॥
আগে আগে চলে শিশু পাতি করি মাথে। নড়ি ধরি চলে বুড়ী শিশুর পশ্চাতে॥
চন্দ্রকলা সতী তার পশ্চাতে গড়ায়। কত দূরে গিয়া মাতা পাছুপানে চায়॥
ঈশ্বরী বলেন কন্যা মোর কথা শুন। সত্য করে স্বামী দিলে পাছু আইস কেন॥
চন্দ্রকলা বলে মাগো তব দাস পতি। আমি তব দাসী হয়ে থাকিব সংহতি॥
প্রাণনাথ কাননেতে কুসুম তুলিব। চন্দন ঘসিয়া তব পাদপদ্মে দিব॥
এ কথা শুনিয়া দেবী ভাবয়ে অন্তরে। শুনগো রাজার কন্যা বর মাগো মোরে॥
চন্দ্রকলা বলে মাগো যদি বর দিবে। প্রথমে শ্বশুরে মোর কুবুদ্ধি ঘুচাবে॥
ঈশ্বরী বলেন কথা শুন মন দিয়া। মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র তুমি যাও নঞা॥
তবে চন্দ্রকলা হৈল আনন্দিত মনে। মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র শুনিল শ্রবণে॥
মন্ত্র পেয়ে শশীমুখী আনন্দিত মনে। প্রাণনাথে সঙ্গে করি চলিল ভবনে॥

হেথা পুত্রবধূশোকে কান্দে রাজরাণী। শীঘ্রগতি চলে ধেয়া লোকমুখে শুনি ॥
পুত্রবধূ রাজরাণী করিলেন কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব খায় বদনমণ্ডলে ॥
ধন্য তব জনক জননী রত্নাবতী। হেন কন্যা গর্ভে ধরে রত্নাবতী সতী ॥
কন্যা বলেন ঈশ্বরী পূজহ মহারাজা। জীয়াইব ভাশুর আর পাত্র মন্ত্রী প্রজা ॥
এত শুনি নিবেদিল নৃপতির ঠাঁঞি। যাহার প্রসাদে রাজা হারা মরা পাই ॥
পূজহ ঈশ্বরীপদ পূজ মৃত্যুঞ্জয়। নৃপতি বলেন মোর কথা হেন নয় ॥"

এই উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি কিছু তাড়াতাড়ি কাব্য শেষ করিয়াছেন। এত তাড়াতাড়ি যে চন্দ্রকলাকে শীতলা নিজ পরিচয় দিবার অবকাশ পান নাই, এমন কি যে জন্য কাব্যের জন্ম, শীতলা সেই চন্দ্রকেতুদ্বারা নিজ পূজার ব্যবস্থা করাইবারও অবসর পান নাই, এমন কি বরদাসীর প্রার্থিত "শ্বশুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ" বর প্রদান করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন।

রাজা চন্দ্রকেতু শীতলার অনুগ্রহ পাইলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িতে পারেন নাই, অথবা রাজোপযুক্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবশতঃ রাণী ও পুত্রবধূর অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন—

"পুনর্ব্বার পুত্র বধূ মরুক দুজন।
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন ॥"

রাজা প্রতিজ্ঞা রাখিলেন, কিন্তু শিব ভয় পাইলেন। একে চন্দ্রকেতুর সাহায্যে আসিবামাত্রই শীতলা তাঁহার ভূতসেনাকে বসন্তে পাড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে আবার তাঁহারই জন্য শীতলার পূজাও রাজা বন্ধ করিতেছেন, কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া—

"ডাকিয়া বলেন কিছু প্রভু কৃত্তিবাসে ॥
পূজহ ঈশ্বরীপদ শুনরে রাজন। একান্ত ভজিবে তুমি দেব ত্রিলোচন ॥
শুনিয়া শিবের বাণী অঙ্গীকার করে। মরাছে যতেক লোক জীউক সত্বরে ॥
মন্ত্রবলে শশিমুখী দিল জিয়াইয়া। নৃপতি দিলেন পূজা জয় জয় দিয়া ॥
জয় জয় শব্দ হইল নৃপতি-ভবনে। পালা সায় রহে গান নৃপতি-কল্যাণে ॥
ইতি চন্দ্রকেতুর পালা সমাপ্ত।

রাজা শেষকালে যে শীতলাপূজা করিলেন, তাহাও শিবানুরোধে, সুতরাং তাঁহার দৃঢ়তা একনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

কাব্যাংশ।—এই কাব্যানুসরণ করিয়া আমরা যতটা দেখিলাম, তাহাতে কবির উপাখ্যান রচনায় যে বিশেষ কৌশল কিছু আছে, তাহা দেখিলাম না। কাব্যাংশে ইহার সৌন্দর্য্যও যে অধিক আছে, তাহাও বোধ হইল না;—তবে একবারে যে কিছুই নাই এমন নহে, দু' একটী নূতন ছন্দও আছে।

(১) নিম্নলিখিত ছন্দটীর নাম কবি "একাবলী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"রাণী বলে নরপতি। কি হবে আমার গতি ॥

উনসর্ত্ত তনয় মৈল। বধূয়া বিধবা হৈল॥
এ মুখ দেখাব কারে। প্রবেশি পাতালপুরে॥
পুত্র বিনে নাহি ধন। পিণ্ড দিব কোন জন॥"

এটি অষ্টাক্ষরী মিত্রাক্ষরা বৃত্তি। তৃতীয় চরণে "তনয়" শব্দ "পুত্র" শব্দে পরিবর্ত্তিত করিলে অক্ষরাধিক্য দোষ থাকিত না। "উনসর্ত্ত" শব্দটি "উনসত্তর"বোধক; উহা হয়ত কবির দেশপ্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) মা, তুমি যারে কর বিড়ম্বনা।
কাষ্ঠ জিনি কলেবর কর তারে জর জর
অঙ্গে কর উএর নাদনা॥

এরূপ ধুয়াবিশিষ্ট ত্রিপদী ছন্দ সমগ্র কাব্যে এই একটী মাত্রই আছে।

কল্পনা।—কবির কল্পনাশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত ছিল না। তাঁহার বিচারে চূড়ান্ত সুখের ছবি যে কি, তাহার একটা উদাহরণ তিনি চন্দ্রকেতুর প্রজার অবস্থা-বর্ণনার মধ্যে অসতর্ক ভাবে দিয়া গিয়াছেন,—

"সুবর্ণের কলসীতে প্রজা জল খায়। কেবা রাজা কেবা প্রজা চেনা নাহি যায়॥
রোগ শোক নাহি জানে সদাই মদন। লিখিতে না পারে যেন ইন্দ্রের ভুবন॥
রাজার রাজ্যেতে কেহ নাহি করে ভাগা। কুলা ভরি ধান্য লেই তিল ভোর বিঘা॥"

কবির মতে, প্রজা সুবর্ণের কলসীতেই জল খাউক, আর রাজায় প্রজায় সমান ভাবেই চলুক, যদি তাহাকে ভাগে চাষ করিতে না হয়, যদি সে কুলা ভরিয়া ধান লইতে পায় এবং যদি তার বিঘা ভোর জমীতে তিল জন্মে, তাহা হইলে আর তাহার দুঃখ কি? ইহা হইতে আমরা কবির নিজের অবস্থাও অনুমান করিতে পারি।

ভাষা।—ভাষাগত বিশেষত্ব এই কাব্যে বড় বেশী নাই, যাহা আছে, তাহা দেখাইতেছি—

(১) কাঁটাল্যা বসন্ত বলে দেবী বিদ্যমান।

(২) শিখর্য়া বসন্ত বলে দেবী বিদ্যমান।

এইরূপ "বেঁউচ্যা", "গগর্য়া"। এরূপ শব্দ আরও আছে। এখনকার ভাষায় এইগুলির যফলা ও আকারটীকে বিস্তৃত করিয়া "কাঁটালিয়া" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "শিখরিয়া", "বেঁউচিয়া" ইত্যাদিরূপে লেখাই প্রথা ও শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মগর্য়া"টি মগরিয়া না হইয়া বোধ হয় মগ্‌রাই হয় (যেমন খাগ্‌ড়াই)।

(৩) আভরণ ত্যজিলেন রূপা আদি হীরা।

কবি যদিও চন্দ্রকেতু রাজার প্রজাবর্গকে সোণার কলসীতে জল খাওয়াইয়াছেন, সোণার ভাঁটা লইয়া শিশুদিগকে খেলা করাইয়াছেন, তবু এই চরণটীতে রূপার আভরণ ভিন্ন সুবর্ণের অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। যদিও এস্থলে "আদি" শব্দের প্রয়োগ আছে ও হীরকের উল্লেখও আছে, কিন্তু কবির সামাজিক অবস্থা যাহা ছিল, সে অবস্থায় লোকে রূপার গহনা

পরিতে পারিলেই কৃতার্থজ্ঞান করিত এবং কবিও সেই অবস্থার লোক ছিলেন বলিয়া, মা শীতলার গাত্রে রৌপ্যালঙ্কারের প্রাধান্য রাখিয়া গিয়াছেন। হীরকের উল্লেখ এস্থলে যেন কবি একান্ত ধনের মান রাখিবার জন্যই করিয়াছেন। কবির সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যদি এরূপ অনুমান করি, তাহা হইলে বোধ হয় কোন অন্যায় করা হয় না।

"বাম হাতে ছেল্যা মুণ্ড ভল্লুক-বাহন।"

এই "ছেল্যা" শব্দ অবশ্য পূর্ব্বোল্লিখিত "শিখরীয়া", কাঁঠালিয়া"র ন্যায় এখনকার ভাষায় "ছেলিয়া" রূপধারণ করে না বটে, কিন্তু হিন্দী ভাষায় ছেলিয়া হয়। এরূপ স্থলে এই যফলা ও আকারের প্রয়োগ রাঢ়ীয় বিকার কি না তাহা জানি না, তবে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় "ছাল্যে" প্রয়োগ শুনিয়াছি।

"শীতলা বলেন ঘুচাইব সোণা শৈঁকা।"

"শৈঁকা" অবশ্য এতদঞ্চলে "শাঁখা" রূপে লিখিত হয়। আসলে ইহা "শঙ্খ" শব্দের অপভ্রংশ। "শৈঁকা" বা "শৈঁখা" রাঢ়ীয় বিকার বটে। এইরূপ "ভাটা স্থলে "ভেঁটা"—"সুবর্ণের ভেটা লঞা শিশুগণ খেলে।"

"আগমন" অর্থে "গমন" শব্দের প্রয়োগ—

"ব্রাহ্মণী দেখিয়া রাজা করে নিবেদন।
কি কারণে মোর স্থানে করেছ গমন॥"

"দেয়" অর্থে "দেই" এবং "নাপাক" অর্থে 'অপাক'—

অপাক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটী।"

উর্দ্দু ভাষায় "নাপাক" অর্থে অপবিত্র, বাঙ্গালী কবি সেস্থলে "অপাক" শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজে যে ভাষাটী ভাল হজম করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। "দেয়" অর্থে "দেই" শব্দের প্রয়োগ ঠিক প্রাদেশিক প্রয়োগ নহে, ইহা উক্ত শব্দের প্রাচীনরূপ-মাত্র, কারণ উহা প্রায় সকল প্রদেশের কবির লেখাতেই দেখা যায়। "বল্যা" ও "বলিয়া" উভয়বিধ প্রয়োগই দেখা যায় যথা—"শিব শিব বলিয়া দুই কর্ণে দিল কর।" এইরূপ দ্বিবিধ রূপের প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয় যে (কহনার্থ) "বলে" পদের সহিত "বলিয়া" অর্থের অর্থাৎ হেতুবোধক "বলে" (যাহার উচ্চারণ বোলে) পদের পার্থক্য রাখিবার জন্যই "বল্যা" এই রূপের উদ্ভাবন করা হইয়াছে ; কিন্তু এ উদ্ভাবন এই কবির নিজস্ব নহে, ইহার বহু পূর্ব্ব-কালের কবির রচনাতেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অকারান্ত উচ্চারণবিশিষ্ট লান্ত ক্রিয়া-পদ গুলিতেও কবি একটী করিয়া যফলার ব্যবহার করিয়াছেন, আবার কোথাও তাহাও করেন নাই।

(১) তার বাড়ী চলিল বসন্ত গজশুঁড়া।
(২) রাজার মহলে শীঘ্র প্রবেশিল গিয়া।
(৩) পূর্ণ হাট বসাইল, বসাইতে না পাইল।

অন্যত্র—

(১) আলকুঞ্চা বসন্ত বেরাইল্য তার গাঁয়।

(২) তার বাড়ী বসন্ত পাঠাইল্য চামদল।

(৩) মৈল্য যত প্রজালোক, মোরে হৈল্য পুত্রশোক।

এরূপ করিবার অর্থ কিছুই দেখা যায় না।

প্রথম পুরুষের কর্ত্তায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহারও এ কাব্যে বিরল নহে;—"আর কি পূজিব চন্দ্রকেতু নৃপমণি।" এস্থলে "পূজিবে" অর্থে "পূজিব" প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) পুত্র বিনে নাহি ধন। পিণ্ড দিব কোন জন॥

এস্থলে 'দিবে' অর্থে "দিব" প্রয়োগ।

(৩) তোমা বিনে কেবা রাজা। অনাথ হইব প্রজা॥

এস্থলে 'হইবে' অর্থে "হইব" প্রয়োগ।

বস্তুবাচক শব্দের স্থলে ব্যক্তিবাচক শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন কবিদের কাব্যে যথেষ্ট দেখা যায়, কবিবল্লভের রচনাতেও তাহা আছে,—

"সূর্য্য সনে মোর মিতা।"—

এস্থলে "মিতালী" অর্থাৎ মিত্রতা অর্থে 'মিতা' শব্দের প্রয়োগ।

ভিন্নার্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ—

"দুহিতা যমুনা যম তনয় আমার।
তেজময়ী পাছে দুঁহে করেন প্রতিকার॥"

এস্থলে 'অধিকার' অর্থে 'প্রতিকার' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে; কিন্তু প্রতি উপসর্গের অর্থের প্রতি কবির উদ্দেশ্যের একটা বিশেষ টান আছে। সূর্য্যালোকে রাজপুত্রকে বসন্ত ভয়ে লুকাইয়া রাখা হইলে, শীতলা সূর্য্যলোকেও বসন্ত ছড়াইয়া দেন। পুত্রকন্যার প্রতি পাছে শীতলা অনুগ্রহ করেন, এই ভয়ে সূর্য্যপত্নী ছায়া সূর্য্যকে ঐ কথা বলিতেছেন। অতএব অনুভব হয় যে, ছায়া ভাবিতেছেন, শীতলার শীকার রাজপুত্রকে আনিয়া রাখা অপরাধে শীতলা প্রতিশোধ দিবার জন্য যদি তাঁহার পুত্রকন্যাকেই আক্রমণ করেন। প্রতিকার শব্দের 'প্রতি' উপসর্গ হইতে আমরা কবির অন্তরস্থ প্রতিশোধের ভাবটুকু বোধ হয় টানিয়া বাহির করিতে পারি।

একটী কবিকল্পনার সমাস অতি সুললিত বটে—

"নীলকণ্ঠ-প্রিয়া-তাত তথি কেবা যায়।"

নীলকণ্ঠের (শিবের), প্রিয়া (পত্নীর), তাত (পিতা) অর্থাৎ হিমালয় হইলেও ব্যাপ্ত্যর্থে পর্ব্বতমাত্র অর্থ গৃহীত হইয়াছে। "তথি" তথায়।

"বিদুর বাড়ীকে যেন গোবিন্দ ভিখারী।"

'বাড়ীতে' স্থলে "বাড়ীকে" বর্দ্ধমান অঞ্চলে কথোপকথনের ভাষায় সপ্তমী বিভক্তির "এ"ও "তে" চিহ্নের স্থলে "কে" চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যেমন ঘর্‌কে যাবি ?

দিগম্বরী বেশ ধর ইবেশ ছাড়িয়া।

এস্থলে "ই" শব্দটী "এই" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই "এই" শব্দ ২৪ পরগণা, হুগলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি জেলার ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে 'এ' হয়। আর বর্দ্ধমান অঞ্চলে 'ই' হয়। সুতরাং এই "ই" হইতে আমরা কবিকে রাঢ়ীয় লোক বলিয়া ধরিতে পারি।

বিশেষার্থক শব্দাবলী।—

"রাজকন্যা সতী হৈল ঈশ্বরীর বোলে।"

ইংরাজেরা "She became a *Sutee* on her husband's funeral pile" এতদ্বাক্যে সতী শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ করে, এস্থলে কবি সেই অর্থে সতী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সতীশব্দের এরূপ অর্থ এখনকার ভাষায় চলিত নাই।

"অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য শুন রূপসিনী।"

এস্থলে "রূপসিনী" এরূপ পদ ভুল হয়, "রূপসী" শব্দকে পর পংক্তির "রাজরাণী" শব্দের সহিত মিত্রাক্ষর করিবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছে। এরূপ ভুলগুলি সংস্কৃতে "আর্ষ-প্রয়োগ" বলিয়া উপেক্ষিত হয়, আমরা বাঙ্গালায় "কবিপ্রয়োগ" বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি। আজকালকার লেখকেরও যে এ দোষ নাই, এমন নহে,—"সুকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে",—সুকেশী বা সুকেশা পদই শুদ্ধ, সুকেশিনী হয় না।

"পাতি বৈতে কাঁকালেতে ধরিলেক বাত।"

"বৈতে" অর্থ 'বহিতে' এবং "কাঁকালেতে" কটিদেশে।

"সতী বলে পতি যদি প্রাণদান পাব।"

"পায়" বা "পাইবেন" অর্থে "পাব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

"কাপড় কাণ্ডার দেবী বেড়ি দিল তথা"

'কাণ্ডার' অর্থে পর্দ্দা, আবরণ ইত্যাদি।

"মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল।"

"মৃতসঞ্চারিণী" স্থলে "মৃতসঞ্জীবনী" হওয়াই কবির উদ্দেশ্য; ঠিক বলা যায় না ইহা লিপিকর-প্রমাদ কি না।

"চন্দ্রকলা সতী তার পশ্চাতে গড়ায়।"

"গড়ায়" অর্থে অনুসরণ করে।

"কত দূরে গিয়া মাতা পাছু পানে চায়।"

"পাছু" অর্থে পশ্চাতে।

আমি গিয়া যার ঘরে করি বিড়ম্বনা।
সোণার শরীর করি উএর নাদনা॥

এস্থলে "নাদনা" শব্দের অর্থ যতটা বুঝা যায়, তাহাতে ঢিপি বা স্তূপ বলিয়াই অনুমান হয়। উইয়ের ঢিপি যেমন অন্তঃশূন্য, বসন্তের প্রকোপে সোণার ন্যায় শরীরও সেইরূপ অন্তঃশূন্য হইয়া যায় বা উইয়ের ঢিপির উপরিভাগ যেমন অমসৃণ, বসন্তের চিহ্নে সোণার শরীরও সেইরূপ বিকৃত হইয়া যায়; এইরূপ অর্থই এস্থলে অনুমিত হয়।

"নেকা চেঁকা মেঘনাদ বিষম মূরতি।"

এস্থলে "নেকা চেঁকা" এক কথা কি স্বতন্ত্র অর্থবিশিষ্ট দুই কথা তাহা বুঝিলাম না। অনুমানে অঙ্কন অর্থে লিখন এবং তদর্থে লিখন শব্দের অপভ্রংশ "নেকা" হইতে পারে। "চেঁকা" অনুকারক শব্দ। মেঘনাদের মুখখানা নানারূপ চিত্রিত (অবশ্যই ভয়োৎপাদক) এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

"তেজময়ী বলেন তবে না হইল পূজা।
নিদান রাখিল পুনঃ চন্দ্রকেতু রাজা॥"

এস্থলে "নিদান" শব্দের কি অর্থ বুঝা গেল না। আমাদের এতদঞ্চলে কথোপকথনের ভাষায় নিদান শব্দ বিকৃত হইয়া "নিদেন" হয় এবং 'একান্তপক্ষে' এইরূপ অর্থপ্রকাশ করে। এস্থলে চন্দ্রকেতু কনিষ্ঠ পুত্রকে সূর্য্যালোকে লুকাইয়া রাখায় শীতলা ঐ কথা বলিতেছেন, সুতরাং এস্থলে যদি এরূপ অর্থ করা যায় যে, 'একান্তপক্ষে রাজা চন্দ্রকেতু এ পুত্রটিকে রক্ষা করিতে পারিল'—তাহা হইলে এই নিদান শব্দের অর্থ যেন কতকটা হয়।

"পদ্ম বলে শরণাপনে যদি ছেড়্যা দিব।
তবে কি আমারে হর মস্তকে ধরিব॥"

'শরণাপন্ন' অর্থে "শরণাপন" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ইহা বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ।

"প্রাণ দিয়া শর্ণাপন শিশু যদি রাখি।"

"শরণাপন্ন" শব্দের অন্তর্গত নানাবর্ণের বিকার ঘটিয়া শর্ণাপন হইয়াছে। এরূপ স্পষ্ট ভ্রমাত্মক শব্দকে কোন দিন স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। উপরিলিখিত "শরণাপন" শব্দকেও স্বতন্ত্র শব্দ ধরা উচিত নহে।

"ডান হাতে আশাবাড়ি বামহাতে পাতি।
চৌষট্টি বসন্ত মাতা রাখিলেন তথি॥"

"আশাবাড়ি" কি তাহা জানিনা, তবে "বাড়ি" অর্থে "নড়ি" "লাঠি," "ছড়ি" ইত্যাদি বটে। "পাতি" অর্থে পেঁতে, চুবড়ি। "তথি" অর্থে তথায় কিন্তু এখানে "তাহাতে"।

উপরে যে সকল ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হইল, তদ্দ্বারা আমরা এই কাব্যখানি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বের গ্রন্থ বলিয়া গণনা করিতে পারি, কারণ ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষা যে পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছিল, ইহার ভাষা সে পরিমাণে মার্জ্জিত নহে। আবার কবিকঙ্কণাদির

ভাষার ন্যায় তত প্রাচীনাবস্থাসূচকও নহে। অনুমান হয়, ইহা কেতকাদাসাদির সমকালের রচনা।

ইতিহাস।—এই কাব্য হইতে সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। যে স্থলে শীতলা-দেবীকর্ত্তৃক চন্দ্রকেতুর রাজ্যে প্রজার জাতিনির্ব্বিশেষে বসন্ত-ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থলে কয়েকটী জাতির ও রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহার বর্ণিত আছে। কবির সময়ে সেই সকল জাতির ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা এখানকার লোকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইতেছে,—

"আমীন মাপএ জমী কোণে কোণে দড়া। তার বাড়ী চলিল বসন্ত গজগুঁড়া॥

* * * * * *

শ্রাদ্ধ সময় ভাট বোধ নাহি যায়। আমবোয়া আলকুশ্যা বসন্ত বেরাইল্য তার গায়॥

* * * * * *

গোয়ালা বিচিত্র ঘোল তাতে দিয়া জল। তার বাড়ী বসন্ত পাঠাইল চামদল॥
আসি বলি নাপিত ভাঁড়ায় মনুষ্যেরে। উঞানিয়া বসন্ত ধরিল গিয়া তারে॥
বাসিবস্ত্র দিলে রজক সুখে পরে। পোড়া মসুরিয়া পাঠাইল্য তার ঘরে॥
অনেক ছলনা ধরে কোটাল নিশাচর। মগর্যা বসন্ত পাঠাইল্য তার ঘর॥"

গোয়ালা, ধোপা, নাপিত এখনও যে এ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য কেহ দিবেন কি না জানি না।

এতদ্ভিন্ন আরও একটী কথা বলিতেছি। কেতকাদাসাদির মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদবেণে শিবভক্ত ছিলেন, আর এই কাব্যের নায়কও শিবভক্ত। উভয়েই প্রাণান্তে শিবোপাসনা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন অথচ দেবীরাও তাঁহাদিগকে ভিন্ন আর কাহারদ্বারা আপন আপন মহিমা প্রচার করাইতে সম্মতা নহেন। শিবভক্তগণকে দেবীভক্ত করিবার এই চেষ্টা দেখিয়া বোধ হয় যে, যে সময় বাঙ্গালায় শৈবধর্ম্মের সহিত শক্তিধর্ম্মের সংঘর্ষ হয়, সেই সময়ে এই সকল দেবীমহিমা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তন্ত্র-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সময়েই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবী আপন আপন পূজাস্থাপনে ব্যস্ত হইয়া থাকিবেন বোধ হয়, নতুবা শিবভক্ত নায়কগণকে এতটা দেবীদ্বেষী করিয়া অঙ্কিত করিবার অর্থ কি? আর দেবীগণের ব্রতদাস-নিরূপণার্থ শিবভক্তকেই নির্ব্বাচিত করিবার কারণ কি? যাঁহারা এই সকল উপাখ্যানকে প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবের কোন কথা বলা বিড়ম্বনামাত্র।

কবিতার প্রসিদ্ধি।—ভারতের অসংখ্য কবিতার ন্যায় দৈবকীনন্দনের দুই চারিটি কবিতাও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে,—

(১) "সুখের হাটে দাগা বিধি দিলা এতদিনে।"

(২) "পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে॥"

(৩) "কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা।"

খুঁজিলে এরূপ সদ্ভাবব্যঞ্জক কবিতা আরও দুদশটী পাওয়া যায়।*

২। নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল।

গোকুল-পালা।

এই পালার যে পুঁথিখানি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও অধিক দিনের প্রতিলিপি নহে, তবে মৎসংগৃহীত পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানি-অপেক্ষা অধিক দিনের। ইহা ১২১৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে রামধন চোঙ্গদার নামক ব্যক্তির লিখিত। কাহার জন্য কোথায় লিখিত হয়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পুঁথিখানির বয়স ৮৮ বৎসর হইলেও ইহার অবস্থা ভাল। ইহার রচনা পূর্ব্বোক্ত কাব্যের রচনা হইতেও প্রাঞ্জল ও সরস। এই কবিও ভারতচন্দ্রাদির পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন বলিয়া অনুমান করা যায়, যথাস্থানে তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। পুঁথিখানি ৯ পাতা মাত্র, কবিতার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ হইবে।

কবি নিত্যানন্দের বিশেষ পরিচয় কাব্যের দুই স্থলে পাওয়া গিয়াছে; এক স্থলে,—

"সৌতিসম সর্ব্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ, চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত, নিত্যানন্দ নামযুত, গাহে ভেবে শীতলাচরণ॥"

আর এক স্থলে—

"কাঁটাদের ডিঙ্গিসাঞি গোত্র ভরদ্বাজ। মহামিশ্র রাধাকান্ত খ্যাত ক্ষিতিমাঝ॥
দ্বিতীয় আত্মজ তার দৈব অনুবলে। দ্বিজ নিত্যানন্দ রচে সাধনের ফলে॥"

এতদ্ভিন্ন কয়েক স্থলের ভণিতা হইতে আমরা পাইয়াছি :—

"চিন্তিয়া শ্রীশীতলার পদ্মপাদদ্বন্দ্ব। বিরচিল চক্রবর্ত্তী কবি নিত্যানন্দ॥"

এই সকল হইতে আমরা দেখিতেছি, কবি নিত্যানন্দ ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভূত ডিঙ্গীসাহী (ডিংশাই) গ্রামী কাঁটাদিয়াবাসী ছিলেন। ইহার বংশে প্রথমে ডিংশাই, পরে মিশ্র, পরে

* ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধে বৌদ্ধ হারীতী দেবীর প্রসঙ্গ আছে বলিয়া যে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ভুল। উহা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাজী (বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মা-বশেষ) প্রবন্ধে আছে।

চক্রবর্ত্তী উপাধি' প্রচলিত হয়। ইহার উর্দ্ধতন তিন পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছে এবং ইহারা যে অন্ততঃ তিন সহোদর ছিলেন, তাহাও জানা যাইতেছে; কেননা তিনি আপনাকে চৈতন্যের মধ্যম ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অন্ততঃ একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কবির বংশাবলী এইরূপ,—

ভবানী মিশ্র ... ... (কবির প্রপিতামহ)
|
চিরঞ্জীব ... ... (পিতামহ)
|
মহামিশ্র রাধাকান্ত ... ... (পিতা)

চৈতন্য | নিত্যানন্দ (শীতলা-মঙ্গল প্রণেতা) | (নাম অপ্রাপ্ত)

কবির বংশ ডিণ্ডীসাহীগ্রামী। এই গ্রামীণেরা বল্লালসেনের সময় হইতে কৌলীন্য-হীন ছিলেন, প্রভৃত বল্লালসেনের প্রদত্ত স্বর্ণময়ী ধেনুদান লইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত হন, তাঁহাদের মধ্যে ডিণ্ডীসাহীগ্রামী শঙ্কর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। কবির বংশ এই পতিত শঙ্কর ডিণ্ডীসাহী হইতে উদ্ভূত কি না কে জানে? লক্ষ্মণসেন যখন কুলীনের মুখ্য, গৌণ ও বংশজভেদ স্থাপন করেন, তখন ডিণ্ডীসাহীগ্রামী জনার্দ্দন গৌণ কুলীনশ্রেণীতে গৃহীত হন, কবি নিত্যানন্দ এই ব্যক্তির বংশ-জাত কি না, কে বলিবে? দনৌজামাধব যখন কুলীন ও শ্রোত্রিয় সংজ্ঞকভেদ প্রবর্ত্তিত করেন, তখন তাঁহার আদেশে ডিণ্ডীসাহী গ্রামীণেরা সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। দেবীবরের সময়ও ডিণ্ডীসাহীরা ঐ মর্য্যাদাতেই অবস্থিত ছিলেন। যাহাহউক কবির কুল-পরিচয়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে আর অধিক সুবিধা নাই। কবির বংশের বাসগ্রাম কাঁটাদিয়া, কবির জন্মস্থান বলিয়া যত প্রসিদ্ধ না হউক, এক শাখার কুলীনাবাস বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। বল্লালী কুলীন মকরন্দ বন্দ্যের জ্যেষ্ঠপুত্র দাশরথী এই গ্রামে বাস করেন, তদবধি একাল পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তর পুরুষগণ আপনাদিগকে "কাঁটাদিয়ার বাড়ুয্যে" বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন।

কবি নিত্যানন্দ কোন্ সাম্প্রদায়িক ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার কাব্যে কোথাও তাহার সুস্পষ্ট আভাস নাই! তবে তাঁহার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ২টী (নিত্যানন্দ ও চৈতন্য) দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার পিতা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী ছিলেন, কিন্তু তাহাও এই সামান্য প্রমাণের বলে নিঃসন্দেহে বলা যায় না। একটি ভণিতায় আমরা পাইয়াছি;—

"চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ রচে মধুক্ষর। শীতল্যা পিরীতে হরি বল নর ॥"

এই "হরি বল" হইতে কবিকে যদি কেহ বৈষ্ণব বলিতে চাহেন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহাদের জন্য আরও একটী সপক্ষীয় ভণিতা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"ব্রাহ্মণে করিতে কৃপা ব্রাহ্মণীর গুণে। নারায়ণ চিন্তি মনে নিত্যানন্দ ভণে॥"

নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গলের বিবরণ এইরূপ,—

"গোকুল-পালা।—

রঙ্গরসে কর‍্যা স্থিতি রোগপুরপাটনে। বসন্তকুমারী বস্যা বস্যা ভাবে মনে॥
ব্রণব্যাধি-যানে বেড়াই চৌদ্দভুবন। সত্য ত্রেতা নিলাম পূজা শাস্যা ত্রিভুবন॥
দ্বাপরেতে দাসী সঙ্গে বস্যা যায় দিন। মহীতলে হল নাস্তি মহিমার চিন॥"

কবি নিত্যানন্দের কল্পনা বড় তেজস্বিনী। শীতলার অবস্থানের জন্য তিনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও স্থান না করিয়া "রোগপুরপাটনের" সৃষ্টি করিয়াছেন, শীতলার চৌদ্দভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য "ব্রণব্যাধিরূপ যানের" সৃষ্টি করিয়াছেন, আর শীতলার নাম দিয়াছেন "বসন্তকুমারী"। যে পুরাণকার কবি যেন ব্রণভয়ে ভীত হইয়া এই দেবীর নাম শীতলা রাখিয়াছিলেন, তাঁহা অপেক্ষা বাঙ্গালী নিত্যানন্দকে অধিক সাহসী বলিতে হয়, তিনি নির্ভয়ে দেবীর নাম "বসন্তকুমারী" রাখিয়াছেন। যে বাঙ্গালী ভয়ে বসন্তের নাম করে না, বলে "মার অনুগ্রহ", সেই বাঙ্গালীরই জনৈক কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মার বাস্তবিক অনুগ্রহলাভাশয়ে, মার উপযুক্ত নাম-ধাম-যানাদির কল্পনা করিয়া একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে।

তাহার পর কবি শীতলাকে সর্ব্বকালজয়িনী করিবার জন্য দ্বাপরে কিরূপে মহীতলে মহিমার চিহ্ন থাকিবে, তাহা ভাবিতে বসাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, মহিমা প্রচার করিতে হইলে, দেবদেবীদিগের একার যুক্তিতে কিছু হয় না, কাহারও সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক হয়, সুতরাং প্রথানুসারে শীতলারই বা না হইবে কেন? দৈবকী-নন্দনের শীতলাও জ্বরাসুরকে ডাকিয়া ছিলেন, নিত্যানন্দের বসন্তকুমারীও তাঁহাকেই ডাকিলেন ;—

"যুক্তিহেতু জগৎমাতা জ্বরাকে জিজ্ঞাসে। পৃথিবীতে পূজার প্রচার হয় কিসে॥
বুঝ্যা বুঝ্যা বিচক্ষণ বুদ্ধি দিল জ্বর। গুণ খ্যাত হবে যাহ গোকুলনগর॥
নাশিতে ক্ষিতির ভার দৈত্যের নিধনে। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের ভবনে॥
বাল্যবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল। শ্রীদামের অংশকলা দ্বাদশ রাখাল॥
ষোড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আদ্যা রাধা। কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা॥
ব্রহ্মাদি বাসনা করে যার পদধূলি। সে হরি আপনি গোপগোপী সঙ্গে কেলি॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা। ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা॥
ত্রিসর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বারাণস। এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ॥
এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি। ত্রিভুবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি॥"

মা শীতলা সত্য-ত্রেতায় ত্রিভুবন শাসিত করিয়া পূজা লইয়া গরবিনী হইয়া বসিয়া ছিলেন ; দ্বাপরে কিরূপে পৃথিবীতে মহিমার চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহাই ভাবিতে

ভাবিতে জ্বরকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্বর, পৃথিবীর মধ্যে আপাততঃ কৃষ্ণাবতার হওয়াতে কাশী গঙ্গা প্রভৃতি অপেক্ষাও গোকুলনগরের শ্রেষ্ঠতা জানাইয়া, সেখানে পূজা লইতে পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যে বিধিমত জব্দ হইবে, তাহাও বলিয়া দিল; কিন্তু শীতলার একটু ভয় হইল, একবারে নারায়ণের বিহারভূমিতে গিয়া অনুগ্রহ-বৃষ্টি করিতে তাঁহার প্রাণ একটু কাঁপিয়া উঠিল;—

"যে কথা জ্বরার সে যুক্তি অসম্ভব। শুনে শীতলার মুখে সরে নাঞি রব॥"

কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলে কৈ, কাজেই মার মুখে রব ফুটিল, তিনি জ্বরাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন;—

"বাপু জ্বরা বুদ্ধির বালাই লয়্যা মরি। যেই দিলেন চুরী বিদ্যা তার ঘরে চুরী॥
নন্দের কানাঞে মোকে লাগে বড় ভয়। স্তনপানে পুতনা পাঠালে যমালয়॥
চরণ নাচেড়ে ভঙ্গ দুর্জ্জয় শকট। বলা নয় ব্রজে যাওয়া বিষম সঙ্কট॥

* * * * * *

ইন্দ্র যথা হারে তথা যেত্যা বল মোকে। মাতঙ্গ মন্দিরে সিংহ লজ্জা নাঞি ঢোকে॥"

শীতলার এই ভীতি-কম্পিত কথাগুলি জ্বরার বড় ভাল লাগিল না। শীতলা তাহাকে এতটা মূর্খ, অপরিণামদর্শী ঠাহরাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া বোধ হয় জ্বরা একটু চটিল ও জোড়হাতে বলিল,—

"বিষ্ণু দিল বসন্ত ব্রহ্মার হয়ে ঝি। নবঅবতার কৃষ্ণ ভয় কর কি॥
ব্রণ-জালে ব্রজপুরি চলগ্যা বেড়িব। মরি যদি মারে কৃষ্ণ মোক্ষপদ পাব॥
পূজা নিতে পারি যদি পৃথ্বীতে রবে খ্যাত। যাত্রা কর ত্বরিত যা করে জগন্নাথ॥
জ্বরতী ব্রাহ্মণীবেশে যশোদা সাক্ষাতে। যে কিছু পূজার কথা যায় জানাইতে॥
চল চল চক্রিণী চরণে পড়্যা কই। পাবে না পাবে না বিড়ম্বনা এই॥
নিত্যানন্দ বলে চল দোষ কি তোমার। পশ্চাতে বুঝিব যত যোগ্যতা জ্বরার॥"

এই স্থলে নিত্যানন্দ জ্বরার মুখে শীতলাকে ব্রহ্মার নন্দিনী বলিয়া পরিচয় দিলেন। দৈবকীনন্দন তাঁহার "কশ্যপের যোগে জন্ম" বলিয়া গিয়াছেন। এস্থলে দুইটী সাক্ষীর কথাই পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং শীতলার জন্মের ঠিক হইল না; তবে শীতলা পৌরাণিক দেবতা, পুরাণের কথা না পাইলে কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না।

যাহা হউক জ্বরার কথায় শীতলা একটু সাহস পাইলেন; জ্বরার কথামত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে, বামকক্ষে কলসী, দক্ষিণ হস্তে মুড়া ঝাঁটা লইয়া গোকুলে যাত্রা করিলেন। মা ছদ্মবেশ ধরিলেন, কিন্তু তাঁহার শীতলাগিরির চিহ্ন "মার্জ্জনীকলসোপেতাম্" মূর্ত্তি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। একটী রঙ্গীন চুপড়িতে ভরিয়া বসন্তগুলিও লইলেন। যাত্রা করিবার সময়—

"গোবিন্দ স্মরণে গতি গোকুলের পথে ॥"

এই টুকুই বড় সুন্দর ! জরা যতই সাহস দিক, মা শীতলা কৃষ্ণকে ভালরূপ চিনিতেন, কাজেই গোবিন্দ-মোহনার্থ যাত্রাকালে সেই গোবিন্দেরই নাম স্মরণ করিয়াই যাত্রা করিলেন। যখন শীতলা গোকুলের পথে প্রবেশ করিলেন, তখন কৃষ্ণ গোষ্ঠে আসিয়াছেন ;—

"জাবটে প্রবেশ হও জানাতে রাধারে। হাসি হাসি রমানাথ বাঁশী নিল হাথে ॥"

এই দুইটি চরণে কবি গোষ্ঠ-প্রবেশকালে বংশীবাদনের যে কারণ দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। অনেক বৈষ্ণব কবির ও অনেক প্রাচীন কবির কাব্য এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, তাহার কোথাও এমন সুন্দর মধুর কারণোল্লেখ দেখি নাই ; কিন্তু এই বাঁশী বাজাইবার কারণ বুঝিয়া আমরা যতই আহ্লাদিত হই না, আর বাঁশীর স্বরে শ্রীমতী রাধিকার যতই আনন্দোৎকণ্ঠার উদ্ভব হউক না কেন, মা শীতলার কিন্তু প্লীহা চমকাইয়া গেল ; কবি বলিতেছেন,—

"রাধা রাধা বলিয়া বংশীতে দিতে শাণ। শীতলার শুন্যা পথে উড়ে গেল প্রাণ ॥"

তার পর শীতলা পাছে কৃষ্ণের সম্মুখে পড়েন, এই ভয়ে পথ ছাড়িয়া এক নিম্ববৃক্ষমূলে লুকাইলেন। সেই বৃক্ষের নিম্ন দিয়া কৃষ্ণ ধেনুপাল ও দ্বাদশ গোপাল লইয়া চলিয়া গেলেন। শীতলা সেই "নটন গতিভঙ্গ" দেখিলেন, তখন—

"এ সব কৃষ্ণের কীর্ত্তি করি নিরীক্ষণ। দুনয়নে বহে ধারা ব্রণময়ী কন ॥
পৃথ্বী হলি পবিত্র পবিত্র হল মাটী। প্রত্যহ পড়িয়া কৃষ্ণের পাদপদ্ম দুটী ॥
তোর পৃষ্ঠে লীলা খেলা কৃষ্ণের বিহার। এমন পরমভাগ্য আর হবে কার ॥"

এইরূপে শীতলা একে একে পৃথিবীর, নন্দের, গোপগোপী, গোকুলের তরুলতা পশু পক্ষীর, শ্রীদামাদির এবং যশোদার কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে তাহাদের ভাগ্য-প্রশংসা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, তাঁহার যেন একটু সাহস হইল,—

"শূন্য হল গোকুল বিপিনে গেল হরি। শীতলা বলেন আমি অকারণে ডরি ॥
এইবার যেতে হল যশোদা নিকটে। বিপ্র নিত্যানন্দ বলে এই যুক্তি বটে ॥"

তাহার পর শীতলা নন্দালয়ের পথ ধরিলেন।

"যত গোপশিশু সঙ্গে যত গোপের মেয়্যা। জরাবস্থা বুড়ী দেখে সভে আইল ধেয়্যা ॥
বলে,
ঝাঁটা হাতে কুলামাথে কক্ষেতে কলসী। কে তুই কাহার মেয়্যা কোথারে যায়সি ॥"

তৎপরে কেহ ডাকিনী বলিল, কেহ পিশাচী বলিল, কেহ গাত্রগন্ধে হুঙ্কার তুলিয়া পলাইল। শীতলা দোষ খুঁজিতেই আসিয়াছিলেন, এই অপমান দেখিয়া, অতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, তাহাদের পতিপুত্রের মুণ্ড-ভোজনের ব্যবস্থা করিতে করিতে, তাহাদের যৌবনোদ্ভাসিত দেহ বসন্তে পচাইয়া দিতে দিতে চলিতে লাগিলেন, শেষে—

"গোসায় গর্গর বুড়ী উঠিতে পড়িতে। বসিল ব্রাহ্মণী যেয়্যা নন্দের বাড়ীতে॥"

তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বুড়ী নন্দালয়ে ভিক্ষা চাহিল। যশোদা-রোহিণী স্বর্ণথালে ভিক্ষা লইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। শীতলা ভিক্ষা লইয়া নানা আশীর্ব্বাদের পর বসন্তভয়নিবারক নিজ প্রসাদী ফুল দিয়া বলিলেন ;—

"সুখে স্বাস্থ্যে ঘর কর, শীতলার ফুলটি ধর, রোগ শোক বিঘ্ন যাবে দূর॥
পুণ্যবতী যশোমতী, তোমা চেয়্যা ভাগ্যবতী, ত্রিভুবনে আছে কোনজন।"

তাহার পর কৌশলে স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"কহিব কহিব করি, বুড়া লোক বড় ডরি, পাছে কিছু কর‍্যা থাক মনে।
পূজা কর শীতলাই, বাড়ি দিবে গরু গাই, ছেলে দুটী থাকিবে কল্যাণে॥
শীতলাই স্বর্গ হইতে, পৃথিবীতে পূজা লইতে, বসন্ত আন্যাছে ষাটী ভার।
যে দেশে প্রবেশ হয়, * * সদা রয়, মানেনা ঔষধ প্রতিকার॥
* * * * * *
নন্দকে সংবাদ দিয়া, ব্রজ গোপ গোপী লয়্যা, পূজ পূজ শীতলা-চরণ।
আশীর্ব্বাদ লেহ মোর, পুত্রের কল্যাণ তোর, ব্রাহ্মণীকে করাও পারণ॥"

তাহার পর শীতলা কিসের জন্য পারণ করিবেন, তাহাই বলিলেন,—

"কপট করিয়া মাতা, সংযম ব্রতের কথা, কন বস্যা যশোদার পাশে॥
ভৃগুরাম মহামতি, নিক্ষত্রা করিলা ক্ষিতি, যে কালেতে তিন সাত বার।
সেই রক্ত মাংস গ্রাসি, পুণ্যব্রত একাদশী, সত্যযুগে সংযম আমার॥
ত্রেতাযুগে উপবাস, শ্রীরাম করিলেন নাশ, সীতার্থে রাক্ষস সমুদয়।
তা সভার মাংস মেদে, ত্রেতান্তে মনের সাধে, ফলমূল করিলাম লঙ্কায়॥
দ্বাপরে পারণার বিধি, গোকুল জাবটাবধি, গোপ গোপী আছে যত জনা।
খেপালে ঠেকিবে দণ্ডে, আজি সভাকার মুণ্ডে, কর‍্যা যাব তুলসী-পারণা॥"

তুলসী-পারণা অর্থে সামান্য পারণা। ব্রতাদির পর পারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য, পারণ না করিলে ব্রতফল নষ্ট হয়, অথচ ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে গৃহীর আহার নিষেধ, এমত স্থলে হরিচরণ-প্রসাদী তুলসীপত্রমাত্র চর্ব্বণ করিয়া গৃহী পারণ করিতে পারে,—প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই তুলসী-পারণা। মা শীতলা ত্রিযুগব্যাপিনী সংযম ব্রতের তুলসী-পারণা করিবার জন্য নন্দরাণীকে যে ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী নাম সার্থক হয় বটে। শীতলা বলিলেন,—

"লহে সুখে থাক শুন, লক্ষ ভার ফল আন, মৎস্য মাংস তোমাকে না চাই।
যদি হইত অন্য বাড়ী, তবে কি ছাড়িত বুড়ী, চাব কি তোর পুত্রকে ডরাই॥
ভুঞ্জয়ে ব্রজের যত, দুগ্ধ ঘোল দধি ঘৃত, ক্ষীর সর চিনি মধু ছেনা।
বিরোধ কি করো আর, প্রতি প্রতি লক্ষ ভার, আন যাই করিয়া পারণা॥

দিলাম কসা পাছে ভুল, নন্দকে গিয়া শীঘ্র বল, পূজিতে শীতলা পদদ্বয়।
না পূজ না রবে চাড়, পচায়্যা গলার হাড়, চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ কয়॥"

ব্যাপার শুনিয়া নন্দরাণীর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। বুড়ী খাইতে চায় খাউক, তাহাতে তাঁহার রাজার সংসারে আর আপত্তি কি? তবে গোপালের কথা কি বলিল, তাহাতেই তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন,—

"এ বুড়ী মনুষ্য নয়, ডাকিনী হাকিনী হয়, যোক্ষিণী যোগিনী রাক্ষসিনী॥"

বাঙ্গালী মাতৃ-হৃদয়ের একখানি পূর্ণছবি কবি এই স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর যশোদা নন্দকে গিয়া সমস্ত বলিলেন। নন্দ চাঁদবেণের মত চটিয়া লাল,—

"এত শুনি নন্দ ঘোষ জ্বলন্ত আগুনি। কিসের শীতলা সেটা কিসের রমণী॥
পারণাতে মৎস্য মাংস করেন ভোজন। পিশাচের ধারা এত প্রেতের লক্ষণ॥
এমন দেবীর পূজা আরাধিব কে। তারে দেখিলে পাপ ঘটে দূর করে দে॥"

দূর হইতে গালাগালি দিয়া নন্দের তৃপ্তি হইল না, উঠিয়া সম্মুখে গিয়া গালি দিল, আর বলিল—

"কোথাকার রাক্ষসী বক্সী বেশ হয়্যা। মেয়্যা ঘর পেতে চাহিস্ দাবাইয়া॥"

তার পর 'দোহাতিয়া বাড়ি' তুলিয়া মারিতেও গেল। শীতলা দূরে সরিয়া গিয়া মাথা বাঁচাইলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন,—

"ইহার শাস্তি ঘোষ আজি কালি পাবি॥"

তাহার পর জ্বরকে আসিয়া সমস্ত বলিলেন। নন্দকর্ত্তৃক অপমানাদি সমস্ত বলিয়া মা শীতলা শেষে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণ যার পুত্র তার এত গর্ব্ব বাড়ে। জ্বরা বলে আহীরীয়া অঙ্গ নাহি ছাড়ে॥
কৃষ্ণ তার কেনা কি করয়াছে এই মনে। তেঁই পাকে বেন্ধে মারে যমলঅর্জ্জুনে॥
তপস্যার বশ কৃষ্ণ জানে নাঞি তা। বৎসর বারর জন্মে পোষা বাপ মা॥
এই গর্ব্বে আহীরিয়া এতেক দিছে গালি। ইহার উচিত ফল দিব আজি কালি॥
ব্যাধি অধিকার দিল ব্রহ্মা হর হরি। আহীর কি গর্ব্ব করে ঈশ্বরে না ডরি॥
ইন্দ্র আদি দেবতা অর্চ্চিয়া কৈল পূজা। ব্রজে হব বঞ্চিত বৃথাই ব্যাধি রাজা॥"

এইরূপ আস্ফালন করিয়া জ্বর জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, কৃষ্ণকে এতটা অপমান কি সহ্য করা যায়? ও গোয়ালাদের সঙ্গে ইহার মীমাংসা কি করিব, জিনি এই রোগাধিকার দিয়াছেন, একবার তাঁহার সহিত ইহার বোঝা পাড়া করিতে হইবে,—

"এত অপমানে প্রাণ রাখি অকারণে। জানাইতে যাই আগে জনার্দ্দন স্থানে॥
দাসে যদি দয়া নাঞি করে দেবরাজ। আজি হতে অধিকারে আর নাহি কাজ॥
নহে যদি হরিষে হুকুম করে হরি। বস্যা দেখ ব্রজেতে বিরাট পর্ব্ব করি॥"

এই বলিয়া জ্বরাসুর মা শীতলাকে কতকটা প্রবোধ দিয়া "জয় জগন্নাথ" বলিয়া

কৃষ্ণান্বেষণে যাত্রা করিল। কৃষ্ণ তখন গহনে গাভী রক্ষা করিতেছেন। যেদিন জরা এইভাবে কৃষ্ণের নিকট গেল, সেইদিন কৃষ্ণ "ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ নষ্ট ও ব্রাহ্মণীগণের নিকট অন্নভিক্ষা" লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। জরাসুর যখন গোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তখন কৃষ্ণের লীলা শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে এক নির্জ্জন তরুতলে রঙ্গহাস্যরহস্যে বিরাজ করিতেছেন। জরা আসিয়া কিন্তু দেখিতে পাইল না। তখন সে এক বৃদ্ধ বিপ্রের বেশ ধরিয়া গোষ্ঠের মধ্যে ঘটস্থাপনা করিয়া শীতলার পূজা আরম্ভ করিল; ঘণ্টার বিকটনিনাদে বনপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে শব্দে গাভীগুলি চমকাইয়া উঠিয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল,—

"ঝাঁপ দে গহনে গরু বুলে ঝালি খায়্যা। খেলা ভাঙ্গে সুবল তখন আল ধায়্যা॥
গুটায়্যা গহনে গাভী লয়্যা আল গোঠে। এথা পদ্ধতি করিয়া জরা পুষ্প দেই ঘটে॥"

সুবল আসিতে আসিতে ইহা দেখিতে পাইল, দেখিয়া চটিল, বলিল, দেখিতেছি তুমি ঠাকুরাণী পূজা করিতেছ, কিন্তু তোমার পূজার চোটে আমার গো-পাল "ঝাল খেয়ে" বেড়াইতেছে, এ কি রকম বিকট পূজা। জরাসুর মিষ্ট কথায় সত্য কথাই বলিল,—

"ব্রাহ্মণ বলেন বাপু বসন্তের রাজা। গোরু গাই বাড়ি দিবে গোষ্ঠে হল পূজা॥"

সুবল বলিল,—তাতো ঠিক কথাই, কিন্তু কৃষ্ণকে আনিয়া তোমার এ ঠাকুরালী ভাঙ্গিয়া দিব আর চড় মারিয়া তোমার গালও ভাঙ্গিব। জরও বলিল—সেই কথাই ভাল, কৃষ্ণকে ডাকিয়া আন। তিনি জগন্নাথ, আমি যে কে তাহা তিনি জানেন। আমার একটু পরিচয় তোমাকেও দি,—

"জরা নাম ধর্য়াছি যাবত বীরকে জারা। গর্ব্ব ছাড় গোয়ালা গর্জ্জনে যাবে মর্য়া॥"

সুবল কৃষ্ণ বলে বলীয়ান্—একথা শুনিয়া হটিয়া যাইবার পাত্র নহেন, বলিলেন,—

"সুবল বলেন বিপ্র বাড়ি যে দেখি বড়। লুটাব লোটায় যেন লোটন কপোত॥"

তাহার পর সুবলের বালকত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, জরাকে চড় মারিতে গেল। জরা তখন স্বরূপ ত্রিশির, ষড়বাহু, নয়চক্ষু, ত্রিপদ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। জরকে আর কিছু করিতে হইল না, এই বিকট জুজুমূর্ত্তি দেখিয়াই সুবল পলাইল এবং কাঁদিয়া কৃষ্ণকে গিয়া সমস্ত বলিল। অন্যান্য রাখালেরা শুনিয়া কংসচর বলিয়া অনুমান করিল। বলরামও বাহ্বাস্ফোট করিয়া উঠিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ জরার বিবরণ জানিতে পারিলেন। তারপর কৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে জরাকে জানান দিবার জন্য বাঁশী বাজাইয়া অগ্রসর হইলেন। জরাসুর বাঁশী শুনিয়া আবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া বসিল। কৃষ্ণ সদলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দক্ষিণ চরণের আঘাতে শীতলার ঘট ফেলিয়া দিলেন। কৃষ্ণের এই অপকার্য্য কবি অতি সুন্দর ভাবে সমর্থন করিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে পাদপরশে দেবীর ছিল মনে। ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভাব তাহা জানে॥
দক্ষিণ চরণে কৃষ্ণ দিল ঘট ঠেল্যা। আকাশে দুন্দুভি বাজে উরিলা শীতলা॥

বৈষ্ণব নিত্যানন্দ এইরূপে ইষ্টদেবতার মানরক্ষা ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বড় সুন্দর ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শীতলার বাঞ্ছাপূর্ণ হওয়ায় শীতলা কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তাঁহার ব্রহ্মাদি বন্দিত অভয়পদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—

"যুদ্ধে জ্বরা জিনি নিল যে পদ চিন্তে হর। এমন পদাঘাত আমার ঘটের উপর ॥
জন্মকালে কর্ম্মস্থানে শুভগ্রহ ছিল। অসাধনে অভয়চরণ তেঁই মিলে গেল ॥"

শীতলার এতটা অনুনয় বিনয় শুনিয়া কৃষ্ণও পাল্‌টা জবাব দিলেন,—

"কৃষ্ণ কহেন মাপ কর ক্ষম ব্রহ্মার ঝি। তব বাঞ্ছা ভঙ্গে ডরি মোর দোষ কি ॥"

তাহার পর শীতলা একটী নাতিদীর্ঘ স্তবপাঠ করিলেন,—কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গস্থ দেবতাগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শীতলা ভগবদ্বিনা স্বর্গ অন্ধকার জানাইলেন, দেবগণের চিন্তার কথা বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন,—

"গোবিন্দ কহেন শুন, তা সভার চিন্তা কেন, দৈত্য নাশ্যা খণ্ড্যা ক্ষিতিভার।
দ্বারকাতে কর্য্যা লীলা, যেতেছি অমরশালা, কহ কেন গমন তোমার ॥"

শীতলা এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন, এক সঙ্গে তিনজন, শীতলাকে দিলে অধিকার।
বিশেষয় ব্যাধি দিয়া, পাঠাল্যা বসন্ত লয়্যা, ব্রজপুরে পূজা নাঞি তার ॥"

তার পর কৃষ্ণ শীতলাকে গোকুলে অধিকার দিলেন এবং বলিলেন, দেবতারাও দুঃখভাগী, আর গোকুলের গোয়ালারা মানুষ হইয়া দুঃখ সহিবে না, এও কি হয়। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণ রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারে তাঁহার নিজের যে সকল দুঃখ কষ্ট ভোগ হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা শুনাইয়া দিলেন, শেষে বলিলেন,—

"দারুব্রহ্ম হব পূর্ণ করি এই লীলা। কৃষ্ণের করুণা শুনি কান্দে মা শীতলা ॥"

তাহার পর কৃষ্ণ বলিলেন,—

"ফিরে প্রভু কন দেবী ব্রজপুরে যায়। তুমি পূজা লইতে কি আমারে ডরায় ॥
আপনি বসন্ত আমি করিলা সৃজন। আমি নাহি সহিলে সহিবে কোন জন ॥
বসন্তে উত্তরি বাপু হয় বজ্রবৎ। মৃত্তিকার পাত্র পোক্ত দহনে যেমত ॥
কাঁচা থাকে কলেবর বসন্তবিহীন। দামোদরে দয়াময়ী দিও গুটি তিন ॥

* * * * * *

মন যেন মোর গো না কোরো উদাসীন। যেন ব্রজ গোপদের মুখে না রাখিহ চিন ॥"

শীতলা সন্তুষ্ট হইয়া রোগপুরশিখরে ফিরিয়া আসিলেন এবং রক্তবতী-সখী সঙ্গে রোগ-গণকে লইয়া ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। পরামর্শ হইল শিলাবৃষ্টি করিয়া সেই শিলার সঙ্গে বসন্তবীজ প্রেরণ করিতে হইবে। তাহাই হইল, জ্বরা বসন্তের শিল করিয়া চাপ বাঁধিয়া ছড়াইতে আরম্ভ করিল। গোকুলের ছেলে-বুড়া সকলে সেই শিল অতিরিক্ত খাইয়া জ্বরগ্রস্ত এবং বসন্তাক্রান্ত হইল। কৃষ্ণ বলরামেরও বসন্ত হইল। ক্রমে "কর্দ্দম

হইল ব্রজ নয়নের জলে।" তখন নন্দাদি সকলেই বুঝিলেন, "শীতলাকে না পূজিলে আর রক্ষা নাঞি।" তখন গোপপতি নন্দ সকলকে লইয়া শীতলার উদ্দেশে স্তবপাঠ ও আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। শীতলাও সন্তুষ্ট হইয়া শান্তিবিধান করিলেন। পরদিন গৃহে ও গোষ্ঠে মহাপূজার আয়োজন হইল। প্রত্যেক গৃহস্থ উপহার আনিল। মহা আয়োজনে মহাপূজা শেষ হইল।

এই স্থলে নিত্যানন্দের গোকুল-পালার শেষ। রচনা-পারিপাট্যে নিত্যানন্দ কবিবল্লভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহার রচনা সুপ্রণালীবদ্ধ, সরস এবং প্রাঞ্জল। উপরে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভাষার ও শব্দের বিশেষত্ব।—নিত্যানন্দের কাব্যের সর্ব্বত্র "নাহি" শব্দের স্থলে "নাঞি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়;—

(১) "মহীতলে নাঞি মহিমার চিন।

(২) ব্রজশিশু বলে আজ বুঝি নাঞি বাঁচে॥"

এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট আছে।

"চরণ নাচেড়ে ভঙ্গ দুর্জ্জয় শকট।"

এস্থলে "নাচেড়ে" শব্দের অর্থ "ঊর্দ্ধক্ষেপ" বোধ হয়। শব্দটী স্থানীয় গ্রাম্যপ্রয়োগ হওয়াই সম্ভব।

"বলা নয় ব্রজে জাওা বিষম সঙ্কট।"

এই "জাওা" শব্দের অর্থ "যাওয়া।" বাঙ্গালা-ভাষার আধুনিক অবস্থায় এই "ওা"—'ওয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উদাহরণও যথেষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস ইহা তখনকার শব্দের প্রকৃত রূপ নহে, তখন সাধারণতঃ শুদ্ধরূপে বানান লিখিবার প্রণালী না থাকায় ঐরূপ হইয়া গিয়াছে। "অ" তে "া" দিয়া "আ" হয়; হয়ত ইহা দেখিয়া "ও" তে "া" দিয়া "ওা" বা 'ওয়া' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে।

(১) "জাবটে প্রবেশ হয় জানাতে রাধারে।

(২) জাবটে পশ্চাৎ কর্য়া যমুনার পার।

(৩) জাবট্যা প্রবেশ হয়্যা কর্য়া হরিধ্বনি॥"

(৪) "গোকুল জাবটাবধি"

এই "জাবট" শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা বুঝা গেল না। কোন স্থানের নাম বলিয়াই অনুমিত হয়।

(১) এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।

(২) যে কিছু পূজার কথা যায় জানাইতে॥

এই দুই স্থলে "নেয়" ও "যায়" এই দুই পদের অর্থ 'গ্রহণ করে' ও "গমন করে" এইরূপ

তৃতীয় পুরুষান্তক নহে। উহার অর্থ "গ্রহণ কর" এবং "গমন কর" এইরূপ অনুজ্ঞাবোধক দ্বিতীয় পুরুষান্তক। যে যে স্থলে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থল ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। লহ বা নেও এবং যাহ বা যাও এইরূপ আকারে প্রযুক্ত হইলেই ঠিক হইত, কিন্তু কবি নিত্যানন্দের কাব্যে সেরূপ প্রয়োগ বড়ই বিরল, বরং এইরূপ তৃতীয় পুরুষান্তক ক্রিয়ার অনুজ্ঞাবোধ আরও আছে।

"কে তুই কাহার কন্যা কোথারে যায়সি।"

এস্থলে কোথারে শব্দে "কোথায়" এবং যায়সি অর্থে "যাইতেছ।" কোথারে শব্দে সপ্তমী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। "যায়সি" সংস্কৃত তিঙ্‌বিভক্ত্য বাঙ্গালা ক্রিয়া, কিন্তু এরূপ পদ এই দুইটী মাত্র আছে, আর নাই।

"এ মাগী মনুষ্য বেনে নয়।"

এস্থলে "বেনে" শব্দের অর্থ অধিক নিশ্চয়তাসূচক, কিন্তু, ভারতচন্দ্র এই অর্থে স্থানে স্থানে "মেনে" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যেমন "আর মেনে পারিনে।" ইহাও প্রাদেশিক গ্রাম্যভাষা।

"কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিব যজ্ঞ হকু সায়।"

"হকু" হউক বা হোক্ শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ, এরূপ আরও আছে।

"তোমা হতে হল আমার ই জন্ম সফল।"

এই বা ইহ শব্দ স্থানে "ই" শব্দের প্রয়োগ বহু স্থলে আছে। ইহাও প্রাদেশিক গ্রাম্য-ভাষার শব্দ। পশ্চিম রাঢ়ে এই শব্দের প্রয়োগ শুনা যায়।

"ঝাঁপদে গহনে গরু বুল্যা ঝাল খায়্যা।"

এস্থলে এই সমস্ত ভাবটীই প্রাদেশিক ভাব। গৃহাদিতে অগ্নি লাগিলে গৃহস্থেরা পালিত গাভীর গলার দড়ি কাটিয়া দেয়, তাহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই সময়ে যে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, সেই চকিত ভ্রমণকে "গরু ঝাল খাইয়া বেড়াইতেছে" এইরূপ বলে। বনে ঝাঁপাইয়া পড়াও ঐরূপ ভাবমূলক।

"ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন একু সঙ্গে তিনজন"

এই "একু" শব্দের প্রয়োগ গীত সুরের গড়েন ধরিয়া হইয়াছে; পূর্ব্বার্দ্ধ চরণে বিষ্ণু শব্দের উকারের উচ্চারণের গীত সুরের যে গড়েন টুকু আছে, গায়নদিগের গাহিবার সময় পরার্দ্ধ চরণে সেই টুকু প্রয়োজন হওয়া "এক" স্থানে "একু" প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা শব্দের প্রাচীন রূপ নহে। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস এইরূপ।

"স্বর্ণঘটে সিন্দূর গর্ভেতে গঙ্গাজল।
আম্রশাখা উপরে আথগুলার ফল॥"

"আথগুলার ফল" অর্থে "কদলী"—নারিকেল নহে। আমার এইরূপ জানা আছে, তবে সত্য কি না জানিনা।

এতদ্ভিন্ন বিশেষ্যের স্থানে বিশেষণ, কর্ত্তার স্থানে কর্ম্ম, ক্রিয়ার স্থানে বিশেষ্য, অনুজ্ঞা স্থানে বর্ত্তমান ইত্যাদির ব্যবহার যথেষ্ট আছে, সে সকল প্রাচীন রচনামাত্রেই দেখা যায়, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। অক্ষর বৃদ্ধি ও হ্রাসও আছে।

উর্দ্দু বা পারস্য শব্দের মধ্যে—"আশা", "জব্দ" ও "হুকুম" এই তিনটী মাত্র পাইয়াছি।

পুঁথিখানির প্রতিলিপি করিবার সময় একস্থলে লেখক কতকাংশ লিপি করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ৩।১ পৃষ্ঠায়—

"পদ্মহাত পেত্যা হরি অন্নথাল নিল।
যজ্ঞশালে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যত ভাবে মনে মনে।
যজ্ঞ পূর্ণ নহে ঘণ্টা * (আর নাই) * ॥"

ইহার পর কতকাংশ নাই—তাহার পর আছে,—

"ব্রাহ্মণী আসিয়া তখন বলে হেনকালে।
এত থালা অন্ন দিলাম নন্দের গোপালে॥"

এতদ্ভিন্ন শীতলার মস্তকসজ্জা সূর্প অর্থাৎ কুলার কথা যেখানে আছে, সেইখানে "সুপ" শব্দের প্রয়োগ আছে, সমস্ত কাব্যের মধ্যে কোথাও "কুলা" শব্দ নাই অথচ রাঢ়ীয় গ্রাম্য কথা অনেক আছে।

এই সকল ভাষাগত প্রয়োগাদি দৃষ্টে কবি নিত্যানন্দ ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। তবে কত পূর্ব্বের তাহা মীমাংসা করিতে যাওয়া বোধ হয় বিড়ম্বনা। ইনি পূর্ব্বোক্ত কবি কবিবল্লভের পূর্ব্ববর্ত্তী। উভয়ের কাব্যের একটী চরণের বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়।

"সোণার শরীর করে উয়ের নাদনা।"

অতঃপর বটতলার ছাপা নিত্যানন্দের বিরাটপালা হইতে কবির পরিচয়সূচক আরও দুই চারি কথা বলিব।

ঐ পালার প্রকাশক ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত একটী আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন। তিনি "প্রকাশকের উক্তি" নাম দিয়া পয়ারছন্দে বলিয়া গিয়াছেন,—

"শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়। নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া। উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ। নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ। বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবারে অর্থ॥
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ। গীতছন্দে এই পুঁথি করিল রচন॥"

একথা কতদুর প্রামাণিক তাহাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। দ্বিজ নিত্যানন্দের গোকুল-পালার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে উড়িয়া নহেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই ছাপা পুস্তকের মধ্য হইতেও যে সকল পরিচয়

পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও তিনি যে বাঙ্গালী তাহা স্পষ্টই জানা যায়, এতদ্ভিন্ন সে পরিচয় আর গোকুল-পালায় উল্লিখিত পরিচয়ে কোন ভিন্নতা নাই। এতদ্ভিন্ন গোকুল-পালায় অনেকগুলি কবিতা এই জাগরণ-পালার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারও দু একটা প্রমাণ দেওয়া যাইবে। ইহাতে কবির পরিচয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই প্রসঙ্গতঃ আর দু এক কথার উল্লেখ করিব।

"দ্বিজ নিত্যানন্দ কয়, শ্রীযুক্ত রাজার জয়, বিনাশ করহ রিপুগণ॥"— ৭ পৃ।

এই "রাজা"টী কে? তাহার পরিচয় পরে আছে—

"কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্।
শীতলা-মঙ্গল রচে পান সুধামত॥"—২১ পৃ।

বাঙ্গালার প্রায় সকল কবিরই পৃষ্ঠপোষক প্রতিপালক রাজা একজন, কবি নিত্যানন্দেরও ছিলেন, তাহার পরিচয় এই পাওয়া গেল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীজোড়ার জমীদার রাজা রাজনারায়ণ নিত্যানন্দের প্রতিপালক ছিলেন। এই রাজনারায়ণের সময় নিরূপিত হওয়া দুঃসাধ্য হইলেও বোধ হয় অসাধ্য নহে। ৬৪ পৃষ্ঠার এই ভণিতায় সৃষ্টিপাড়ার স্থানে যষ্ঠীপাড়া পাঠ আছে।

"কাজীর পদবী যেই গোত্রে ভরদ্বাজ। মহামিশ্র রাধাকান্ত খ্যাত ক্ষিতিমাঝ॥
দ্বিতীয় অনুজ তার দেব অনুবলে। দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে সাধনের ফলে॥"—২৪ পৃ।

এই টুকু হইতে আমরা বুঝি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশে কাজী উপাধি ছিল, সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এক সময় কবিবংশ নবাব সরকারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এস্থলে গোকুল-পালার লিখিত কবির পিতৃনামের সহিত এস্থলে উল্লিখিত কবির পিতৃনামের একত্ব আছে।

এই জাগরণ-পালার আর একস্থলে কবির বংশাবলী দেওয়া আছে,—

"পিতামহ পীতাম্বর, তস্য সুত মনোহর, তাহার তনয় চিরঞ্জীব।
তস্য সুত হরিহর, সখা যার দামোদর, চরাচর খ্যাত সেই সব॥
রাধাকান্ত তস্য সুত, অশেষ গুণের মত, শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভাই, শীতলা আদেশ পাই, দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ॥"—২৯ পৃ।

গোকুল-পালায় মনোহরের পিতার নাম ভবানী মিশ্র আর চিরঞ্জীব মিশ্রের পুত্রের নাম মহামিশ্র রাধাকান্ত লিখিত আছে, কিন্তু এখানে মনোহরের পিতার নাম পীতাম্বর ও চিরঞ্জীবের পুত্রের নাম হরিহর এবং হরিহরের পুত্র রাধাকান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আর একস্থলে আছে,—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণে রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতীরে সিংহ হলধর॥"

এই হলধর সিংহ সম্ভবতঃ কবিকে গঙ্গাতীরে বাস করাইয়া ছিলেন। প্রকাশকের লিখিত অনুবাদক শিবনারায়ণ সিংহের সহিত এই হলধরের কোন সংশ্রব আছে কি'না, কে জানে? কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ নিত্যানন্দের প্রতিপালক ছিলেন, তাঁহার আশ্রয় কবি কেন 'যে ত্যাগ করিয়া হলধর সিংহকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।

আত্মপূজার প্রচার হেতু শীতলা বিরাটের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু বিরাট বলেন,—

"শিব ছেড়ে সেবিতে নারিব শীতলাই।"

মৎস্যদেশী ব্রাহ্মণেরা বলেন,

"শিব বিনে অন্য দেব নাহি পূজে রাজা।
শীতলা পূজিলে সবংশে বধিবেক রাজা॥"

এতদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতুর পালা ও গোকুল-পালাতেও এই শিবভক্তির কথা কথিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অনুমান হয় যে যখন শৈবধর্ম্মের সংঘর্ষে ধীরে ধীরে শাক্তধর্ম্মের বা তান্ত্রিক পূজার প্রচার হইতেছিল, সেই সময়েই চণ্ডী শীতলা মনসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবীপূজার প্রচার আরম্ভ হয়। চাঁদবেণে, কালকেতু, রাজা চন্দ্রকেতু, নিমাই জগাতি, দেবদত্ত, বিরাটরাজ সকলেই শিবভক্ত আর সকলেই শিবপূজা ছাড়িয়া দেবীপূজা করিতে প্রথমে অস্বীকৃত শেষে দেবীর প্রকোপে লাঞ্ছিত হইয়া অনিচ্ছায় দেবীভক্ত হইয়া পড়েন। এই সকল দেবী যে যে রোগ বা জন্তুভীতিনিবারিণী বা সুখদাত্রী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইতেন, সেই সকল গুণ পূর্ব্বে শিবেই ন্যস্ত ছিল। লোকে সেই সকলের জন্য পূর্ব্বে শিবেরই সেবা করিত। এক্ষণে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এক এক উপাস্য দেবী পাইয়া শিবকে ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ, সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন।

নিম্নলিখিত চরণগুলি গোকুল-পালায় ও এই বিরাট-পালায় অবিকল এক দেখা যায়;

(১) যুক্তি হেতু জগৎমাতা জ্বরাকে জিজ্ঞাসে।
(২) দাণ্ডাল যতেক ব্যাধি জোড়হাত হৈয়া॥
(৩) সোণার শরীর করে উয়ের নাদনা।
(৪) যাত্রা কৈল শীতলা জ্বরাকে সঙ্গে করে।

ইত্যাদি আরও অনেক কথা আছে।

জাগরণ-পালায় শীতলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্ব্বত্র তাঁহাকে ব্রহ্মার কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল—

"ভারি ভুরি বিমুখ ভিখারী তোর খুড়া।
ষাঁড় ছেড়ে এক পা হাঁটিতে নারে বুড়া॥"

এ স্থলে শিবের ভ্রাতুষ্কন্যা। আবার—

"মা স্বাহা পিতা অগ্নি জানে ত্রিভুবনে।
ব্যাধি সঙ্গে বুলি আমি সাক্ষাৎ ত্রিভুবনে॥"

এস্থলে অগ্নিও স্বাহার কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। স্ববাক্য-বিরোধী বাক্যের মধ্যে সত্য-নির্ণয় করা এক প্রকার অসাধ্য।

নিত্যানন্দ যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা তাঁহার বৃন্দাবন-বর্ণনায় ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিলেই বুঝা যায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যে বিরোধী ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিরাটরাজের বৈষ্ণব-পূজার বর্ণনায় পাওয়া যায়,—

"এই মত ক্রমে ক্রমে করয়ে ভ্রমণ। বিরাজিল বুঝিবারে বৈষ্ণবের মন॥
আশাদাস অধিকারী অষ্ট বেটী বেটা। চৌদিকে বৈষ্ণবের পাড়া নিত্য মালা ফোঁটা॥
পূজার প্রকাশ বুড়ী কহে নিত্যধামে। সীতারাম স্মরে তারা শীতলার নামে॥
বলে মোঁরা বিষ্ণু পূজি বুড়ী মাগী কে। ছহাতিয়া সোটা মেরে দূর করে দে॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

অযোনিসম্ভবা আমি ধাতা মোর পিতা।
ব্রহ্ম অংশে জন্ম মম সর্ব্বজনখ্যাতা॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি কৃষ্ণ দশ অবতার।
সকলে সংঘট কৈল বসন্ত আমার॥
তোরা কাটু তিলক তুলসী কণ্ঠমালা
তেল পারা বপুতে বেরাবে নুহ্না গড়া॥
গা পচাইয়ে হাড় গলাইব পোঁটা।
পূজা নিব ঘরে বসে বৈয়া দিবি জোড়া পাঁটা॥"

শেষোক্ত চরণে শীতলার মুখে বৈষ্ণবের প্রতি যে শ্লেষোক্তি কবি গাহিয়াছেন, তাহা হইতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার মনোভাব বুঝা যায়।

দুঃখের বিষয় যে বিরাটপালা ছাপা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ও সুপ্রণালীশুদ্ধ নহে, সুতরাং তাহা হইতে আমরা আর অধিক আলোচনা করিব না। বিরাট-রাজ্যের প্রজার ব্যবস্থা, সুখ দুঃখ-বর্ণনায় তখনকার বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায়।

শীতলা বৃদ্ধা জরতীবেশে বলদবেশী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসন্তের ছালা চাপাইয়া জ্বরাসুরকে রাখাল সাজাইয়া মৎস্যদেশের পথে উপস্থিত হইলেন। নিমাই সেই পথের বাণিজ্য-দ্রব্যের শুল্ক-সংগ্রাহক অর্থাৎ "জগাতি" ছিলেন। বলদের ঘণ্টারব শুনিয়া সদলে আসিয়া শীতলার পথরোধ করিয়া বলিলেন,—

"জোর করে তোর বেটা দাঁড়ায়ে জগাতি।
রাস লৈয়া রহ্ন বৈয়া যাইস সারা রাতি॥

গোস্বায় গর্জ্জিয়া খাড়া দেই গোপ মোড়া।
এইরূপে আমার অনেক খাইল ভাড়া॥
পাইয়াছি প্রথমে আজি পলাইবি কোথা।
নাহি জান রাজকর দিতে হবে হেথা॥"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কবির সময়ে কাশীজোড়া অঞ্চলে পথে বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করা হইত। যে আদায় করিত, তাহাকে ঘাটওয়াল বা জগাতি বলিত। তাহার পর কত দিতে হইবে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে—

"আগে মোর মামুলী আঠারো বুড়ি গণ। পরে ফেল আষাঢ়ীর পঞ্চাশ কাহন॥
একুনেতে অষ্ট শত চারি পণ সাড়ে। নহিলে ভৎর্সনা করে নিব নাথি চড়ে॥"

অর্থাৎ তখন মামুলী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট রাজকর ছিল আঠার বুড়ি কড়ি, তাহার উপর জগাতিরা বলপূর্ব্বক নানা বাবে অনেক আদায় করিত। এখানে শীতলার নিকট আটশত সাড়ে চারি পণ দাবী করা হইয়াছে। এই সকল আদায়ের জন্য মারপিট অত্যাচার বড়ই হইত ঃ তবে আর একটা নিয়ম ছিল। যাহারা রাজাদেশে শুল্কদান হইতে পরিত্রাণ পাইত, তাহারা ভারবাহী বলদের গলায় ঘণ্টা বান্ধিয়া দিত এবং রাজার ছাড় পাট্টা পাইত। ঘণ্টাবান্ধা বলদ ও ছাড় পাট্টা দেখিলে জগাতিরা আর তাহার শুল্ক আদায় করিত না; যথা,—

জরাসুর জগাতির কথা শুনিয়া বলিল,—

"এত জোর কেন তোর মোকে তুল বাড়ি। ঘণ্টা বান্ধা বলদের ঘাটে নাই কড়ি॥
নিমা বলে নিষ্ঠুর বেটা নিয়ে আয়তো দেখি পাট্টা। কার পাট্টা পাইয়া বলদে দিলি ঘণ্টা॥
ঘাটের রাজস্ব দিয়া আমি যাই মারা। চোরা গরু লয়ে চোর কর্য্যাছ চতুরা॥"

ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, ঘাটওয়ালদিগকে রাজসরকার হইতে এক একটা ঘাট জমা করিয়া লইতে লইত এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সে রাজসরকারে জমা দিয়া আপনি দৈনিক আদায়ের উপর নির্ভর করিত। ইহাতে জগাতির বিস্তর লাভ হইত, কিন্তু শুল্কদাতৃগণের প্রতি বিস্তর অত্যাচার হইত।

তাহার শীতলা গরীব বলিয়া দুই কাঠা কলাই মাত্র দানস্বরূপ দিয়া অনেক কষ্টে জগাতির হস্তে উদ্ধার হইলেন। বলা বাহুল্য এই কলাইগুলিই গুপ্ত বসন্ত। এই কলাই অতি সুস্বাদু। নিমাই রান্ধিয়া সপরিবারে খাইল। ক্রমশঃ সেই কথা রাজ্যমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সকলে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়া গেল। ওদিকে শীতলা গিয়া বাজারে সেই গুপ্ত বসন্তের কলাই বেচিতে বসিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ রাজ্যমধ্যে প্রতি গৃহে বসন্ত ছড়াইয়া পড়িল। নিমাইয়ের সাত পুত্র মরিল। রাজ্যে হুলস্থুল পড়িল। শীতলা রাজার গুরু পুরোহিত বিদ্যানিধি ও বাচস্পতিকে বৃদ্ধা বেশে গিয়া জানাইলেন যে, রাজা যদি দেবদাসদত্ত বণিককে পাঠাইয়া রঙ্গজসফর হইতে সমুদ্রগর্ভস্থ হেমঘট উঠাইয়া আনাইয়া মেষ মহিষাদি বলি দিয়া পূজা করেন, তবেই রাজ্যরক্ষা হইবে। প্রত্যূষে পত্নীর সহিত

বাচস্পতি পাশা খেলিতেছিলেন। বুড়ীর কথা বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তিনি অক্ষপাটী ফেলিয়া মারিলেন। শীতলা গালি দিতে দিতে ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। তার পর সর্ব্বজাতিতে বসন্ত ছড়াইবার সময় কবি কয়েকটী জাতির বৃত্তির ও স্বভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি,—

(১) "আসি বলে নাপিত ভাঁড়ায়ে যায় নরে।"
(২) "আগুরি বেচয়ে পলা প্রবাল মুকুতা।"
(৩) "গয়ালা বেচয়ে দধি জল মিশাইয়া।"
(৪) "করে চাষ কৈবর্ত্ত কোদালে তাড়ে পড়া।"
(৫) "বাইতি বুনয়ে শয্যা বাজায় মৃদঙ্গ।"
(৬) "নগরে যতেক জুগী লাল করে সুতা।"
(৭) "কাট কাটে কোড়ি খায় যতেক শবর।
(৮) ধরয়া ধনুক কোল বাজী করয়ে শীকার॥"

এই সকল জাতির অনেকের এখন আর বৃত্তি স্থির নাই।

"রাজা বলে শ্রীদেবী শ্রীহরিপদ ছাড়ি।
প্রাণ গেলে পূজিতে নারিব পচামুড়ী॥"

আমরা দেখিতেছি, চাঁদ সওদাগর কবি ক্ষেমানন্দ ও কেতকার সাহায্যে মনসাকে—"চেংমুড়ী কাণী" বলিত, আর বিরাটরাজ কবি নিত্যানন্দের প্রসাদে শীতলাকে "পচামুড়ী" বলিতে পারিয়াছেন।

বিরাটরাজের পুত্র উত্তরের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। তাঁহার পত্নী রত্নাবতী তখন পিতৃগৃহে ছিলেন। শীতলা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে গিয়া এই সুসংবাদ দিলেন। তার পর রত্নাবতী সহমৃতার সজ্জা করিয়া অর্থাৎ "ভাঙ্গিয়ে আমের ডাল হস্তেতে লইল" পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া স্বামীর শ্মশানে যাইতে ইচ্ছা করিবামাত্র শীতলার ইচ্ছায় পৃথিবী দেহ সঙ্কুচিত করিলেন, ছমাসের পথ রত্নাবতী বামপদ বাড়াইতেই পার হইয়া আসিল। রত্না একবারে স্বামীর শ্মশানে। তাহার পর সতীর রোদনে দেবীর দয়া হইল। শ্মশানে পূজা হইল, বিরাটপুত্র উত্তর দেবীর কৃপায় জীবন পাইলেন। এই স্থলে কবি শীতলার মুখে বিরাটমহিষীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসংস্কৃতজ্ঞের ন্যায় কথা,—শীতলা বলিলেন সুদেষ্ণা পূর্ব্বজন্মে মেনকার কন্যা শকুন্তলা ছিলেন। হস্তিনার রাজা অনরণ্য তাঁহাকে গুপ্তবিবাহ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে শকুন্তলা মঙ্গলা পূজা করিয়া রাজাকে স্বামী লাভ করেন। কপিল মুনির আশ্রমে গুপ্তবিবাহ হয়। শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। শীতলা এই সুদেষ্ণার ভবিষ্যজ্জন্মের কথাও বলেন—সুদেষ্ণা পরজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্নমহিষী সুরুচি হইবেন এবং দারুব্রহ্ম স্থাপন করিবেন।—নিত্যানন্দের উড়িষ্যার সহিত যে কিছু সংশ্রব ছিল, তাহা এই বর্ণনা হইতে অনুমিত হইতে পারে।

শ্মশানের পূজায় রাজা বিরাট যোগ দেন নাই। রাণী ও রাজবধূ গোপনে পূজা করেন। রাণীর নিকট শীতলার অনুগ্রহ শুনিয়া বিরাট গলায় কুঠার বান্ধিয়া শীতলার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। শীতলা তখন দেবদাস সাধু দ্বারা হেমঘট আনাইয়া পূজা করিতে বলিলেন। রাজা বণিককে রঙ্গপাটনে পাঠাইয়া দিলেন। দেবদাসকে প্রলোভিত করিবার জন্য বিরাট স্বীয় মন্ত্রিকন্যার সহিত বিবাহ দিলেন।

তাহার পর দেবদাসের নৌকাযাত্রা। শ্রীমন্তের পথের বর্ণনার ন্যায় কবি দেবদাসের পথের বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থলে বণিকের নৌকার নাম "মধুকর" পাওয়া যায়;—

"পবন গমনে চলে সপ্ত মধুকর।"

শ্রীমন্তের নৌকার নামও মধুকর, রায়মঙ্গলের পুষ্পদত্তের নৌকার নামও মধুকর আর এই দেবদাসের নৌকার নামও মধুকর। অতএব মধুকর সমুদ্রগামী প্রাচীন নৌকাশ্রেণীর নাম মাত্র বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর দেবদাসের পথ—

"ওথা সাধু বাহে হর শঙ্করের ঘাট।
যেথানে শঙ্করযাত্রা করেন বিরাট॥
চক্ষুর নিমেষে সাধু গেল পালুডাঙ্গা।
সাতগাঁ ছাপাইল সাধু পাইয়া শিঙ্গাভাঙ্গা।
বেণেপাড়া বাহিয়া যে এড়াল বিরাট।
সম্মুখে এড়ান নিমা জগাতির ঘাট॥"

বিরাট রাজ্য বা মৎস্যদেশ কোথায় তাহা জানিনা, কিন্তু এস্থলে যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যাইতেছে, এগুলি বাঙ্গালা দেশের একাংশে বটে। তার পর একবারে নৌকা যমুনা বাহিয়া অযোধ্যার নন্দীগ্রামে পৌঁছিবার কথা আছে। তার পর লৌহবন, ভাণ্ডীর বন, কদম্ববন, জাবট, গোবর্দ্ধন, কালীদহ ইত্যাদির কথা। তাহার পর বৃন্দাবন হইয়া সারেঙ্গচাখলা নামক স্থানে সাধুর নৌকা উপস্থিত হইল তাহার, পর পুর্ব্বহট্টে প্রবেশ করিল। তাহার পর বেহুলা, কুমুদবন, বংশীবট, চক্রশাল, ভোজনটিলা, তৎপরে মধুবন, তালবন, তাহার পর কংস রাজপাট (মথুরা) হইয়া প্রয়াগে আসিল, সেখান হইতে একবারে—

"পবন গমনে ছোটে সপ্ত মধুকর।
এড়াইল কলঙ্গ রাজার বাড়ী ঘর॥
এক বৈদ্যপুর বাহে পরম কৌতুকে।
দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা আইল কটকে॥
কটক বাহিয়া ডিঙ্গা আইল উজানি।
* * * *
বালীঘাটা বনপুর বাহে সাধুবালা।

পর্ব্বত রৈকম দ্বীপ দক্ষিণে রাখিয়া।
হিড়িম্বার ঘাটে ডিঙ্গা রহে চাপাইয়া॥

* * * *

কাশী বারাণসী সাধু দিল দরশন।"

এ পথ কিরূপ তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন—ইহাতে সত্যের বিন্দুমাত্র অংশ নাই, কেবল স্থানের নামগুলি যথার্থ। যাহা হউক তাহার পর কাশী হইয়া গয়ায়, গয়া হইয়া ধবলাপর্ব্বত, তথা হইতে বিশ্বেশ্বরগিরি, তৎপরে অনেক স্থান (নাম নাই) হইয়া চন্দ্রভাগা দিয়া সমুদ্রে পড়িলেন। এই স্থলে দেবদাস গঙ্গাপূজা করিয়া দ্রাবিড়ে উপস্থিত হইলেন, তৎপরে দ্বারকা হইয়া ত্রিকুট পর্ব্বত, তৎপরে রঙ্গজসফর নামক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। পদ্মমালার ঘাটে (কমলে কামিনীর ন্যায়) শীতলার মায়ায় সমুদ্র জলে হেমঘট ভাসিয়া উঠিল। তাহার পর শ্রীমন্তের দেবদাস কর্ত্তৃক রাজা চন্দ্রসেনের নিকট পদ্মমালার ঘাটের বিবরণ বর্ণন, রাজা কর্ত্তৃক নিগ্রহ, শেষে শীতলার কৃপায় রাজকন্যা কর্ত্তৃক হেমঘট উদ্ধার ও তাহার সাধুর সহিত বিবাহ, দেশাগমন ইত্যাদি। তাহার পর অষ্টমঙ্গলাও আছে। তাহাতে ৮টীর স্থানে নিম্নলিখিত ৯টী মঙ্গলের বর্ণনা আছে,—

১ম—শচী মুখে নিন্দা উপলক্ষে স্বর্গে পূজাপ্রচার।

২য়—বরুণ কর্ত্তৃক পাতালে পূজাপ্রচার।

৩য়—রাবণ কর্ত্তৃক লঙ্কায় পূজাপ্রচার।

৪র্থ—বালীরাজ কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় পূজাপ্রচার।

৫ম—অযোধ্যায় দশরথ কর্ত্তৃক পূজাপ্রচার।

৬ষ্ঠ—কংস কর্ত্তৃক মথুরায় ও জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মগধে পূজাপ্রচার।

৭ম—গোকুলে নন্দ কর্ত্তৃক পূজা প্রচার বা গোকুল-পালা এবং দেবদাস কর্ত্তৃক টীকার প্রকাশ।

৮ম—বিরাটের ব্যাপার রত্নাবতী কর্ত্তৃক উত্তরের প্রাণদান, রঙ্গজসফরে দত্ত কর্ত্তৃক হেমঘট উদ্ধার।

৯ম—হেমঘট পূজা।

তাহার পর দেবদত্ত ও তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বর্গারোহণ। তখন——

"কুবেরের ঘরে দেবী পুত্রবধূ দিয়া। নিজ কীর্ত্তি শীতলাই মর্ত্ত্যেতে রাখিয়া॥
রোগসহ রোগপুরে বসিল কৌতুকে। রক্তসিংহাসনে দেবী ত্রিশিরা সম্মুখে॥
রক্তাবতী দেই অঙ্গে চামরের বা। বিচিত্র পালঙ্কে দেবী ঢালিলেন গা॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচিছে অপ্সরী। শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি॥"

প্রথম চরণে দেবদাসদত্তের পূর্ব্বাবস্থায় কুবের পুত্রত্বের কথা জানা যাইতেছে। ইহার কবিকঙ্কণের অনুকরণ। যাহাহউক, শীতলার এই অষ্টমঙ্গলানুযায়ী নিত্যানন্দের পূর্ণ বৃহৎ

গ্রন্থ কোথাও আছে কিনা বা আদৌ ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল। দেবদাস দত্ত কর্তৃক টীকা দিবার ব্যবস্থা-প্রকাশের কথা অষ্টমঙ্গলায় দেখা যাইতেছে, কিন্তু আসল কাব্যের মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কি দৈবকীনন্দন কি নিত্যানন্দ উভয়েরই কাব্যালোচনা করিয়া আমরা যতটা বুঝিলাম, তাহাতে উভয়কেই মনসার ভাসান ও চণ্ডী-মঙ্গলের অনুকরণে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত বলিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই, তবে সাধারণকে অনুরোধ যে যাহাতে এই শীতলা-মঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

একটা কথা,—এই কাব্যের নাম আমরা বরাবর শীতলা-মঙ্গল বলিয়াই আসিতেছিলাম, অথচ তাহার কোন আভ্যন্তরিক প্রমাণ দিই নাই। বিরাট-পালার শেষচরণে কবির কথায় সে কথার সুন্দর প্রমাণ হইয়া গিয়াছে—"শীতলা-মঙ্গল সাঙ্গ সবে বল হরি।" প্রথমে আমরা শীতলা-মঙ্গলের পাঁচটী পালার উল্লেখ স্থলে "রঘুরাম দত্তের পালা" নামে এক পালার উল্লেখ করিয়াছি, বিরাট-পালা-কথিত দেবদত্তের পালার কথা আলোচনা করিয়া বোধ হয় যে যাহার নিকট আমি রঘুরাম দত্তের পালার নাম শ্রবণ করি, তাঁহার সম্ভবতঃ ভুল হইয়াছে, উহার নাম দেবদত্তের পালাই হইবে। যাহা হউক অনুসন্ধান আবশ্যক। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

---

* কলিকাতা আহীরীটোলা ষ্ট্রীট-প্রতিষ্ঠিত শীতলা-মন্দির কলিকাতার সকল শীতলা-মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন, এখানকার প্রতিমা ডোমের ব্যবহৃত প্রতিমা নহে। বর্ত্তমান সেবাইতগণের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সেবাইতগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান সেবাইতগণ বিশেষ শাস্ত্রদর্শী নহে। শীতলার স্তবকবচপূজাদির মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের নিকট শীতলার ৩।৪ প্রকার ধ্যান শুনিয়াছি। তাঁহাদের বিশ্বাস দক্ষিণ কালিকায় ও শীতলায় বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। ডোম পণ্ডিতের আবিষ্কৃত শীতলা মূর্ত্তিকে ইঁহারা কুষ্ঠখণ্ডমূর্ত্তি বলেন। ইঁহারা বলেন,—"কলিদুঃখবিমোচনতন্ত্র" নামক একখানি গুপ্ততন্ত্র আছে, তাহাতেই শীতলা-রহস্য বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। সে তন্ত্র অতি দুর্লভ। সালিখানিবাসী শীতলা-মন্দিরের সেবাইত মাধবদাসের নিকট সম্ভবতঃ উক্ত তন্ত্র পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে সহজে কাহাকেও দেখিতে দেয় না। ইঁহারা স্কন্দপুরাণীয় কবচ-ধ্যান বা পিচ্ছিলা তন্ত্রোক্ত ধ্যানাদির উপর ততটা শ্রদ্ধান্বিত নহেন।

বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(২)

১। অমৃতরত্নাবলী। মুকুন্দদাস।

মঙ্গলাচরণ শ্লোক,—

প্রণম্য-সচ্চিদানন্দং গোকুলানন্দবর্দ্ধনং।
অমৃতরত্নাবলীঃ গ্রন্থ মুকুন্দ ক্রিয়তেঽধুনা॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু॥ ইত্যাদি।

মন্তব্য—পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০, প্রতি পৃষ্ঠার শ্লোক সংখ্যা ৪০, এই গ্রন্থ একটী অপূর্ব্ব রূপক ;—

বিশুদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অখণ্ড অকাম।
অনিমিত্ত নিমিত্ত বিরজা পারে ধাম॥
বিরজা নদীর পারে সেই দেশ খান।
সহজপুর সদানন্দ নামে সেই গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম দিকে কলিঙ্গকলিকা।
চম্পককলিকা নামে তাহার নায়িকা॥
মূলবৃক্ষ সাতদল সহস্রকমল।
দেশবেড়া সেই বৃক্ষ সরোবর জল॥
তাহার উত্তর দিকে আনন্দপুর গ্রাম।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ মন্মথের ধাম॥
সদানন্দ সদা মগ্ন সদা অভিলাষ।
সহজ মানুষ তাতে সদা করে বাস॥
তাহার দক্ষিণ দিকে চিদানন্দপুর।
চন্দ্রকান্তি দেশ হয় কিঞ্চিৎ তার দূর॥

এইরূপে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, অজ্ঞান, আত্মা সমস্তই এই রূপকের বর্ণনীয় বিষয়।

অন্ত শ্লোক,—

পীযূষ মন্দাকিনী হয় অমৃত বিলাস।
অমৃতরত্নাবলী গ্রন্থ কহে শ্রীমুকুন্দদাস॥ ইতি
অমৃতরত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

২। কণ্বমুনির পারণ। শঙ্কর কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক—

সূত কহে সনকাদি শুন এক চিত্তে।
শুকদেব কহে পুন রাজা পরীক্ষিতে॥
শুন শুন মহারাজা পরম সাদরে।
বিহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে॥
নন্দ যশোদা ভাগ্যের কথা কি বলিব আমি।
পুত্রভাবে বিহার করয়ে চক্রপাণি॥

ভণিতি,—

শঙ্কর কহেন সবে কর অবধান।
শুনহ গোবিন্দলীলা অমৃত সমান॥

শেষ শ্লোক,—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পালা হৈল সায়।
ভক্ত সহিত প্রভু হবে বরদায়॥

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০ শত। লিখিতং শ্রীগদাধর দাস। সাং কুমরুল। সন ১১৯৭ সাল তাং ১৩ ফাল্গুন। দিবা ৪ দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত।

৩। কুম্ভকর্ণ রায়বার। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

নিদ্রা হৈতে উঠিয়া বসিল কুম্ভকর্ণ।
সুবাসিত জল কেহ যোগায় সংপূর্ণ॥
কুমকুম কস্তুরি লেপ কেহ দেয় গায়।
কতশত সেনাপতি চামর ঢুলায়॥
কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কায় জাগিল।
ইহা শুনি ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল॥

অন্তশ্লোক,—

তোর কুড়ি চক্ষু থাকিতে তবু পড়্যা গেলি হ্রদে।
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র বিষম আমোদে॥

কুম্ভকর্ণের রায়বার সম্পূর্ণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, প্রতি পৃষ্ঠার শ্লোক সংখ্যা ২২।

৪। কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ। (খণ্ডিত)

মঙ্গলাচরণ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আরম্ভ শ্লোক,—অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক লিখ্যতে।

কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে আছিলা নির্জ্জনে।
অনেক রহস্য কথা বিচার কথনে॥

এ বড় রহস্য কথা শুন সাবধানে।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচনে॥

মধ্য শ্লোক,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই মন্ত্র মহাতীর্থ ভব তরিবারে।
কলির প্রথম হবেন চৈতন্য অবতারে॥
কলিতে প্রকাশ প্রভু হইবেন আপনি।
এ সব অপূর্ব্ব কথা ভক্তিভাবে শুনি। ইত্যাদি।

অন্তশ্লোক,—নাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯, প্রতি পৃষ্ঠায় শ্লোক সংখ্যা ২৮, যত টুকু আছে তাহার শেষ শ্লোক,—

রাধাকৃষ্ণ পায় যেবা দরিদ্র হৃদয়।
রাধার চরণাশ্রিত যেবা জন হয়॥

৫। গঙ্গার বন্দনা। অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—

বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উৎপাদন, দ্রবময়ী তব নাম,
সুরাসুর নরের জননী॥

শেষ,—

নীচ পশু কীট পক্ষ, নৃপআদি জীবলক্ষ,
সকলি তোমার সমতুল।
হৃদয়মিশ্রের সুত, কবিচন্দ্র গুণ যুত,
মহিমার নাহি পায় কূল॥
ভণয়ে অযোধ্যারাম, পুরাও মনের কাম,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যেন মরণ সময় আসি, তোমার পদেতে ভাসি,
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রাণ যায়॥

ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত তাং ১৯ ফাল্গুন ১১৪৭ সাল। পঠনার্থে শ্রীরামসদয় দে সাং মদনমোহনপুর। লেখক শ্রীকানাইরাম সরকার। শ্লোক-সংখ্যা ২০টী।

৬। চৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস। অকিঞ্চন দাস।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥

শেষ,—

পুনর্ব্বার জন্ম মোর নরকুলে হয়।
বৈষ্ণবেতে সুদৃঢ় মন যেন রয়॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীপদ্মলোচন নন্দী সাং খাটুল গ্রাম। পরগণে জাহানাবাদ ইতি ১২০০ সাল তারিখ রবিবারে সমাপ্ত ৭ রোজ।

৭। চৈতন্যরসকারিকা। যুগলকিশোর দাস।

আরম্ভ শ্লোক,—

আলুলিতখেদয়া বিষদয়া প্রোন্মীনদামোদয়া।
সর্ব্বশাস্ত্রবিবদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া॥
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমসয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥
জয় নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণধাম।
দয়ার ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রাম॥

মধ্য শ্লোক,—

ঈশ্বরের কার্য্য হয় যুগধর্ম্ম স্থাপন।
অসুর সংহার আর সাধুর পালন॥
অনিবন্ধরূপে জীব মুক্ত নামাভাসে।
নিজ প্রয়োজন গুহ্য নহে সর্ব্বদেশে॥
এই হেতু হয় ঈশ্বরের অবতার।
অবতারি কৃষ্ণ যৈছে মনুষ্য আচার॥
নিজ প্রয়োজন তাঁর প্রেম আস্বাদন।
ভক্ত আস্বাদন হেতু ভক্তিসংস্থাপন॥

অন্তশ্লোক,—

যুগলকিশোর দাসের আর কেহ নাঞি।
এই বার মোর হও চৈতন্য নিতাই॥

ইতি চৈতন্যরসকারিকাগ্রন্থ সমাপ্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯, প্রতি পৃষ্ঠায় শ্লোক সংখ্যা ৩০।

৮। তরণীসেন বধ। শ্রীশঙ্কর।

আরম্ভ শ্লোক,—

পুত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া দশানন।
সিংহাসন হইতে ভূমে পড়িল রাবণ॥
রাজা লঙ্কেশ্বর করাঘাত হানে ভালে।
গড়াগড়ি যায় রাজা পড়ি ভূমিতলে॥

অন্তঃশ্লোক,—

বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়।
এত দূরে তরণীর পালা হৈল সায়॥

মন্তব্য,—এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শ্রীশঙ্কর এইরূপ ভণিতি দৃষ্ট হয়। ইতি সন ১২৫০ সালে তাং ১৯ আষাঢ়। পুস্তক শ্রীরামসদয় পাল সাং মায়াপুর। হাল সাং গালিয়া। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০৪।

৯। দধিখণ্ড। বৃন্দাবন।

আরম্ভ শ্লোক,—

গোকুলে গোলোকনাথ পাতিল জঞ্জাল।
গোয়ালার গোরু ফেরে মদনগোপাল॥
দিনে দিনে যার যত দধি দুগ্ধ হয়।
কৃষ্ণের প্রসাদে এক রতি নাহি রয়॥

অন্ত শ্লোক,—

বৃন্দাবন বলে ভাল করিলা আদ্দাশ।
মনে মনে মন্দ মন্দ হাসেন শ্রীনিবাস॥

ইতি দধিখণ্ড সমাপ্ত। পাঠক শ্রীস্বরূপচরণ পাল সাং নদীপুর পরগণে বালিগড়, সন ১২১৩ সাল তাং ১৩ ফাল্গুন। শ্লোকসংখ্যা ৮০।

১০। ৭২ সালের দামোদরে বন্যা। (রচয়িতার নাম নাই।)

শুনা যায় ভাঙ্গামোড়া নিবাসী অনিরুদ্ধ গুপ্ত ইহার প্রণেতা। শ্লোক সংখ্যা ৭০ মাত্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুন সবে এই বিবরণ॥
সন হাজার বাত্তর সালে প্রথম আশ্বিনে।
দামোদরে আইল বান অতি কুলক্ষণে॥

শেষ শ্লোক,—

রচিলাম এই কাব্য ধর্ম্মের চরণে।
লোক মুখে শুনি ভাই না দেখি নয়নে॥

১১। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কবিচন্দ্র।

এ সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। দুইখানিরই রচয়িতা কবিচন্দ্র, কিন্তু রচনা বিভিন্ন প্রকার। প্রথমখানির নাম দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দ্বিতীয়খানির নাম দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ। প্রথমটীর আরম্ভ শ্লোক,—

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
মহাভারতের কথা শুন জন্মেজয়॥
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিলা সভায়॥
সহদেব নকুল আর ভীম ধনঞ্জয়।
সভা করি বসিলেন পাণ্ডুর তনয়॥
ভীষ্মদেব কৃপাচার্য্য দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
কর্ণ অশ্বত্থামা আদি যত যোদ্ধাবর॥

মধ্য শ্লোক,—

দুর্য্যোধন বলে ভাই শুন দুঃশাসন।
দ্রৌপদীকে আন হেথা দেখিব কেমন॥
যুধিষ্ঠির দুই চক্ষু করে ছল ছল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

* * *

অন্ত শ্লোক,—

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
পরের করিলে মন্দ আপনার হয়॥
পরের অখ্যাতি পরে করে যেই জন।
মরিলে না হয় মুক্ত নরকে গমন॥
এত শুনি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান গোবিন্দ-মঙ্গল॥

ইতি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্তং। স্বাক্ষরং শ্রীগোবিন্দরাম সরকার। পাঠক শ্রীরামনারায়ণ শেঠ সাং ভাঙ্গামোড়া পরগণে বালিগড় সন ১২৪৪ সাল বারশত চুয়াল্লিশ সাল তাং ১৯ ফাল্গুন। পাঠশালে বসিয়া ইতি। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪০।

১২। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

রাজা কহে শুন শুন ব্যাসের নন্দন।
কহ গোসাঞি দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব।
বসিয়া আছিল তথা সকল পাণ্ডব॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সনে।
পণ করি পাশা তবে খেলে ততক্ষণে॥

শেষ শ্লোক,—

দ্রৌপদী লইয়া সবে করিয়া গমন।
এতদূরে সমাধান লজ্জা নিবারণ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা ব্যাসের বর্ণন।
ভাগবতামৃত কথা কবিচন্দ্র গান॥

ইতি দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৪ সাল শনিবার। এই পুস্তক শ্রীরামচন্দ্র পাল সাং মদনমোহনপুর (ভাঙ্গামোড়ার অন্য নাম) পরগণে বালিগড়। সরকার মান্দারণ। ২৪ পৌষ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্য দোষ নাস্তি। শ্লোক সংখ্যা ২২০।

১৩। দুর্ব্বাসার পারণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ শ্লোক,—

বনবাসে রমণী করিলেন রক্ষা।
দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণ করিলেন যক্ষা॥
এক দিন দুর্ব্বাসা হাজার শিষ্য সাথে।
গেলা দুর্য্যোধন বাসে ভোজন জনিতে॥

শেষ,—

দ্রৌপদীরে রমানাথ করিয়া সান্ত্বনা।
দ্বারকায় গেলা হরি ঘুচিল যন্ত্রণা॥
এই পালা যেই জন করেন স্মরণ।
রোগশোক যায় তার বিপদ খণ্ডন॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে বলে পালা হৈল সায়।
ধনপুত্র হয় তার যে জন গাওয়ায়॥

ইতি দুর্ব্বাসার পালা সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। সন ১১৯৩ সাল, সাং পোল পুঁথি পাঁচু দাস বসাকের তাং ১৫ আশ্বিন। লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ বাউল।

১৪। ধর্ম্মপারায়ণ। সহদেব চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মপুরাণ, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইতিপূর্ব্বে পরিষৎপত্রিকায় আমূল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। ধর্ম্মমঙ্গল। দ্বিজ রামচন্দ্র।

কেবলমাত্র আদি ঢেকুর পালাটী আছে। উহার আরম্ভ,—

বেণু রাজার ঘরে কন্যা বাড়ে রঞ্জাবতী।
রূপের প্রতিমা জিনি রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজা গৌড়েশ্বর লয়্যা কর অবধান।
দালানে বসিলা দিয়া করিয়া দেয়ান॥

ভণিতা,—

নিজ দুঃখ সেন কহে রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান নিবাস চাঁমটে॥

শেষ,—

দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদ্যের পায়।
হরিধ্বনি কর সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সন ১২৫২ সাল তারিখ ৩২ পৌষ। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৮০।

১৬। নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—নন্দবিদায় লিখ্যতে,—

যুবতী সকলে কান্দে কংস করি কোলে।
করাঘাত করে শিরে ভাসে অশ্রুজলে॥
অতিশয় করুণা করয়ে কংসজায়া।
কোথাকারে গেলে নাথ কে করিবে দয়া॥

শেষ,—

ইতি নন্দবিদায় সমাপ্তং। স্বাক্ষরমিদং শ্রীগোলোক ধাম কুণ্ড সাং হেলান। পুস্তকমিদং শ্রীকৃষ্ণমোহন দত্ত সাং নছিপুর পরগণে বালিগড়ি সন ১২০৩ সাল তাং ২রা কার্ত্তিক শনিবার। শ্লোক সংখ্যা ২২০।

১৭। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী। গৌরীদাস।

আরম্ভ,—

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং গোকুলানন্দনন্দনং।
অমৃত-রত্নাবলী গ্রন্থ মুকুন্দঃ ক্রিয়তেঽধুনা॥
জয় জয় সচ্চিদানন্দ রসের বিগ্রহ।
তোমার পদারবিন্দ ভজি হে নিগ্রহ॥

জয় জয় গোকুলানন্দ শ্রীনন্দনন্দন।
অধমের অভিলাষ করিবে পূরণ॥

ইহাও একটী রূপক, অমৃতরত্নাবলীর বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শেষ,—

রত্নসার রত্নেশ্বর সদা ভাবি মনে।
অধম জনার এই রত্নসার ধনে॥
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী হইল পূরণে।
দীন গৌরীদাস কহে নিজ প্রভুগুণে॥

ইতি নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী সম্পূর্ণ। যত্নেন লিখিতং ইত্যাদি। শ্লোক সংখ্যা ১৫৫৫।

১৮। নিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন কৃত মূল বংশীদাস কৃত অনুবাদ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যোনমঃ। শ্রীশ্রীরূপসনাতন গোস্বামী চরণেভ্যোনমঃ। সকল রসিকেভ্যোনমঃ। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-জয়তঃ। অথ শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তব অস্য গীতালি। আদৌ শ্রীমতো গোস্বামিনোর্বর্ণনং। ধানসী জয়শ্রীঃ।

শ্রীশচীনন্দন হৃদয় সনাতন রূপ রসিক দুই ভাই।
নিত্যশুদ্ধ যুগশরীর মনোরম জীব লাগী দরশন পাই॥
বৃন্দাবনে সতত নিবাস।
নিশি দিশি রমণী শিরোমণি
মঞ্জুল পাত্র করুণা পরকাশ॥ ধ্রু।

ইহা অতি উচ্চ অঙ্গের ভক্তিগ্রন্থ। ইহার সংস্কৃত কবিতাগুলি শ্রীমৎরূপ গোস্বামী প্রভু কর্তৃক বিরচিত। সর্ব্ব সমেত ৩২টী শ্লোকের ৩২টী গীতালি এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত।

প্রথম স্তব,—

নবললিতবেশৌ নব্যলাবণ্যপুঞ্জৌ
নবরসচলচিত্তৌ নূতনপ্রেমবিত্তৌ।
নবনিধুবনলীলা কৌতুকে নাতিলোলৌ
স্মরনিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ॥

অস্য গীতালি। কেদার।

দেখ সুনিভৃত নিকুঞ্জ মন্দিরে কেলি
সতলপ মাঝ রে।
নবীন রসে ভরি নবীন নাগরী
নবীন নাগররাজ রে॥
নবীন যৌবন বেশ সুনবীন
নবীন পহিরণ বাস রে।
নবীন লাবনি পুঞ্জ রঞ্জিত
চেতন বর ভাস রে॥
নবীন রুচিবর প্রেমসরোবর
ভাঙ্গি ভোগত রঙ্গ রে।
নবীন নিধুবন কেলী কৌতুকে
চপল রসময় অঙ্গ রে॥
নবীন মুখ পেখি কেকি বোলত
আলি আনন্দ বাঢ়েরে।
শরদ রঙ্গিণী রজনী শোহত
বংশী হেরত ঠাঢ়েরে॥

শেষ,—

স্তবমিমমতি রম্যং রাধিকাকৃষ্ণ্যো-
প্রমোদভববিলাসৈরদ্ভুতং ভাবযুৎকঃ।
পঠতি য ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিত্তৌ
বিমলমতি সদালীষু সখ্যং লভেতঃ॥

অস্য গীতালি। করুণাশ্রী।

অতি মনোরম নব, নিকুঞ্জে রহস্য স্তব,
দুঁহার বিলাস সুখরাশি।
প্রমোদ মদন ভর, অদ্ভুত সুন্দর,
সদাই নবীন পরকাশী॥
নিতি নিতি নিশাযোগে, দুই ভাব অনুরাগে,
গায় যেবা শুনে যেবা সুখী।
প্রেমরস ঝলমলে, রাই সখী মণ্ডলে,
গিয়া হয় এক প্রিয়া সখী॥
ইহা জানি ভজ ভজ, বৃন্দাবনচন্দ্ররাজ,
যমুনাবেষ্টিত বন কুঞ্জে।
যাহাতে মন্দির চারু, আর রত্ন কল্পতরু,
বিবিধ বিভব পুঞ্জে॥
তার অতি রম্য রাজে, মনোজ্ঞ মন্দির মাঝে,
সাজে নব কিশোরী কিশোর।
সেই অতি নিরুপম, বিহরে বিলক্ষণ,
হেরি হেরি বংশীদাস ভোর॥

ইতি শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি সংপূর্ণামি ১২০০ বারশত সাল ৮ অগ্রহায়ণ।

১৯। নিগমগ্রন্থ। গোবিন্দ দাস।

এ সম্বন্ধে পৃথক্ কিছু লিখিবার প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত তালিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আদ্য ও অন্ত যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আমার সংগৃহীত পুথির মিল নাই।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীবে কৈলা পার॥
বন্দিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চূড়ামণি।
বন্দে পদ্মাবতীসুতনিত্যানন্দ মণি॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সংসার পঙ্ক তার ধূলি কবে পাব।
পবিত্র হইতো সে নর বৈষ্ণব ভজিব॥
কহেন গোবিন্দদাস ভজ ওরে ভাই।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি॥
দৃঢ় করি ভজ ভাই বৈষ্ণব গোসাঞি।
সকল ভুবনে তাহা হৈতে আর নাঞি॥
বড়র আশ্রয় করি থাকে যেইজন।
যুগযুগান্তরে দুঃখ না পায় কখন॥
ইহা ভাবি ভজ ভাই যার যাহা ইচ্ছা।
কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেম দান দেন সবাকারে॥

ইতি শ্রীনিগম গ্রন্থ সমাপ্তং। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৩২টী।

২০। নৌকাখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভ,—

গোপীকে করিতে পার, ছলে কৃষ্ণ কর্ণধার,
হয়্যা যদি রহিলা আপনি।
জানিয়া প্রভুর ছল, যমুনায় অগাধ জল,
বায়ুবেগে বহে তরঙ্গিণী॥
মথুরায় গোপনারী, সুখে বিকি কিনি করি,
সবে বলে চল যাই ঘর।
যাইতে অনেক দূর, আছে বৃকভানুপুর,
বেলা হৈল তৃতীয় প্রহর॥

ভণিতি,—

এক চিত্তে এক ধ্যানে, চিন্তে যেবা একমনে,
ভজে যেই কৃষ্ণের চরণে।
চক্রবর্ত্তী নারায়ণ, তস্য সুত শ্রীজীবন,
বিরচিল তাঁহার স্মরণে॥

শেষ,—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষ নাশ বৈকুণ্ঠে গমন॥

ইতি নৌকা খণ্ড সমাপ্ত। সন ১২০২ সাল মাহ ১১ আশ্বিন। পঠনার্থে শ্রীরামজয় পাল। শুক্রবার বেলা এক প্রহর থাকিতে হইল। শ্লোকসংখ্যা ১২০।

২১। প্রসাদ-চরিত্র। শঙ্কর কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভে,—প্রসাদ চরিত্র লিখিতং।

প্রসাদ চরিত্র কথা শুন ভাই সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি পূর্ব্বে॥

ভণিতি,—

শ্রীকবি শঙ্কর গায় ব্যাসের আদেশে।
মদনমোহন কৃপা কৈলা ব্রাহ্মণের বেশে॥

অন্যত্র,—

পরাভব পায়্যা দৈত্য গেল রাজা পাশে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুরাণেতে ভাষে।

শেষে,—

সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে হইয়া সদায়॥

প্রসাদ চরিত্র অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক লিখিতং শ্রীগোপীচরণ ঘড়া সাং রামপুর পরগণে ভুরষিট্ট। সরকার সেলিমাবাদ। এই পুস্তক পঠনার্থ শ্রীনিধিরাম মাঞিতি নিবাস রামপুর পরগণে ভুরষিট্ট। বেলা একপ্রহর থাকিতে পুস্তক হইল ইতি ১১৫৪ চোয়ান সাল তারিখ ২৬ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার তিথৌ কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী। শ্লোকসংখ্যা ৪২০।

২২। প্রেমবিষয়-বিলাস। যুগলকিশোর দাস।

আরম্ভ,—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বন্দেঽহং শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসহগণৈঃ।
শ্রীঅদ্বৈতাদ্বৈতবন্দ্যং গৌরভক্ত প্রণমাম্যহং॥

বান্দব শ্রীরূপ রসিকের শিরোমণি।
অনুবাদ কহি ইহার বিধেয় কি জানি॥

শেষ,—

আমারে করহ সবে কৃপাবলোকন।
যুগল কিশোরদাসের এই নিবেদন॥
শ্রীস্নেহমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ।
এই যে কহিল প্রেমবিষয়বিলাস॥

ইতি প্রেমবিষয়বিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত। শ্লোকসংখ্যা ৪৪২।

২৩। ভক্তিরসাত্মিকা। অকিঞ্চনদাস।

আরম্ভ,—আজানুলম্বিত ভুজৌ ইত্যাদি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥

মধ্য,—

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু শুন দয়াময়।
বৈষ্ণব অবৈষ্ণব প্রভু কেমতে জানয়॥
বল প্রভু কোন বৈষ্ণব করিব পূজন।
কোন বৈষ্ণব দ্বারে করি মন্ত্র উপাসন॥
প্রভু কহেন নিত্যানন্দ কর অবধান।
বৈষ্ণব চিনিতে হয় কৃষ্ণের সমান॥
নৈষ্ঠিক ভজনে যার বিশ্বাস দৃঢ় হয়।
সর্ব্বজীবে সমভাব করুণাহৃদয়॥
এইত বৈষ্ণব স্থানে আশ্রয় করিয়া।
বৈষ্ণব সঙ্গ করিব সদা বেদবিধি ত্যজিয়া॥

শেষ,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবাণেশ্বর দাস চঙ্গ সাং খাতসি। শ্লোকসংখ্যা ১৭৫।

মন্তব্য—গ্রন্থ খানি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সংবাদ। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং শ্রীচৈতন্য-উত্তর দাতা।

২৪। যোগাদ্যাবন্দনা। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ,—অথ যোগাদ্যার বন্দনা লিখ্যতে।

নীলকমলদলখঞ্জননয়নী।
আর কত দিনে দয়া করিবে ভবানী॥
জয় জয় যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামবাসী।
অবনীতে মহা স্থান গুপ্ত বারাণসী॥
বাম হস্তে খর্পর মায়ের দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা।
লঙ্কায় রাবণ ঘরে ছিলে উগ্রচণ্ডা॥

শেষ,—

দ্বিজের স্তবেতে দেবী হরষিত হৈল।
জল হৈতে দুটী বাহু শঙ্খ দেখাইল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ॥
যোগাদ্যার পালা সাঙ্গ শুন সর্ব্বজন॥

ইতি যোগাদ্যাবন্দনা সমাপ্ত। তাং ১০ ফাল্গুন সন ১২৩৬ সাল লিখিতং শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং মদনমোহনপুর (ভাঙ্গামোড়া) পঠনার্থে শ্রীপীতাম্বর দাস শেঠ, সাং ভাঙ্গামোড়া।

মন্তব্য,—পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত যোগাদ্যা বন্দনা কবিচন্দ্র প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু আমার সংগৃহীত পুথি খানিতে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভণিতিযুক্ত। রচনারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

২৫। রত্নমালা। এখানি সংগ্রহ গ্রন্থ।

ইহাতে কতকগুলি শ্লোক এবং সেই সকল শ্লোকের ভাবানুগামী চন্দ্রশেখর, শশিশেখর এবং গোবিন্দদাস এই তিন মহাজনের কতকগুলি সুমধুর পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তাম্।

নমামি সততং ভক্ত্যা গুরুদেব দয়ানিধিং।
অগতের্মম সর্ব্বস্বং কৃষ্ণকিঙ্করসংজ্ঞক॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ নত্বা যথামতিঃ।
অভিসারাদিকানাঞ্চ বিভবামি প্রভেদকম্॥

প্রথম শ্লোক,—

কুচকলসভরার্ত্তাৎ কেশরী ক্ষীণমধ্যা।
বিপুলতরনিতম্বা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী॥

ধবল-বসন-বেশা মালতী-বদ্ধ-কেশা।
নিধুবন-রসপুঞ্জং যাতি রাধা নিকুঞ্জং॥

ধানসী,—

সুচারু চন্দ্রিকা কুটিল পানি।
শ্যাম অভিসারে চলল ধনী॥
লোটান লম্বিত-মালতী-মাল।
সৌরভে মাতল ভ্রমরা জাল॥
কুচগিরি-কল-চন্দন মাখা।
নুপুর ধবল বসন ঢাকা॥
সোণাতে জড়িত মুকুতা কশা।
ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাসা॥
গজদশনের সুচারু শাঁখা।
করমূলে কিবা দিয়াছে দেখা॥
নিশিসঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি।
শশী কহে কুলে মিলিল নাগরী॥

শেষ,—

শ্রীরাধায়াঃকুসুমবিপিনে রাজবেশং বিনোদীঃ।
কৃত্বা ছত্রং কনকরচিতং চাপি দণ্ডং দদাতি॥
শ্রীকালিন্দ্যাঃ সলিলশিশিরৈস্তাঞ্চ সিক্তাং করোতি।
প্রেমাকৃষ্টো ব্রজপতিসুতঃ কৌতুকী বেণুপাণিঃ॥

মঙ্গল,—

রাইক নরপতি বেশ বনাওত কুম বিপিনে হরিরায়।
কাঞ্চনছত্র দণ্ডতারে দেয়ল নিজ করে চামর ঢুলায়॥
সখী হে দেখ দেখ রাইক ভাগই।
অভিষেক করি যমুনা জল
সুশীতল কলতাই অনুমতি মাগই॥ ধ্রু
নব নব যৌবনী রসিকিনী রঙ্গিনী
সারি সারি করিয়া বসায়।
কুঞ্জ সহরে হরি করে এক শাঠ করি
রাইক দোহাই ফিরায়॥
যৌবন রতন পসার পসারল নবনব নাগরী ঠাট।
চন্দ্রশেখর কনে তুহি গ্রাহক বোই পাতায়ল হাট॥

ইতি শ্রীনায়িকারত্নমালায়ামষ্টপ্রকারস্বাধীনভর্তৃকা সমাপ্তা। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ ভৃঙ্গানামনুকম্পয়া সমাপ্তেয়ং বহুবশ্রীনায়িকা রত্নমালিকাঃ॥ ইতি শ্রীরত্নমালা-গ্রন্থঃ সমাপ্তশ্চায়ম্।

২৬। লক্ষ্মণভোজন। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

শ্রীশ্রীসীতারামচন্দ্রায় নমঃ। অথ লক্ষ্মণভোজনং লিখ্যতে।

আরম্ভ,—

আনন্দে বসিলা রাম লয়্যা পরিজন।
হেনকালে আইলা তথা কশ্যপ তপোধন॥
শ্রীরাম বসিলেন রত্ন সিংহাসনে।
শিরে ছত্র ধরেছেন আপনি লক্ষ্মণে॥

শেষ,—

লক্ষ্মণভোজন চৌদ্দভুবন উল্লাস।
মোহ পায়্যা বিরচিল কৃত্তিবাস॥

ইতি লক্ষ্মণভোজন সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীগোরাচাঁদ দাস, সাং কালিকাপুর, পরগণে বালিগড়ি। ইতি তাং ১৩ ভাদ্র, সন ১২৫০ সাল। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৮০।

২৭। লক্ষ্মণের শক্তিশেল। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—অথ লক্ষ্মণের শক্তিশেল লিখ্যতে।

মরিল সকল সেনা শূন্য হইল পুরী।
অবিরত মোহে কান্দে সবাকার নারী॥
দিবানিশি মন্দোদরীর শুনিয়া ক্রন্দন।
কোপ করি রণমাঝে সাজে দশানন॥

মধ্য,—

নব দূর্ব্বাদলশ্যাম, ধূলায় ধূসর রাম,
শোকানলে হইয়া অস্থির।
এলাইলা জটাভার, ভাই ডাকে বার বার,
ধরিলে না ধরে ধনুতীর॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণে লক্ষ্মণের পাশে,
ক্ষণে ক্ষণে করে হায় হায়।

শেষ,—

লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ডাকে রাম জয়।
রাবণ সাজিল বলি কবিচন্দ্র কয়॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল সাঙ্গ। ইতি সন ১২৫১ সাল। পাঠক শ্রীরামভদ্র বিশ্বাস। পরগণে বালিগড়ি লাট ঘনশ্যামপুর সাং দরাপুর। দিবসের শেষে চারি প্রহর বেলার সময় সাঙ্গ। শ্লোকসংখ্যা ৪২০।

২৮। শিবরামের যুদ্ধ। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ,—

শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
ক্ষুধায় আকুল মোর না রহে জীবন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন কমললোচন।
ফল মূল আনি কিছু করহ ভোজন॥
এত বলি চলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শিবের বাগানে গিয়া দিলা দরশন॥

শেষ,—

এত শুনি রামচন্দ্র বলেন বচন।
চিরজীবী হও তুমি পবননন্দন॥
শিবরামের যুদ্ধ কথা শোনে যেই জন।
যমের তাড়না যায় বৈকুণ্ঠ গমন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব ভারতী।
যার কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী॥

ইতি সন ১২৯৭ সাল তাং ১৩ কার্ত্তিক। পঠনার্থে শ্রীরামসদয় পাল সাং ভাঙ্গামোড়া লেখক শ্রীচতুর্ভুজ সরকার। শ্লোকসংখ্যা ৪১৫।

২৯। শতস্কন্ধ বধ। কৃত্তিবাস।

আরম্ভ,—অথ শতস্কন্ধ রাবণবধ লিখ্যতে।

রজনী প্রভাতে রাম করিল দেয়ান।
সপ্তদ্বীপের মুনি বৈসে তার বিদ্যমান॥
পাত্রমিত্র বসিল আর সভাজন।
অগস্ত্যমুনি জিজ্ঞাসিল যুদ্ধ বিবরণ॥

মধ্য,—

শতস্কন্ধের সনে রামের বাজিয়াছে রণ।
এই ক্ষণে শীঘ্র চল ধার্ম্মিক বিভীষণ॥

শেষ,—

হনুমানে কোল দিলা অগস্ত্য মহামুনি।
রাম জয় রাম জয় এই মাত্র শুনি॥
কৃত্তিবাস রচিল অদ্ভুত রামায়ণ।
শ্রবণেতে পাপ খণ্ডে দুঃখ বিমোচন॥

ইতি শতস্কন্ধরাবণবধ সমাপ্ত। ইতি সন ১২৫০ সাল তাং ৯ ভাদ্র শ্রীগোরাচাঁদ দাস সাং কালিকাপুর। শ্লোকসংখ্যা ২২০।

৩০। সীতাহরণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ,—

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
সীতার প্রাণ রঘুনাথ লোকের জীবন॥
এইরূপে রহে রাম অঘোর কাননে।
বানায়্যা বিচিত্র কুঁড়্যা ভাই দুই জনে॥

শেষ,—

হনুমান বলে প্রভু নিবেদি চরণে।
কেমনে চিনিব সীতা কহ বিবরণে॥
হের আসি হনুমান পাত দুই কর।
মাণিক অঙ্গুরী দিবে সীতার গোচর॥
দেখিলে অঙ্গুরী সীতা আনন্দ হইব।
তবে সে প্রাণের সীতা প্রত্যয় যাইব॥
অঙ্গুরী লইয়া হনু করিল পয়াণ।
এতদূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র গান॥

লিখিতং শ্রীগঙ্গারাম দানা সাং মদনমোহনপুর পরগণে বাজিগড়ি সন ১১৯৭ সাল তারিখ ৭ পৌষ মঙ্গলবার বেলা একপ্রহর থাকিতে হইল। শ্লোকসংখ্যা ১৮০।

৩১। শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপ্রার্থনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। অনুবাদক বৈষ্ণবদাস।

আরম্ভ,—

শ্রীরূপমঞ্জরিনিজ স্বরয়োগদাক্ষে।
সেবামৃতে রবিরতং পরিপূরিতাসী॥
তৎপাদপঙ্কজগতৌ ময়ি দীনজন্তৌ।
দৃষ্টিং কদাঃ বিকীরসি স্বকৃপান্তরেণ॥

অন্বার্থ,—

হে রূপমঞ্জরি তোমার ঈশ্বরী ঈশ্বর।
বৃকভানুসুতা আর প্রিয় গদাধর॥
এ দুঁহার পাদপদ্ম সেবামৃতরসে।
পরিপূর্ণ হও তুমি রজনী দিবসে॥
কেবল তোমার পাদপদ্মে মোর গতি।
মোর সম দীনজন্ত নাই আর ক্ষিতি॥
নিজ কৃপা ভার আর সুপ্রসন্ন মনে।
কবে দৃষ্টি ইক্ষেপণ করিবে আমা পানে॥

নীলৈকসাধ্যা বহু সাধনানি
কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞঃ পরমাদরেণ।
শ্রীরূপপাদাব্জঃ রজোভিষেকং
বৃতঞ্চ মে তত্বমমসাধনানি॥
কৃষ্ণপ্রিয়জনশিরোমণি শ্রীরাধিকা।
কৃপাদৃষ্টি কর মোকে করুণা অধিকা॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ হৃদয়ে ধরিয়া।
বৈষ্ণবচরণ দাস কহে আর্ত্ত হঞা॥

ইতি শ্রীরূপমঞ্জরী সংপ্রার্থ সংসষ্কৃতং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজবিরচিতং শ্লোকদ্বাদশকং তদর্থং ভাষাবলীং শ্রীবৈষ্ণবচরণদাসবর্ণনং সমাপ্তাশ্চায়ং।

৩২। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ,—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হৈয়া একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ॥

শেষ,—

শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণলীলা।
সুখে গৌড়বাসীগণ তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি স্বরূপ বর্ণন গ্রন্থ সমাপ্ত। সন ১২৮১ সাল মাহ আষাঢ়। ১৯ তারিখ বেলা দুই প্রহর দুই দণ্ডের সময় সমাপ্ত।

৩৩।* সারাবলী। বলরাম দাস।

আরম্ভ,—শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আদি বস্তু প্রভু।
তোমার ভজন বিনা ত্রাণ নাঞি কভু॥
জয় জয় চৈতন্যের যত ভক্তগণ।
শ্রীচৈতন্য বস্তু হৈতে সবার জনম॥

শেষ,—

ঠারভাঙ্গি ব্যক্ত অর্থ করিনু বর্ণনে।
সারাবলী গ্রন্থ হবে হইল লিখনে॥
সারাবলী গ্রন্থ কহে বলরাম দাস।
সার সার সার এই জানিবে নির্য্যাস॥

যথা দৃষ্টমিতি। শ্লোকসংখ্যা ৪৮০।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

---

* এই ৩৩ খানি পুথি বর্দ্ধমানের ভাঙ্গামোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে চণ্ডীদাসের রাসলীলাত্মক এই কয়েকটি পদ পাইয়াছি। যতদূর জানি, এই পদগুলি পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের আরও অনেক অপ্রকাশিত পদ আছে। অনুসন্ধান করিতেছি, পাইলেই প্রচারিত করিব।

অথ রাসলীলা।

রমণীমোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টাননি কিবা সে বান্ধনি
বিচিত্র সুচারু কেশ॥
মণি হেম মালে বেড়িয়া দুধারে
তাহাতে মুকুতার মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া
দেখনা শোভিছে ভাল॥
নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমরা ধাওল কোটী।
পরিমল আশে উড়ি বৈশে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটী॥
দুকানে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ূর শিখণ্ড ঝলমল করে
তাহা সে উড়িছে বায়॥
নাগর বরণ যেন নবঘন
অঞ্জন গনিয়ে কিসে।
ভাণ্ড ধনুবাণে কামের কামানে
রমণী হানিয়ে জিসে॥
মন্দ মন্দ হাসি করে লয়ে বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।
সোণার বরণ নানা আভরণ
রতন নূপুর পায়॥
রমণী-রমণ করিতে যতন
নাগর-শেখর রায়।
এমন মূরতি সুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥ ১॥

রাগ—কানড়া।

মোহন মুরতি কান।
অবলা কি রহে প্রাণ ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা ॥
তা দেখি রমণী জিয়ে।
নব মধু যেন পিয়ে ॥
হাসির হিল্লোলে তারা।
অমিয়া বরিখে ধারা ॥
নবীন চাতক যেন।
ঘনরস পিয়ে ঘন ॥
চাঁহনি চঞ্চল শরে।
তারা কি রহিব ঘরে ॥
নব নব বেশ খানি।
রহিব কোন বাধনি ॥
মুরলী অপার গান।
পাষাণ গলিয়া যান ॥
সে নব চলন গতি।
মদন মোহিত তথি ॥
চণ্ডীদাস রূপ হেরি।
মূর্চ্ছিত ধরণী পড়ি ॥ ২ ॥

রাগ—সুই।

বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
মোহিতে অবলাগণে।
নানা আভরণ করিল শোভন
জননী নাহিক জানে ॥
নিভৃতে উঠিয়া নাগরশেখর
তেজিয়া আনহি কাজ।
চলিলা সত্বরে বাঁশী লয়ে করে
নানাবেশ ফুল-সাজ ॥
চলিতে গমন ময়মত্ত[১] হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
মদন বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে ॥
মনসিজ শরে বিন্ধিল বিন্ধিল
ধানুকী আর কি চেতন রহে।[২]
নিবারণ নহে মরম বেদন
মর্ম্মহি মাঝারে বহে ॥
বরজ-রমণী রমণ-কারণ
চলিলা গভীর বনে।
এই রস তত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহত নাহিক জানে ॥
প্রবেশ করল বৃন্দাবন মাঝে
দেখিয়া নিভৃত স্থান।
রতন-বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান ॥
চণ্ডীদাস কহে অপরূপ রাস
বিহার করল কানু।
রস-সুখ-রতি করিতে পীরিতি
সুধুই রসের তনু ॥ ৩ ॥

রাগ—জয়শ্রী।

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা তায়।
নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত
নানাপক্ষী গুণ গায় ॥
তরুগণ যত ফুল ভরে তারা
লম্বিত ধরণী-তলে।
মধু ঝরে কত দেখহ বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে ॥

---

(১) "মদমত্ত হাতী" নয় কি?
(২) বোধ হয় পাঠ এরূপ হইবে,—
"মনসিজ শরে বিন্ধিল ধানুকী
আর কি চেতন রহে।"

ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
পেকন ধরিয়া তারা।
চাতক চাতকী ডাহুক ডাহুকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা॥
যমুনার নীরে জলচর চরে
সফরী ফিরিছে তায়।
নানাপুষ্প ফুটে পঙ্কজ দুসারী
মধুকর মধু খায়।
চণ্ডীদাস কহে কিবা সুখময়ে
নিভৃত সুচারু বনে।
সেথানে একাকী বৈঠল নাগর
এ কথা কেহ না জানে॥ ৪॥

রাগ—কাফি।

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ কুটীর
মণিমাণিকের স্তম্ভ।
রতন জড়িত পরশ পাথর
অতি অনুপম রঙ্গ॥
উপরে জড়িত হেম মরকত
মুকুর কিসে বা গণি।
চারি পাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি॥
ঝালর ঝলকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে।[১]
নেতের পতাকা উড়ে অনুপম
কুটীর উপরে দিয়া।
শত শত কোটী এ কুঞ্জ কুটীর
সকল তাহার ছায়া॥
বৈঠল নাগর চতুর শেখর
চতুর নাগর কান।

(১) ইহার পর আর এক চরণ থাকা উচিত ছিল। পুঁথিতে কিন্তু নাই।

এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান॥ ৫॥

তথা—

টল টল টল অতি মনোহর,
শরত পূর্ণিমার শশী।
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদনে কুটীরে বসি॥
কলরব করু যত পাখীগণ
ময়ূর ময়ূরী নাচে।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে॥
মদন বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রসের লীলা।
নিভৃতে বসিয়া নাগর রসিয়া
কামেতে হইয়া ভোলা॥
বদনে ভূষণ মুরলী বদন
বাজয়ে কতেক তান।
সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান
ছুটল পঞ্চম গান॥
প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিলু শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলহ তবে॥
বিহ্বল মরমে হিয়া আনচান
কহিতে কাহারে নারে।
মনের বেদন নাহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধের বাণ খেয়ে ধাওল হইয়া
চারি দিকে যেন চায়॥

চণ্ডীদাস বলে ব্রজ-জনাচিত
আকুল হইয়া গেল।
নাহি আন কথা পাই হিয়া ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল ॥ ৬ ॥

রাগ—ধানসী।

শুনগো মরম সখি।
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল আঁখি।
ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল ॥
এই অনুমান করে গোপিগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেখ এই তনু মোর
তথায় আছয়ে চিত ॥
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ।
যেনক চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ ॥
সেজন পাইলে চাঁদের সুধাটী
সুখের নাহিক ওর।
কতক্ষণে মোরা ভেটব নাগর
পাবহু তাকর কোর ॥
যেন মেঘ রস তাহাতে আবেশ
চাতক (না ?) পায় বারি।
সেজন পিয়ারে না পাই আবেশে
সেজন হতাশে মরি ॥
জলের আধেশে চাতক ঝরয়ে
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জিয়ই অথির রমণী
জলদ গতিক সেই ॥
চণ্ডীদাস বলে চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
ত্বরিতে চলিয়া যান ॥ ৭ ॥

শ্রীরাগ।

কি করিতে পারে গুরু দুরুজন
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম দরশনে
ইথে কি আনের বশ ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
সেজন ডাকিতে মুরলী সঙ্কেতে
ত্বরিতে গমন মানি ॥
কেহ বলে শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মন হেন লয়ে ॥
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ কাজ ত্যজি চলিলা তখনি
যেমত আছিল সাজ ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
তেজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগারি ভরিয়া বারি ॥
চলিলা ত্বরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন মুখে তখনি চলিলা
রহল তেমতি পড়ি ॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাঁড়িতে জাল।

আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখী
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হইবে উথল হাসি ॥ ৮ ॥

রাগ তথা।

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে আছিল স্তন।
দুগ্ধপোষা বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন ॥
চলিলা গমন সেই বৃন্দাবন
কান্দিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতনা নাহিক কিছু ॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হৈয়া।
হেন বেলে শুনি মুরুলির ধ্বনি
উঠিল চেতনা পা(ই)য়া ॥
বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলল পতিরে ত্যজি।
পতি কোল সেই ত্যজিলা তখনি
চলল বনেতে সাজি ॥
কোন গোপী ছিল, কোন আরম্ভণে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহিঁ বলে ॥
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ ॥

চণ্ডীদাস বলে কিবা সে দেখল
অপার অথল রামা।
তেই সে প্রেমেকে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা ॥ ৯ ॥

রাগ—কানড়া।

ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিত
শুনিয়া মুরলী গীতে ॥
রসের আবেশে পদ আভরণ
কেহ বা পরল গলে।
গল আভরণ কোন ব্রজরামা
পরিছে চরণে ভালে ॥
বাহুর ভূষণ কনক কঙ্কণ
পরিল হৃদয় মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে ॥
কেহবা পরল একই কুণ্ডল
শোভই একই কানে।
ঐছন চলিল বরজ রমণী
ধৈরজ নাহিঅ মানে।
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দুর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহিঁ নয়ন চালে ॥
নানা আভরণ পরে কোন থানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন পানে ॥
কেহ নব রামা বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।

চণ্ডীদাস কহে আহীর-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে ॥ ১০ ॥

শ্রীরাগ।

এই মত সব গোপেরি রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই পাশে গিয়া চলিলা ধাইয়া
সঙ্কেত বলহিঁ ধা(ই)য়া ॥
চল চল ধনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে।
রসের আবেশে কহে নব রামা
কহিছে ধনির স্থানে ॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই।
তরল কথন (?) রমণী অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই ॥
পুনঃ শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মরলী তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিতে নাহি কিছু আন ॥
রাধার আরতি সে নহে পীরিতি
তথায় আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে বেশের আবেশে
কহিছে সকল জন ॥
সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
দিয়া মুকুতার মাল ॥
দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক চম্পক কবরী বেড়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল ॥
সিঁথায় সিন্দুর তার মাঝে মাঝে
দিয়েছে চন্দন ফোঁটা।
যেন শশধর চৌদিকে বেড়ল
কি তার কহিব ঘটা ॥
নাসায় বেসর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক কাঁচুলি তার পরিপাটী
মুকুতা গাঁথনি পাশে ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি রিণি
পিঠেতে ছুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক চাঁপা ॥
নীল উরণী ভুবনমোহিনী
সোণার নূপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম বাজই
হংস গমনে যায় ॥
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল ॥ ১১ ॥

রাগ—কামদ।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব সংসার মাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে ঢল ঢল ॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হ'য়ে বাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়।
ভয়েতে আকুল হৈয়া ত্বরিতে রাধারে লৈয়া
বৃন্দাবন মুখে সব ধায় ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতুহলে
আজ বড় আনন্দ অপার।
সেরূপ আনন্দ নিধি দেখিব চরণ দুটী তার ॥[১]

---

[১] কিছু বাদ গিয়াছে।

ভাসিব আনন্দ রসে পূরিব যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূরিত।
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হোথা যদুনাথে
রাধা নামে বাঁশী গায় গীত॥

অভিসারানুরাগ—রাগ সুই।

শ্যাম-মন্ত্র-মালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়॥
রসের আবেশে আনন্দ হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়॥
অপার অপার বহুবিধগদ(?)
সুন্দরী সে ধনি রাই।
শ্যাম দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম গুণ গাই॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোণার লতা।
কিবা সে তড়িত চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে॥
পথে যেতে কহে রাধা শিরোমণি
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন খানে আছে
রমণী জনার ধন॥
আগে হেরি দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে॥
চণ্ডীদাস কহে গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিলা রাই।
ঘন ঘন রব মুরলীর শব্দ
তাহাই শুনিতে পাই॥ ১৩॥

রাগ—কানড়া।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখি?
আজি সে তোমার মিলিব সুদিন
কমল-নয়ন আঁখি॥
প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকষে
কহেন রমণী ধনি॥
কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুঃখ উঠে মরম বেদন
মোর মনে হেন লয়॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পড়িয়া আছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়া আছি॥
শ্যাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে আছে আন বোল
নিগড় আছয়ে বান্ধা॥
গোপীগণ বলে হাসি রস রসে
চলই ত্বরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।
চণ্ডীদাস কহে ত্বরিত গমনে
এস বৃন্দাবন মুখে॥ ১৪॥

রাগশ্রী।

চলল গমন, হংস যেমন,
বিজরীতে অন উয়ল ভুবন,
ল্যাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল,
ও চাঁদ বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুর বিন্দু,
তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু,
কুসুম সুষম মুকুতা মাল
নোটন ঘোটন বান্ধিয়া॥
বিম্ব অধর, উপমা জোর,
হিঙ্গুল মণ্ডিত অতি সে ঘোর,
দশন কুন্দ, যেমন কলিকা,
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল,
নাসা করপর বেসর আর,
মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল,
দেখহ রে কত ভালিয়া॥
চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত,
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত,
রস ভরে ধনি সুন্দরী রাই,
চলল মরমে মাতিয়া॥ ১৫॥

রাগ—কানড়া।

রাধার আবেশ গমন মন্থর
চলল আবেশ হৈয়া।
শ্যাম-মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া॥
উপবন মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনি রাই।
প্রেম-রস-ভরে আধ আধ ব'লে
কহিছে সঘনে তায়॥

এক সখী গিয়া, সেখানে যাইয়া,
কহিছে রাধার পাশে।
কি আর বিলম্ব, করিছ তোমরা,
চলহ ত্বরিত বেশে॥
নাগর-শেখর একলা আছয়ে
চলহ ত্বরিত করি।
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥ ১৬॥

কামদ—রাগ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া বলে॥
এত নিশি বল, কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ, কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত, দেখি তোর রীত,
এ নিশি কোথাএ যাবে।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ যায় তবে॥
ত্যজিয়া আমারে, যাই কোথাকারে,
এ বড় বিষম দেখি।
বহুত গঞ্জনা, শুনি নি-শবদে
রহিল কমলমুখী॥
যখন তাহার, ঘুমাইল পতি,
তখন ত্যজিয়া গেল।
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি শুনিল॥
ভয় পরিহরি, চলিল সুন্দরী,
যেখানে নাগর কানু।

চণ্ডীদাস ভনে, কিছুই না মানে,
এমনি বাঁশীর তান ॥ ১৭ ॥

শুন হে কমল আঁখি।
এ বড় সেখানে, পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাথী ॥
সকল তেজিয়া, শরণ লয়েছি,
ও দুটী কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল, ওহে বাঁশীধর,
যে তোর উচিত হয় ॥
তিলেক না দেখি, ও মুখমণ্ডল
মরমে না শুনে আন।
দেখিলে জুড়ায়, এ পাপ পরাণ,
ধড়ে আসি রহে প্রাণ ॥
যেমন ঘরের, দীপ নিভাইলে,
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি, লোচন সভার,
হেনক আমরা বাসি॥
সকল ছাড়িয়া, যে জন শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ-ভূষণ শকতি
বাঞ্ছা সিদ্ধি নাম ধর ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারী
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী ॥ ১৮ ॥

শ্রীমতীর করুণা-দৈন্য উক্তি।

তথা রাগ।

শুনহে নাগর রায়।
কি বলিব রাঙ্গা পায় ॥
আমরা কুলের ঝি।
তোমারে বলিব কি ॥
যে ভজে তোমার পায়।
সে জন তোমারে ধ্যায় ॥
আন কি জানি এ মোরা।
তুমি নয়নের তারা ॥
যে বল সে বল মোরে।
ছাড়িতে নারিব তোরে ॥
তোমার মুরলী শুনি।
ধাইয়া আইনু আমি ॥
শুন হে পুরুষ-ভূষণ।
তুয়া মুখে এমন বচন ॥
কি বলিব আমরা অবলা।
আমি হই দাসী পনসারা(?) ॥
চণ্ডীদাস কছু গুণ গায়।
অদ্ভুত শুনি হে হেথায় ॥ ১৯ ॥

তথা রাগ।

শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত, এ নয় উচিত
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমার কারণে, সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়েছি ডোর।
অবলা অখলে, হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর ॥
আমরা স্বপনে, আন নাহি জানি
কেবল দুখানি পায়।
এতেক বেদন, তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায় ॥
সকল তেজিনু, তবু না পাইনু
হৃদয় কঠিন বড়ি।
হাসিয়া হাসিয়া, বঙ্কিম চাহিয়া
এবে কেনে কর দেড়ি ॥
তুমি প্রেম মণি, পরম বাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।

রাঙ্গের সমান, ইথে নাহি আন
এমন গতিক নয় ॥
বহুর অধন, অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া, পাইয়া আমরা
না পাইয়া কোন কূল ॥
চণ্ডীদাস বলে, আমি জানি ভালে
কালার পীরিতি নেঠা।
যেমন জানিবে, সরোরুহকূল
তাহার অঙ্গের কাঁটা ॥ ২০ ॥

রাগ—কানড়া।

তুমি বিদগধ, সুখের সম্পদ
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ, লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর ॥
দেখি বল নাথ, এ ভব সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী জনার, হৃদয় মানস
কেবল আঁখির তারা ॥
গৃহপতি ত্যজে, হা হা মরি লাজে
শুন হে নাগর রায়।
এ সব না জানি, মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায় ॥
শীতল চরণ, যে লয় শরণ
তাহাতে এমনি রোষ।
অবলা বচনে, কত খেণে খেণে
কত শত হয় দোষ ॥
প্রাণপতি তুমি, কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ ॥ ২১ ॥

শ্রীরাগ।

তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি, কি আর বলিব
সকলি গোচর পায় ॥
যে বল সে বল মোরে নাগরশেখর।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥
মনের আগুণ কত উঠে অনিবার।
কাহাবে কহিব ইহা আচার বিচার ॥
এমন ব্যথিত পাই আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে করএ অন্য চিতে ॥
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী ॥
তোমার কলঙ্ক-হেম-মালা করি গলে।
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে ॥
ঘবে হৈল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিঠুর তুমি এবে গেল জানা ॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে পীরিতে ॥
তোমার পীরিতি গোপী তেজিয়া সকল।
দাণ্ডাইতে নারী মোরা হইল বিকল ॥
চণ্ডীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী।
হরষে পরসমণি পরিবে এখনি ॥ ২২ ॥

রাগ—কাফি।

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি
অথির কুলের বালা।
খেণে খেণে উঠে বিরহ আগুণ
দুগুণ হইল জ্বালা ॥

মলয় চন্দন মৃগমদজাত
অঙ্গেতে আছিল মাখা।
হৃদয় কাঁচুলি তিতিল সকল
তাহা নাহি গেল রাখা॥
প্রেম ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ বাণ খায়্যা যাইল হইয়া
চারিদিকে চাহি সারা॥
ক্ষীণ গোপীগণে, চাহে চারু পানে
বিরহ বেদনা পায়্যা।
কাষ্ঠ সম যেন চিত্রের পুতলি
সারি সারি দাণ্ডাইয়া॥
কি শুনি কি শুনি বিষম সঙ্কট
হৃদয়ে হইয়া বেথা।
আর কি জীবন সঙ্কট হইল
কি আর দেখহ সেথা॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
এমত তাহার রীত।
চল গিয়া জলে প্রেম কুতূহলে
মরিব এ নহে চিত॥
কি আর পবাণ রাখিব আমরা
কি শুনি দারুণ বোল।
যার লাগি এত বিষম বিবাদ
নয়নে বহিএ লোর॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
কহত ইহার বাণী।
নাগর বচন কিসের সমান
এবে সে ইহাই জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনী
এই মোর মনে লয়।
ভকতি আদরে সরল বচনে
বিনতি করহ পায়॥ ২৩॥

রাগ—জয়শ্রী।
তুমি বঁধু ব্রজের জীবন।
জাতি কুল করিয়া রোপণ॥
তুমি নহ নিঠুরাই পনা।
কেনে দেহ বিরহ বেদনা॥
যে ভজে তোমার দুটী পায়।
তারে নাথ হেন না জুয়ায়॥
গৃহপরিবার পরিহরি।
তোমারে ভজিল ব্রজনারী॥
দেখ নাথ মনে বিচারিয়া।
যত দুখ তোমার লাগিয়া॥
শাশুড়ী-খুরের অতি ধাঁর।
খরতর তাহার বিচার॥
কান্দিতে না পারি তব লাগি।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ।
বাহির হইএ সাধে বাদ॥
চণ্ডীদাস দেখিএ দুখিত।
শ্যামে কহিছে অনুচিত॥ ২৪॥

রাগ—ধান্সী।
তোমা হেন ধন পরম কারণ
পাইল অনেক সাধে।
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে॥
যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অন্তর বড়ি।
সরল যেজন নাহি তার কোন
কুটিল কটক্ষ ছাড়ি॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পুরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে।
কোন কোন দিনে সেই বাজিকারে
দংশয়ে আপন রোষে॥

ভুজঙ্গ সমান তেন ভুয়া মন
তোঁহার চলন বাঁকা।
তোমার অন্তর সেই সে সোসব
এ দুই তুলনা একা॥
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।
অন্তর কুটিল মুখে মধুপর
আমরা এমন বাসি॥
যে ছিল তা হল তাহাই করিল
নিরমল যেবা ছিল।
তাহে দিয়া কালি ঠাকুরাণী ভালি
কলঙ্ক উঠিল ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বলি রাধা
ঐছন কানুর লেহা।
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা॥ ২৫॥

রাগ—সুই।

কানু কহে শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস॥
রাধা কহে তাহে শুন যদুনাথে
আর কি কুলের ভয়ে।
এক দিন জাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়েছি ওহুটী পায়ে॥
আর কি কুলের গৌরব সূচনা
আর কি জেতের ভয়।

তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল॥
কেবল গোপীর নয়ন অঞ্জন
হিয়ার পুতলি তুমি।
তাহে কর হেন কেন ভুয়া মন
এবে সে জানিনু আমি॥
ভাল তুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ।
চণ্ডীদাস বলে এ নহে উচিত
শুন হে নাগর-রাজ॥ ২৬॥

রাগ—পূরবী।

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কাহিনী যতি।
তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীতি॥
হাসি রসাইয়া কুল ভাসাইয়া
নিদানে এমনি কর।
এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া-বরণ-ধর॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ।
তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
এবে হে জানিল এহ॥
তখন প্রথম পীরিতি করিলে
দেখি আকাশের চাঁদ।
কত মুখে হাসি বচন সেচন
ইথে সে পাতিলে ফাঁদ॥
হৃদয়ে যা কর কালিয়া-বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিতে
এবে সে হইল গাড়ি॥

আমরা হই এ কুলের বৌহারি
কি বলিতে মোরা পারি।
তাহার উচিত করিলা বেকৃত
শুন হে প্রাণের হরি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সকল স্বপন সম।
কানুর ঐছন পীরিতি কেবল
কেন বা করিছ ভ্রম॥ ২৭॥

তথা রাগ।

বঁধু তুমি বড় কঠিন পরাণ।
ইবে মোরা জানি অনুমান॥
কেনে তুমি বিরস বদন।
কহে যত গোপ-সখীগণ॥
ওহে তুমি বিদগধ রায়।
মো সভারে হেন না জুয়ায়॥
শ্রীধর পাতকী ভয় পাবে।
মরিব তোমার নিজ ভাবে॥
দাণ্ডাইয়া দেখহ আপনে।
হয় নয় বুঝ নিজ মনে॥
একে একে ব্রজের রমণী।
হেট মাথে খুটএ ধরণী॥
পাসরিলে সে সব পীরিতি।
পরিণামে হেন কর গতি॥
তুয়া বিনে আর কেবা আছে।
আমরা দাঁড়াব কার কাছে॥
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
সুখে রসে কর রাসকেলি॥ ২৮॥

শ্রীরাগ।

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তাথে।
আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে॥
পরের পীরিতি আগে না গণিয়া
যে জন পীরিতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়্যা
পরিণামে হেন করে॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিলাএ
জলের বিম্বুকি প্রায়।
যেন নিশিকালে নিশার স্বপন
তেমত পীরিতি ভায়॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতনু করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটী
বাজীকরে করে কেলি॥
তেমতি তোমার পীরিতি জানিল
শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায়॥
মুখে কতজন সরল বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখনি এমন না জানি কখন
এমন তোমার ধারা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
কে বলে পীরিতি ভাল।
পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল
অন্তর হইল কাল॥ ২৯॥

সুরুই সিন্ধুড়া।

সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ
যার লাগি যেবা ঝিরে।

সে কেনে নিদয়া নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে॥
তোমার ধরণী ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বর্নে।
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে॥
তোমা হেন বিধি মিলাইল রাধা
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে
শোকেতে মরিবে রাধা॥
তোমার কারণ এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাসাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে॥
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
মুখে নাহি সরে বাণী।
চিত বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী॥ ৩০॥

রাগ—সুরুই-সিন্ধুড়া।

বঁধু আর কি ঘরেব সাধ।
হ্যাদে গো সজনি কহ মোবে বাণী
এ সুখে হইল বাদ।
যে জন ব্যথিত সে জন নৈবাশ
মনে না পূরল সাধ॥
কাঠেব পুতলি রহে সারি সারি
চাহিয়া নাগর পানে।
যেন যে চান্দের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে॥
তৈমত নাগরী রসের গাগরী
মুগধ তাহাতে করি।
যেন বা কো আশে ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
কয়িতে রসের পান।
সফরী জীবন যেন জল বিন
সে জন কূলেতে জান॥
সুধা মাথে যেন করি আনচান
চণ্ডীদাস কহে তবে॥ ৩১॥

রাগ—কানড়া।

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হৈল।
যা লাগি এতেক হল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়া॥
উপজল মান যেন বিষতুল
সে নব কিশোরী রাধা।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত এ তনু আধা॥
নয়ন কমল যেন রাতাপল
তেজিয়া আনেব কাছ।
বৈঠল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবীলতার গাছ॥
মাধবীলতাতে বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।
শ্রীমুখ বিছুটি(?) ধরণী ধূসর
কছু না বচন লবে॥
বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুটে।
নিশ্বাস হুতাসে তাহার বাতাসে
নানা আভরণ ছুটে॥
ঐছন মনের উঠিল আগুনি
সে ধনি কিশোরী রাই।
কাছে একজন ছিল গোপীগণ
তাহারে উঠাল তাই॥

তুমি হেথা কেন কোন অভিমান
তুমি যাহ শ্যাম পাশে ।
অতি সে বিমুখী রাধা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ৩২ ॥

মান ।

রাগ সুহই ।

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা রাধার কাছে ।
সুধামুখী ধনি হয়েছে মানিনী
অতি কোপ মনে আছে ॥
কহে এক সখী শুনহে বচন
যদি বা মানেতে রাধা ।
তবে কিবা সুখ উঠে কিবা দুখ
সে ধনি তেজিয়া কিবা ॥
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা ॥
দুই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
কহিতে লাগিল তায় ।
কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হয়্যাছ কায় ॥
শ্যাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয় ।
সে জন বচনে অভিমান কেন
এ তোর উচিত নয় ॥
শ্যাম পরসঙ্গ না কহ আরতি
তোমরা সুরীতে গিয়া ।
শ্যামসোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ গিয়া ॥
আমি না যাইব শ্যাম সাধ গেল
কি বাসে রহল তোরা ।
চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা ॥ ৩৩ ॥

রাগ—সুহই ।

গেলা যত সখী বচন না শুনি
যুকতি করিছে কতি ।
রাই মানাইতে না পারিল মোরা
কি কব ইঁহার গতি ॥
চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী
কহিতে লাগিল তায় ।
রাই মানাইতে না পারিবে কত
এ কথা কহিবে কায় ॥
হেথা শ্যামরায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান ।
কহে এক সখী শুন সুনাগর
রাধার হয়েছে মান ॥
অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন ॥
কেন বা মানিনি হয়েছে সে ধনি
কিসের কারণে বল ।
কহে সুনাগরী শুন প্রাণ হরি
মানেতে হয়েছে ঢল ॥
তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে ।
সেই সে কারণে অতি অভিমানে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥ ৩৪ ॥

ধানসী রাগ ।

নিকুঞ্জে রসিয়া নাগর বসিয়া
বড়ই হইলা দুখী ।
রাধার পীরিতি মনে হয়ে তথি
হিয়াতে না হয় সুখী ॥
বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া
পুরত সুস্বর বাণী ।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
তুরিতে গমন ধনি ॥

এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়
ঘনে ঘনে কহে রাই।
বাঁশীতে সকলি নিশান ব্যাকত
ভাবিয়া অমৃত তাই ॥
শুনি পশু পাখী পুলকিত মনে
বনের হরিণী যত।
বাউল হৈয়া মিলাইছে শিলা
শুনি সে মুরলী গীত ॥
মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।
অতি সে কোপিত না হয় সরল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥ ৩৫ ॥

রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে
বসিল কুঞ্জের ভিতে ॥
কোথা রসময়ী দেহ দরশন
তো বিনে সকলি আন।
তুমি কুঞ্জেশ্বরী তুমি সে মাধুরী
তোর সদা করি গান ॥
তোমার কারণে বাঁশীটী বদনে
শুনি বা কেমন রতি।·· (?)
এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত নিশান
বাজই রসিক রায় ॥
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস পুনঃ গায় ॥ ৩৬ ॥

রাগ—সুই।

রাই রাই নাম আর সব আন
চিবুকে মুরলী দিয়া।
রাধা নাম দুটী আখর জপিছে
কোথা হে রসের পিয়া ॥
খেণে রাধা রূপ ধেয়ান করয়ে
অন্তরে ওরূপ দেখি।
খেণেক নিশ্বাসে অতি সে হুতাশে
রাধা নাম তাহে লিখি ॥
মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম
গাইয়া আপন মনে।
তেজল সকল বেশ পরিপাটী
রহই একটী ধ্যানে ॥
করের অঙ্গুলী ধরি কত বেরী
জপয়ে রাধার নাম।
এই তন্ত্র মন্ত্র এই সুধারস
সঘনে কহই শ্যাম ॥
মুগধ মুরারি রসের চাতুরী
আকুল হৈয়া চিতে।

রাগ—করুণা।

বাঁশী ঝাটপনা কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।
তবু না আইল বৃষভানুসুতা
রহল নিভৃত মান ॥
বিনোদ নাগর হইল ফাঁপর
তেজিল সকল সুখ।
রাধা পথপানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ দুখ ॥
খেণে কত বেরী উঠল মুরারি
সঘনে নিশ্বাস নাসা।
আলসে কাতর রসিক নাগর
না করে একহি ভাষা ॥
না জানি কোথায়ে পড়ল মাথার
পিঞ্ছ মুকুট চূড়া।
কোথা না পড়ল কটির বাগর
সে পীতবসন ধড়া ॥
কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা।

কোথা না পড়ল চূড়ার বন্ধন
সে সব গুঞ্জার মালা ॥
কোথা না পড়ল মধুর মুরলী
নূপুর পড়ল কতি ।
নয়নে বহত বহুতর বারি
চণ্ডীদাস দুখমতি ॥ ৩৭ ॥

রাগ—সুহই ।

খেণে রাধা পথ পানে চাই ।
মুগধ সে লুবধ মাধাই ॥
কুঞ্জে লুঠত মণি ঠাম ।
রাধা রাধা নাম করি গান ॥
কোথা রাধা সুকুমারী গৌরী ।
হেরত নয়ন পসারি ॥
পুন মুদত দুই আঁখি ।
ধনি মণি কতি নাহি দেখি ॥
এখনি কুঞ্জ নিকুঞ্জে ।
গান করত কত পুঞ্জে ॥
হা রাধা রাধা তনু আধ ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ ॥
তো বিনু সব ভেল রাধে ।
হৃদি পরজা তাত রাধে ॥
ঐছন কাতর মুরারি ।
গদগদ নয়নক বারি ॥
খেণে উঠে খেণে করে গান ।
রাইক পথ পানে চান ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি ।
আমি মিলব পুন হরি ॥ ৩৮ ॥

দুর্জ্জর মান ।

রাগ—শ্রী ।

এই পরবাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায় ।
রাই ভাবে তনু পরিত হইয়া
তাম্বূল নাহিক খায় ॥
বিসর সকল পূরব পীরিতি
এবে ভেল অভিমান ।
কহে সুনাগর চতুর শেখর
দূতী যাহ রাধা ঠাম ॥
রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
তবে সে জীয়ই কান ।
ত্বরিত গমন করহ এখন
ইহাতে না হয় আন ॥
বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
বসিয়া মাধবী মাঝে ।
সঙ্কেতে মুরলী ডাকিল সুস্বরে
অনেক মানের কাজ ॥
তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
না ভাঙ্গে রাধার মান ।
সেই গোপরামা পরাভব মানি
আয়ল আমার ঠান ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসময়
রাধার বড়ই মান ।
আন আনিবারে কেহ সে নারিব
শয়ান করহ কান ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমতীর নিকট দূতীর গমন ।

রাগ—কামদ ।

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়া
দূতী কহে এক বাণী ।
রাই মানাইয়া এখনি আসিব
শুন হে নাগর-মণি ॥
কহিছে নাগর চতুরশেখর
এখনি চলিয়া যাও ।...
চলি এক মন দূতীর গমন
যেখানে আছয়ে রাই ।

সেইখানে গিয়া দিল দরশন
কহিতে লাগল তাই ॥
দূরে হতে দেখি দূতীর গমন
করিল শ্রীমুখ বঙ্ক।
হেন কালে দূতী দাঁড়াই সম্মুখে
কহেন রসের রঙ্গ ॥
দূতী বলে ভাল তোমার চরিত
বুঝিতে নারিল এ।
সে হেন নাগরে পরিহরি ধনি
তাহারে সঁপিল দে ॥
যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
সে হেন বঁধুরে ভেজি বহু দুব
কত মেনে সুখ পাও ॥
যাহার কারণে বেণীর বন্ধনে
দিনে কত বার কর।
কালিয়ার সাধে কাল জাদ(?)খানি
ভাবে বেণী পর ধর ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুধামুখি
কুঞ্জেতে আকুল কান।
ত্বরিত গমন বিলম্ব না কর
তেজল দারুণ মান ॥ ৪০ ॥

রাগ—গয়া।

সে হেন বেশের কেনে রবি তথা
মলিন শ্রীমুখ চাঁদ।
যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিষের ফাঁদ ॥
বিষের কাছেতে অমিয়া টলকে
কেবল গরল সারা।
যে দেখি আমি তোমার চরিত
বিষম বিপাক ধারা ॥

হেন লয় মন শুনহ বচন
এই সে বাসিএ ভাল।
সে হেন নাগরে তোমার হাবাশে
বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥
শীতল পঙ্কজদল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায়।
বিরহ হুতাশে সেই দল জল
খেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে।
তাহা খেণে খেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥
কমল নয়ন মলিন বয়ান
সঘনে তোঁহারি ধ্যান।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
তেজল নাসার নানা আভরণ
ও নব মুকুটচুড়া।
অতিপ্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
আর সে পীতের ধড়া ॥
শুনহ সুন্দরী করহ গমন
বিলম্ব না কর রাধা।
চণ্ডীদাস বলে তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥ ৪১ ॥

রাগ—মালব।

কি আর দেখহ রাই।
কানু তুয়া গুণ গাই ॥
পরিয়া নিকুঞ্জ ঠাম।
কেবল তোমার নাম ॥
তুয়া পথ কত বেড়ি।
হেমরতন হার তোরি ॥

ডারল অভরণ ভার।
তাম্বুল দূরে করি ডার॥
হেম নূপুর করি দূর।
না কহি বরণ পুর॥
যে হেন নাগররাজে।
অতি মান কন সাজে॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি।
তোঁহার ধেয়ান বনমালী॥ ৪২॥

রাগ—কামদ।

কি আর বিলম্ব কাজ।
তুরিতে গমন, করহ যতন,
ভেটহ নাগররাজ॥
কিসের কারণে, মানিনি হয়্যাছ
শুনহ কিশোরী গোরী।
সে শ্যাম নাগর, তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বোড়ী॥
দেখিল যেমন, শুনহ কারণ
নিদান দেখিল শ্যামে।
তোমার বেণীর পদ্ম পড়েছিল
তাহাই ধরিয়া বামে॥
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি
তাহাত লইএ কান্দে।
এমনি দেখিল, দেখাই বচন
বড়ই নিদান ছান্দে॥
তোমার ধেয়ানে যেন যোগীজনে
যেনমত দেখিয়াছি।
তাহার কারণে, আমি সে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি॥
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলী
জপই তোমার নাম।
মান তেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম॥
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর।
শ্যাম সম্ভাষণে কানুর মালাটী
যতন করিয়া পর॥৪৩॥

রাগ—কানাড়া।

এই দেখ ধনি, চান্দ মুখ তুলি
কানুর সন্দেশ লহ।
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ॥
এই লহ রাধা, শ্যামের কুসুম
অতুল তামূল হার।
গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার॥
যে হরি তিলেক, দেখিতে না পায়্যা
হৃদয় ফাটিয়া মর।
সে জন কুঞ্জেতে, একাকী বসিয়া
এখন এমত কর॥
তুমি সুনাগরী, প্রেমের আগরী
সে রস ছাড়িয়ে কেনে।
এত অভিমান, কিসের কারণ
তিলেক না কর মনে॥
মুখ তুলি চাহ, নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা।
সে হেন নাগরে, পরিহর কেনে
সে রসে করহ বাধা॥
অতি নিদারুণ, দেখিনি করুণ
না দেখি না শুনি কভু।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু॥

পুরুষ ভূষণ, কমল নয়ন
তুরিতে ভেটহ কানে।
রাধারে বিনয় বচন কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৪৪ ॥

রাগ—কানড়া।

রাই তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া।
যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া ॥
কোথা না পড়িল চূড়া মালতী মালা।
কোথা না পড়িল সেই বরিহার জালা ॥
কোথা না পড়িল প্রিয় ধড়ার অঞ্চল।
কোথা না পড়িল নব মুঞ্জরীর দল ॥
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
রাধা রাধা বলি কান্দে করি উচ্চ স্বর ॥
মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা।
সে কোথা বাড়িল তার নাহিক সম্বোধা ॥
অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর।
রাধা বিনু বিকল হইলা বংশীধর ॥
তোমার কারণে ধনি তেজি সুখোল্লাস।
খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ হুতাশ ॥
মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমময়ী।
চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাগ।

দূতীর বচনে সুধামুখী ধনি
বয়ানে নাহিক বাণী।
হেঁট মাথে রহে, ও চাঁদবয়ান
তাহাতে অধিক মানী ॥
একে ছিল মান, তাহাতে বাঢ়ল
শতগুণ করি উঠে।
বিরহ আগুন নহে নিবারণ
সে যেন সঘনে ছুটে ॥

বিরহ আগুন নহে নিবারণ
নাহিক বচন ভাষা।
মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
সঘনে নিশ্বাস নাসা ॥
বিরস বদন আন ছলা করি
উত্তর না দেই কিছু।
মাধবী তলাতে বসি ধনি রাধে
নখেতে ধরণী নিছু ॥
বঙ্কিম কটাক্ষে, চাহে দূতী পানে
খেণেকে মুদিত আঁখি।
তা দেখি ব্যথিত মানে গুণি আর
চণ্ডীদাস তাহে সাখী ॥ ৪৬ ॥

রাগ—মালব।

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে
কেন বা আইলে ইথে।
কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে ॥
কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখী
তোমারে আইল নিতে।
নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে ॥
কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর।
সে হেন পীরিতি, তেজিয়া আরতি
তাহারে গুমান কর ॥
সে নব নাগর, তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাধা।
তুয়া গুণগান জপিতে জপিতে
সে শ্যাম হইল আধা ॥
তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি
গুণের নাহিক সীমা।

চতুর নাগরী, গুণের আগরী
মান পথে দেহ ক্ষেমা ॥
জগজনে কয় রাধা ধীরময়
সকল গোচর আছে।
সে বুঝে যে বুঝে কহি তার মাঝে
কহি এ তোঁহার কাছে ॥
তুমি প্রেয় সখা তুমি কুলরামা
তুমি সে রসের নদী।
যার সব গুণ, নিগুঢ় মরম
পঞ্চ তত্ত্ব যার সিদ্ধি ॥
আট গুণ গুণ, তার পহু গুণ
এ নব যাহাব গতি।
চণ্ডীদাস কহে রস তত্ত্ব লাগি
কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি ॥ ৪৭ ॥

রাগ—গরা।

শুনহ সুন্দরী রাধা।
যে জন পরসে লাখ সুধানিধি
সেজনে কেনবা বাধা ॥
তোমারো লাগিয়া যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ।
তেমত যে শ্যাম তোমাতে ধেয়ান
তারে কেন কর রদ ॥
রস রস পর, আর রস পর
পাঁচ রস আট মিট।
বেদ গুণ গুণ, গুণ রস পর
সায়র আসিয়া বিঠ ॥
যে জন রসের সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেনে।
তুমি চাঁদ হয়া চকোর পাখীর
রসটী না দেহ পানে ॥
তুমি সে প্রেমের গাগরী থাকিতে
আন জন মরে শোষে।

এ কোন চরিত আচার বিচার
সেই সে আছয়ে আশে ॥
চল চল রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী
নিকুঞ্জ মন্দিরে চল।
চণ্ডীদাস বলে তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে চল ॥ ৪৮ ॥

রাগ শ্রী।

তুমি বড় নিদয় নিদান।
উহারি কেবল ধেয়ান ॥
সেজন ছাড়িয়া এখনে।
একলা বসিযা কুঞ্জবনে ॥
শুনহ সুন্দরি ধনি রাই।
খেণে খেণে বিরহে লোটাই ॥
এত কিবা সহই পরাণ।
ঝাট করি দেখ গিয়া কান ॥
তাহারে করহ ধনি রোষ।
সকল সে জন দোষ ॥
তুমি সে নাগরী রামা।
চিতে দেহ ধনি ক্ষেমা ॥
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ।
তেজহি আনহি কাজ ॥
চণ্ডীদাসে ভাল জান।
কহে দূতী কত অনুমান ॥ ৪৯ ॥

রাগ—সুহা।

কালার জ্বালাটি, বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়া।
তাহে কেন রাধা, সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চায়া ॥
পরশ রতনে তেজহ যতনে
রস কথা কিছু কয়।

দের দেখা দিয়া লহ না আসিয়া
এতন তাম্বূল লয় ॥
মুখ রস মধু কত শত বিধু
উলটা কহত বোল।
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কয়ে গিয়া কোল ॥
মুখ তুলি বল মানে আছে চল
এ কোন বিচারি পণা।
একে নাম ধরি, তরুর ছায়াতে
আছে হরি মন মনা ॥
আমি আহ্বানিতে কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
কহত বচন লখি ॥
এত পরমাদ মান পরিহরি
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।
চণ্ডীদাস দেখি বেথিত হইয়া
বিরস পাওল হিয়া ॥ ৫০ ॥

রাগ শ্রী।

কহে ধনি রাধা কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেনবা আইলে, কিসের কারণে
কে তোমা পাঠায়া দিল ॥
তবে কহে দূতী শুনহ আরতি
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভাঙ্গিতে দারুণ মান ॥
সে হেন নাগরে, পরিহর ধনি
আছহ মাধবীতলে।
শ্যামের বিধতা শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ ঝুরে ॥

কহে ধনি রাধা শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত।
তা সনে কিসের, মান অভিমান
জানিল তাহার রীত ॥
পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ।
পরের পীরিতি, আন্ধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস ॥
রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
সুদৃঢ় চতুর জনা।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক
সে সব গেলই জানা ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে সুন্দরী
তুরিতে গমন কর।
শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
যতন করিয়া পর ॥ ৫১ ॥

রাগ—কামদ।

দুতি না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটী, আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা ॥
আমি না যাইব, সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি।
শ্রবণে শুনিতে শ্যাম পরসঙ্গ
অন্তরে উঠএ আগি ॥
কিসের কারণে, তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও।
তাহার মরম জাগিল এখন
রহিল মাধবী ছাও ॥
তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া।
তভু না পাইল সে নব নাগর
কেমন রসের পিয়া ॥

কুল শীল ছিল, সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা।
সুখের লাগিয়া, পীরিতি করল
তাহার এমতি ধারা॥
সুখের আরতি, করিল পীরিতি
সুখ গেল অতি দূরে।
সুখের সাগরে, করহ পয়ান
মনোরথ পরিপূরে॥
পাড়ার পরসী, কবে লোক হাসি
শুনিএ এসব কথা।
অন্তর বেদন বুঝে কোন জন
কে জন বুঝিব হেথা॥
কানুর পীরিতি, দিল সমাধান
না কহ আমার কাছে।
কেবল বিষের, রাশির সমান
হেন কেবা আর আছে॥
তুমি যাহ সখি, কানুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব।
চণ্ডীদাস বলে বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব॥ ৫২॥

রাগ—কানড়া।

বেরি বেরি দূতি, বচন সরস
কত সে আর শুনব।
যথা না শুনব, শ্যাম নাম সুধা
সেখানে চলিয়া যাব॥
তবে ত দারুণ, ব্যথা উপজল
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দুতি, বচন সরস
একথা না শুনি তব॥
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী
কথা সে মনে না বাসি।

শুনগো সজনি যে জন গরল
খায় সে বিষের লাগি॥
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়া
খাইল করম ভাগি॥
যে খায়ে গরল, বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে ভুখিল, কাল কালবিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায়॥
কারে কি বলিব, বলিতে না পারি
গুপথে গুমরি গেহা।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা॥
ভাবিতে শুনিতে মরিএ ঝুরিয়ে
শুনগো স্বজনি সখি।
হেন মনে লয়, পরাণ সংশয়
নিদানে মরণ দেখি॥
যেন যে জলের বিনুক উপজে
তেমতি কানুর প্রীত।
এবে সে জানল সে জন লালস
চণ্ডীদাস কহে হিত॥ ৫৩॥

রাগ—কানড়া।

কালা হৈল ঘর, আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান, আন নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা॥
পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি॥
গগনে চাহিতে, সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।

জ্বদয় মুদিলে, সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু ॥
শুন হে স্বজনি, কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।
সেজন বিমুখ, বিরাগ বচনে
পরাণ হইল সারা ॥
তা সনে কিসের, আরতি পীরিতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে, সব তেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গেহা ॥
কুজন সুজন, তার কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল না হয়, সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার, সেজন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে ॥ ৫৪ ॥

রাগ—মালব।

দূতী কহে শুন আমার বচন
করিয়ে আদরপণা।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর
অতি সে সুজন জনা ॥
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া
সে হরি কাতর হয়।
দিয়া দরশন, কর পরশন
আমার মনেতে লয় ॥
এখনে ছাড়িয়া যাহত চলিয়া
দুগুণ উঠয়ে দুখ।
তাহার সনেতে, কিবা পরিচয়
এ লেহা রসের সুখ ॥

জানিল তাহার, যত বড় তেঁহো
কালিয়া বিষের রাশি।
কুলের ধরম, সরম ভরম
সকল হইল হাসি ॥
সে দেশে যাইব, যথা না শুনিব
কালিয়া বরণ নাম।
সেই দেশে যাব, শুনহ সজনি
রহবি সেই সে ঠাম ॥
অনেক যতন, করিল সঘন
রাধার না ঘুচে মান।
কাষ্ঠের পুতুলি রহে দাণ্ডাইয়া
মনেতে ভাবয়ে আন ॥
মান না ভাঙ্গিতে পারল স্বজনি
চলিল শ্যামের পাশে।
দূতী গেল যথা, নাগর শেখর
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণের নিকট দূতীর পুনরাগমন।

রাগ—সোয়ারি।

তলাতে রহে এক ভিতে
সে হেন সুন্দরী রাই।
মানে মনরিত, এ তার চরিত
অনেক বুঝাল তাই ॥
তোমার কুসুম, হার মনোহর
দূরেতে ডারিয়া দিল।
এ তিন তাম্বূল কিছু না ছোয়ল
ক্রোধেতে কুপিত ভেল ॥
অনেক প্রবন্ধ, প্রকার করিয়া
বুঝাইল রাই পাশ।
হেট মাথে রহে, বচন না কহে
মুখেতে নাহিক ভাষ ॥

যে দেখি দারুণ মান উপজল
এ মান ভাঙ্গিতে গাঢ়া।
আপনে যাইতে, মান ভাঙ্গাইতে
বুঝল এ সব ধারা।
আপনি গমন করহ এখন
তবে সে আসিবে রাধা।
নহে বা এ মান আন কোন জন
তাহারে করিব বাধা॥
দূতীর বচন, শুনি সুনাগর
বড়ই হইলা সুখী।
একথা উচিত, জানিল বেকত
চণ্ডীদাস আছে সাথী॥ ৫৬॥

অথ সখ্য-দূতী।

মাধবী তলাতে দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সঘনে, নিশ্বাস হুতাশ
কাঁহা না বোলই বাত॥
এক নব রামা, আছে রাধা কাছে
তা সনে না কহে বোল।
মাধবী ডালেতে, এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল॥
চাহিয়া দেখিল, মাধবী উপরে
রসময়ী ধনি রাই।
কালার বরণ দেখি সুনাগর
হেরিয়া দেখিল তাই॥
করতালি দিয়া, দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
কি কারণে বসি, ডাকহ সুস্বরে
তেই সে দিলাউ নিছু॥
যাহ শ্যাম পাশ, নিকুঞ্জ-বিলাস
এখানে কিসের বাণী।
এই অনুরাগ রাগের অন্তিক (?)
কহেন কিশোরী ধনি॥
উড়ি যাহ ঝাট, ছাড়িয়া নিকট
এড়ান ছাড়িয়া জা।
চণ্ডীদাসে কহে, পিক চলি গেল
কহিতে বলিতে রা॥ ৫৭॥

রাগ—জয়শ্রী।

ময়ুর ময়ুরী, নাচে ফিরি ফিরি
আসিয়া মাধবী তলে।
দেখিয়া কুপিত, হইল বেকত
তারে ধনি কিছু বলে॥
হেথা কেন তোরা, নাচ হয়া ভোরা
দিতে সে সোচনা সারা।
ঝাট করি যাও, যেখানে রসিক
নাগর-শেখর তারা॥
নিকুঞ্জ ভবনে, যাহ সেই খানে
এখানে নাচহ কেনে।
হেথা কিবা সুখ, সুখের বিচার
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
তুমি না ধরিতে, শ্যামল বরণ
তবে সে হইত ভাল।
কালিয়া বরণ, দেখি মোর মন
অনল উঠিয়া গেল॥
কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
এখানে কিসের কাজ।
কালিয়া বরণ, বরণ মিশাহ
যেখানে রসিক রাজ॥
কোপে সুধামুখী, করতালি দিয়া
ময়ুর উড়ায়ে দিল।
চণ্ডীদাস বলে অপর মানেতে
সে ধনি হইল চল॥ ৫৮॥

রাগ—কাফী।

মাধবী লতায় ফুলের সৌরভে
যতেক ভ্রমরা তারা।
মকরন্দ পানে মুগধ হইয়া
মাতিল সে রসে ভোরা॥
তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গৌরী
কহিতে লাগিল তায়।
তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
কেন বা ধরিলে কায়॥
এখানেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রমি
ভ্রমহ কিসের লাগি।
মোরে দিতে চাহ বিরহবেদনা
উঠাইতে দারুণ আগি॥
তোমার চরিত্র আছে বেয়াপিত
সে শ্যাম অঙ্গের মালে।
মধু খেয়্যা খেয়্যা রসেতে পূরিয়া
আইলে মাধবী ডালে॥
একে মরি জ্বালা, আছি এ একলা
তাহে দেখা দিলে ভালে।
অতি সে বিষাদ বাঢ়য়ে দ্বিগুণ
চণ্ডীদাস কিছু বলে॥৫৯॥

রাগ—তুড়ী।

শুন হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কার
তোমার কালিয়া তনু।
তোমারে দেখিএ বাঢ়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠল দুনু॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও
চমকে আমার হিয়া।
যাহ বৃন্দাবনে, নিকুঞ্জ ভবনে
যথায় রসের পিয়া॥
সেই খানে গিয়া ফুলে মধু খেয়্যা
থাকহ যেখানে কানু।
হেথা কেনে তুমি মধুর লালসে
তোমার কালিয়া তনু॥
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
এ কথা কহিব কায়॥
এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর
তখনি চলিয়া গেল।
কোথাও না দেখি মেলি দুটী আঁখি
তবে সে ধৈরজ ভেল॥
নীল কাল যদি, ফেলিল ছিনিয়া
কিছু না রাখল ভালে।
অঙ্গের কাঁচলি ফেলি দূর করি
নীলের উড়নী দূরে॥
কাল আভরণ, ফেলিয়া তখন
পরল ধবল বাস।
হিয়ার কাঁচলী পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস॥৬০॥

তথা রাগ।

নয়ন কাজল, মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত।
সখী এক সঙ্গে, কহে কিছু রঙ্গে
কহিছে রাধার মত॥
শুন সুধামুখি, আমার বচন
তেজহ দারুণ মান।
যে দেখি তোমার, অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ মান॥
ধৈরজ ধরহ, শুনহ সুন্দরি
এতেক কেনু বা মান।

সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন ॥
যদি আছ তুমি, বিরস বদনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
কেন বা অঙ্গের, ভূষণ সকল
তেজিয়ে তেজিলে ভাই ॥
তুমি সুনাগরী, রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখীর বচনে, কমল নয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥
শুন গো স্বজনি, কালিয়া বরণ
দেখিএ উঠএ তাপ।
চণ্ডীদাস কহে, হেন মনে হয়
মানসে দারুণ পাপ ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাগ।

কহে যদুমণি, শুনহ স্বজনি
রাধা আনিবারে গেলে।
কি শুনি বচন, কহ কহ দেখি
সঘনে সঘনে বলে ॥
সখী কহে তায়, শুন শ্যামরায়
রাধার বড়ই রোষ।
তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ ॥
সখীর বচনে, কমলনয়ন
আপনি সাজত যান।
বেশ সে সুবেশ, অতি মনোহর
ভাঙ্গিতে রাধার মান ॥
বাঁধল কুণ্ডল, লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতী দাম।
তাহার পাশেতে, মুকুতার মালা
শোভে অতি অনুপাম ॥
নানা আভরণ, কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিনী জাল।
নীল বসনের, ওড়নী সুন্দর
করে বীণাযন্ত্র ভাল ॥
এক সখী সঙ্গে, চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা।
চলত নাগর, বেশ মনোহর
সেই সে মাধুরী ধামা ॥
নারী বেশ ধরি, চতুর মুরারি
মাধবীতলাতে যায়।
কিবা অদভুত, দেখিয়া বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥ ৬২ ॥

রাগ—তুরী।

মন্দ মন্দ গতি, চলন চাতুরী
কুঞ্জর গমনে চলি।
যেমন কুঞ্জর, চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥
মদনমোহন, নবঘন শ্যাম
কিবা এ আপন বেশ ॥
কান্ধে লই বীণা, নবঘন শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ ॥
চলিতে চরণে, বাজএ সুতানে
বাজন নূপুর পায়।
ফুলের সৌরভে, অলিকুল যত
যূথে যূথে সব ধায় ॥
দূরে হতে রাই, দেখি নব রামা
বিস্মিত হইলা চিতে।
কোন নব রামা, কাঁধে যন্ত্র করি
আমারে আইল নিতে ॥
এই অনুমান, করে দুইজন
রাধা বলে হের দেখ।

রাধার বচনে, দেখে মুখ তুলি
চন্দ্রবদনী মুখ ॥
হেনই সময়, আসিবে মিলন
সেই সে মাধবীতলে।
নব পরিচয়, চণ্ডীদাস তথা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥ ৬৩ ॥

রাগ—সুই।

দেখি নব রামা, তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে।
কেনে বা এথানে, তোমার গমন
কহ কহ বলে তারে ॥
সখী কহে তাথে, শুনহ সুন্দরী
গেছিল কাননকুঞ্জে।
যথা রসময়, ব্রজরামাগণ
আছয়ে কতেক পুঞ্জে ॥
মোরে বোলাইয়া, গেছিল লইয়া
আমি সে বটিয়ে যতি।
কিছু তাল মান, করিয়াছি গান
যে ছিল আপন শক্তি ॥
গৌরী নট আর, কেদার সুন্দর
পূরবী সিন্ধুড়া আড়া-কো ॥
শ্যামনট আর, মাধবী মঙ্গল
হিল্লোল মঙ্গলা দো ॥
পাহিড়া দীপক, আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ।
গাইতে প্রবন্ধে, প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ ॥
এ রাগ শুনিতে, বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে।
পুনঃ পুনঃ কহ, ইহার উপর
আর কিছু শুনি চিতে ॥
তবে কৈলা গান, যে ছিল সুতান
তাহাই করিলা গান।
রাধাকৃষ্ণ নাম, অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান ॥
এ তান শুনিয়া, নাগর রসিয়া
হরষ হইল বড়ি।
এই সে গানের মধুর শুনিয়া
আমারে না দিল ছাড়ি ॥
রহ রহ ধনি, আর গান শুনি
কহত প্রথম নাম।
শুনিতে মধুর, ও দুটী আখর
রাধানাম অনুপাম ॥
কানুর পীরিতি, যে দেখিল রীতি
এ কথা কহিব কত।
রাধা নামে কত, অমিয়া আওল
রস উপজিল যত।
গাও গাও ধনি, কহে গুণমণি
রাধানাম কর গান।
ঐ রস বই, আন না শুনিব
এ বড় মধুর তান ॥
আলাপে রাগিণী, রাগের উরলি
রাধা বলি যেন বাজ।
তোমার ও গানে, মোর মনে হানে
যেমতি হৃদয়ে বাজ ॥
চণ্ডীদাসে বলে, এই গীতে মোহ
রসে ভেল অতি ভোর।
মুগধ মাধব, বহু বিদগধ
সুখের নাহিক ওর ॥ ৬৪ ॥

রাগ—সুই।

শুন ধনি রাই, তান কিছু গাই
রাগেতে রাগিণী মেলা।

গাইতে গাইতে, মুগধ হইলা
নন্দের নন্দন কালা ॥
পুনঃ কহে শ্যাম, অতি অনুপাম
শুনিতে মধুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বলি, ডাকিছে বীণাটী
মুগধ হইল শুনি ॥
এই রস তান, অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম।
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাইতে রাধার নাম॥
ভাবে গদগদ, অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান।
রাধা নাম বিনে, আন নাহি জানে
শ্রবণে শুনল গান॥
নয়ন কমল, যেন ঢল ঢল
লোরেতে কমল আঁখি।
যেমন ঘনের, বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি ॥
রাধা রাধা রাধা, আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান।
রাধা নাম গানে, কমল নয়নে
কিছুই নাহিক আন ॥
এই সব রস, শুনিয়া অবশ
রসিক নাগর কান।
সে নব নাগর, রসের সাগর
শ্রবণে শুনয়ে গান ॥
যখন বাজায় রাই নাম সুধা
কান্দিয়া আকুল শ্যাম।
হইয়া মুগধ, অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম ॥
দেখ দেখ ধনি, আমার উরতে
এই মুকুতার মালা।
সে নব নাগর, গুণের সাগর
রাধানামে বড় ভোলা ॥
এই সব রসে, তার মন তোষে
বীণাতে করিল গান।
বিকল কিসে বা, না জানি কেন বা
কিসের কারণে ধ্যান ॥
কুঞ্জে একাকিনী, করেতে বাঁশীটী
ধরিয়া নাগর রায়।
তোমারে কিছুই, তান শোনাইতে
আইল মাধবী ছায় ॥
চণ্ডীদাস দেখি, অতি অপরূপ
অপার দোঁহার লীলা।
কে ইহা জানিবে, নিগূঢ় মরম
দোঁহে হুঁহু রসমেলা ॥৬৫॥

রাগ—কেদারা।

শুন শুন রাধা, কহে সেই ধনি
শুনহ রসের গান।
তোমারে এ গান, শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী স্থান ॥
মুখ তুলি চাহ, রসের প্রেয়সী
গাই এ একটী রাগ।
শ্রবণ পরসি এ গান শুনিতে
কতি যাব অনুরাগ ॥
এ কথা শুনিয়া, কহে সুধামুখী,
শুনহ সুন্দরী রামা।
কর কিছু গান, শুনি কিছু তান
নবীন নাগরী শ্যামা ॥
বীণাতে কেদার, রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে।
রাধাকৃষ্ণ নাম, উঠে অনুপাম
শুনিতে শ্রবণ পাশে ॥

এ চারি আথর, বাজন মধুর
বীণাতে কহত রাই।
কেন বা মানিনী, হয়াছ সে শ্যামে
মধুর মধুর গাই॥
সে হেন নাগরে, পরিহরি রাধে
কি সুখে আছএ বসি।
মলিন হইল, সে মুখমণ্ডল
ঝলকে সে মুখশশী॥
মানে মন দুনু, দেখি ক্ষীণ তনু
যেতি আভরণ ভার।
বচন কহিছ, তাথে নাহি রস
এত বা কিসের তার॥
সে হেন নাগরে, বিরস বদনে
আছএ মাধবীতলে।
বীণা গীত তালে, বুঝাযে সঘনে
দীন চণ্ডীদাস বলে॥ ৬৬॥

রাগ তথা।

মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া,
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল,
কিছুই রসের তান॥
সেখানে হইতে আইল হেথায়
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরী,
তেজিয়া বিষম মান॥
চণ্ডীদাস কহে ওতি বড় মোহে
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম,
ভাঙ্গিতে নারিল সেই॥ ৬৭॥

রাগ—কাফি।

গুণী না কহ কানুর কথা।
শুনিতে মরমে, সেইখানে হানে,
উঠত দারুণ ব্যথা॥
মনের আগুণ বাঢ়ল দ্বিগুণ,
নিভাইতে যদি সাধ।
যে জানে বেদনা মরমে পশিনু,
তনুখানি হল আধ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশিটী বেঁধল,
বুকে বাজী মিঠে নার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়,
এ দুখে জীব কি আর॥
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ,
আর সে বিরহ আসি।
এ দুই যাহার অন্তরে পেশল,
কি ছার দিবার লাগি॥
কাননে অনল কেহনা নিভায়,
আপনি নিভায় সেই।
হৃদয় অনল কেবা নিভাইব,
বিষম আগুণ এই॥
কাহারে কহিব এ সব বিচার,
মরম জানএ কে।
চণ্ডীদাস কহে যে জানে মরম,
সে জন বেথিত দে॥ ৬৯॥

রাগ শ্রী।

শুন নব রামা ওই পরসঙ্গ,
না কহ আমার কাছে।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ,
ও বোলি কি বোল আছে॥
যে জন কুজন সে নহে সরল,
গাও গাও কিছু শুনি।
এ কথা শুনিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া,
বীণা কাঁধে নিল গুণী॥

গাইতে লাগিল হিল্লোল নায়ক,
রাগিণী ভুপ্লায় তায়।
মধুর মধুর তান মান রাগ,
সে স্বর মধুর প্রায়॥
প্রথম রাগেতে রাগিণী ডুবায়ে,
গাওল প্রিয়ার নাম।
দুটীয় আখরে রাধা নাম ওটে,
শুনিতে মধুর তান॥
এই দুটী নাম বাজে অনুপাম,
মুগধ হইলা রাধা।
* * * সুধা॥
শুন শ্যামা সখি * *
বচন শুনহ * *
* * *
কে জানে এমন তোমার ধরণ,
কপট আগুণ ইথে।
বহুবিধ মান কপট অন্তরে,
ভাঙ্গল কপট চিতে॥
আর কিবা আছে মান অভিমান,
চলহ নিকুঞ্জ বনে।
করহ বেশের পরিপাটী যত,
চলহ সখীর সনে॥

শ্যাম সুনাগর চতুর শেখর,
চলিল নিকুঞ্জ ধামে।
হেথা সুধামুখি বেশ পরিপাটি,
কত সে মনের সনে॥
চলল কিশোরী, শ্যাম দরশনে,
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন,
চাতুরী বদনশশী॥
যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে,
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীল লোচনী আধেক ওড়ণী,
বচন কহত আধা॥
শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ গদ ভেল,
বচন চপল আধা।
চলিতে মধুর বাজএ পঞ্চম
মধুর মধুর নাদা॥
সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী,
অগুরু সৌরভ প্রায়।
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল,
এ সব সঘনে ধায়॥*

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

---

* ইহার পর আর একটী পদ আছে, তাহার অধিকাংশ চরণই খণ্ডিত বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। মূল পুথিতে যেরূপ দৃষ্ট হইল তাহাই প্রকাশ করা গেল। কোনরূপ সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। চণ্ডীদাসের রাসলীলা ব্যতীত আরও অনেক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সুবিধামত প্রকাশ করা যাইবে।—সাঃ পঃ সঃ।

উপসর্গের অর্থ বিচার।

কিয়ৎমাস পূর্ব্বে আমি "উপসর্গের অর্থ-বিচার" নামক একটী প্রবন্ধ এইখানে পাঠ করি। প্রবন্ধটী দীর্ঘ হওয়াতে সে দিবস আমি তাহার সমস্ত অংশের পাঠ সমাপন করিতে না পারিয়া 'অবশিষ্ট অংশ বারান্তরে আপনাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, অতি সত্বরে আমি আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব; কিন্তু কিয়ৎপরেই আমার হস্তে বিশেষ একটী প্রয়োজনীয় কার্য্যের ভার আসিয়া পড়াতে আমি তাহাতেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম—আর কোন কার্য্যে যে হস্তার্পণ করিব তাহার তিলমাত্রও অবকাশ রহিল না। দুই মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে সেই অভীষ্ট কার্য্যটী নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়া যাওয়াতে আমি আজ দ্বিগুণ আহ্লাদের সহিত সেদিনকার সেই পঠিত প্রবন্ধের শেষাংশ লইয়া আপনাদের সমক্ষে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইতেছি।

প্র নি সং বি অপ পরি এই ছয়টী উপসর্গের অর্থ আমি যেরূপ অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছি গতবারে তাহা সাধ্যানুসারে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি। বিগত সংখ্যার পূর্ব্ব-সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা তাহা দেখিতে পারেন। শুদ্ধিপত্রে ছাপার ভুল সবই সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে কেবল এক স্থানের একটী ভুল অসংশোধিত রহিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম

"শিষ্য = যাহাকে শেষ করিয়া তুলিতে হইবে; অর্থাৎ বিদ্যার সঞ্চার দ্বারা যাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

কিন্তু ছাপায় দেখিলাম যে, শিষ্যের পরিবর্ত্তে শিষ্টের ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে। ঐ স্থানটীতে দুইটি কথা আমার বক্তব্য ছিল; একটি কথা এই যে,

শিষ্য = যাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর একটি কথা এই যে,

শিষ্ট = যাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ছাপার ব্যতিক্রম-গতিকে দুই কথার প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে ঐ স্থানটিতে পাঠকের একটু ধাঁদা লাগিতে পারে—তা ভিন্ন কথিত ছয়টি উপসর্গ সম্বন্ধে আমি আর আর যাহা বলিয়াছিলাম সমস্তই পত্রিকাতে যথাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট উপসর্গগুলির কাহার ভিতর কিরূপ অর্থ লুক্কায়িত আছে তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। অনেক সময়ে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এখানে সেরূপ কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই; এখানে বরং ভগ্নাবশিষ্ট রাজধানীতে পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে সোনা-রূপার তৈজসপাত্র বাহির হইবারই সম্ভাবনা।

কতকগুলি উপসর্গকে বিচারের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে;—সু = ভাল, দুঃ = নিন্দনীয় এবং পক্ষান্তরে কষ্টজনক, অনু = পশ্চাৎ পশ্চাৎ, উৎ = উপর দিকে, অতি = বাড়াবাড়ি, এই গুলিকে (আদালতি ভাষায়) বেকসুর খালাস দেওয়া যাইতে পারে; কেননা

ইহাদের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই—সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এই সঙ্গে 'অপি' উপসর্গকে আর এক কারণে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইতে পারে; সে কারণ এই যে, অপি উপসর্গের প্রয়োগ কেবল একটি মাত্র স্থানে দৃষ্ট হয়; পিধান-শব্দে; তদ্ভিন্ন আর কোনো স্থানেই তাহার দর্শন মিলে না। পিধান-শব্দে অপি'র অ খসিয়া গিয়া তাহার পি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। খোট্টাই ভাষায় বস্ত্র-পরিধান = কাপড়া পিন্না। পিন্না শব্দ ঠিক পিধান শব্দের না হউক্ তাহারই সহোদর পিন্ধন শব্দের অপভ্রংশ। অপি = Epi তাহাতে আর ভুল নাই, কেননা দুইই বহিরাবরণ-জ্ঞাপক; তার সাক্ষী

Epidermis = শরীরের বহিশ্চর্ম্ম; পিধান = অপিধান = গাত্রাবরণ।

গতবারে ছয়টি উপসর্গের একপ্রকার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া চুকিয়াছে; এক্ষণে, আর ছয়টি উপসর্গ অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট রহিল পরা অব নিঃ অধি প্রতি অভি উপ আ এই আটটি উপসর্গ।

প্রথমে, ঐ আটটি উপসর্গের মধ্যে যে তিনটি অক্ শব্দের শিরোভাগে বাসতে আসন পায়, সেই তিনটির প্রতি মনোনিবেশ করা যা'ক। সে তিনটি হ'চ্চে—অব প্রতি এবং পরা; তার সাক্ষী

অব + অক্ = অবাক্
প্রতি + অক্ = প্রত্যক্
পরা + অক্ = পরাক্।

অক্ আসিয়াছে অঞ্চ ধাতু হইতে। অঞ্চ ধাতুর আর আর অর্থের মধ্যে একটি প্রধান অর্থ—গতি। অব + অক্ = নিম্ন দিকে যাহার গতি অথবা নিম্নদিকে যাহার ঝোঁক।

অবাঙ্মুখ = অবাক্ + মুখ = হেঁট মুখ।

"অবাক্ হইলাম" এ অবাক্ স্বতন্ত্র, আর, অবাঙ্মুখ-শব্দের অবাক্ স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত অবাক্ = অ + বাক্ = বাক্যরহিত;
শেষোক্ত অবাক্ = অব + অক্ = নিম্নে অবনত।
অব = Sub।

অব উপসর্গের লক্ষ্য নিচের দিকে। প্রথমতঃ নিচু দুই প্রকার—(১) দেশে নিচু এবং (২) ভাবে নিচু। দ্বিতীয়তঃ ভাবে নিচু তিন প্রকার—(১) লৌকিক ভাবে-নিচু, (২) দার্শনিক ভাবে-নিচু, এবং (৩) জ্যামিতক ভাবে-নিচু। সবশুদ্ধ ধরিয়া চারিপ্রকার নিচু পাওয়া যাইতেছে—(১) দেশে নিচু, (২) লৌকিক ভাবে-নিচু, (৩) দার্শনিক ভাবে-নিচু, (৪) জ্যামিতিক ভাবে-নিচু। অব উপসর্গের এই চারিপ্রকার নিচু অর্থেরই উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে; তাহার গোটা কত নমুনা দেখাইতেছি প্রণিধান করা হোক্ঃ—

দেশে নিচু ... ... { অবরোহন, অবতরণ, অবলুণ্ঠন }

লৌকিক ভাবে-নিচু…	অবজ্ঞা অবহেলা অবমাননা
দার্শনিক ভাবে-নিচু…	অবান্তর অবধারণ অবগতি
জ্যামিতিক ভাবে-নিচু	অবশেষ অবচ্ছেদ অবকাশ

অবতরণ, অবরোহন, অবলুণ্ঠন, এই তিন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের দেশে-নিচু অর্থ, আর, অবজ্ঞা অবহেলা এবং অবমাননা এই তিন শব্দেব আদিস্থিত অব-উপসর্গেব লৌকিক ভাবে-নিচু অর্থ ঐ ঐ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রণিধান করা হো'ক্‌ ঃ—

অবরোহন = নিচে নাবা।

অবতরন = নিচে উত্তীর্ণ হওয়া।

অবলুণ্ঠন = নিচে গড়াগড়ি দেওয়া।

অবজ্ঞা = হেয় জ্ঞান করা = নিচু করিয়া দেখা।

অবহেলা = নিচে হেলন করা = নিচে ঠেলিয়া ফেলিবার মতন ভাব-ভঙ্গী প্রকাশ করা।

অবমাননা = নিচু করিয়া মানা = তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

অবধান শব্দের মৌলিক অর্থ—নিচের দিকে প্রণিধান; কিন্তু কালক্রমে "নিচের দিকে" এই সূক্ষ্ম অংশটি ব্যাঙাচির ল্যাজের ন্যায় খসিয়া গিয়া উহার স্থূলাংশটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে—শুধু প্রণিধান এই অর্থটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবলোকন-শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গেরও ঐরূপ দশা। উভয়স্থলেই অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা অর্থ সাপের পা'য়ের মতো লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার আমার চক্ষে সাপের পা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা—চর্ম্ম-চক্ষে এক আনা এবং জ্ঞান-চক্ষে পোনেরো আনা সবশুদ্ধ ধরিয়া ষোলোআনা—সাপের পা তাহার পাঁজরের ভিতরে লুক্কায়িত দেখেন। অবধান এবং অবলোকন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা-অর্থ সাপের পায়ের মতো লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিলেও ঐ দুই শব্দের গোটা দুই মুখ্য প্রয়োগ-স্থলে উহা চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তির নিকটে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রণিধান করা হউক ঃ—

সাবধান = স + অবধান।

এ শব্দটি প্রধানতঃ পথের কাঁটা খোঁচা এবং জঞ্জাল উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়। "দেখো যেন কাদায় পা পড়ে না—দেখো যেন পা'য়ে কাঁকর বেঁধে না—দেখো যেন ভিজে মাটিতে পা

পিছুলোয় না—সাবধান!" এ সকল স্থলে সাবধান শব্দের অর্থ পষ্টই নিচের দিকে মনোযোগী হওয়া। তা ছাড়া, চাসা রাইয়ত "অবধান" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া জমিদারের দৃষ্টি নিচের দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকে, আকর্ষণ করে। কৃপাবলোকন=কৃপাপাত্রের প্রতি অবলোকন =নিচু ব্যক্তির প্রতি উচ্চ ব্যক্তির অবলোকন। নিম্নগামী স্নেহ-দৃষ্টি উপলক্ষেই আমরা বেশীর ভাগ মুখাবলোকন শব্দ ব্যবহার করি; যেমন পুত্রের মুখাবলোকন, বধূর মুখাবলোকন ইত্যাদি। তবে কিনা স্নেহ-দৃষ্টি বা রসপূর্ণ দৃষ্টি মাত্রই নিম্নগামী—বাস্তবিক নিম্নগামী যদি নাও হয় তথাপি ভাবে নিম্নগামী তাহাতে আর ভুল নাই। এইজন্য উচ্চ স্থানীয় বস্তুর প্রতি যখন আমরা সস্নেহ অথবা রসপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করি, তখন সেই রসাত্মক ঊর্দ্ধগামী দৃষ্টিকেও এক হিসাবে অবলোকন বলা যাইতে পারে।

এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, অব-উপসর্গের দেশে-নিচু এবং লৌকিক ভাবে-নিচু এই দুই প্রকার অর্থ তাহার মধ্য হইতে খুব সহজে বাহির হয়; কিন্তু তাহার দার্শনিক এবং জ্যামিতিক ভাবে-নিচু অর্থ উন্মোচন করা অতটা সুখসাধ্য নহে—উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া তাহা টানিয়া বাহির করিতে হয়।

ইংরাজি ন্যায় দর্শনের ভাষায় "To class under" কাহাকে বলে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। যাহা classed under তাহাকেই আমরা বলি—নিম্নশ্রেণী। অবান্তর শ্রেণীর অর্থ তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে অব-উপর্গের অর্থ—বিশেষ একপ্রকার সম্বন্ধে নিচু; কি সম্বন্ধে? না ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধে। ব্রাহ্মণজাতি একটী ব্যাপক শ্রেণী; আর, রাঢ়ীশ্রেণী, বারেন্দ্র-শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী এগুলি হ'চ্চে তার অবান্তর শ্রেণী অর্থাৎ নিম্নস্থ শ্রেণী। রাঢ়ী; বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী ব্যাপক ব্রাহ্মণ-জাতির নিম্নস্থ শ্রেণী বলিয়া অবান্তর শ্রেণী, আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি শ্রেণী ব্রাহ্মণজাতির পার্শ্বস্থ শ্রেণী বলিয়া জাত্যন্তর শ্রেণী। এস্থলে

জাত্যন্তর=পার্শ্বস্থ শ্রেণী;

অবান্তর=নিম্নস্থ শ্রেণী;

এই দুয়ের প্রভেদ সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

অবধারণ কাহাকে বলে?

অবধারণ করা=জিজ্ঞাস্য বিষয় কোন্ নৈয়ায়িক শ্রেণীর নিম্নে অবস্থিতি করে, তাহা স্থির করা। তার সাক্ষী—সম্মুখস্থিত জীবকে গোরু বলিয়া অবধারণ করা আর তাহাকে গোরু-শ্রেণীর বা গোজাতির নিম্নে নিক্ষেপ করা একই কথা। অবগত হওয়া কাহাকে বলে? সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্থলে গত শব্দের অর্থ প্রাপ্ত; যেমন

নিদ্রাগত=নিদ্রাপ্রাপ্ত;

শরণংগত=শরণ-প্রাপ্ত;

অবগত হওয়া=অব+গত হওয়া=নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া।

কাহার নিম্নে কাহাকে প্রাপ্ত হওয়া? জিজ্ঞাস্য বিষয়কে কোনো একটী নৈয়ায়িক শ্রেণীর

নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া; তার সাক্ষী—"চীন জাতিকে নির্বীর্য্য বলিয়া অবগত হইলাম" এই কথাটি নৈয়ায়িক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে বলা উচিত যে, "চীনজাতিকে নির্বীর্য্য-শ্রেণীর নিম্নে প্রাপ্ত হইলাম।" ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ একপ্রকার দার্শনিক আধার-আধেয় সম্বন্ধ বা আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ। এই কারণ গতিকে পাশ্চাত্য ন্যায়-দর্শনের অবয়ব-ব্যূহে হেতু-স্থানীয় এবং উদাহরণ-স্থানীয় ব্যাপক-তত্ত্বের নাম দেওয়া হইয়াছে Premise। এ দেশীয় ন্যায়-দর্শনের অবয়ব-ব্যূহের অভ্যন্তরে যদিচ Premiseএর তুল্যার্থবোধক কোনো-একটা পৃথক্ অবয়বের উল্লেখ নাই, কিন্তু দেশীয় ন্যায়-দর্শনের মূল গ্রন্থে যে-স্থানটিতে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই স্থানটিতে Hypothesisএর নাম দেওয়া হইয়াছে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত, আর, Premiseএর নাম দেওয়া হইয়াছে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। Premise এবং Hypothesisএর এই দুই খাঁটি স্বদেশীয় তাত্ত্বিক সংজ্ঞা (Technical term) আধুনিক বঙ্গীয় লেখকদিগের হয় তো বা কোন না কোন সময়ে কাজে লাগিয়া যাইতে পারে; অতএব প্রণিধান করা হোক,—

গৌতম-সূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন "অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ" যে বিষয় এখনো অবধারিত হয় নাই তাহা গ্রহণ করা;—কি অভিপ্রায়ে? না "বিশেষ পরীক্ষণায়" বিশেষের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে অর্থাৎ Verificationএর অভিপ্রায়েঃ—

"অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ তদ্‌বিশেষ পরীক্ষণায় অভ্যুপগম সিদ্ধান্তঃ" বিশেষের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে (Verificationএর অভিপ্রায়ে) অনবধারিত বিষয় গ্রহণ করা'র নাম অভ্যুপগত সিদ্ধান্ত। আপেল্-পাত দেখিয়া নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তখন সেটা তাঁহার অনবধারিত বিষয় ছিল—অনবধারিত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন; কি অভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলেন? না তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণের পরীক্ষ অভিপ্রায়ে; অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তটীকে বিশেব বিশেষ দৃষ্ট ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে। তবেই হইতেছে যে, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত= Hypothesis। কিন্তু অভ্যুপগম শব্দটা বেজায় খট্‌মোটে—তাহা বাঙ্গালায় চাল্যানো দুষ্কর; যদিচ তাহার অর্থ খুব সোজা। অভ্যুপগত কি? না যাহা সম্মুখে উপগত বা উপস্থিত। আপেল্-পাত দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্ত নিউটনের মনোনেত্রে উপস্থিত হইল—অভ্যুপগত হইল, তাই তাহার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত; সে সিদ্ধান্তটি তখন মনোনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল মাত্র—তাহা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা ভবিষ্যতের কার্য্য;—তখনকার কার্য্য তাহা নহে—তখনকার কার্য্য সেই অভ্যাগত অতিথিকে hypothesis বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে পরীক্ষিতব্যের কোটায় স্থান দান করা। এখানে অভ্যাগত এবং অভ্যুপগত এই দুই শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য সবিশেষ দ্রষ্টব্য। অতএব, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত যে, hypothesis ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে কি? না যাহা বলিলাম—শব্দটা বেজায় খট্‌মোটে! কিন্তু আর একদিকে তেমনি

এটাও দেখা উচিত যে, খটমোটে ভাষা দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গের ভূষণ। যদি খটমোটে ভাষাকে দর্শন-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় যে, তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন হইয়া উঠে। অত কথায় প্রয়োজন নাই—মহর্ষি গৌতম যখন hypothesisকে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন তখন তাহা উল্টানো তোমার-আমার সাধ্য নহে। এই গেল অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। অধিকরণ-সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গৌতম স্বয়ং বলিতেছেন "যৎসিদ্ধৌ অন্য প্রকরণ সিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ।" যাহা সিদ্ধ হইলে অন্য প্রকরণ সিদ্ধ হয় তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বলিতেছেন "যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ অন্যে অর্থা অনুষজ্যন্তে" যে বিষয় সিদ্ধ হইলে অন্যান্য বিষয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয়, "ন তৈর্বিনা সোঽর্থঃ সিদ্ধ্যতি" সেই সকল অন্যাশ্রিত বিষয় ব্যতিরেকে যাহা আপনাআপনি সিদ্ধ হয় না, আর, "তেঽর্থা যদধিষ্ঠানা" সেই সকল অন্যাশ্রিত বিষয় যাহাতে ভর করিয়া অবস্থিতি করে "সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ" তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ইহার নব্য টীকা এইরূপ ঃ—"মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এই বিষয়টি সিদ্ধ হইলে "দেবদত্ত জ্ঞানবান্ জীব" এ বিষয়টি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয়; আবার দেব-দত্ত, ধনঞ্জয় এবং আর আর ব্যক্তি (individual) যদি জ্ঞানবান্ জীব না হয়, তবে "মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এ কথাটা কাঁচিয়া যায়; কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব এ কথাটা যদি পাকাপোক্ত রকমে সিদ্ধ হয়, তবে "দেবদত্ত জ্ঞানবান্ জীব" এ কথাটা তাহারই লেজুড় ধরিয়া পার পাইয়া যায়। এরূপ স্থলে "মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এই সিদ্ধান্তটি অধিকরণ শব্দের বাচ্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে যাহার নাম Premise, দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে তাহারই নাম অধিকরণ। Premise এবং অধিকরণ উভয়েরই অর্থ আশ্রয়-স্থান। ফলে, ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধকে একপ্রকার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধরূপে কল্পনা করিবার প্রথা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রেই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ যদিচ ঠিক্ গণিত শাস্ত্রানুযায়ী উচ্চ নীচ সম্বন্ধ নহে, তথাপি তাহা ভাবে একপ্রকার উচ্চ নীচ সম্বন্ধ; তার সাক্ষী—

আশ্রিত কর্ম্মচারি = under officer = নিচের কর্ম্মচারী।

দার্শনিক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য-শ্রেণী ব্যাপক-শ্রেণীর আশ্রিত, জ্যামিতিক হিসাবে তেমনি অংশ অংশীর আশ্রিত। এইজন্য, এক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য-শ্রেণীকে অবান্তর-শ্রেণী (কিনা নিম্নস্থ শ্রেণী) বলা হইয়া থাকে, তেমনি ঠিক্ সেই হিসাবে না হউক্ তাহারই অনুরূপ আর এক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অংশকে অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নিচের শেষাংশ বলা হইয়া থাকে। অবশেষ, অবচ্ছেদ, এবং অবকাশ, এই তিন শব্দে অব-উপসর্গের জ্যামিতিক ভাবে-নিচু-অর্থ অতীব স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে; তার সাক্ষী—

অবশেষ = নিচের শেষভাগ = প্রথম অংশ বা প্রধান অংশ অপনীত হইলে দ্বিতীয় অংশ বা

লেজুড় অংশ যাহা পড়িয়া থাকে।

অবচ্ছেদ = নিম্নস্থ বিষয়ের ছেদ = মূল বস্তু হইতে খণ্ডাংশের ছেদ।

অবকাশ = আশ্রিত শূন্য এই অর্থে নিচের শূন্য = অংশ-স্থানীয় শূন্য। যেমন, মৌচাকে মধ্য হইতে মৌমাছিরা উড়িয়া পালাইলে পরিত্যক্ত শূন্য ঘর-গুলি মৌচাকে মধ্যস্থিত অবকাশ;—ইংরাজিতে যাহাকে বলে vacuum। vacationকে ঐভাবে গতিকে অবকাশ বলা যাইতে পারে—বলা হইয়াও থাকে।

আমরা যখন কথায় বলি "আমার অবকাশ নাই" তখন সেটা অবকাশ-শব্দের একটি আলঙ্কারিক প্রয়োগ মাত্র। যদিচ, বস্তুরই ফাঁক সম্ভবে, কার্য্যের ফাঁক সম্ভবে না তথাপি আমরা কার্য্য-প্রবাহের মধ্যস্থিত শূন্য কালাংশকে ফাঁকরূপে কল্পনা করিয়া - সেই কালাশ্রিত ফাঁককে অবকাশ-নামে সংজ্ঞিত করিয়া থাকি। এই সকল স্থলে অব-উপসর্গে অর্থ জ্যামিতিক ভাবে-নিচু অর্থাৎ 'আশ্রিত-খণ্ডাংশ' এই ভাবে নিচু। অবকাশ এবং অবসর এ দুই শব্দের অর্থ প্রায় একই রূপ। সর কিনা নড়িবার চড়িবার পরিসর তাহারই নাম ফাঁকা স্থান। সর = ফাঁকা স্থান, আর, কাশ = শূন্য আকাশ, দুয়ের মধ্যে কেবল নামেরই প্রভেদ। এতক্ষণ ধরিয়া অব-উপসর্গ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম সমস্ত কুড়াইয়া আমরা এইরূপ পাইতেছি ঃ—

(১) অবতরণ, অবরোহণ, অবলুণ্ঠন এ শব্দগুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ পষ্টাপষ্টি দেশে-নিচু।

(২) অবজ্ঞা, অবহেলা, অবমাননা, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ লৌকিক ভাবে-নিচু।

(৩) অবান্তর, অবধারণ, অবগতি, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ দার্শনিক ভাবে-নিচু।

(৪) অবশেষ, অবচ্ছেদ, অবকাশ, এ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ জ্যামিতিক ভাবে-নিচু।

তাহার পরে আসিতেছে প্রতি-উপসর্গ। প্রতি-উপসর্গের মুখ্য অর্থ দিক্ বৈপরীত্য। মনে কর তুমি আমাকে একখানি পত্র পাঠ করিতে দিলে, আমি তাহা পাঠ করিয়া তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। এরূপ স্থলে পত্রখানি গ্রহণ করিবার সময় আমি যদি তাহা পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে আনয়ন করি, তবে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার সময় পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে চালনা করি। এই প্রকার দিক্ বৈপরীত্যই প্রতি-উপসর্গের মৌলিক অর্থ; তা বই উহার আর আর যত প্রকার অর্থ আছে সমস্তই ঐ মৌলিক অর্থ হইতে উৎপত্তি-লাভের স্পষ্ট নিদর্শন স্ব স্ব ললাটে ধারণ করে। "অমুক ব্যক্তির প্রতি অমুক ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করিল বা অসদ্ব্যবহার করিল, সন্তুষ্ট হইল বা বিরক্ত হইল" এরূপ বলিলে প্রতি-উপসর্গের মন্ত্রগুণে হঠাৎ মনে হয় যেন সে দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি

পশ্চিমমুখা এবং আর এক ব্যক্তি পূর্ব্বমুখা অথবা এক ব্যক্তি উত্তরমুখা এবং আর এক ব্যক্তি দক্ষিণমুখা হইয়া দণ্ডায়মান থাকা কালীন উভয়ের মধ্যে ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল। এরূপ যে মনে হয় তাহার অবশ্য কারণ আছে; সে কারণ এই ঃ—

(১) মনশ্চক্ষে বা চর্ম্মচক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে দুইজনের মধ্যে কোনো প্রকার ব্যবহার চলিতে পারে না।

(২) মানসিক প্রতিমুখিতা ব্যতিরেকে মানসিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে না; বাস্তবিক প্রতিমুখিতা ব্যতিরেকে বাস্তবিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে না।

(৩) লক্ষ্য সমর্পণের দিক্‌বৈপরীত্য ব্যতিরেকে প্রতিমুখিতা সম্ভবে না।

(৪) দিক্‌বৈপরীত্যের প্রজ্ঞাপনই প্রতি-উপসর্গের একমাত্র কার্য্য।

দিক্‌বৈপরীত্য দুই প্রকার——

(১) অভিমুখী বস্তুদ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য, আর—

(২) পরাঙ্মুখী বস্তুদ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য। যদি একটা অপ্‌ট্রেন এবং একটা ডাউন্‌ট্রেন উভয়েই হুগ্‌লি অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তবে একদিকে যেমন দুই ট্রেন দুই বিপরীত দিকে প্রধাবিত হয়, আব একদিকে তেমনি উভয়ে পরস্পরেব অভিমুখে প্রধাবিত হয়; ইহাই অভিমুখী বস্তুদ্বযের দিক্‌বৈপরীত্য, অথবা যাহা একই কথা—প্রতিমুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য। ক্ষণপরে যখন হুগ্‌লি হইতে ঐ দুই ট্রেন দুই বিপরীত দিকে প্রধাবিত হয়; তখন তাহারি নাম পরাঙ্মুখী বস্তু-দ্বয়ের দিক্‌বৈপরীত্য অথবা পরাঙ্মুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য। প্রতি-উপসর্গ বেশীর ভাগ প্রতিমুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য-অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু স্থলবিশেষে পরাঙ্মুখী-ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য অর্থেও তাহাকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। "সকল ব্যক্তি" বলিলে বুঝায় যে, ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত; প্রতি-ব্যক্তি বলিলে বুঝায় যে, ব্যষ্টি যেন সমষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিরুদ্ধে আপনার স্বাতন্ত্র্য সমর্থন করিতেছে। প্রতিজন প্রত্যেক প্রত্যহ প্রভৃতি শব্দে এইরূপ পরাঙ্মুখী-ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য অতীব নিগূঢ়রূপে অবস্থিতি করে। মনে কর দশ ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিল—সকলেই বাঙ্গালি, কিন্তু প্রতি জন বিভিন্ন পরিচ্ছদে পরিহিত। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, দশ ব্যক্তির মধ্যে যেখানে ঐক্য সেই খানেই "সকল" শব্দ বসিয়াছে, আর দশ ব্যক্তির মধ্যে যেখানে বৈপরীত্য বা প্রতিপক্ষতা সেইখানেই "প্রতি" শব্দ বসিয়াছে। লিব্‌নিট্‌জ্‌ নামক সুবিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত একদা ফরাসীস দেশীয় রাজ-সভার মহিলাবর্গের সহিত রাজবাটীর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে পার্শ্বচরী মহিলাগণকে লীলাচ্ছলে বলিলেন যে, সমস্ত উদ্যান ঘুঁটিয়া যদি আপনারা এমন কোনো দুইটী বৃক্ষপত্র বাহির করিতে পারেন যেদুটি সর্ব্বাংশে সমান, তবে যে দণ্ড বলেন আমি তাহাই স্বীকার করিব। বলা বাহুল্য যে, মহিলাবর্গ সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেরূপ দুইটী পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। এই প্রকার ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যকে একটু বেশী মাত্রা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমি ইতিপূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে দশজন বাঙ্গালিকে দশ প্রকার ভিন্ন পরিচ্ছদ

পরিধান করাইয়াছিলাম; কিন্তু উক্ত স্থলে ভিন্ন পরিচ্ছদের কথা উল্লেখ না করিলেও দৃষ্টান্তের বিশেষ কোনো অঙ্গহানি হয় না। দশজনের প্রতিব্যক্তি বলিলেই বুঝায় যে, প্রতি ব্যক্তি এক পক্ষ, এবং অবশিষ্ট নয় ব্যক্তি আর এক পক্ষ, আর, সেই প্রকার দুই দুই পক্ষ অল্প পরিমাণেই হউক্ আর অধিক পরিমাণেই হউক্ কোনো না কোনো পরিমাণে—কাজে না হউক্ ভাবে—পরস্পরের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে—শারীরিক মুখ না হউক্ মানসিক মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। 'প্রতি' শব্দের এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবের পরাঙ্মুখিতা অর্থে যদি শ্রোতা বা পাঠকের মন প্রবোধ না মানে, তবে তিনি প্রতীচী শব্দের আদিস্থিত 'প্রতি' উপসর্গের অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলেই আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব প্রণিধান করা হো'ক্,—

প্র + অক্ = প্রাক্ = প্রাচী।

প্রতি + অক্ = প্রত্যক্ = প্রতীচী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে; কাজেই প্রাচী শব্দের মৌলিক অর্থ সম্মুখের দিক্ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাচী যখন সম্মুখ দিক্, তখন প্রাচী'র বিপরীত দিক্ অবশ্য পশ্চাৎ দিক্। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে প্রাচীর বিপরীত দিক্—পশ্চাৎ দিক্—তাহা কোন্ দিক্? পশ্চিম এবং পশ্চাৎ এ দুই শব্দের মধ্যে কেবল ইম এবং আৎ এই দুই লেজুড় মাত্রের প্রভেদ; কিন্তু সে প্রভেদ যে কোনো কার্য্যেরই নহে—পাশ্চাত্য শব্দ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পাশ্চাত্য জাতি = পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি;

অথবা, যাহা একই কথা—

পশ্চাৎ প্রদেশীয় জাতি = পশ্চিম প্রদেশীয় জাতি।

তবেই হইতেছে যে,

পশ্চাৎ দিক্ = পশ্চিম দিক্। কিন্তু পশ্চিম দিকের আর এক নাম প্রতীচী। অতএব এটা স্থির যে,

প্রতীচী দিক্ = পশ্চাৎ দিক্। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচী শব্দের মৌলিক অর্থ সম্মুখের দিক্; এখন দেখিতেছি যে, প্রতীচী শব্দের মৌলিক অর্থ পশ্চাৎ দিক্। প্রাচী এবং প্রতীচীর মধ্যে এই যে পরাঙ্মুখী ভাবের দিক্‌বৈপরীত্য সম্বন্ধ—ইহার জন্য প্রাচী-শব্দের আদিস্থিত প্র-উপসর্গ কোনো অংশেই দায়ী নহে—প্রতীচী শব্দাশ্রিত আদিস্থিত 'প্রতি' উপসর্গই একাকী তাহার জন্য দায়ী; কেননা 'প্রতি' উপসর্গের দিক্‌বৈপরীত্য-সূত্রেই প্রতীচী বলিতে 'প্রাচী'র উল্টা দিক্ বুঝায়, পশ্চিম দিক্ বুঝায়। প্রতীচী-শব্দাশ্রিত 'প্রতি' উপসর্গের পরাঙ্মুখিতা অর্থ এত করিয়া বুঝাইতে হইল তাহার কারণ এই যে প্রতীচী-শব্দ বঙ্গভাষায় তেমন প্রচলিত নাই;—যদিচ পাশ্চাত্য শব্দের পরিবর্ত্তে প্রতীচ্য-শব্দ শুনিতে মন্দ হয় না। কিন্তু 'প্রতি' উপসর্গের পরাঙ্মুখিতা অর্থের জন্য অত দূরে হাতড়াইবার

প্রয়োজন নাই ;—তাহার ঐ প্রকার অর্থ প্রতিনিবৃত্ত এবং প্রত্যাহার এই দুই শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে ; কেননা, প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নামই পরাঙ্মুখ হওয়া ; আর, প্রত্যাহরণের নামই উল্টা দিকে টানিয়া লওয়া।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, প্রতিমুখিতা এবং পরাঙ্মুখিতা দুয়েতেই দিক্‌বৈপরীত্য সমান মাত্রায় সূচিত হয়। যখন একটা অপ্‌ট্রেন এবং একটা ডাউন্‌ট্রেন উভয়েই হুগলি অভি-মুখে প্রধাবিত হইতেছে, তখনও একটা উত্তরাভিমুখী—একটা দক্ষিণাভিমুখী ; আবার ক্ষণপরে যখন উভয়েই হুগলি ছাড়াইয়া চলিল, তখনও একটা উত্তরাভিমুখী—একটা দক্ষিণাভিমুখী। অতএব প্রতিমুখী এবং পরাঙ্মুখী উভয়-ভাবের গতিতেই দিক্‌বৈপরীত্য অবিকল সমান। দিক্‌বৈপরীত্য বিষয়ে প্রতিমুখিতা এবং পরাঙ্মুখিতার মধ্যে এইরূপ যখন মিল রহিয়াছে, তখন দিক্‌বৈপরীত্যের লেজুড় ধরিয়া 'প্রতি' উপসর্গের অর্থাভ্যন্তরে কোনো স্থলে বা প্রতিমুখিতার ভাব, কোনো স্থলে বা পরাঙ্মুখিতার ভাব প্রবেশ করিবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে পরা উপসর্গের অর্থ কিরূপ তাহা দেখা যাক্। পরা-উপসর্গে আকার আছে—পর শব্দে আকার নাই, দুয়ের মধ্যে এইরূপ সাকার নিরাকারের প্রভেদ। পর-শব্দে প্রথমতঃ দূরস্থ বুঝায়—যেমন পর-পার অথবা যেমন ঘর আর পর। দ্বিতীয়তঃ শত্রুপক্ষ বুঝায়—যেমন পরন্তপ অর্থাৎ শত্রু-সন্তাপক। তৃতীয়তঃ আপনার মত আর একজন বুঝায়। পর শব্দের প্রথম দুই অর্থের ছায়া পরা-উপসর্গে এবং তৃতীয় অর্থের ছায়া para উপসর্গে সংক্রমিত হইয়াছে।

পর শব্দের দূরতা-অর্থ পরাক্ শব্দের পরা উপসর্গে অতীব স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচী এবং প্রতীচী, অথবা যাহা একই কথা প্রাক্ এবং প্রত্যক্, এ-দুয়ের মধ্যে কিরূপ সম্মুখ পশ্চাৎ সম্বন্ধ তাহা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট দেখা হইয়াছে, এক্ষণে পরাক্ এবং প্রত্যক্ এ-দুয়ের মধ্যে কিরূপ দূর-নিকট সম্বন্ধ তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হো'ক। পঞ্চদশী হইতে পরাক্ এবং প্রত্যক্ শব্দের পরস্পর প্রতিযোগিতার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই ঃ——

তে পরাক্ দর্শিনঃ প্রত্যক্ আত্মবোধবিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বন্তে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্মকর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥

ইহার অর্থ এই যে, সেই সকল প্রত্যগাত্ম-বোধ-বিবর্জিত পরাগ্দর্শী ব্যক্তিরা ভোগ করিবার জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করে। "প্রত্যক্ আত্মা" কিনা নিকটস্থ আত্মা ; "পরাক্ বিষয়" কিনা দূরস্থ বিষয় অর্থাৎ বহির্বিষয়। এইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, প্রত্যক্ শব্দ যখন প্রাক্ শব্দের সহিত প্রতিযোজিত হয়, তখন প্রত্যক্ বলিতে প্রাক্‌দিকের অথবা প্রাচীদিকের উল্টাদিক বুঝায়—সম্মুখদিকের উল্টাদিক্ বুঝায়—পশ্চাৎ দিক বুঝায়—পশ্চিমদিক বুঝায় ; আবার, ঐ একই প্রত্যক্ শব্দ যখন পরাক্ শব্দের

সহিত প্রতিযোজিত হয়, তখন প্রত্যক্ বলিতে পরাক্ বিষয়ের উল্টাদিক বুঝায়—দূরস্থ বিষয়ের উল্টাদিক বুঝায়—নিকটস্থ বুঝায়। উভয়স্থলেই দিক্‌বৈপরীত্য ঘটাইবার কর্ত্তা 'প্রতি' উপসর্গ বই আর কেহ নহে।

পরা উপসর্গ যে দূরতা প্রতিপাদক—পরাঙ্মুখ শব্দ তাহার অন্যতম প্রমাণ। বিমুখ হওনের অর্থ মুখ পার্শ্বে ফিরানো—পরাঙ্মুখ হওনের অর্থ মুখ দূরে সরানো; তবে, লৌকিক ব্যবহার-কালে ও-দুই শব্দের অর্থ-বৈষম্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; কেননা মুখ পার্শ্বে ফিরানো এবং দূরে সরানো একই ভাবের অভিব্যঞ্জক—দুইই বিরাগ ভাবে অভিব্যঞ্জক।

পর-শব্দের দূরতা-অর্থ এবং শত্রুতা-অর্থ এই দুয়ের সম্মিশ্রভাব অনেক সময়ে পরা-উপসর্গের অর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। পরাজয়, পরাভব, পরাহত পরাক্রম, এই সকল শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শত্রুদিগকে দূরে হটাইয়া দিবার ভাব সর্ব্বাগ্রে নেত্র পথে উপস্থিত হয়। দূরতা এবং শত্রুতা এ-দুই অর্থ ব্যতীত পর-শব্দের তৃতীয় অর্থ আপনার মত আর একজন। পর-শব্দের এইরূপ সমতুল্যতা বা সমকক্ষতা অর্থ para উপসর্গে দিবালোকের ন্যায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে; এমন কি, সে অর্থের কতকটা ছায়া দেশীয়ভাষায় পার-শব্দের গাত্রে সংক্রমিত হইয়াছে। তার সাক্ষী—নদীর এপার ওপার মোটামুটি হিসাবে parallel কিনা সমান্তরপাতী। ফলে, সোজাসুজি ভাবের দূরতার সঙ্গে parallel ভাবের যেরূপ ঘনিষ্ঠ জ্যামিতিক সম্বন্ধ, তাহাতে পরা-উপসর্গের দূরবর্ত্তিতা অর্থ এবং parallel শব্দের সমান্তরপাতিতা অর্থ দুয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্য না থাকিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। পরাক্ এবং তির্য্যক্ এই দুই শব্দকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয়েরই অন্তে অক্ রহিয়াছে, আর, উভয়েই জ্যামিতিক ভাবের দূরতা-ব্যঞ্জক; প্রভেদ কেবল এই যে, তির্য্যক শব্দে ত্যাড়্‌চা-ভাবের বা কোণাকুনি-ভাবের দূরবর্ত্তিতা বুঝায়, পরাক্ শব্দে সোজাসুজি ভাবের দূরবর্ত্তিতা বুঝায়। পর, পার, পরা এবং পরাক্—এই শব্দগুলির মধ্যে যেমন নিকট সম্বন্ধ; তর, তীর, ত্বরা এবং তির্য্যক্—এ গুলির মধ্যেও সেইরূপ। তা ছাড়া, নদীর তীর এবং নদীর পার—একই। নদী তরিয়া যেখানে পৌঁছানো যায় তাহাই নদীর তীর; নদী পেরিয়ে যেখানে পৌঁছানো যায়, তাহাই নদীর পার। কিন্তু উহারই মধ্যে পার এবং তীরের ভিতরে অল্প একটু অর্থের ইতর-বিশেষ আছে; তাহা এই যে, তীর বলিতে যেমন-তেমন নদীর কিনারা বুঝায়; পার বলিতে এপার ওপারের মধ্যে মোটামুটি রকমের Parallel ভাব বুঝায়। এখন বক্তব্য এই যে, (১) Para উপসর্গের সমকক্ষতা অর্থ; (২) পার-শব্দের Parallel ধাঁচার দূরত্ব অর্থ; (৩) পরা-উপসর্গের সোজাসুজি রকমের দূরত্ব অর্থ; (৪) পর-শব্দের "আপনার সদৃশ অথচ আপনা হইতে দূরবর্ত্তী" এইরূপ সম্মিশ্রভাবের অর্থ; এই সকল সমশ্রাব্য শব্দের নিকট সম্পর্কীয় অর্থ-গুলির মধ্যে ভাব সাদৃশ্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া

খুব সহজ—কিন্তু তাহার মূল অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিলে ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের বিশেষ একটী অভীষ্ট কার্য্য নিষ্পাদন করা হয়, তাহাতে আর ভুল নাই।

পরামর্শ-শব্দের 'পরা' উপসর্গও যে, দূরতা ব্যঞ্জক, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নৈয়ায়িক ভাষায় পরামর্শ-শব্দের অর্থ "ব্যাপ্যস্য পক্ষত্ব ধর্ম্মধীঃ" অর্থাৎ ব্যাপ্য-বিষয়ের পক্ষত্ব-ধর্ম্ম অবধারণ। "পক্ষত্ব" কিনা partyত্ব। এখানে পৌরুষেয় ভাব (personality) বাদ দিয়া party শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হোক ঃ—যদি বলা যায় যে, জীবজন্তু বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাত, তবে অন্তরিন্দ্রিয়কে party করা হয় নাই বলিয়া কথাটায় দোষ পড়ে ;—এখানে অন্তরিন্দ্রিয়কে আলঙ্কারিক হিসাবে party বলা হইতেছে। পক্ষত্ব-অবধারণ বলিতে এইরূপ আলঙ্কারিক ভাবের partyত্ব-অবধারণ বুঝায় ; সে partyত্ব-অবধারণ এইরূপ ঃ—

"ব্রাহ্মণোচিত আচার" বলিতে আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আচার ব্যবহার বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি—সারস্বত ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনো দূর-দেশীয় ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার গণনার মধ্যে আনি না। সারস্বত-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিলেও—তাহা যখন ব্রাহ্মণত্বের ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কোটায় স্থান পাইবার যোগ্য, তখন—ব্রাহ্মণ-জাতিবিষয়ক কথার আন্দোলন-কালে সারস্বত ব্রাহ্মণকেও একটা পক্ষ বলিয়া (party বলিয়া) গণনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ, ব্যাপ্য-বিষয় দূরবর্ত্তী হইলেও তাহার পক্ষত্ব (partyত্ব) অবধারণ করা'র নাম পরামর্শ—"ব্যাপ্যস্য পক্ষত্ব ধর্ম্মধীঃ"। অতএব এটা স্থির—যে, পরামর্শ একপ্রকার দূরান্বয়-গর্ভ যুক্তি।

তাহার পরে আসিতেছে অভি উপসর্গ। অভি উপসর্গের লক্ষ্য প্রার্থনীয় বস্তুর প্রতি। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্র-উপসর্গের লক্ষ সম্মুখের দিকে। 'প্রার্থনীয় বস্তু' কিনা প্র+অর্থনীয় বস্তু। প্রার্থনীয় বস্তু বলাও যা, আর, মনোনেত্রের সম্মুখবর্ত্তী অভীষ্ট বিষয় বা উদ্দেশ্য বলাও তা, একই কথা। প্র-উপসর্গের সম্মুখবর্ত্তিতা-অর্থের সহিত বিষয়ের ভাব, অর্থের ভাব, বা উদ্দেশ্যের ভাব, সংযোজিত হইলেই তাহা অভি-উপসর্গে পরিণত হয়। প্র এবং অভি দুয়েরই লক্ষ্য সম্মুখদিকে ; তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অভি-উপসর্গের বিশেষ কোনো একটা বিষয় বা উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকা চাই—প্র-উপসর্গের তাহা চাই না।

তার সাক্ষী——

প্রধাবন=সম্মুখে দৌড়িয়া চলা মাত্র।

অভিধাবন=সম্মুখস্থিত ব্যক্তির প্রতি তাড়াইয়া যাওয়া।

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সামুদ্রিক দীপস্তম্ভের আলোকের ন্যায় (Light-houseএর আলোকের ন্যায়) প্রমুক্তভাবে সম্মুখে প্রসারিত হয় ; অভি উপসর্গের লক্ষ্য ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের আলোকের ন্যায় (magic lanternএর আলোকের ন্যায়) সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যে মূর্চ্ছিত হয়।

তার সাক্ষী—অভিধ্যানের ঐন্দ্রজালিক আলোকে ধ্যেয় বস্তু চিত্তপটে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত হয়। ফলে, অভি = ob।

অভি + প্রায় = ob + ject

আমার যা অভিপ্রায় তা এই = The object I have in view is this.

Object এবং অভিপ্রেত বিষয় দুয়ের অর্থ-সাদৃশ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। নিম্নে প্রণিধান করা হউক ঃ—

প্রেত = প্র + ইত = প্র + গত। প্র-গত বলিতে দুইরূপ বুঝায়—সম্মুখ-গতও বুঝায়, আর, যাহা সম্মুখ হইতে গত হইয়াছে, এক কথায়—যাহা প্রস্থান করিয়াছে, তাহাও বুঝায়। ভূত-প্রেতের প্রেতের সহিত শেষোক্ত অর্থ, আর, অভিপ্রেতের প্রেতের সহিত পূর্ব্বোক্ত অর্থ, বিশিষ্টরূপে সংলগ্ন হয়।

অভিপ্রেত = সম্মুখে গত; আর,

Object = অভিject = সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত; দুয়ের মধ্যে এই যা প্রভেদ। ভাবার্থ দুয়েরই অবিকল সমান; তাহা আর কিছু না—যাহা মনোনেত্রের সম্মুখে প্রভাসিত হয়। তার সাক্ষী—অভিপ্রেত বিষয়, অভীষ্ট বিষয়, অভিলষিত বিষয়, অভিধ্যেয় বিষয়, এ সমস্তই বিশিষ্টরূপে object-স্থানীয় বিষয়। অভি-উপসর্গ কর্ণধারের ন্যায়- ঐ সকল শব্দের মূল স্থানে বসিয়া সমস্তেরই গতি সম্মুখবর্ত্তী কূলের দিকে নিয়মিত করিতেছে।

"অভিমুখ" বলিলেই সম্মুখস্থিত একটা কোন লক্ষ্য বস্তুর প্রতি অভিমুখ বুঝায়। "অভিধ্যান" বলিলেই ধ্যেয় বস্তুকে মনোনেত্রের সম্মুখে আনয়ন করা বুঝায়। "অভিজ্ঞান" বলিলেই জ্ঞেয় বস্তু মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে বুঝায়। শকুন্তলার আঙুটি দেখিয়া দুষ্মন্ত রাজা যেমন অতীত বৃত্তান্ত মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন, সেইরূপ অন্য কোনো সূত্রে জ্ঞেয় বিষয়কে মনোনেত্রে প্রাপ্ত হওয়ার নাম, অথবা যাহা একই কথা—চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া জ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ার নাম—অভিজ্ঞান।

অভিনয় = সম্মুখে আনয়ন = রঙ্গভূমিতে দর্শকের সমক্ষে নানা প্রকার দৃশ্যের আনয়ন।

অভিধান = সম্মুখে স্থাপন করা = নামোচ্চারণের মন্ত্রবলে নামীকৃত বস্তুকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করানো।

সংস্কৃত কাব্যাদিতে অভিসার নামক একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়ের ব্যাপার মধ্যে মধ্যে বর্ণিত হইয়া থাকে; বিজ্ঞান-চর্চ্চার অনুরোধে সে বিষয়টার সম্বন্ধে একটী কথা স্বল্প উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। অভিসরণ = অভি + সরণ। সরণ শব্দে শুধু কেবল চলা বুঝায়; কিন্তু তাহার সহিত অভি-উপসর্গ সংযোজিত হওয়াতে চলার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—মনোনেত্রের সম্মুখবর্ত্তী গন্তব্য প্রিয়-নিকেতনের অভিমুখে চলা। অভিবাদন, অভ্যর্থনা, প্রভৃতি শিষ্টাচার-ব্যঞ্জক অভিপূর্ব্বক শব্দগুলিতে অভি-উপসর্গের লক্ষ্য এরূপ স্পষ্টভাবে সম্মুখস্থিত ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সবিশেষ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উদাহরণ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—এখন একটী পৌরাণিক রহস্যের প্রতি প্রণিধান করা হউক ঃ—

মূল আর্য্যজাতি যে, এক আদিম নিবাস হইতে তুই বিপরীত দিকে তুইশাখা প্রসারণ করিয়াছিলেন, সেই রহস্য-কাহিনীর একটী তুইমুখা চাবি এতকালের পর খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে ;—সে চাবির একটী মুখ প্রতি-উপসর্গ এবং আর একটি মুখ অভি-উপসর্গ।

Occident = ob + cident = অভি + পতিত = যাহা সম্মুখে পড়ে। এখানে পড়া এবং উপস্থিত হওয়া এ তুয়ের অর্থ-সাদৃশ্য সবিশেষ দ্রষ্টব্য ; এইটি দ্রষ্টব্য যে,—

বিপৎপাত = বিপদ পড়া = বিপদ উপস্থিত হওয়া।

Accident = যাহা ad + cident = যাহা আ + পতিত = আপদ = যাহা গায়ের উপর আসিয়া পড়ে।

Occident = ob + cident = অভি + পতিত = সম্মুখে উপস্থিত। শুধু যে কেবল সম্মুখে উপস্থিত তা নয়—তা অপেক্ষা আর একটু বেশী। কি ? না সম্মুখে উপস্থিত প্রার্থনীয় বিষয়, অভিপ্রেত বিষয়, অভীষ্ট বিষয়, object রূপী বিষয় ; কেননা সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি যে, অভি-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখবর্ত্তী প্রার্থনীয় বস্তুর প্রতি।

এইরূপ যখন আমরা পাইতেছি যে, occident দিক = সম্মুখবর্ত্তী অভিপ্রেত দিক, এক কথায়—গন্তব্য দিক, তখন তাহা অপেক্ষা এবিষয়ের আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে যে, আদিম নিবাস হইতে বহিঃপ্রয়াণকালে, পশ্চিমদিক, যাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের পশ্চাৎদিক ছিল, তাহাই পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের সম্মুখদিক ছিল। তখন দিক্‌দর্শনী অর্থাৎ সামুদ্রিক কম্পাস্ ছিল না—কাজেই বিদেশ-যাত্রাকালে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা একপ্রকার শাব্দিক দিক্‌দর্শনী গড়িয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরাতন দিক্‌দর্শনীর চারিটী কাঁটা এইরূপ :—

উদীচী = উচ্চস্থান

↑

প্রতীচী = পশ্চাৎ প্রাচী = সম্মুখ

দক্ষিণ = ডাহিন দিক্

পূর্ব্বদিক = প্রাচীদিক = সম্মুখের দিক = গন্তব্য দিক।

পশ্চিমদিক = প্রতীচী-দিক = সম্মুখের বিপরীত দিক = পশ্চাৎ দিক = পরিহার্য্য দিক।

দক্ষিণদিক = পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রাকালে দক্ষিণ-হস্ত যে দিকে পড়ে সেই দিক।

উত্তরদিক = উদীচী = উৎপ্রদেশ = উচ্চপ্রদেশ = Highlandপ্রদেশ = হিমালয়-সংশ্রিত পার্ব্বত্য-প্রদেশ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের দিক্‌দর্শনীতেই পশ্চিমদিক = পশ্চাৎ দিক; কিন্তু পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের দিগদর্শনীতে—

পশ্চিমদিক = Occidentদিক = ob + cidentদিক = অভি-পতিতদিক = সম্মুখবর্ত্তী অভিপ্রেত-দিক = গন্তব্য দিক।

ইহাকে এক যাত্রার পৃথক ফল বলে না—ইহাকে বলে দুই যাত্রায় পৃথক ফল।

Latin অভিধান আমার নিকটে নাই সুতরাং ল্যাটিন্ অভিধানকারেরা Occident শব্দ ভাঙিয়া তাহার মধ্য হইতে 'পশ্চিম' অর্থ কিরূপে টানিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া, আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যে, Occident শব্দের ঐ যেরূপ অর্থ আমি প্রদর্শন করিলাম তাহা আমার স্বকপোল-কল্পিত। আমি আমার একজন বন্ধুকে দিয়া ঐ বিষয় সম্বন্ধে সেণ্ট্ জেবিয়র কালেজের রেক্টর এল্ হ্যাগেন্-বেক সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; রেক্টর সাহেব আমার কৃত ঐ অর্থ সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন, আর, সেই সঙ্গে মাক্সমূলার এবং অন্যান্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ (অর্থাৎ Orientalist) পণ্ডিতদিগকে ঐ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া তাঁহারা কি বলেন তাহা জানিতে পরামর্শ দিলেন।

অতঃপর আসিতেছে নিঃউপসর্গ অর্থাৎ সবিসর্গ নি উপসর্গ।

নিঃ = ex

তার সাক্ষী

নিঃশেষণ = নিঃ + শেষণ = ex + terminaton = Extermination.

এখানে নির্ব্বিসর্গ নি এবং সবিসর্গ নি দুয়ের অর্থ-বৈষম্য—অর্থের বৈষম্য শুধু নয়, অর্থের বৈপরীত্য, সবিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

সবিসর্গ নিঃ = ex = out,

নির্ব্বিসর্গ নি = in ;

তার সাক্ষী

নিবসন = বাসস্থানের অভ্যন্তরে থাকা।

নির্ব্বাসন = বাসস্থান হইতে বহিষ্করণ।

নিরীক্ষণ = বাহির করিয়া দেখা অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুকে আশ-পাশের জঞ্জাল হইতে পৃথক করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

নির্দ্ধারণ = জ্ঞাতব্য বিষয়কে পার্শ্ববর্ত্তী সমজাতীয় বস্তুর দল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার বিশেষত্বের প্রতি মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ করা।

গৌতম-সূত্রে নির্ণয় শব্দের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হউক ঃ—

"বিমৃষ্য পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যাং অর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।"

অর্থাৎ বিচার-পূর্ব্বক পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্য হইতে (অর্থাৎ thesis এবং antithesisএর মধ্য হইতে) প্রকৃত সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করার নাম নির্ণয়। ইহার একটী উদাহরণ দিতেছি—তাহা দেখিলেই নির্ণয়-শব্দের প্রকৃত অর্থ, এবং সেই সঙ্গে তাহার আদিস্থিত নিঃউপসর্গের সার্থকতা, পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) চন্দ্র হয় গ্রহ, নয় উপগ্রহ।

(২) গ্রহ মাত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

(৩) চন্দ্র তাহা করে না।

(৪) অতএব চন্দ্র গ্রহ হইতে পারে না।

(৫) তবেই হইতেছে যে, চন্দ্র উপগ্রহ। ইহারই নাম চন্দ্রকে উপগ্রহ বলিয়া নির্ণয় করা। এখানে যাহা করা হইল তাহা এই ঃ—

একটী পক্ষ এই যে, চন্দ্র গ্রহ; আর একটী পক্ষ এই যে, চন্দ্র উপগ্রহ। এই দুই পরস্পর-বিরোধী পক্ষের একটীকে সরাইয়া অপরটীকে যুক্তিদ্বারা টানিয়া বাহির করা হইল ঃ—ইহারই নাম নির্ণয়। নির্ণয় শব্দের অর্থের মধ্যে, এইরূপ, সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করিবার ভাব সঞ্চারিত করা সবিসর্গ নি উপসর্গেরই কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রচলিত বঙ্গভাষায় ক্রিয়াবাচক-শব্দের লেজুড় স্বরূপে যেখানে 'তোলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে তোলা-শব্দের অর্থ—বাহির করা; তার সাক্ষী টানিয়া তোলা=টানিয়া বাহির করা। আমরা একদিকে যেমন বলি যে, "মুখচক্ষু দিয়া সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে" আর একদিকে তেমনি বলি যে, "চিত্রকর মুখের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে"; এস্থলে দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, ফুটাইয়া তোলাও যা, আর, ফুটাইয়া বাহির করাও তা, একই কথা। এইজন্য, টানিয়া তোলা, ফুটাইয়া তোলা, করিয়া তোলা, গড়িয়া তোলা, এই ভাবের সংস্কৃত-ঘ্যাঁসা শব্দে প্রায়ই নিঃউসপর্গ সংযোজিত হইয়া থাকে। তার সাক্ষী—

নির্ব্বাহ বা নিষ্পাদন=করিয়া তোলা।

নির্ম্মাণ=গড়িয়া তোলা।

নির্ব্বাচন বা নির্ব্বচন=বাক্যের ঠিক অর্থটি বিবৃত করিয়া তোলা—Define করিয়া তোলা।

বস্তু-বাচক বা ভাব-বাচক শব্দে অনেক সময় নিঃউপসর্গের বহিষ্কার-অর্থ বিহীনতা-অর্থে পরিণত হয়; কিন্তু সে বিহীনতা বহিষ্কারেরই ফল-স্বরূপ। তার সাক্ষী—

নিস্তেজ=তেজোহীন; তেজোহীন কেন? না যেহেতু তেজ বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। বস্তুবাচক বা ভাব-বাচক শব্দের আদিস্থিত নিঃউপসর্গেরই ঐরূপ অর্থান্তর ঘটে; ক্রিয়াবাচক শব্দের আদিস্থিত নিঃউপসর্গের অর্থ যেমন তেমনি অবিকৃত থাকে। তার সাক্ষী—

সম্বল শব্দ বস্তু-বাচক তাই—নিঃসম্বল=সম্বলবিহীন।

গমন শব্দ ক্রিয়াবাচক তাই—নির্গমন=বহির্গমন।

শ্বাস শব্দ বস্তুবাচক তাই—সবিসর্গ নিঃশ্বাস = শ্বাস-বিহীন। শ্বসন-শব্দ ক্রিয়াবাচক তাই নিঃশ্বসিত = বহিঃশ্বসিত।

এখানে এইটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, আমরা যখন বলি যে, কবির হৃদয় হইতে কবিতা নিঃশ্বসিত হইতেছে, তখন সে নিঃউপসর্গ সবিসর্গ; পক্ষান্তরে যখন বলি "নিশ্বাস টানিতেছি" তখন সে নি-উসপর্গ নির্বিসর্গ। সবিসর্গ নিঃশ্বাস এবং নির্বিসর্গ নিশ্বাস দুয়ের মধ্যে এইরূপ স্পষ্ট প্রভেদ সত্ত্বেও অনেকে তাহা দেখিয়াও দেখেন না; এমন কি পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও অনেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নি-উপসর্গে বিসর্গ বসাইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। সচরাচর আমরা বলি বটে যে, নিশ্বাস ফেলিতেছি কিন্তু সেটা তারি ভুল—বলা উচিত "শ্বাস ফেলিতেছি"। কেননা, নিশ্বাস যদি সবিসর্গ হয় তবে তাহার অর্থ শ্বাস-বিহীন; আর, তাহা যদি নির্বিসর্গ হয়, তবে তাহার অর্থ ভিতরে টানিয়া লওয়া শ্বাস; দুয়ের কোনোটিরই সহিত নিক্ষেপণ-ক্রিয়া সংলগ্ন হয় না। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে নিশ্বাস-ক্ষেপণ বা নিশ্বাস-পাতন এপ্রকার শব্দ-যোজনার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

তার পর আসিতেছে উপ-উপসর্গ। উপসর্গ-শব্দ নিজেই উপ-উপসর্গের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। সর্জ্জন শব্দে ত্যাগ বা প্রক্ষেপণ বুঝায়। মূল-শব্দের গাত্রে যাহা উত্তরীয় বস্ত্রের ন্যায় উপনিক্ষিপ্ত হয় তাহাই উপসর্গ। উপ-উপসর্গের যেখানে যে-ভাবের যত প্রকার প্রয়োগ আছে, সকল স্থলেই একটা বড় বিষয়ের বা প্রধান বিষয়ের প্রান্ত-ঘ্যাঁসা ছোটোখাটো বিষয় বা লঘীয়ান্ বিষয় সূচিত হয়। তার সাক্ষী—

উপকূল = কূলঘ্যাঁসা প্রদেশ।

উপান্ত = প্রান্তঘ্যাঁসা প্রদেশ।

উপবেশন = কোনো একটি প্রদেশ ঘেঁসিয়া তাহার একস্থানে বসা।

উপাসনা = সেবার্থে প্রান্ত ঘেঁসিয়া বসা।

ইট কাট প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ সামগ্রী প্রকরণ-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া গঠিতব্য মন্দিরে পরিণত হয়। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উপকরণ প্রকরণের আনুষঙ্গিক ব্যাপার। অভিপ্রায় সাধনার্থেই নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে; অতএব অভিপ্রায়ই মূল, উপায় তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। অতঃপর আসিতেছে আ-উপসর্গ।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, নি = in; এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, আ = ad। Inhere এবং adhere এই দুই শব্দের অর্থভেদের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে আ এবং নি-উপসর্গের অর্থভেদ স্পষ্ট ধরা পড়িবে। উপরে উপরে সংলগ্ন হওয়ার নাম adhere। হাড়ে হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার নাম inhere। তেমনি, আহত = উপরে উপরে হত; নিহত = মর্ম্মান্তিকরূপে হত। সংস্কৃত ভাষায় ঘাড়ে ভূত চাপাকে বলে ভূতাবেশ;— রোষাবেশ বলিতেও ঘাড়ে-ভূতচাপা-রকমের রিপুর আক্রমণ বুঝায়। কিন্তু যদি বলি যে,

"অমুকের মুখচ্ছবি আমার অন্তঃকরণে নিবিষ্ট রহিয়াছে" তবে ভাবে বুঝায় যে, তাহা আমার অন্তঃকরণে এমনি সেঁধিয়া রহিয়াছে যে, তথা হইতে তাহাকে নড়ানো সুকঠিন। ওঝা ভূত ঝাড়াইতে পারে, সান্ত্বনা-বাক্য ক্রোধ ঝাড়াইতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিবিষ্ট ছবি সেথান হইতে স্থানান্তরিত করা—কাল যদি পারে তো পারে—নহিলে তাহা দেবতারও অসাধ্য।

সংলগ্ন বস্তু মাত্রই প্রথমতঃ দূর হইতে নিকটে উপনীত হয়; দ্বিতীয়তঃ সংলগ্ন হওয়া কালে তাহা আশ্রয়-স্থানের দূর হইতে নিকট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। বাণ গাত্রে সংলগ্ন হইয়াছে বলিলেই বুঝায় যে, প্রথমতঃ তাহা দূর হইতে আসিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তাহা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী পক্ষযুক্ত সূক্ষ্মাংশ হইতে নিকটবর্ত্তী তীক্ষ্ণ ফলা পর্য্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব্বোক্ত ভাবটি, অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে আসিবার ভাবটি, আগমন, আনয়ন, আয়োজন প্রভৃতি শব্দের আ-উপসর্গে খুবই স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত ভাবটির মধ্য দিয়া, অর্থাৎ 'সংলগ্ন বস্তু অপেক্ষাকৃত দূর হইতে নিকট পর্য্যন্ত প্রসারিত' এই ভাবটির মধ্য দিয়া আ-উপসর্গের অর্থের মধ্যে অনেক সময় অবধি এবং পর্য্যন্তের ভাব প্রবেশ করে; তার সাক্ষী—আ-সমুদ্র = সমুদ্র পর্য্যন্ত; আ-জন্ম = জন্মাবধি। মূল-ভাগ যে স্থানটিতে সংলগ্ন থাকে, তাহারই নাম অবধি, আর, অন্ত-ভাগ যে স্থানটিতে সংলগ্ন থাকে তাহারই নাম পর্য্যন্ত।

আজন্মকাল = জন্মাবধি কাল = যে কাল-প্রবাহের মূলাংশ জন্ম মুহূর্ত্তের সহিত সংলগ্ন।

আমরণ কাল = মৃত্যু পর্য্যন্ত কাল = যে কাল-প্রবাহের অন্তভাগ মৃত্যুর সহিত সংলগ্ন।

আসমুদ্র পৃথিবী = যে পৃথিবীর অন্তভাগ সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন।

আবহমান কাল = আজ পর্য্যন্ত বহমান কাল = যে কাল-প্রবাহের অন্তভাগ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সহিত সংলগ্ন।

এই সকল দৃষ্টান্তে পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংলগ্ন হওনের ভাবই আ-উপসর্গের অর্থের সমগ্র শরীর, অবধি এবং পর্য্যন্তের ভাব তাহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অতঃপর আ-উপসর্গের মুখ্য অর্থের (অর্থাৎ খাস্ অর্থের) গোটাকত নমুনা দেখাইতেছি—প্রণিধান করা হউক ঃ——

আলিঙ্গন = গাত্রে গাত্র সংলগ্ন করিয়া কোলাকুলি।

অশ্বারোহণ = ঘোড়ায় চড়া, অশ্বের পৃষ্ঠে সংলগ্ন হওয়া।

দোষারোপ = দোষ স্কন্ধে চাপানো, দোষ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া।

চলিত ভাষায় এইরূপ দোষ সংলগ্ন করিয়া দেওয়ার নাম—লাগানো; যেমন, অমুকের কাছে অমুকের নামে লাগানো।

আমরা বলি "আজ্ঞাবহ ভৃত্য" আর বলি "আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।"

তবেই হইতেছে যে, আদেশ একপ্রকার বহন করিবার জিনিস—মাথায় ধারণ করিবার জিনিস। আজ্ঞা বহন করা বা আদেশ বহন করা = আদিষ্ট কার্য্যের ভার বহন করা,

আর, সে ভার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নির্ব্বাহিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা মনের স্কন্ধে সংলগ্ন থাকে।

তাহার পরে আসিতেছে অধি-উপসর্গ। অধি-উপসর্গের ধি অংশটি মুখ্যরূপে সীমা অর্থে এবং গৌণরূপে—কোথাওবা আধার অর্থে কোথাওবা আধেয় অর্থে ব্যবহৃত হয়; তার সাক্ষী—

অবধি অব + ধি = নিম্ন সীমা অর্থাৎ ইংরাজি গণিত শাস্ত্রে যাহাকে বলে Lower limit। পরিধি = চতুঃসীমা = periphery। আধি = আ + ধি। আধি শব্দের আ-উপসর্গ বলিতেছে যে আধি (কিনা মনঃপীড়া) মনের সহিত সংলগ্ন; ধি বলিতেছে যে তাহা মনের সীমা-প্রদেশে অর্থাৎ শরীর এবং মনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করে। সীমার ভাবের সঙ্গে আধার-আধেয়-ভাবের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তার সাক্ষী—

আধার-পাত্রের অন্তস্তর আধেয়-জলের সীমা-স্থান, এবং আধেয়-জলের বহিস্তর আধার-পাত্রের সীমা-স্থান। সীমা-স্থানের একদিকে আধার এবং আর একদিকে আধেয়, এই সূত্রে ধি শব্দের সীমা-অর্থ কোনো স্থলে বা আধার-অর্থে, কোনো স্থলে বা আধেয় অর্থে পরিণত হয়। তার সাক্ষী—

জলধি = জলের আধার, সমুদ্র।

নিধি = খনির আধেয় বস্তু, রত্ন।

ধি-শব্দের সীমা-অর্থ অধি-উপসর্গে সংক্রামিত হওয়াতে অধি-উপসর্গের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—বাচ্য বিষয়ের চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রভাবের বিস্তার। তার সাক্ষী—

অধিষ্ঠান = আশ্রয়-প্রদেশের চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া অবস্থান।

অধিকার = অভিলষিত স্থানের চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার।

বলিলাম "প্রভাব বিস্তার করা"—কিন্তু "প্রভাব বিস্তার" অধি-উপসর্গের অর্থের মুখ্য অবয়ব নহে, তাহার মুখ্য অবয়ব—সীমাবসায়িতা। এই জন্য সংস্কৃত গ্রন্থে অধিকার শব্দে অনেক সময়ে সীমা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা বুঝায়। "অমুকং অধিকৃত্য বর্ত্ততে" অর্থাৎ অমুকের সীমা আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ অমুককে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অধ্যাত্ম বিষয় কি? না যে বিষয় আত্মাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে—অর্থাৎ যাহা আত্মার সীমা আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে—আত্মার সীমার বাহিরে যায় না।

অধি-উপসর্গ এবং অধিক শব্দ উভয়ের মধ্যে উপাধি-গত যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে দেখিয়া দোঁহার মূলগত অর্থ-সাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা করা কোনো-ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বেদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রে অনেকানেক স্থলে উপসর্গ পৃথক্ শব্দাকারে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খুব সম্ভব যে, অত্যতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ মান্ধাতারও মান্ধাতার আমলে সকল স্থলেই উপসর্গগুলি ইংরাজি prepositionএর ন্যায় পৃথক্ শব্দাকারে ব্যবহৃত হইত। যাহাই হউক—অধিক এবং অত্যন্ত এই দুই শব্দের দুই অর্থ পরস্পর মিলাইয়া দেখিলে অধি এবং অতি এ দুই

উপসর্গের দুই অর্থের ভেদাভেদ অতীব উজ্জ্বল-রূপে পরিস্ফুট হয়। অধিক শব্দে বুঝায়—যাহা চরম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অত্যন্ত-শব্দে বুঝায়—যাহা অন্তকে অতিক্রম করে—সীমাকে অতিক্রম করে—সীমা ছাড়াইয়া উঠে। আমরা যখন বলি "অধিক ক্রোধ ভাল নয়" তখন তাহার অর্থ এই যে, যতটা ক্রোধ সম্ভবে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত ক্রোধ ভাল নয়। পক্ষান্তরে যখন বলি "আমাব অত্যন্ত ক্রোধ হইল" তখন তাহার অর্থ এই যে, আমার ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া উঠিল।

উপসর্গের অর্থ বোঝাই করিয়া প্রবন্ধের জাহাজ-খানি নানা-প্রকার প্রতিকূল স্রোত, ঘূর্ণার পাক, এবং চোরা পাহাড়, বাঁচাইয়া কোনো মত প্রকাবে তো বন্দরে আনিয়া উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে যাঁহারা আমার পণ্যদ্রব্য বাজারে যাচাই করিবেন, তাঁহা-দিগের সহিত একটি বিষয়ে আমি পূর্ব্বাহ্নে বোঝা-পড়া করিয়া রাখা শ্রেয় বিবেচনা করি—সেইটী হইয়া চুকিলেই আমার আজিকের কার্য্য শেষ হইযা যায়। কথাটী এই ঃ——

গণিতের প্রমাণ ছাড়া আর যত প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে সমস্তেরই বলবত্তা আপেক্ষিক মাত্র। বিজ্ঞান-মহলে প্রমাণের ঐকান্তিক বলবত্তা কেবল গণিতের যুক্তি প্রণালীতেই সম্ভবে। গণিতকে গণনার মধ্য হইতে সরাইয়া রাখিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অভ্রান্ত সত্য সংস্থাপন করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে; তবে কি? না যাহাতে উত্তরোত্তর সত্য হইতে সত্যে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে তাহার পথ পরিষ্কার করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এমন কি, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণেব সিদ্ধান্তটীও একান্ত অভ্রান্ত বলিযা—নিখুঁত অভ্রান্ত বলিয়া—গৃহীত হইতে পারে না। বলিতেছ মাধ্যাকর্ষণ;—কিন্তু একটা কিছুর মধ্য দিয়া—দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো প্রকার রজ্জু দিয়া—আকর্ষণ না করিলে আকর্ষণ করা হইতেই পারে না। সেই মধ্যবর্ত্তী বস্তু এবং মূল আকর্ষক বস্তুর মধ্যেও আকর্ষণ রহিয়াছে; সেই দ্বিতীয় আকর্ষণেব জন্য দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তী বস্তুর প্রয়োজন। দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তী বস্তু এবং মূল আকর্ষক বস্তুব মধ্যেও আকর্ষণ রহিয়াছে; সেই তৃতীয় আকর্ষণের জন্য তৃতীয় মধ্যবর্ত্তী বস্তুর প্রয়োজন। এইরূপ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যবর্ত্তী বস্তুর প্রয়োজন। সর্ব্ব প্রথম মধ্যবর্ত্তী বস্তু কে? সেই আদিম মধ্যবর্ত্তী বস্তু বিনা-রজ্জুতে অর্থাৎ অন্য কোনো মধ্যবর্ত্তী বস্তুব সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে মূল বস্তুর আকর্ষণে বাঁধা রহিবে? মূল আকর্ষক বস্তু তবে কি শূন্যের মধ্য দিয়া আকর্ষণ করিতেছে? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? ঐকান্তিক শূন্য দুই বস্তুর মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইলে উভয়ের মধ্যে ভৌতিক সম্বন্ধ সমূলে রহিত হইয়া যাইবারই কথা। অতএব মাধ্যাকর্ষণ-শব্দ কেবল বিজ্ঞানের গন্তব্য-পথ-নির্দ্দেশক একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; তা বই তাহা পরাকাষ্ঠা সত্যের পরিচায়ক নহে। সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নে যৎকিঞ্চিৎ সত্যের আভাস যাহা পাওয়া যায়, সেই আভাস-সত্য প্রকৃত সত্যের পদবী অধিকার করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলে, অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে সর্ব্ব-জগতের মূলাধার বলিয়া

পূজা করিতে পারেন; কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন তাহা ভাবিয়া পা'ন না। তবে, নিউটনের আবিষ্কৃত ঐ সাঙ্কেতিক চিহ্নটি যে, সত্য-নিকেতনের একটী প্রশস্ত রাজ-পথের ঠিকানা নির্দ্দেশ করে, এ বিষয়ে কাহারো মনে তিলমাত্রও সংশয় স্থান পাইতে পারে না।

ইহা দেখিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোনো প্রকার অভ্রান্ত মত সংস্থাপনের প্রয়াস পাইব? আমার কি হাস্যের ভয় নাই! ফলে, বর্ত্তমান্ প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত কোনো-একটী স্থানেও আমি গায়ের জোরে কোনো অভ্রান্ত মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি নাই। অপক্ষপাতী এবং অকপট যুক্তি ও বিচার আমাকে যে পথে চালাইয়াছে আমি সেই পথে চলিয়াছি। চাই আমি আর কিছু না—বর্ত্তমান প্রবন্ধের যে স্থানের যে যুক্তির যত-টুকু প্রামাণিকতা বা বলবত্তা সম্ভবে, তাহার অনুকর্ষিত সিদ্ধান্ত তত-টুকু সত্য বলিয়া গৃহীত হউক্—তা বই আমি অভ্রান্ত সত্যের কোনো দাবি রাখি না। আমার চরম মন্তব্য কথা এই যে, সুবিবেচনাপূর্ব্বক উপসর্গের প্রয়োগদ্বারা বঙ্গভাষার শক্তি শ্রী এবং নিষ্কর্ষতা (অর্থাৎ accuracy) সাধন করিবার যে, একটী সুন্দর পথ আছে, তাহার প্রতি যদি কোনো সজ্জন সাহিত্য-সেবকের চক্ষু ফুটাইয়া দিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

[সভাস্থলে আমার পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতির আসনারূঢ় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সর্ব্বশেষে উঠিয়া বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের সব স্থান তাঁহার স্মরণ নাই—অতএব তিনি আপাততঃ কোনো কথা বলিতে চাহেন না। কিন্তু তাহার পরেই, তিনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে এরূপ গোটা দুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যাহা প্রথম উদ্যমেই তড়ি ঘড়ি প্রকাশ না করিয়া—আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি তাহা অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া—পরে প্রকাশ যোগ্য বোধ হইলে, প্রকাশ করা উচিত ছিল।]

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, দুঃ উপসর্গের অর্থ শুধু যে, মন্দ, তাহা নহে—অনেক সময় দুঃ উপসর্গ অভাব-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, দুঃ = মন্দ বা কষ্টজনক। "বা কষ্টজনক" এটা যে আমি বলিয়াছি—শাস্ত্রী মহাশয়ের তাহা মনে না থাকাতে তিনি আমাকে অনভিজ্ঞ-বোধে বুঝাইলেন যে, দুঃ-উপসর্গ অনেক সময়ে অভাবজ্ঞাপক। তিনি বলিলেন "অভাব-জ্ঞাপক"—আমি না হয় বলিয়াছি কষ্ট-জ্ঞাপক—ভাবার্থ একই। বরং কষ্টে ভিক্ষা লব্ধ হয় এইরূপ অর্থ দুর্ভিক্ষের সহিত বেশী সংলগ্ন হয়—যেহেতু দুঃসাধ্য, দুষ্কর, দুর্জ্জয় প্রভৃতি ভূরি ভূরি শব্দে দুঃ উপসর্গ কষ্টের পরিজ্ঞাপক। শাস্ত্রী মহাশয় একজন অসামান্য ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিত—সেইজন্য আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া—উপসর্গের অর্থ-বিচারের অর্থ কি তাহা বিস্মৃত হইয়া—অর্থ-বিচারের কিরূপ প্রণালী-পদ্ধতি আমা কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বিস্মৃত হইয়া—পঠিত প্রবন্ধ উপলক্ষে কতকগুলি বৈয়াকরণিক বাজে কথার বক্তৃতা করিলেন।

প্রতিব্যক্তি প্রত্যহ প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত প্রতি'র অর্থ কি-হিসাবে প্রতিপক্ষতা-সূচক বা পরাঙ্মুখিতা-সূচক তাহা আমি খুলিয়া-খালিয়া বলিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সে সকল কথা গ্রাহ্যে না আনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে বলিলেন যে, "প্রতিজন" বলিলে প্রত্যেকের সহিত অপর সকলের কাহারো কোনো সম্বন্ধ বুঝায় না—সুতরাং প্রতিপক্ষতা সম্বন্ধ বুঝায় না। "প্রতি ব্যক্তি" বলিতে প্রত্যেকের সহিত অপর ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধ বুঝায় না—এটা তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। একটা বটবৃক্ষ যদি একাকী মাঠের মাঝখানে দণ্ডায়মান থাকে তবে তাহার তলে বসিয়া কোনো পথিক এরূপ কথা বলে না যে, আমি প্রতি বটবৃক্ষের তলে বসিয়াছি। পক্ষান্তরে, একজন আম্র-ব্যবসায়ী স্বচ্ছন্দে এরূপ কথা বলিতে পারে যে, আমি আজ আম্রোদ্যানের প্রতিবৃক্ষের সমস্ত আম্র উৎপাটন করিব। তবেই হইতেছে যে, আম্রোদ্যানের এক-একটী বৃক্ষ অপরাপর বৃক্ষের সহিত ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই, তদুপলক্ষে "প্রতিবৃক্ষ" এই বচনটীর সার্থকতা হয়। আগে তিন বৃক্ষ, বা চারি বৃক্ষ, বা আট বৃক্ষ, বা দশ বৃক্ষ, একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করে—পরে "প্রতিবৃক্ষ" বলিয়া অপর সকলের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ রহিত করিয়া—তাহাকে এক-ঘরে' করা হয়। সম্বন্ধ রহিত করা প্রতিপক্ষতারই লক্ষণ। আমি যদি বলি যে, তোমার সহিত আমার আজ অবধি সম্বন্ধ রহিত হইল, তবে সেই মুহূর্ত্তে তোমার আমার মধ্যে মিত্রতা-সম্বন্ধ খণ্ডিত হইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিপক্ষতা-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে। সম্বন্ধ সাধারণতঃ দুইরূপ, (১) অন্বয়াত্মক (positive), (২) ব্যতিরেকাত্মক (negative)। শাস্ত্রী মহাশয় যদি বলিতেন যে, "প্রতিজন" বলিলে অপর-সকলের সহিত প্রত্যেকের অন্বয়াত্মক সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার কথা ঠিক্ হইত; কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতাম যে, অন্বয়াত্মক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিত্যক্ত স্থানে ব্যতিরেকাত্মক সম্বন্ধ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হয়—যেহেতু মিলনের সম্বন্ধ রহিত করা'র নামই পরাঙ্মুখিতা-সম্বন্ধ সংস্থাপন করা। আমি তাই বলিয়াছি যে, "সকল" বলিলে বুঝায়—ব্যষ্টি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকে সমস্তের অন্তর্ভুক্ত; "প্রতি" বলিলে বুঝায়—ব্যষ্টি সমষ্টি হইতে (অর্থাৎ সাকল্য হইতে) মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রজ্ঞাপন করিতেছে। ফলে, প্রতি ব্যক্তির আদিস্থিত "প্রতি" এই শব্দটীতে এক রকমের প্রতিপক্ষতা-অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; আর সে প্রতিপক্ষতা যে কি রকমের প্রতিপক্ষতা, তাহা আমি যথাসাধ্য স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে ত্রুটি করি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় আরো বলিলেন যে, প্রতি ব্যক্তির আদিতে যে "প্রতি" শব্দ দেখা যায় তাহা উপসর্গই নহে। তাঁহার এ কথা খুবই সত্য ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় নিজে কি বলিয়াছেন? তিনি তাঁহার বক্তৃতার গোড়াতেই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, উপসর্গ যখন মূল শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে তখনই বিশিষ্টরূপে তাহার নাম দেওয়া হয় উপসর্গ; পক্ষান্তরে, যখন

তাহা মূল-শব্দ হইতে বিযুক্ত থাকে, তখন তাহার আর একটা নাম দেওয়া হয়। তবেই হইতেছে যে, বৈয়াকরণিক নাম-ভেদে উপসর্গের অর্থ-ভেদ হয় না। উপসর্গের অর্থের বিচারই বর্ত্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য—তা বই তাহার নাম-ভেদ বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাজে কথারই সামিল। অর্জ্জুন ও অর্জ্জুন—বৃহন্নলাও অর্জ্জুন। বিরাট-রাজার ন্যায় একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বৃহন্নলার 'অর্জ্জুন' নাম শুনিলে চমকিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির বৃহন্নলাকে "অর্জ্জুন" বলিয়া সম্বোধন করিলে সেজন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, "প্রতি" উপসর্গ উপসর্গই থাকুক, আর, তাহা 'অব্যয়' মূর্ত্তিতেই বিরাজ করুক্—আমার নিকটে দুইই সমান; কেননা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, উভয় স্থলেই তাহার মৌলিক অর্থ একই প্রকার। এমন কি, আমি মৌলিক অর্থের ঐক্য দেখিয়া অধি-উপসর্গ, ধি-শব্দ, এবং অধিক-শব্দ, তিনের মধ্যে বিশিষ্টরূপ ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে ইহা প্রথমে hypothisis স্বরূপে মানিয়া লইয়া, পরে যথোচিত প্রমাণ-প্রয়োগ-দ্বারা তাহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছি। প্রথমে পরিধি এবং অবধি এই দুই শব্দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ দুই শব্দে ধি-শব্দের অর্থ সীমা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তাহার পরে দেখাইয়াছি যে, অধিকার, অধিষ্ঠান প্রভৃতি শব্দে অধি-উপসর্গের অর্থ স্পষ্টই সীমাবসায়িতা। তাহার পরে, সীমা-ভাবের সহিত আধার-আধেয় ভাবের কিরূপ নিকট-সম্পর্ক তাহা দেখাইয়াছি। তাহার পরে দেখাইয়াছি যে, সেই সম্পর্ক-সূত্রে ধি-শব্দ কোথাও বা আধার-অর্থে কোথাও বা আধেয়-অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমার প্রদর্শিত এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি গ্রাহ্যে না আনিয়া—ঐ-সকল যুক্তি-প্রদর্শন আমি যেন দেয়ালকে করিয়াছি এইরূপ উচ্চভাব ধারণ করিয়া—তদুপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় একটী কথা ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন;

সে কথা এই যে, ধি-শব্দ ধা-ধাতু হইতে হইয়াছে। অথচ, ধি-শব্দ যে, ধা-ধাতু হইতে হয় নাই এরূপ কথা আমি কোনো স্থানেই বলি নাই। ধি-শব্দ যে-ধাতু হইতেই হউক্ না কেন—তাহার অর্থ কি তাহাই বিচার্য্য। মূল ধাতুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও ভাষার শব্দ-গাঁথনি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ধি এবং ধা একই—বিধি এবং বিধান একই। বিধান কি? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে rule। Rule টানা একপ্রকার সীমা নির্দ্দেশ করা—লেখা যাহাতে পংক্তির বাহিরে না যায় সেই উপলক্ষে সীমা নির্দ্দেশ করা। কালিদাস বলিয়াছেন যে,

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোর্বর্ত্মনঃ পরং ন ব্যতীয়ুং প্রজা স্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।

এখানে কালিদাস মনুর বিধানকে প্রজাবর্গের আচার ব্যবহারের সীমা-নির্দ্দেশক পথ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব অভিধানে ধা-ধাতুর অর্থ যাহাই থাকুক্ না কেন—ফলে দাঁড়াইতেছে যে, তাহার মৌলিক অর্থ সীমা-নির্দ্দেশ। ধি এবং ধা'র যখন একই রূপ অর্থ তখন আমি ধা'ও বলিতে পারি—ধি'ও বলিতে পারি। বলিয়াছি—ধি।

উপসর্গের অর্থ-বিচারের পরিবর্ত্তে উপসর্গের বৈয়াকরণিক মূলানুসন্ধান যদি আমার প্রবন্ধের ঘুণাক্ষরেও উদ্দেশ্য হইত, তবে ধা-ধাতু হইতে কিরূপে ধি-শব্দ, অধি-শব্দ এবং অধিক শব্দ তিনই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান-স্থলে, সে কার্য্যের ত্রুটির জন্য আমাকে দায়ী না করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিজে তাহা সুনির্ব্বাহ করিলেই সমস্ত গোলোযোগ মিটিয়া যায়। তাঁহার নিজের মন্তব্য এবং কর্ত্তব্য কার্য্য আমি করি নাই বলিয়া সেই অপরাধে—আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা যদি সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া যায়—ধি, অধি এবং অধিক তিন শব্দের মৌলিক অর্থ সাদৃশ্য সম্বন্ধে এত যে যুক্তি এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি সমস্তই যদি এক মুহূর্ত্তে কাঁচিয়া যায়—তবে উপসর্গের অর্থ-বিচারে প্রবৃত্ত না হওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল।

অধি-শব্দ যে পূর্ব্বে এক সময়ে পৃথক্ শব্দাকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় অস্বীকার করেনও না—করিতে পারেনও না;—যেহেতু উপনিষদের এক স্থানে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে "যদ্বিদিতাদথো অবিদিতাৎ অধি।" অধিক শব্দ আর কিছু না—কেবল অধি+ক। অন্ত এবং অন্তক এ দুই শব্দের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—অধি এবং অধিক এ-দুই শব্দের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ হইবারই কথা। আমি যথেষ্ট উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইয়াছি যে, অধি উপসর্গের অর্থ সীমাবসায়িতা; আর সেই সঙ্গে দেখাইয়াছি যে, অধিক-শব্দের অর্থ চরম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহা দেখিয়া কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, অধি-উপসর্গ এবং অধিক-শব্দ দুয়ের মধ্যে কোনো প্রকার মৌলিক সম্বন্ধ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিতান্তই ব্যাবহারিক practical। তাহা এই যে, বঙ্গভাষার ব্যবহারক্ষেত্রে সুবিবেচনাপূর্ব্বক উপসর্গ-প্রয়োগের পথ যথাসাধ্য পরিষ্কার করা; তা বই, যাহা বঙ্গভাষায় বেশী কাজে লাগে না—অথবা যাহা যথাবৎ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হয় না—তাহার অর্থের দৌড় এবং উৎপত্তির বিবরণ লইয়া ব্যাপকতা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি যে সু, দুঃ, অতি প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গকে বিচারের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছি তাহার কারণ এই যে, সেগুলির অর্থ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা একরূপ তেলা মাথায় তেল দেওয়া, অর্থাৎ তেল দেও উত্তম—না দেও কোনো ক্ষতি নাই। তবে কি? না আর আর গুরুতর কার্য্যের পথ আটক করিয়া দাঁড়াইয়া তেলা মাথায় তেল দেওয়া সুপরামর্শ-সিদ্ধ নহে।

পরা-উপসর্গ সম্বন্ধে, আমি আর একটু বিস্তার করিয়া বলিতে পারিতাম—বিস্তার করিয়া না বলা'র কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, পরা-উপসর্গের প্রয়োগ দেশীয় ভাষায় অতীব বিরল। পরাভব, পরাজয়, পরাক্রম, পরাহত, পরাঙ্মুখ, পরামর্শ (আর, তা ছাড়া আর গোটা দুই শব্দ যদি থাকে) এই এক মুষ্টি পরাপূর্ব্বক শব্দের জন্য পুঁথির পাতা বাড়াইবার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। পরা-উপসর্গ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার

গোড়াতেই শাস্ত্রী মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, পর-শব্দ হইতে কিম্বা পার-শব্দ হইতে কি পরা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে? অর্থাৎ আমি যেন প্রকারান্তরে বলিয়াছি যে, পর-শব্দ কিম্বা পার-শব্দ হইতে পরা-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তাল, নারিকেল এবং খেজুর এই সকল বৃক্ষের একইরূপ শাখাপত্রের ব্যবস্থা প্রণালী দেখিয়া আমি যদি বলি যে, উহাদের একটীর পুষ্টি এবং বর্দ্ধন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম বুঝিতে পারিলে, সেই সঙ্গে অপর গুলিরও তৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মের জ্ঞানলাভ হইতে পারে; তবে তাহার অর্থ এ নহে যে, তালগাছ হইতে নারিকেল গাছ হইয়াছে অথবা নারিকেল গাছ হইতে তালগাছ হইয়াছে। ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্বতন্ত্র, আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ স্বতন্ত্র। তবে, ডারুইনের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে উহারা সকলেই একই অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সন্তান-সন্ততি সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আমার মন্তব্য কথা কেবল এই যে, পর, পার এবং পরা তিনের মূলগত ঐক্য থাকিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু তিনের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ট শব্দ-সাদৃশ্য, আর, তেমনিই ঘনিষ্ট অর্থ-সাদৃশ্য। কঠোপনিষদে আছে "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং" ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যবর্গের পরলোকে গতির বিষয় বালকের মনে (অর্থাৎ চঞ্চলমতি ব্যক্তির মনে) প্রতিভাত হয় না। সম্পরায়=সং+পরা+অয়; তাহার মধ্যে সং উপসর্গের লক্ষ্য সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি; পরা-উপসর্গের লক্ষ্য পৃথিবীর ও-পারের প্রতি—দূর দেশের প্রতি; আর, অয় শব্দের অর্থ স্পষ্টই গতি। "সম্পরায়" কিনা সমগ্র জন-সাধারণের দূরদেশে গতি অর্থাৎ পরলোকে গতি। পরা-উপসর্গ এইরূপ দূরত্ব প্রতিপাদক। পর-শব্দও যে দূরতা-ব্যঞ্জক তাহা আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। ঘর এবং পর, এপার এবং ওপার, এই দুই কথার উল্লেখ মাত্রেই পর-শব্দের দূরতা-অর্থ আপামর সাধারণ সকলেরই মনে তৎক্ষণাৎ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত পর-শব্দের আর একটী সূক্ষ্ম-ভাবের দূরতা-অর্থ আছে; তাহা এইরূপ ঃ—

স্বার্থপর বলিলে বুঝায়—স্বার্থের দিকে যাহার সবিশেষ টান বা গতি। এই যে সটান গতি, ইহা একপ্রকার সাম্‌না-সাম্‌নি ভাবে সরল-রেখা-পথ অবলম্বন করে। এইরূপ সরল-রেখা-পথই জ্যামিতিক ভাষায় দূরত্ব বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। যাঁহারা সূক্ষ্ম বিচারে নারাজ তাঁহাদের পক্ষে ঘর এবং পর—এপার এবং পরপার—এই স্থূল দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। সেতারে গৎ বাজাইবার সময় মিড়ের প্রয়োজন হয় না, রাগ-রাগিণীর আলাপচারি করিবার সময়েই মিড় কাজে লাগে। যাঁহারা আলাপচারি করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের উপকারার্থেই আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম। সেতারের মিড় যেমন এক সুর মাড়াইয়া আর এক সুরে অলক্ষিত পদসঞ্চারে বিলীন হয়, তেমনি পর এবং পার এই দুই শব্দের 'সটান গতি' এই অর্থ অলক্ষিত পদসঞ্চারে দূরতা অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কুমার-সম্ভবে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গের বর্ণনা-স্থলে আছে—"ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি" অর্থাৎ দৃষ্টি-ছটা প্রেরণ করিলেন। ব্যাপার=বি+আ+পার এবং তাহার অর্থ প্রেরণ-ক্রিয়া। এইরূপ প্রেরণ-ভাবের সঙ্গে

দূরত্বের ভাব কেমন লপেটভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহা সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এইসকল ঠাস্ বুনানির কোন্ অবয়বের পর কোন্ অবয়ব তাহা দেখিবামাত্রই চক্ষে ধরা পড়ে, কিন্তু তাহার সূত্রগুলি টানাটানি করিয়া খুলিতে গেলে সমস্তই জটা পাকাইয়া যায়। অতএব, পর, পার এবং পরা তিনের মৌলিক অর্থ যে, একই রূপ, তাহা সোজা ভাবে স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জলের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—বাদ-প্রতিবাদের টানাটানিতে উহাদের ঐ সোজা মৌলিক অর্থ জটিল হইয়া পড়িলে, তখন তাহা কাহারো কোনো উপকারে আসিবে না।

সর্ব্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, উপসর্গের অর্থ-বিচারের যুক্তি-পদ্ধতি দুইরূপ হইতে পারে :—

(১) Scholastic deduction এবং (২) Baconian induction। এযাবৎকাল প্রথম পদ্ধতিটীই আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে;—সুতরাং দ্বিতীয় পদ্ধতিটী বৈয়াকরণিকদিগের মনঃপূত না হইবারই কথা। আমি ঐ দুই যুক্তি-পদ্ধতির কোন্‌টী অবলম্বন করিয়া উপসর্গের বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্ব-পঠিত প্রবন্ধাংশের গোড়াতেই স্পষ্টাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সেই গোড়ার বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় বোধ করি আমার উপর ওরূপ চড়াও হইতেন না। Baconian পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রচলিত facts সংগ্রহ, পরে তাহার উপর theory সংগঠন;—আমি তাহাই করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। Scholastic পদ্ধতি এই যে, অগ্রে বারো মুনির বারো theoryর কোনো একটী theoryকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা, পরে factকে গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। fact কিনা বৃত্তান্ত, theory কিনা সিদ্ধান্ত। Baconion পদ্ধতির আগে বৃত্তান্ত, পরে সিদ্ধান্ত; scholastic পদ্ধতির আগে সিদ্ধান্ত পরে বৃত্তান্ত। শেষোক্ত পদ্ধতির ফলদায়কতা কঠোর সত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে—কাজেই পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি ভিন্ন বিজ্ঞানের আর গত্যন্তর নাই। এ যাহা বলিলাম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যে-কিছু ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি সমস্তই Baconian induction পদ্ধতির প্রসাদাৎ।]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা।

এই গ্রন্থখানি পুরাতন মালদহের এক বর্ণক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই। গ্রন্থের প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। উহাতে সম্ভবতঃ কবির পরিচয় লিখিত ছিল। যে সময়ে তৈলঙ্গ মুকুন্দদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে কবি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মুকুন্দদেবের রাজ্যনাশের পরও গ্রন্থে কোন কোন কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যো নমঃ ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং ॥

দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ। ১। ঃ॥ নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুক-মুখাদমৃতং দ্রবসংযুতং। পিবত ভাগবতরসমালয়ং মুহু রহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ। ২ ॥

প্রণমহুঁ নারায়ণ অনাদি নিধন। স্সৃষ্টির পালন মূর্ত্তি পরম কারণ ॥
মায়ারূপে জগত কলুষ উদ্ধারিল। ব্যক্ত হৈঞা মুনিগণ সন্তর্পণ কৈল ॥
না বুঝে ইঙ্গিত যার দেব প্রজাপতি। পুনঃ পুনঃ সে দেবকে করিএ প্রণতি ॥
গণপতি প্রণমহুঁ বিঘ্ন বিনাশন। ভগবতী দেবীর সে বন্দহুঁ চরণ ॥
যার অনুভাবে হএ সরস কবিতা। শ্রুতি স্মৃতি অবিদিত বচন দেবতা ॥
আদি কবি বাল্মীকের বন্দহুঁ চরণ। জনক জননী বন্দো আদি গুরুজন ॥
সভা সভাপতির করিএ পরিহার। ক্ষেমিহ সকল দোষ কবিত্বে আক্ষার ॥
ক্ষার জল জলধরে বরিষে সুধা করি। সুপণ্ডিতে গুণ লএ দোষ পরিহরি ॥
ব্রহ্মার স্বজন দোষ গুণেত জড়িত। স্থাবর জঙ্গম আদি নানা দেশ উপনীত ॥
উৎকল পুণ্যদেশে অদ্ভুত কথন। জাত জগন্নাথরূপে বৈসে নারায়ণ ॥
নানাদেশ আচ্ছাদিল ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। পরম বৈষ্ণব সূর্য্যবংশে মহাতেজা ॥
কুনো রাজা দানে বলী কর্ণের সমান। কুনো রাজা জন যুধিষ্ঠিরের গেয়ান্ ॥
যেই রাজা স্বর্গে গেলা সাধি নিজ কাজ। তেন নৃপ মুকুন্দ হইলা মহারাজ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আদি জিনি সব গুণে। পৃথিবীর রাজা সব জিনিলেক দানে ॥
নিজ কুল-কমল-মিহির-মহাবংশ। দিগন্তর ভ্রমে যার সিতযশোহংস ॥
প্রচণ্ড প্রতাপ বীর পরম সুধীর। আপনিই গঙ্গা দ্বারে দিল গঙ্গানীর ॥
উৎকলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম্ম। শ্রীযুত মুকুন্দদেব সাধিল সেই ধর্ম্ম ॥
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিঞা শ্রবণে। বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণ নয়নে ॥
কুন গুণে মহারাজা হইবু গোচর। হৃদয়ে চিন্তিএ সার করহ অন্তর ॥"

ইহার পর প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই। দুইখানি পত্র যুড়িয়া একখানি ধরা হইয়াছে

এবং তাহার শেষখানিতে অঙ্কপাত করা হইয়াছে। এই শেষখানিতে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় পত্রে আছে,—

"অশ্বমেধ পুণ্য কথা বিবিধ প্রসঙ্গ। যাতে অশ্বরক্ষক কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গ ॥
শ্রীভাগবতে শুনি কৈল প্রবন্ধ পাঞ্চালী। শ্রীমহারাজ কিছু অবধান করি ॥
—সগুণ রাজ্যে ভোগ চিরকাল। এহিতে শুনিলে ভক্তি বাঢ়ে তৎকাল ॥
শ্রীরঘুনাথ বিপ্র কুলে উৎপত্তি। আইলুঁ তোমার দেশে গুণ শুনি অতি ॥
চিরকাল রাজ্য কর উৎকল মাঝে। পাঞ্চালী রচিয়া আইলুঁ তোমার সমাজে ॥
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে করিঞা কৌতুকে। আজ্ঞা দেহ আহ্মি পঢ়ি তুমার সভাতে ॥
শুনিঞাঁ বিপ্রের বোল রাজা হরষিতে। আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পঢ়িতে ॥
তখন সে নারায়ণীকে করিল স্মরণ। পদ ছন্দে পঢ়েন্ত যত বীরের চরণ ॥"

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই ভণিতা,—

"অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃতলহরী। পিবন্ত ভকত জন কর্ণঘট ভরি ॥
শ্রীযুত মুকুন্দদেব নৃপ শিরোমণি। পরম বৈষ্ণব দানে বলি কর্ণ জিনি ॥
উৎকল দেশনাথ যেন কল্পতরু। প্রচণ্ড প্রতাপ জ্ঞানে যেন সুরগুরু ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সম যার যশের মহিমা। প্রজার পালক যার যশের নাহি সীমা ॥
চিরদিন রাজ্য করি হৈল অকল্যাণ। অশ্বমেধ পর্ব্বকথা শ্রীরঘুনাথ ভাণ ॥"

প্রাগুক্ত কবিতাগুলি পাঠে অবগত হওয়া যায়; গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করিয়া উৎকলেশ্বর মুকুন্দদেবের সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেবের অকল্যাণ হইয়াছিল। সে অকল্যাণ কি? মুকুন্দদেব ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের পাঠানরাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। তখন সোলেমান কর্‌রাণী গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত হন। রঘুনাথ এই ঘটনার পরে আপন গ্রন্থের সম্পূর্ণতা বিধান করেন। গ্রন্থের রচনা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে হইয়াছিল, ইহা অনুমিত হইতে পারে।

আমরা হস্তলিখিত যে গ্রন্থখানি পাইয়াছি, তাহা ১০৩১ সালে লিখিত। অতএব গ্রন্থখানি বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের একখানি। পুথিখানি ২৭৪ বৎসরের পুরাতন। কাশীরাম দাসের সময় নির্ণয়ে গোল রহিয়াছে। কাশীরামের গ্রন্থে নানাজনের হাত পড়ায় উহার আদি অবস্থা জানা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। রঘুনাথের অশ্বমেধপঞ্চালিকায় কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। লেখকের দোষে, কোন কোন অংশ যে পরিবর্ত্তিত না হইয়াছে এমন নয়। গ্রন্থের শেষ অংশ এইরূপ,—

"——ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চালিকা প্রবন্ধে শ্রীরঘুনাথ কৃতৌ অশ্বমেধ পর্ব্বং সমাপ্তেতি ॥*॥

শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ। কৃষ্ণাদশম্যাং তিথৌ বেলা প্রহর তিন উপরান্ত ॥ রোজ সোমবার ॥ ফতেয়পুরগ্রামনিবাসীয় শ্রীগৌরীদাস সাহু পুস্তকমিতি ॥ জাহ্নুকী গ্রামেন লিখিতং সৌ কুলে জন্ম ফতেপুরনিবাসীয় শ্রীগৌরী-

দাসস্ত লিখিতমিতি ॥ ভগ্নপৃষ্ঠ কটিগ্রীব স্তব্ধদৃষ্টিরধোমুখঃ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং শোধয়িষ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। শ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ। শ্রীমহাদেব্যৈ নমঃ ॥ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যো নমঃ ॥ পিতামাতা চরণেভ্যো নমঃ ॥"

গ্রন্থকার কাশীরাম দাসের পূর্ব্বতন কি অধস্তন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, বোধ হয়, পূর্ব্বতন লোক। কোথায় বাস করিতেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। রাঢ়ের কি মালদহের লোক তাহা বলা যায় না। তাঁহার ব্যবহৃত অনেক গ্রাম্য শব্দ মালদহ জেলার ভাষায় দৃষ্ট হয়। যে গৌরীদাস সাহুর এই পুস্তক তাঁহার নিবাস ফতেপুর। এই গ্রাম পুরাতন মালদহের নিকট ছিল, এখানে এখন লোকের বাস নাই। চৈতন্যের নামে পাগল মালদহের লোক, চৈতন্যের নামও করে নাই। বোধ হয়, গ্রন্থলেখনের সময় মালদহের লোক এখনকার ন্যায় বৈষ্ণব হয় নাই।

এই গ্রন্থ, জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্ব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা ঃ—

"অশ্বমেধ পুণ্য কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ গাথা, মন দিয়া শুনে পুণ্যবান্।
নাশ যায় পাপচয়, পুণ্য হয় অতিশয়, জৈমিনি সংহিতা বচন ॥"

এই গ্রন্থে কেবল পয়ার ও ত্রিপদীছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী নামকরণ হয় নাই। পয়ারকে হ্রস্ব ছন্দ এবং ত্রিপদীকে দীর্ঘ ছন্দ বলা হইয়াছে। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরী নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষর অপেক্ষা অধিক বা অল্প অক্ষরেও পয়ারের চরণ রচিত হইয়াছে। যথা,—

(১) "হেন সে ঘোটক আদি নাহি দেখি কুনো কালে।"

(২) "ত্রেতাযুগে ছিলা রাম সেনাপতি।"

অধিকাংশ স্থলে "কে" ও "তে" বিভক্তির স্থানে "ক" ও "ত" ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা "ঘোড়াকে" ও "বেদেতে" না বলিয়া "ঘোড়াক" ও "বেদেত" বলা হইয়াছে।

"যথা" শব্দের স্থলে "জাত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"জাত জগন্নাথ রূপে বৈসে নারায়ণ।"

"বলিলেন," "দেখেন," করিলেন" প্রভৃতি নকারান্ত ক্রিয়াপদের স্থলে "বলিলেন্ত," "দেখেন্ত," "করিলেন্ত" ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"পদ ছন্দে পঢ়েন্ত যত বীরের চরণ।"

"ইয়া" প্রত্যয়ের স্থলে ঞিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে,—যথা—"করিয়া," "বুলিয়া," "খাইয়া" স্থলে "করিঞা," "বুলিঞা," "খাইঞা" প্রভৃতি।

"উক" প্রত্যয়ের স্থলে "উ" বা "ঔক" ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন "ধরুক" ও "সহুক" না বলিয়া "ধরৌ," "সহৌক" ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথমা বিভক্তির এক বচনে কখন কখন "এ" ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "রাজা" না বলিয়া "রাজাএ" বলা হইয়াছে।

কোন কোন স্থলে "চাও," "কও" প্রভৃতি ক্রিয়া পদের স্থলে "চাহসি" "কহসি" প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় এই পুস্তকে "দেবদেবী" না বলিয়া "দেবাদেবী" বলা হইয়াছে।

পুরাতন বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র "পড়িল," "বাড়িল," "চড়িল" প্রভৃতি স্থানে "পঢ়িল," "বাঢ়িল" ও "চঢ়িল" প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যথা—"আঠান্তিরে," "সম্বায়," "মুকায়" প্রভৃতি।

কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। কোন কোন স্থানে সুন্দর মিল আছে, কেবল দুটী একত্র মাত্র শব্দ পৃথক্। বলিতে পারিনা, কে কার নিকট ঋণী। গ্রন্থকার যে দেশের লোক, সে দেশে তখন মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ প্রতাপ। পুরস্কার পাওয়ার আশায় গ্রন্থকার, উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। পরের রচনা একটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া পরিচিত করিতে কি তাঁহার সাহস হইয়াছিল? নানা কারণে অনুমিত হয়, রঘুনাথ, কাশীরামের পূর্ব্বতন লোক। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণে বর্ণিত রামাশ্বমেধের বর্ণনা আছে। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"ত্রেতাযুগে ছিলা রাম নরপতি। বিষ্ণু অবতার দশরথের সন্ততি॥
তার পত্নী সীতা যদি রাবণে হরিল। সপুত্র বান্ধব রাম তাক সংহারিল॥
অনল পরীক্ষা দিয়া আনিলেন্তি সীতা। জনকনন্দিনী সতী অতি সুচরিতা॥
সীতাক লইয়া শ্রীরাম কমললোচন। অযোধ্যাক্রে কবিল গমন॥
বিভীষণ আদি করি রাক্ষস প্রভৃতি। আইলা সুগ্রীব নামে বানরের পতি॥
দেশে আসি রাম আইলা অযোধ্যানগরে। বহুকাল রাম রাজা সুখে রাজ্য করে॥
কিঙ্কর সোদর দ্বারে বহু নৃপগণ। পুত্রসম করে রাজা প্রজার পালন॥
তিন বজ্রসম বাক্য রাম নিয়োজিল। বলাবল করিতে কেহ কাকো না পারিল॥
রাজ্য পালিতে রামের আছিল হেন মতি। চারিযুগে তার সম নাহি ছিল নৃপতি॥
নব সহস্র বৎসর সে নিত্য ব্যবহার। রাজ্য করে রাম রাজা বিষ্ণু অবতার॥
কতো কালে রাম রাজার পুত্র না হৈল। হৃদয়েত শ্রীরামের দুঃখ উপজিল॥
বশিষ্ঠ সে নামে রাজার কুলপুরোহিত। শ্রীরামের পুত্র হেতু মন্ত্র জপে নিত॥
তবে সে জানকী দেবী হৈলা গর্ব্ভবতী। শ্রবণার শেষ পাদে গর্ভ উৎপত্তি॥
গর্ব্ভবতী হৈঞা সীতা আছে চারি মাস। কেলি কুতূহলে ছিলা শ্রীরামের পাশ॥
পঞ্চমাসে শ্রীরাম সে এ স্বপ্ন দেখিল। গঙ্গাতীরে সীতা লৈঞা লক্ষ্মণ এড়িল।
"শোকে সে বিলাপ সীতা করে গঙ্গাতীর। হেন স্বপ্ন দেখি যে শ্রীরাম মহাবীর॥
বশিষ্ঠকে স্বপ্ন রাম কহিল সকল। যেন স্বপ্ন দেখিলেন্ত রাম মহাবল॥
এতেক কহিঞা রাম স্থির কৈলা মতি। পুংসবন কর্ম্ম দেখিল হইল সম্প্রীতি॥

শ্রীরাম বৌলেন্ত শুন কুলপুরোহিত। সীতার পুংসবন চাহ দিবস বিহিত॥
রাজার বচন শুনি কহে ব্যবহার। পঞ্চ দিবস লগ্ন আছয়ে এহার॥
এ পুষ্প নক্ষত্রে রাম কর পুংসবন। তার অনুরূপ তুমার হইব নন্দন॥
মুনির বচন শুনি রাম নরপতি। লক্ষ্মণকে ডাক দিয়া বোলে শীঘ্রগতি॥
পঞ্চ দিবসে আমি করি পুংসবন। জনক রাজাকে আন করিঞা যতন॥
গুরু মোর বিশ্বামিত্র আনহ সত্বর। চলহ লক্ষ্মণ ঝাটে বিলম্ব না কর॥
রামের বচন শুনি সুমিত্রা নন্দন। শ্রীরামকে প্রণমিঞা চলে ততিক্ষণ॥
শিল্পী চিত্রগণ সব আনি শীঘ্রগতি। বিচিত্র মণ্ডপ সব তোলে শীঘ্রগতি॥
বিশ্বামিত্র মুনি আইলা রাম সন্নিধানে। জনক লইঞা আইল সুমিত্রা নন্দনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা রাম দুহাক অর্চ্চিল। বশিষ্ঠ মুনিএ তব যজ্ঞ আরম্ভিল॥
সীতার সহিত রাম যজ্ঞের মণ্ডপে। সবান্ধবে বৈসে রাম উপরে চন্দ্রাতপে॥
বেদের বিধানে পুংসবন সে করিল। বহুধনে রাম সে মুনিক তুষ্ট কৈল॥
জনক রাজার আর নাহিকে তনয়। দুহিতা জানকী রাম জামাতা মহাশয়॥
ই কারণে নিজ রাজ্য শ্রীরামকে দিল। বিশ্বামিত্র সঙ্গে রাজা তপোবনে চলিল॥
তপোবনে প্রবেশিল জনক নৃপতি। পাইল শ্বশুর দেশ রাম মহামতি॥
যজ্ঞের মণ্ডপ বিপ্রগণ নমস্করি। সীতার সহিত রাম গেলা নিজ পুরী॥
শয়নে আছেন্ত রাম পালঙ্ক উপরে। বসিয়াছে সীতাদেবী রামের গোচরে॥
শ্রীরামে পুছিল সীতা কহ অভিলাষ। কুন দ্রব্য থাকে নিতে তোর প্রতি আশ॥
সীতা বোলে তোমার প্রসাদে প্রভুবর। ত্রিভুবনের দ্রব্য আছে আমার সে ঘর॥
আর কুন দ্রব্য নাহি মোর প্রতি আশ। সবে এক বস্তু প্রতি আছে অভিলাষ॥
তপোবনে যাই যথা ভাগীরথী-তীর। মুনিপত্নী দেখে গিঞা আশ্রম সুরুচির॥
সীতার বচনে রাম হাসিতে বুলিল। এতকালে বনবাসে সন্তোষ না হৈল॥
পুন বন যাইতে শ্রদ্ধা হইল তুমার। হউক যাইহ কালি ভাগীরথী পার॥
ই বলিয়া নিদ্রা গেলা রাম মহাশয়। বাহির হইল রাম প্রভাত সময়॥
রজনীত বেড়ায় নগরে সহচর। প্রভাতে কহেন্ত * * শ্রী * * ॥
* * * * রজনীত প্রসঙ্গ শুনিল। সকল রহস্য আসি রামকে কহিল॥
শ্রীরামকে চরে কহে নিভৃত কাহিনী। পুন জিজ্ঞাসিল সে শ্রী * * * ॥
সত্য কর চর মোরে অসত্য পরিহরি। দোষ গুণ কিবা বোলে অযোধ্যা নগরী॥
মোর কুন দোষ গুণ বোলে লোকজন। কোন দোষ * * * বোলে ভ্রাতৃগণ॥
সীতার কহেন্ত লোক কুন গুণদোষ। মোর কুন গুণতে প্রজার পরিতোষ॥
স্বরূপ বচন কহ প্রজার পালন। * * * * * ॥
রামের বচনে এক চরে কহে কথা। তাহার বচনে রামের নাহিকে অন্যথা॥

সর্ব্ব প্রজানাথ গোসাঞী বলে মহাবল। তুমা সম কেহো নহে পৃথিবী ভিতর॥
সর্ব্বগুণে তুমাক প্রশংসে সর্ব্বলোক। এক বোল শুনি আজি পাইনু বড় শোক॥
এক সে রজক নারী কলহ করিঞা। বাপের ঘরতে গেল স্বামীক এড়িয়া॥
চারি দিন ছিল বাপের ঘরে গিঞা। সুচরিতে ছিল বাপ মাও আনন্দিঞা॥
আর দিন তার বাপ সংহতি করিঞা। বন্ধু সঙ্গে তার ঘরে কন্যা দিল নিঞা॥
তবে তাগ দেখিঞা রুষিল তার পতি। চারি দিন নাহি তুঞি আমার সংহতি॥
নারী হৈঞা পর ঘরে থাকে এক রাতি। পুরুষে কি করিতে পারে তাহার শকতি॥
তুমাক বর্জ্জিল আমি যাহ বাপ স্থানে। রাম রাজা হেন আমি না চিন্তিহ মনে॥"

স্থানান্তরে—

"নয়ন অগোচর যদি হইল লক্ষ্মণ। মূর্চ্ছিতা হৈঞা সীতা পড়িলা তখন॥
বনে পশু পক্ষী সব টাকে অতুলিত। সে সব শুনিয়া সীতা পাইলে সম্বিত॥
চেতন পাইয়া সীতা কান্দে উচ্চস্বরে। হরিণী কাতর যেন ফুটি বিদ্ধশরে॥
সীতার ক্রন্দন শুনি বনে পশুগণ। ছাড়িয়া আহার পানী চাহে ঘন ঘন॥
"মহাশোকে কান্দে দেবী ছাড়ি দীর্ঘ নাদে। সঙ্গ ভঙ্গ মৃগ যেন সঙ্গ নাহি বান্ধে॥
চমকিত নয়ন দেখি চাহে স্থানে স্থান। বন পশু পক্ষী দেখি ভয়ে কম্পমান॥
কুশের কণ্টক তার ফুটিল চরণে। আকুল হইঞা সব দেখে দেবগণে॥
ক্ষণে হাটে ক্ষণে কান্দে বনে একাকিনী। যোড় হারাইঞা যেন কাতর হরিণী॥

স্থানান্তরে—

"রথে আরোহণ করি সুমিত্রা কুমার। রহ রহ করি দিল ধনুর টঙ্কার॥
অকালে জলদ যেন করিল গর্জ্জন। ধনুর টঙ্কার ভয় পাইল ত্রিভুবন॥
ক্রুদ্ধ হৈঞা আইল বীর রণ করিবার। হাসএ কুমার লব ভয় নাহি তার॥
একবারে যোড়ে বীর একাদশ বাণে। চারি বাণে চারি ঘোড়া কাটিল তামনে॥
আর বাণে কাটিল হাতের ধনুর্ব্বাণ। চারি বাণে রথের চাকা কৈল খান খান॥"

স্থানান্তরে

"যে জন দুর্ব্বল হয়, সেহি চাহে পরিচয়, বলবন্ত করএ সংগ্রাম।
বীর পথ এড় যবে, পরিচয় করি তবে, তত্ত্ব কথা শুন কহি রাম॥
আমি দুই কুশ লব, সীতার উদর সম্ভব, মুনিগণ জন মেলি বসি।
ধনুর্ব্বিদ্যা বেদ মন্ত্র, জানিল সকল তন্ত্র, গুরু মোর বাল্মীক মহাঋষি॥
রামায়ণ বেদ পাঠ, যে মুনির চিন তাক, আমা দুই ভাইরে পঢ়াইল।
সেই মহাপুণ্য অতি, মহামুনি সন্নিহতি, আমি দুই সতত পাইল॥"

উদ্ধৃত অংশের কেবল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছি। গ্রন্থের কোন কোন পত্রের

স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য পড়িতে পারা যায় না। গ্রন্থের কোন কোন স্থানের অর্থবোধ হয় না। রচনা স্থানে স্থানে মনোহর।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন।

পালবংশীয় রাজগণের প্রদত্ত এপর্য্যন্ত ৫ খানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই কয়খানির উপর নির্ভর করিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম ও কিল্‌হোর্ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পালবংশীয়গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে কি অনির্দ্দিষ্ট-কালজ্ঞাপক সেই কয়খানি তাম্রশাসন হইতে তাঁহারা কেহই আশানুরূপ ইতিহাস সংগ্রহে সুবিধা করিতে পারেন নাই। তবে এইমাত্র বলিতে হইবে যে পূর্ব্বে পালরাজগণের বংশাবলী সম্বন্ধে যে সকল অমূলক প্রবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা ভঞ্জন করিতে ঐ সকল সাময়িক লিপি অনেকটা সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু পালরাজগণের প্রকৃত ইতিহাসের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। আজ আনন্দের সহিত যে তাম্রশাসন খানির পরিচয় দিতেছি, তিমিরাবৃত পালরাজগণের ইতিহাসে এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি অনেকটা সত্যালোক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই আজ আমরা এই অত্যাবশ্যক তাম্রশাসনখানির সমস্ত পাঠোদ্ধার করিয়া ইতিহাসপ্রিয় সুহৃদ্বর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বেশী দিনের কথা নয়, দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় দিনাজপুর হইতে দুইখানি খোদিত তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে একখানি মহীপালদেবের প্রদত্ত ও অপর খানি আমাদের আলোচ্য মদনপালদেবের তাম্রশাসন। মহীপালের তাম্রশাসন ছাড়িয়া এখন কেবল আমরা মদনপালদেবের তাম্রশাসন সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

কিরূপে এই তাম্রশাসন খানি সাহিত্যানুরাগী বসু মহাশয়ের হস্তগত হইল, এখনও তাহার সকল সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তিনি শীঘ্রই লিখিয়া পাঠাইবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। তখন সকলে জানিতে পারিবেন।

যতদূর দেখিলাম, এই তাম্রশাসন খানির বিষয় অধিকাংশই সম্পূর্ণ নূতন ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখানির পরিচয় এ পর্য্যন্ত আর কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই; এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন।

(সম্মুখ ভাগ).

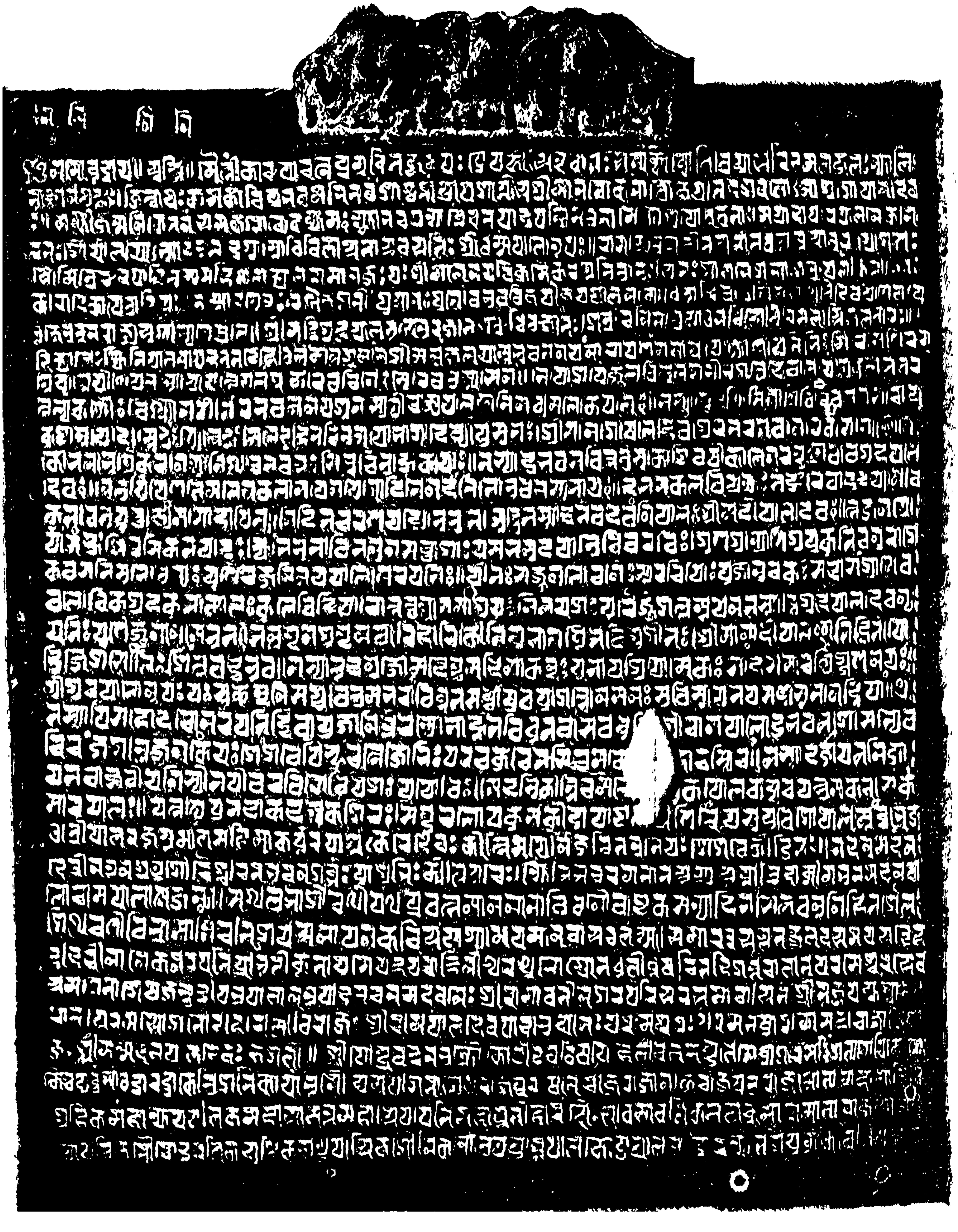

গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন।

(পশ্চাৎ ভাগ)

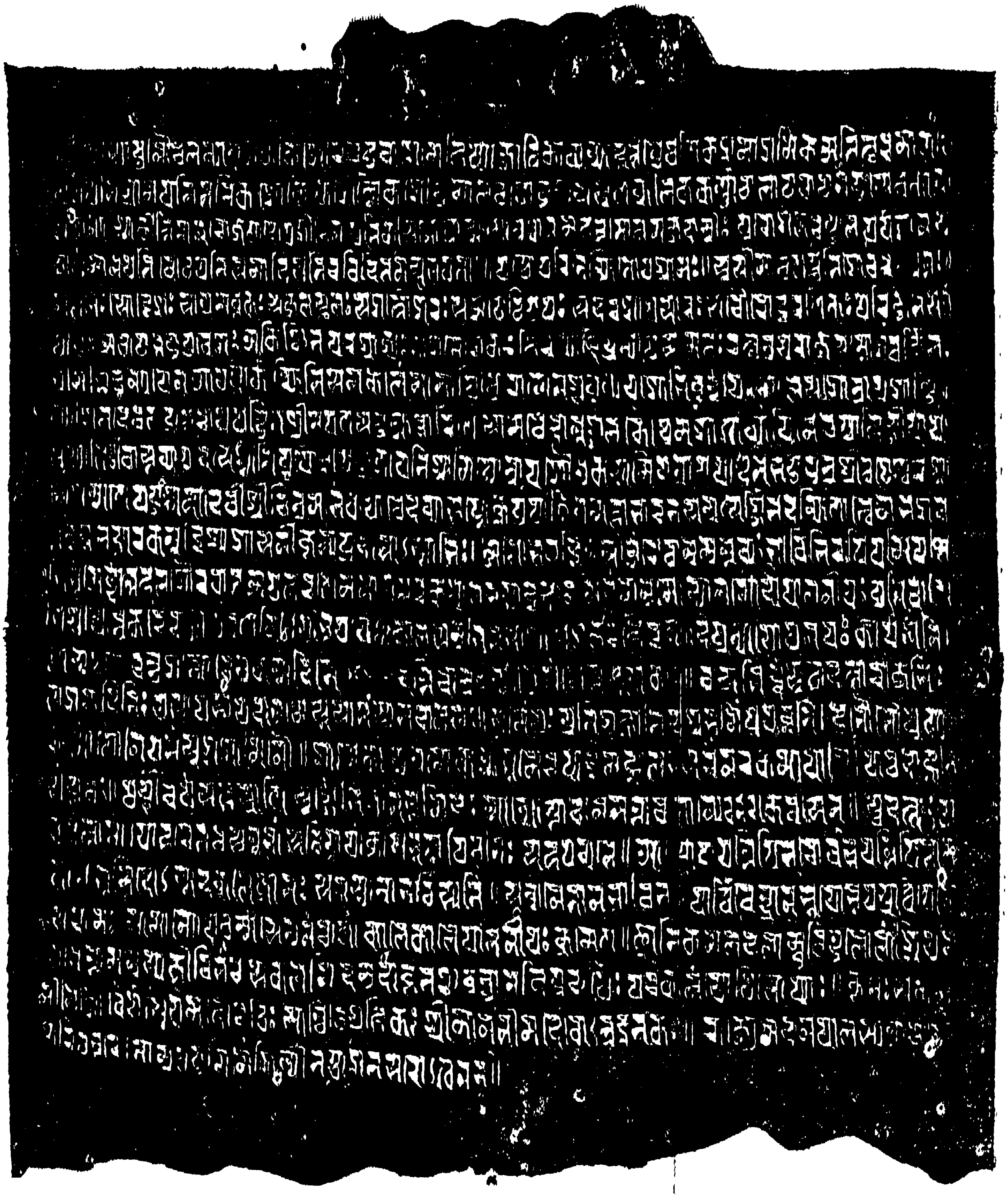

৫ম ভাগ ১৪৪ পৃষ্ঠা।

এই তাম্রশাসন একখানি ফলকে উৎকীর্ণ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫¼ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ১৫ ইঞ্চ ইহার উভয় পৃষ্ঠায় লিপি আছে।

লাঞ্ছন।—তাম্রশাসনের ঊর্দ্ধভাগে পালরাজগণের রাজচিহ্নজ্ঞাপক লাঞ্ছন মূল-ফলকের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। মূল ফলক ছাড়াইয়া ইহা ৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সম্মুখভাগ চারিদিক্ পাতালতা ও শঙ্খঘণ্টাদি দ্বারা অলঙ্কৃত; এই অংশের মধ্যস্থানে লাঞ্ছন বা রাজচিহ্ন। উহা একটী গোলাকার চক্রমধ্যে উৎকীর্ণ; ইহার মধ্যভাগ ক্ষুদ্র তারাচিহ্নরূপ দুই সারি সমরেখা দ্বারা দুই ভাগ করা হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধভাগে মধ্যস্থলে ধর্ম্মচক্র, তাহার দুই পার্শ্বে চক্রাভিমুখী দুইটী মৃগমূর্ত্তি। রেখার নিম্নে উচ্চাক্ষরে "শ্রীমদনপালস্য" এই শব্দ লেখা আছে।

অক্ষরবিন্যাস।—প্রায় আটশত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, এই তাম্রশাসনখানি সেই অক্ষরে লিখিত। ইহার কতকগুলি অক্ষর মৈথিল অক্ষরের সদৃশ; কতকগুলি বর্ণ কুটিলাক্ষরের অনুরূপ। ডাক্তার বেণ্ডল নেপাল হইতে গৌড়াধিপ গোবিন্দ-পালদেবের সময়ে লিখিত যে তালপত্রের পুথি বাহির করিয়া প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচ্য তাম্রশাসনের লিপিবিন্যাস অবিকল তদনুরূপ। ডাক্তার বেণ্ডল এই লিপিকেই প্রাচীনতম বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

অক্ষরবিন্যাস সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে—

অন্তস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব' সর্ব্বত্রই একরূপ, কেবল অন্তস্থ "ব" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যেরূপ 'ধ' আছে, ইহার একস্থানে কেবল সেইরূপ প্রাচীন আকারের 'ধ' দৃষ্ট হইল[২]। রেফের পর অধিকাংশ স্থানেই ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্বরূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে; কোথাও রেফ উঠে নাই, কিন্তু প্রায় সেই সেই স্থানে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব আছে। কোথাও 'দ' এবং 'হ' এক রকম উঠিয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই 'ন' অক্ষরের স্বতন্ত্র রূপই গৃহীত, আবার কোথাও 'ন' এবং 'ত' এক রকমই খোদা হইয়াছে। 'য' এবং 'প'বর্গে' বড় একটা পার্থক্য নাই। 'শ'র পরিবর্ত্তে কএক স্থানে 'স' লিখিত হইয়াছে। ছয় স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন দৃষ্ট হইল।

পালরাজগণের নাম।—ইতিপূর্ব্বে কিল্‌হোর্ণ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পালরাজগণের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ধারাবাহিকরূপে মোট ১১ জন পাল রাজার নাম পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনে ধারাবাহিকরূপে ১৭ জন রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। পর পৃষ্ঠায় বংশতালিকা উদ্ধৃত হইল—

(১) C. Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS, p. iii and plate II, no 4.

(২) ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1891, part I, p. 77-79.

- ১ম গোপালদেব ১
  - ধর্ম্মপাল২
    - দেবপাল*৩
    - জয়পাল
      - ১ম বিগ্রহপাল ৪
        - নারায়ণপাল ৫
          - রাজ্যপাল ৬
            - ২য় গোপাল ৭
              - ২য় বিগ্রহপাল ৮
                - ১ম মহীপাল ৯
                  - নয়পাল ১০
                    - ৩য় বিগ্রহপাল ১১
                      - ২য় মহীপাল ১২
                      - শূরপাল ১৩
                      - রামপাল ১৪
                        - কুমারপাল ১৫
                          - ৩য় গোপাল ১৬
                        - মদনপাল ১৭
  - বাক্‌পাল

এই ১৭ জন রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কে কোন্ সময়ে কতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা এই তাম্রফলকে বর্ণিত হয় নাই।[১] মদনপালদেবের পট্টমহিষী চিত্রমতিকা বটেশ্বরস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে মহাভারত পাঠে নিযুক্ত করেন, ভারতপাঠের দক্ষিণাস্বরূপ গৌড়াধিপ মদনপাল উক্ত ব্রাহ্মণকে বর্ত্তমান তাম্রশাসন দান করেন। বর্ত্তমান শাসনের দূতক মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব। মদনপালের রাজত্বের ৮ম বর্ষে তথাগতসর নামক শিল্পিকর্ত্তৃক এই তাম্রফলক উৎকীর্ণ হয়। মূল তাম্রশাসনের যথাদৃষ্ট পাঠ ও অনুবাদ পরে প্রকাশিত হইল।

* ৪র্থ শ্লোকের অনুবাদিত অংশের টীকা দ্রষ্টব্য।

(১) পালরাজগণের কাল-নির্ণয় ও বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(সম্মুখভাগ।)

শ্রীমদনপালস্য।

(১ম পংক্তি) ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ স্বস্তি ॥

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ

সম্যক্সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলঃ[১]-ক্ষালি-

(২য় পংক্তি) তাজ্ঞানপঙ্কঃ।

জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তীং[২]

স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেব*

(৩য় পংক্তি) ঃ ॥[১]

লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ্বোঢ়[৩] ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং

পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাং।

মর্য্যাদাপরিপালনৈকনি-

(৪র্থ পংক্তি) রতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদ্ভূ[৪]

দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসবাসবসতিঃ শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥[২]

রামস্যেব গৃহীত সত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ[৫]

(৫ম পংক্তি) সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্পালনামানুজঃ [।]

যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে

শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভির-

(৬ষ্ঠ পংক্তি) করোদেকাৎপত্রা[৬] দিশঃ ॥[৩]

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুমানঃ[৭]

পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।

ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে

যঃ পূ-

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী অংশ মূল তাম্রশাসনে নাই।

১ (বিসর্গ হইবে না।)

২ প্রকৃত পাঠ—'শান্তিং'। ৩ বোঢ়ুং। ৪ ঽস্মাদভূৎ। ৫ গুণৈঃ। ৬ দেকাতপত্রা। ৭ পুনানঃ।

(৭ম পংক্তি) র্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ [৪]

শ্রীমদ্বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।

শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ* ॥[৫]

(৮ম পংক্তি) দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্ গুণান্

শ্রীমন্তং জনয়াম্বভুব তনয়ং নারায়ণং সুতাভ্‌ভং[৮] ।

যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ সিরোমণি[৯]-রুচা-

(৯ম পংক্তি) শ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং

ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকারচরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥[৬]

তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ত্তৈ-

দেবালয়ৈশ্চ[১০] কুলভূধর-

(১০ম পংক্তি) তুল্যকক্ষ্যৈঃ[১১] ।

বিখ্যাতকীর্ত্তি[১২]রভবত্তনয়শ্চ তস্য

শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ ।[৭]

তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট[১৩]-

(১১শ পংক্তি) কূটান্বয়েন্দো

স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।

শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইতৈ-

(১২শ পংক্তি) কো[১৪]

ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গকায়াঃ ॥[৮]

তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী

কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপাল-

(১৩শ পংক্তি) দেবঃ।

পিতু[১৫] প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন

* এখানে 'ধ' অক্ষব পূর্ব্বতন পালরাজগণের লিপিতে যেরূপ আছে, সেইরূপ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত এই তাম্রশাসনলিখিত আর কোন 'ধ'র সহিত মিল নাই।

৮ স প্রভুং। ৯ শিরোমণি। ১০ দেবালয়ৈশ্চ। ১১ কক্ষৈঃ। ১২ কীর্ত্তিঃ। ১৩ রাষ্ট্রকূটা°। ১৪ ইবৈকো। ১৫ পিতুঃ।

যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥[৯]
হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা-
(দ)নধি-
(১৪শ পংক্তি) কৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং ।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মা-
দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥[১০]
ত্তজন[১৬]যো-
(১৫শ পংক্তি) ষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং
বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রস্থভ[১৭]মুদয়াদ্রেরিব রবিঃ ।
গুণগ্রাম্যা স্নিগ্ধ প্রকৃতিরনুরাগৈ-
(১৬শ পংক্তি) কবসতিঃ
স্থতো ধন্যপুণৈ[১৮] রজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥[১১]
পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা
সংগ্রামেক[১৯]
(১৭শ পংক্তি) বলোধিকগ্রহকৃতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাং ।
চাতুর্ব্বন্য[২০]-সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃ পূরৈর্জ্জগল্লম্ভয়ন্
তস্মাদ্বিগ্রহপালদেবনৃ-
(১৮শ পংক্তি) পতিঃ পুণ্যৈর্জ্জনানামভূৎ ॥[১২]
তন্নন্দনশ্চন্দনবারিহারি ।[২১] কীর্তি[২২]প্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
(১৯শ পংক্তি) দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভুব ॥[১৩]
তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রমহিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া-
নেকঃ সাহসসারথিগগুণনয়ঃ[২৩]
(২০শ পংক্তি) শ্রীশূরপালো নৃপঃ ।

১৬ ত্যজন্ । ১৭ প্রসভ । ১৮ পুণ্যৈঃ । ১৯ সংগ্রামৈক । ২০ চাতুর্বর্ণ্য । ২১ (ছেদ হইবে না)। ২২ কীর্ত্তি । ২৩ গুণময়ঃ ।

যঃ স্বচ্ছন্দনিসগ্‌গ[২৪] বিভ্রমভরা[২৫]বিভ্রুত[২৬] সর্ব্বায়ুধ-
প্রাগল্‌ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সদ্যসূতা[২৭]নদ্বিষাং ॥[১৪]
এ

(২১শ পংক্তি) তস্যাপি সহোদরো নরপতির্দ্দিব্যপ্রজানির্ব্ভর-
ক্ষোভাহ্নতবিব্রতবাসববৃতিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ।
শাসত্যেব

(২২শ পংক্তি) চিরং জগন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ
তেজোভিঃ পরচক্রচেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং। [১৫]
তস্মাদজায়ত নিজা-

(২৩শ পংক্তি) য়তবাহুবীর্য্য-
নিস্পীতপীবরবিরোধিযশঃপয়োধিঃ।
নেদষ্ঠি[২৮] কীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্রবধূকপোল-
কপ্পূরপত্র[২৯] মকরীষু

(২৪শ পংক্তি) কুমারপালঃ ॥[১৬]
প্রত্তর্থি[৩০]প্রমদাকদম্বকশিরঃ সিন্দূরলোপক্রম-
ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমূর্ব্বীভুজ[৩১]।

(২৫শ পংক্তি) ধাত্রীপালনজৃম্ভমাণমহিমাকপূ্রপাংশূৎকরৈ-
র্দেবঃ কীর্ত্তিময়ৈর্নিজে[৩২]র্বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ।[১৭]
তদনু মদন-

(২৬শ পংক্তি) দেবীনন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈ-
শ্চরিতভুবনগর্ত্তৈঃ পাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ।
ক্ষিতিমববম[৩৩]তাতস্তস্য সপ্তাব্ধিদ্রাক্ষী[৩৪]
মভূতমদনপা-

২৪ নিসর্গ। ২৫ ভরান্। ২৬ (এখানে একটী অক্ষর কম আছে। 'বিভ্রৎস্ব' পাঠ হইতে পারে।)
২৭ সুতাঃ। ২৮ নেদিষ্ঠ। ২৯ পত্রং। ৩০ প্রত্যর্থি। ৩১ ভুজঃ। ৩২ নিজৈ। ৩৩ মনবম। ৩৪ কাঞ্চীং।

(২৭শ পংক্তি) লো রামপালাত্মজম্মা ॥[১৮]

স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পাদিত[৩৫]-সেত্ত[৩৬]বন্ধনিহিতশৈল-

(২৮শ পংক্তি) শিখরণী-বিভ্রমান্নিরতিশয়ঘনায়ন-করিপট্টশ্যামায়মানবা-সরলক্ষ্মীসমারব্ধ-সন্তত-জলদসমরসন্দেহা-

(২৯শ পংক্তি) দুদিচীনা[৩৭]নেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী-খরখুরোৎ-খাত-ধূলীধূষরিতদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবা

(৩০শ পংক্তি) সমাগতাশেষ-জম্বূদ্বীপভূপালানন্তপাদাবনমদবনেঃ শ্রীরামা-বতীনগরপরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবা-

(৩১শ পংক্তি) রাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেব পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরা-

(৩২শ পংক্তি) জঃ শ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী ॥ শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ কোটী-বর্ষবিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্ঠগিরিসংবিংশাত্যাদাধিকোপেতস

(৩৩শ পংক্তি) কৈবত্ত্যধ্ব সাবদ্ধারজ্জাকে[৩৮] বিংশতিকায়াং ভূমৌ। সমুপগতা-শেষ রাজপুরুষান্ রাজরাজান্যক[৩৯] রাজপুত্র রাজামাত্য মহাসন্ধিবি-

(৩৪শ পংক্তি) গ্রহিক মহাক্ষপটলিক মহাসামন্ত মহাসেপাপতি[৪০] মহাপ্রতীহার দৌঃসাধসাধনিক মহাকুমারামাত্য রাজস্থানী-

(৩৫শ পংক্তি) য়োপরিক চৌরোদ্ধরণিক দাণ্ডিক দাণ্ডপাসিক শৌনিক ক্ষেত্রপ প্রান্তপাল কোট্টপাল অঙ্গরক্ষ তদাযুক্তক বিনিযুক্তক

(পশ্চাদ্ভাগ।)

(১ম পংক্তি) হস্ত্যস্বোষ্ট্র[১] নৌবলব্যাপৃতক কিশোরবড়বাগোমহিষ্যাজাবিকা-ধ্যক্ষ দ্রুতপ্রেষণিক গমাগমিক অতিত্বরমাণ বি-

৩৫ সম্পাদিত। ৩৬ সেতু। ৩৭ উদীচীনা। ৩৮ 'সংবিংশা' হইতে এ পর্য্যন্ত অস্পষ্ট, কোন অর্থগ্রহ হইল না। ৩৯ রাজন্যক। ৪০ সেনাপতি।

১ হস্ত্যশ্বোষ্ট্র।

(২য় পংক্তি) যয়পতি গ্রামপতি তরিক শৌল্কিকগৌল্মিক গৌড় মালব
চোড় খস হূন কূলিক কর্ণাট লাট চাট ভট্ট-সেবকাদী-
(৩য় পংক্তি) ন্ অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোজীবিন[২] প্রতিবাসিনো
ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তমোত্তমকুটুম্বীঃ[৩]পুরোগম-চণ্ডালপর্য্যন্তান্ য-
(৪র্থ পংক্তি) থার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ বিদিতমস্তু ভবতাং॥
যথোপরিলিক্ষিতোয়ং[৪] গ্রামঃ॥ স্বসীমাতৃণপ্লুতিগোচরপর্য্যন্তঃ॥
(৫ম পংক্তি) সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধূকঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোশরঃ[৫] সম্সাট[৬]-
বিটপঃ সদরসাপসারঃ সচৌরোদ্ধরণিকঃ পরিহৃতসর্ব্ব-
(৬ষ্ঠ পংক্তি) পীড়ঃ অচাটভট্টপ্রবেশঃ অকিঞ্চিৎপরগ্রাহ্যঃ ভাগ-ভোগকর
হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ রত্নত্রয়রাজসম্ভোগবর্জ্জিতঃ
(৭ম পংক্তি) ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ
পুণ্যযশোভিবৃর্দ্ধয়ে[৭] কৌৎস সগোত্রায় শাণ্ডি-
(৮ম পংক্তি) ল্যাসিতদেবলপ্রবরায় পণ্ডিতশ্রীভুষণ স ব্রহ্মচারিণে
সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়িনে চম্পাহিট্টীয়ায়
(৯ম পংক্তি) চম্পাহিট্টীবাস্তব্যায় বৎসস্বামিপ্রপৌত্রায় প্রজাপতিস্বামি-
পৌত্রায় শৌনকস্বামিপুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বরশ্বা[৮]
(১০ম পংক্তি) মিশর্ম্মণে পট্টমহাদেবী-চিত্রমতিকয়া বেদব্যাসপ্রোক্ত প্রপা-
ঠিত-মহাভারত-সমুৎসর্গিগত-দক্ষিণাত্বেন ভগব-
(১১শ পংক্তি) ন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।
অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি পমিপতি[৯]
(১২শ পংক্তি) ভিভূর্মের্দ্দানফলগৌরবাৎ অপহরণে মহান্ নরকপাতভয়াচ্চ
দানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্য পালনীয়ং প্রতিবাসি-
(১৩শ পংক্তি) ভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈ রাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ী ভূয়ঃ যথাকালং
সমুদিত-ভাগভোগকরহিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি॥

২ জীবিনঃ। ৩ কুটুম্বী। ৪ লিখিতোঽয়ং। ৫ সগর্ত্তোষরঃ। ৬ সসাট। ৭ বৃদ্ধয়ে। ৮ স্বামিং।
৯ অধিপতি।

(১৪শ পংক্তি) সম্বৎ ৮ চন্দ্রগত্যো[১] চৈত্র কর্ম্মদিনে ১৫ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মা-

ন্নুসংসিনঃ[২] শ্লোকাঃ ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ

(১৫শ পংক্তি) সগরাদিভিঃ

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।

উভৌ তৌ পুণ্য-

(১৬শ পংক্তি) কর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বগর্গগামিনৌ ॥

গামেকাং স্বন্ন[৩]-মেকঞ্চ[৪] ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং

হরন্ নরকমায়াতি।[৫] যাবদাহুতি[৬]-সংপ্লবং ॥

(১৭শ পংক্তি) ষষ্টীং[৭]-বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ

আক্ষেপ্তাচানুমন্তা[৮] চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥

স্বদত্তাং প-

(১৮শ পংক্তি) রদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং

স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বম্নয়ন্তি[৯] পিতাম-

(১৯শ পংক্তি) হাঃ।

ভূমিদোঽস্মদ্‌কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিস্যতি[১০] ॥

সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্

ভূয়োভূয়[১১] প্রার্থয়েত্যে-

(২০শ ভক্তি) স[১২] রামঃ

সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্নরাণাং

কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং

শ্রিয়মনু-

১ গত্যা। ২ ধর্ম্মানুসংশিনঃ। ৩ স্বর্ণ। ৪ মেকম্বা। ৫ (ছেদ হইবে না।) ৬ যাবদাহুত-। ৭ ষষ্টি-। ৮ বানুমন্তা। ৯ বর্ণয়ন্তি। ১০ ভবিষ্যতি। ১১ ভুয়ঃ। ১২ প্রার্থয়ত্যেষ।

(২১শ পংক্তি) চিন্ত্য মনুস্য[1]-জীবিতং চ

সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা

ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥

কৃতসর্কল-

(২২শ পংক্তি) নীতিজ্ঞো বৈর্য[2]-স্থৈর্য-মহোদধিঃ।

সান্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীমান্ ভীমদেবোঽত্র দূতকঃ ॥

রাজ্যে মদনপালস্য অষ্টমে

(২৩শ পংক্তি) পরিবচ্ছরে[3]।

তাম্রপট্টমিমং শিল্পী তথাগতসরোঽখনৎ ॥

অনুবাদ।

বুদ্ধকে নমস্কার।

শ্রীমান্ লোকনাথ দশবল (বুদ্ধ) এবং অপর শ্রীমান্ গোপালদেব জয়যুক্ত হউন। যাঁহার হৃদয় কারুণ্যরত্নে প্রমুদিত ছিল, যিনি প্রিয়তমা মৈত্রীকে ধারণ করিয়াছিলেন, সম্যক্সম্বোধি-যুক্ত-বিদ্যারূপ-সরোবরের নির্ম্মল জলে যাঁহার অজ্ঞানরূপ পঙ্ক বিদূরিত হইয়াছিল, যিনি কামকৃত আক্রমণ নিবারণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১।

সেই গোপালদেব হইতে শ্রীধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষীর জন্ম-নিকেতন অর্থাৎ সমুদ্র স্বরূপ, কেন না তিনি সমকর,* পক্ষচ্ছেদভয়ে অর্থাৎ সপক্ষধ্বংসভয়ে উপস্থিত ভূভৃৎগণের† একমাত্র আশ্রয়, মর্য্যাদা ‡ রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। তিনি পৃথিবীকে বহন করিতে সমর্থ, ও শৌর্য্যের আলয়স্বরূপ ছিলেন এবং দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসবাস অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ সদৃশ তাঁহার বসতি ছিল। ২।

তাঁহার বাক্‌পাল নামে এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন। এই শ্রীমান্ বাক্‌পাল সত্যব্রতধারী রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের ন্যায় মহিমান্বিত, গুণাবলীতে ভ্রাতার তুল্য, নয়বিক্রমশালী, ভ্রাতার আদেশ-পালনে তৎপর। তিনি শত্রুসেনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া পৃথিবীকে একাতপত্রা করিয়াছিলেন। ৩।

---

১ মনুষ্য। ২ ধৈর্য্য। ৩ পরিবৎসরে।

* সমকর অর্থাৎ সমুদ্র পক্ষে মকরের সহিত বর্ত্তমান এবং রাজপক্ষে যিনি অপক্ষপাতে করগ্রহণ করেন।

† এখানে 'ভূভৃৎ' শব্দের একপক্ষে রাজা ও অপর পক্ষে পর্ব্বত অর্থ বুঝাইতেছে।

‡ এখানে 'মর্য্যাদা' শব্দে রাজপক্ষে সম্ভ্রম এবং সমুদ্র পক্ষে সীমা বুঝাইতেছে।

তাঁহা[1] হইতে জয়শীল জয়পাল জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দ্বারা যেরূপ জগৎ পবিত্র হয়, তদ্রূপ এই জয়পাল-চরিত্রে জগৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ইনি ধর্ম্মদেষ্টাদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া দেবপাল নামে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অশেষ ভুবনরাজ্যসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন। ৪।

তাঁহার অজাতশত্রুর ন্যায় বিগ্রহপাল নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শত্রুবনিতা-দিগের প্রসাধন (অঙ্গরাগ) নির্ম্মল অসিরূপ জলধারাদ্বারা বিলোপ করিয়াছিলেন। ৫।

(এই বিগ্রহপালের) শ্রীমান্ ও প্রভুত্বশালী নারায়ণ নামে তনয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষিতিপরিপালনের নিমিত্ত দিক্পালগণের অংশদ্বারা বিভক্ত গুণ সকল দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় চরিত্রদ্বারা ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভূপতিগণের শিরোমণির কান্তিদ্বারা যাঁহার পাদপীঠোপল আলিঙ্গিত হইত। ৬।

তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন রাজা শ্রীরাজ্যপাল। যিনি সমুদ্রের মূলদেশের ন্যায় অতিশয় গভীর গর্ভযুক্ত জলাশয় ও কুলপর্ব্বতের সমকক্ষ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭।

সেই পূর্ব্বরাজ হইতে তুঙ্গ (অত্যুন্নত) অতএব অত্যুন্নতমস্তক-রাষ্ট্রকূটবংশের তনয়া ভাগ্যদেবী তেজোনিধি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, (এই পুত্রের নাম) শ্রীমান্ গোপালদেব। ইনি বহুকাল ধরিয়া পৃথিবীর একমাত্র পতি ছিলেন,—পৃথিবীর অঙ্গ যে চারি মহাসমুদ্র উহাও নানা উজ্জ্বল রত্নে খচিত ছিল। ৮।

যেমন সূর্য্য হইতে চন্দ্র, সেইরূপ তাঁহা হইতে বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার অতিশয় প্রিয়, নির্ম্মল চরিত্র, কলাময় ও কোটি কোটি বসু[2]-দানকারী। চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া তিনি জগতের তাপ বিদলিত করিতেন। ৯।

তাঁহা হইতে অবনিপাল শ্রীমহীপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশপূর্ব্বক নিজ বাহুবলে শত্রুদিগের মস্তকদেশে পদার্পণ করিয়া অনধিকৃত ও বিলুপ্ত রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১০।

উদয়গিরি হইতে সূর্য্যের ন্যায় মহীপালদেবের মহনীয় পুণ্যবলে নয়পাল জন্মগ্রহণ করেন, রমণীদিগের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজগণের মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক যিনি আশা[3] সকল বিস্তার করিয়াছিলেন। যিনি বহুগুণশালী, স্নিগ্ধ প্রকৃতি ও অনুরাগের আধার। ১১।

তাঁহা হইতে লোকদিগের পুণ্যহেতু বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি সজ্জনদিগের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিলেন। সর্ব্বদা স্মররিপুর পূজায় অনুরক্ত, যাঁহার বাহুবল সংগ্রামস্থলে

---

(১) যত্তদের নিত্য সম্বন্ধহেতু এখানে ধর্ম্মপাল, কিন্তু সোজাসুজি অর্থ করিলে বাক্পাল।

(২) বসু শব্দের রাজপক্ষে ধন ও চন্দ্রপক্ষে কিরণ অর্থ হইবে।

(৩) আশা শব্দের অর্থ একপক্ষে দিক্ ও একপক্ষে কামনা।

দর্শিত হইত, অধিক যুদ্ধকারী শত্রুকুলের যিনি কালস্বরূপ, চারিবর্ণের আশ্রয়, যাঁহার যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত হইয়াছিল। ১২।

চন্দ্রশেখর শিবের ন্যায় বিগ্রহপাল হইতে শ্রীমান্ দ্বিতীয় মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন। যিনি মলয়জ-শীতল শুভ্র যশোরাশিদ্বারা জগৎকে আনন্দিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৩।

তাঁহার অনুজ শ্রীশূরপাল, ইনি ইন্দ্রতুল্য মহিমাশালী, প্রতাপশ্রীর আধার, অদ্বিতীয়, সাহসই যাঁহার সারথি এবং গুণস্বরূপ। তিনি স্বাভাবিক বিলাসসমূহ ধারণ করিয়া নিজ অস্ত্র-সমূহের প্রাগল্ভ দ্বারা শত্রুদিগের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করেন নাই কি ?। ১৪। (?)

ইঁহার সহোদর রাজা শ্রীরামপাল, যিনি দিব্য প্রজাদিগের অতিশয় ক্ষোভে আহুত অতএব বিব্রতচিত্ত প্রাসবের বৃতি অর্থাৎ বেষ্টনীস্বরূপ। তাঁহার পিতা জগৎপরিপালনে নিরত থাকিলেও যিনি শৈশবকালেই বিস্ফূর্জ্জমান তেজঃদ্বারা শত্রুরাজগণকে স্থায়িভাবে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৫।

তাঁহা হইতে কুমারপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের আয়তভুজবীর্য্যদ্বারা বলবান্ শত্রুদিগের যশঃসাগর পান করিয়াছিলেন এবং তিনি নরেন্দ্রবধূগণের কপোলে কর্পূরের পত্র ও মকরীর চিত্রণ-বিষয়ে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৬।

তাঁহা হইতে নরপতি গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যর্থিগণের রমণীসমূহের শিরস্থিত সিন্দূরলোপক্রমরূপ ক্রীড়া দ্বারা যাঁহার হস্ত পাটল হইয়াছিল, পৃথিবীপালন দ্বারা যাঁহার খ্যাত মহিমারূপ কর্পূরধূলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং যিনি শৈশবে সেই স্বীয় কীর্ত্তিসমূহরূপ ধূলিদ্বারা ক্রীড়িত হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ শৈশবকালেই রাজ্যপালন করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন)। ১৭।

তাহার পরে মদনদেবীর গর্ভে রামপালের ঔরসে মদনপাল জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জ্যোৎস্নাধবল কীর্ত্তিপূরদ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্তসাগরমেখলা পৃথিবীকে পালন করিয়াছিলেন। ১৮।

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সেতুবন্ধ প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, শৈলমালা বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় মেঘবর্ণাশ্রিত হস্তীর আস্তরণে বাসরলক্ষ্মীকে (দিন-শোভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন বর্ষাসময় চিরবিরাজমান বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী রাজগণের প্রদত্ত অসংখ্য অশ্বারোহী সেনার অশ্ব সকলের তীব্র খুরাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা গগনমণ্ডল যেন ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরপূজার্থ সমুপস্থিত অসংখ্য জম্বুদ্বীপভূপালগণের অনন্ত-পাদভরে পৃথিবী নমিত হইতেছিল, সেই রামাবতীনগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত বিজয়ী শিবির হইতে, কুশলে অবস্থিত, পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীরামপালদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক শ্রীমদনপালদেব—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটীবর্ষ-বিষয়ের অধীন হলাবর্ত্তমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী কোষ্ঠগিরি নামক গ্রাম * * * বিংশতি পরিমিত ভূমি (এখানে) সমুপাগত রাজরাজন্তক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, মহাসান্ধি-

বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসামন্ত, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, দৌঃসাধসাধনিক, মহাকুমারামাত্য, রাজস্থানীয়, উপরিক, চৌরোদ্ধরণিক, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, শৌনিক, ক্ষেত্রপতি, প্রান্তপাল, কোট্টপাল, অঙ্গরক্ষক, এবং এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহারা নিযুক্ত বা বিনিযুক্ত; হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌবলে নিযুক্ত, কিশোর অশ্ব-গো-মহিষী-অজ-মেষাদির অধ্যক্ষ, দ্রুতপ্রেষণিক, গমাগমিক, অতিত্বরমাণ, বিষয়পতি, গ্রামপতি, নৌজীবি, শৌল্কিক, গৌল্মিক, গৌড়-মালব-চোড়-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-হইতে আগত চাট, ভট্ট ও অপরাপর সেবকাদি এবং অনুক্ত অপরাপর সকল রাজপুরুষদিগকে, রাজপাদোজীবি প্রজাদিগকে, মহত্তমোত্তম কুটুম্বি-প্রমুখ ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত (সকলকেই) যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন, জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন, আপনারা সকলে বিদিত হউন ! যথা উপরিলিখিত গ্রাম, স্বসীমান্তর্গত তৃণ, প্লুতি ও গোচারণভূমি পর্য্যন্ত; তল, উদ্দেশ, আম্র, মধুক, জলস্থল, গর্ত্ত, উষর, সাট, বিটপ, দরি, অপসার, চৌরোদ্ধরণিক, (প্রত্যেকসহ) সকলপ্রকার উৎপীড়নপরিহৃত, চাট (ঠিকা) ও ভট্ট (নিয়মিত সৈন্য)-প্রবেশের অযোগ্য, অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে অনধিকারী, ভাগ ভোগ, কর ও হিরণ্যাদি রাজস্ব সমেত, রত্নত্রয়রাজসম্ভোগবর্জ্জিত, 'ভূমিছিদ্র'-ন্যায়ানুসারে যত দিন চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীতে বিদ্যমান ততদিনের নিমিত্ত এবং মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য ও যশোবিবর্দ্ধনার্থ চম্পাহিট্টীগ্রামবাসী বৎসস্বামীর প্রপৌত্র, প্রজাপতিস্বামীর পৌত্র ও শৌনকস্বামীর পুত্র সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়ী, কৌৎসগোত্র শাণ্ডিল্য অসিত ও দেবলপ্রবরযুক্ত পণ্ডিত শ্রীভূষণ (উপাধিধারী) বটেশ্বরস্বামিশর্ম্মাকে পট্টমহিষী চিত্রমতিকা কর্ত্তৃক বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতপাঠের উদ্যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম স্মরণ করিয়া শাসনদ্বারা (উক্ত গ্রাম) আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। অতএব আপনারা সকলেই (এই দান) অনুমোদন করিবেন এবং ভূমির দানফলপ্রাপ্তির গৌরবে ও অপহরণ করিলে নরকপাতের ভয়ে ভাবী নৃপতিবর্গও এই দান অনুমোদন করিবেন। প্রতিবাসী কৃষকগণও (এই) রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা পালন করিবে এবং যথাকালে উৎপন্ন (শস্যাদির) ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্যাদি রাজস্ব (এই শাসনগৃহীতার) নিকট উপস্থিত করিবে। সম্বৎ ৮, শুক্লপক্ষে চৈত্র কর্ম্মদিনে ১৫।

এ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোকগুলি এইরূপ আছে—

সগরাদি বহু রাজাই ভূমিদান করিয়াছেন। যাহার যাহার যেমন ভূমিদান, তাহার তাহার তেমনি ফল। যে ভূমি গ্রহণ করে ও যে ভূমিদান করে, এই উভয় পুণ্যকর্ম্মাই নিয়ত স্বর্গগামী হয়। একটী গোই হউক, একটী স্বর্ণই হউক বা অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমাণ ভূমিই হউক, হরণ করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকভোগ হয়। ভূমিদানকারী ষাটহাজার বর্ষ স্বর্গে অবস্থান করে এবং তাহার গ্রহণকারী ও নিবারণকারী ততদিন নরকে বাস করে। স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক যে ভূমি হরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃপুরুষের সহিত পচিয়া থাকে। পিতৃগণ আহ্লাদসহ প্রকাশ করেন ও পিতামহগণ বর্ণনা করেন যে, আমার বংশে ভূমিদানকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই ভূমিদ আমাদের পরিত্রাতা হইবে।

রাম এইরূপে সকল ভাবী পার্থিবেন্দ্রদিগের নিকট ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছেন। নরগণের ইহাই সামান্য ধর্ম্ম-সেতুস্বরূপ এবং ক্রমানুসারে কালে কালে পালনীয়। মানব-জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ চঞ্চল এই চিন্তা করিয়া ও এই উদাহরণ বুঝিয়া পুরুষগণ পরকীর্ত্তি বিলোপ করিবেন না।

যিনি সকল নীতিতে অভিজ্ঞ, ধৈর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে মহাসমুদ্র সদৃশ (সেই) সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীমান্ ভীমদেব এই শাসনে দূতক। মদনপালের রাজত্বের অষ্টম পরিবৎসরে তথাগতসর নামক শিল্পী কর্ত্তৃক এই তাম্রপট্ট উৎকীর্ণ হইল।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* মূল তাম্রশাসনের কোন কোন স্থান ঠিক বুঝিতে না পারায় অনুবাদের স্থানে স্থানে মূল শব্দের অবিকল রক্ষিত হইল।

৫ম ভাগ।] [৩য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

স্ত্রীকবি মাধবী।

এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভসুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবীদেবী। কবিতাকুসুমের পরিমল বিস্তার মাত্র ইঁহার গৌরব নহে, মাধবীর গুণগরিমা পুরুষসমাজেও দুর্লভ ছিল।

মাধবী নীলাচলনিবাসিনী। শিখি মাহিতির ছোট ভাই মুরারি মাহিতি; মাধবী মুরারির ছোট ছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগকে "তিনভ্রাতা" বলা হইয়াছে; মাধবীকেও ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন ও পুরুষের ন্যায় "জপতপ" করিতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে উপস্থিত হইলে, জগন্নাথমন্দিরে প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। চিন্তামণির গ্রন্থকার রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির গুরু (শিক্ষাদাতা) কঠোর নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম, মুখে ঈশ্বর মানিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন। জ্ঞান-গৌরবে সার্ব্বভৌমের ন্যায় তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না; নীলাচলে এই সার্ব্বভৌম একজন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হইলেন। কেবল তাহাই নহে, নদীয়ার শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে নীলাচলের রাজা প্রতাপরুদ্র হইতে সামান্য স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত, শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের মত পরিবর্ত্তন করিয়াই, দক্ষিণদেশ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, নীলাচলবাসির আশা শীঘ্র পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ দুই বৎসর কাল, দক্ষিণদেশের নানাস্থানে ভ্রমণান্তর মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম একে একে নীলাচলবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগকে তৎসহ মিলাইয়া দেন। মহাপ্রভু স্ত্রীদর্শন করিতেন না, মাধবীকে নীলাচলের সকলেই যদিও জানিত, তথাপি স্ত্রী বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে যাইতে পারেন নাই। তবে মাধবী অন্তরালে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেন। এই দর্শনমাত্রই শ্রীমহাপ্রভুকে মাধবীর

ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান হইল; তিনি মহাপ্রভুর একজন "ভক্ত" হইলেন। মাধবী বলেন যে, গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখিলেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। যথা তৎকৃত পদ্যে,—

"যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।"

গৌরাঙ্গকে একবার মাত্র দেখিয়াই মাধবী ও মুরারি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শিখি মাহিতির তদ্রূপ ভাব হয় নাই। শেষে কোন বিশেষ ঘটনায় তিনিও ভাইদের অনুগমন করেন। সে সকল কথা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

প্রাচীন কালাবধি নীলাচলে একটী প্রথা প্রচলিত আছে। জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে একজন "লিখনাধিকারী" থাকেন অর্থাৎ একজন লেখক-কর্ম্মচারী শ্রীমন্দিরের দৈনন্দিন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। মাধবীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তাঁহার স্বল্পাক্ষরগ্রথিত রচনক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, মাধবীকে ঐ সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এই জন্যই মাধবী "প্রভু লেখা করে" বলিয়া লিখিত আছে।

যথা চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে—

"শিখি মাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবী। বৃদ্ধ তপস্বিনী তেহোঁ পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে, যেই রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ দামোদর, আর রামানন্দ। শিখি মাহিতি, তার ভগিনী অর্দ্ধ॥"

মহাপ্রভু জীবগণকে যে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেন, মোটে সাড়ে তিন জন ব্যক্তিই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করিতে সক্ষম হন। সেই সাড়ে তিনজন—স্বরূপ দামোদর, রায়-রামানন্দ, শিখিমাহিতি এবং মাধবীদেবী। স্ত্রীলোক বলিয়াই তাঁহাকে "অর্দ্ধপাত্র" বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝুন—মাধবীর ভক্তিপ্রভাব, ইহাতেই অনুভব করুন্—মাধবীর জ্ঞান কত গভীর; তাঁহার শক্তি কত দূরপ্রসারিণী। তাঁহার বৈষ্ণবতা ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, চরিতামৃতগ্রন্থে একটীমাত্র ছত্রে, তাঁহার যে গুণ ও ভক্তি-গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। নীলাচলবাসী ভক্তগণের নামগণনায় কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,—

"মাধবীদেবী শিখি মাহিতির ভগিনী। শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥"

সে যাহাহো'ক, এখন মাধবীর কবিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা দিব। বলরাম দাস, গোবিন্দ ও বাসুঘোষ প্রভৃতি খাস বাঙ্গালার অধিবাসী। এই উড়িয়া রমণীর বিরচিত পদাদি কোনও অংশে তাঁহাদের রচনা হইতে নিকৃষ্ট নহে। ভাব, ভাষা, লিখনভঙ্গী তদ্রূপই সুন্দর ও মনোরম; কিন্তু মাধবীর রচনার সর্ব্বত্র যে সারল্য ও মধুরতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতীব দুর্লভ। যদিও তাঁহার রচনায় "ভেল", "ডালি", "উথালি", "বিলসই", "কাঁপই", "কহই", প্রভৃতি শব্দের অভাব নাই, তথাপি বলিতে পারা যায়, অন্যান্য কবির ন্যায়, মাধবীর রচনাতে তৎকালপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দ অল্পই দৃষ্ট হয়। এস্থলে আমরা অধিক বাক্যব্যয়

না করিয়া, পাঠক মহাশয়ের জন্য মাধবীদেবীর একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম নীলাচলগমনোপলক্ষে মাধবী লিখিয়াছেন,—

"কলহ করিয়া ছলা,　　আগে পহুঁ চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
যতেক ভকতগণ,　　হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাই বিরহ অনলে ভেল অন্ধ।
আঠারনালাতে হৈতে,　কান্দিতে কান্দিতে পথে,
যায় নিতাই অবধৌতচন্দ্র॥
সিংহ দুয়ারে গিয়া,　　মরমে বেদনা পাইয়া,
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বলে,　　দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে,
নীলাচলবাসিরে সুধায়॥
জাম্বুনদ হেম জিনি,　　গৌরাঙ্গ বরণ খানি,
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গর গর,　　আঁখিযুগ ঝর ঝর,
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ,　　ভ্রমে পহু দেশে দেশ,
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসীতে কয়,　　অপরূপ গোরা রায়,
ভট্ট গৃহে করল প্রবেশ॥"

মাধবীদেবীর গৌরবিষয়ক পদগুলি ঐতিহাসিক, সুতরাং সে পক্ষেও ইহার মূল্য খুব অধিক। পথে কোন ভাব বিশেষের বশীভূত হইয়া, নিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর "দণ্ড" ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কৃত্রিম কলহ ছলে শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি পার্ষদ ভক্তগণকে পশ্চাৎ করিয়া অগ্রে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন, তথায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, আপনার ঘরে লইয়া যান। ইহার পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি নানা স্থানে খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে সার্ব্বভৌমগৃহে উপস্থিত হন।

মাধবী বলেন,—

"নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধরে।　দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘরে॥
প্রতপ্ত কাঞ্চন কান্তি অরুণ বসন।　প্রেমে ছল ছল দুই কমলনয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।　উন্নতনাসিক ঊর্দ্ধ তিলকভূষিত॥
গোপীনাথ সার্ব্বভৌম বাণীনাথ কাশী।　গোরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী॥

দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর। মিলিলেন গোরাচান্দের যত অনুচর ॥
যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে। মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্ম দোষে ॥"

দোললীলা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন বর্ণন করিয়া, মাধবী যে পদগুলি রচনা করেন, তন্মধ্যে একটী এই,—

"আনন্দে নাচত, সঙ্গেতে ভকত,
গৌর কিশোররাজ।
ফাগু উঝালি, করে ফেলাফেলি,
নীলাচলপুরী মাঝ ॥
শুনিয়া নাগরী, প্রেমেতে আগরি,
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে, পড়িলা ফাঁপরে,
বদন বাহিয়া থাকে ॥
দু বাহু তুলিয়া, বেড়ায় নাচিয়া,
ভকতগণের সঙ্গ।
নীলাচলবাসী, মনে অভিলাষী,
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ ॥
বাজে করতাল, বোলে ভালি ভাল,
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস, মনেতে উল্লাস,
সদা বলে হরিবোল ॥"

নীলাচল হইতে প্রভু, স্বীয় জননীর সংবাদ লইবার জন্য, জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। এই জগদানন্দের মুখে নবদ্বীপের দশাশ্রবণে মাধবীর করুণ হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। নিম্নের পদটীতে অল্পাক্ষরে তিনি নবদ্বীপের কি বিষাদময়ী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথো দূরে, দেখে নদীয়ারে,
গোকুলপুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে,
এই অনুমানে চায় ॥
লতা তরু যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।

স্ত্রীকবি মাধবী।

রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন,
মেঘগণ দেখে রাতা ॥
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটী আঁখি,
ফুল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি,
গোরাচান্দ নাম লৈয়া ॥
ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর, পণ্ডিত ঠাকুর,
পড়িলা আছাড়ে গা ॥"

মাধবীকৃত গৌরবিষয়ক পদ উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। কৃষ্ণবিষয়ক তাঁহার দুইটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিব, পাঠক মহাশয় তাহাতে তাঁহার রচনানৈপুণ্য কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে দেখিবেন। যথা—

(প্রথম পদ)

"পরশিতে রাই তনু, আপনে ভুলল কানু,
মুরছি পড়ল ধনী কোর।
শ্যামক হেরইতে, ধনী ভেল গদ গদ,
ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥
শ্যাম মুরছিত হেরি, চকিতে ললিতা ফেরি,
রাধামন্ত্র শ্রুতিমূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু, নিরখই রাই তনু,
হেরি সখী চমকিত ভেল ॥
চিত্র পুতলী যেন, বেঢ়ল সখীগণ,
নিরখই শ্যামমুখচন্দ্র।
কি ভেল কি ভেল বলি, ধাওল বিশাখা আলী,
সব জনে লাগল ধন্দ ॥
শ্যামর সুন্দর বদন সুধাকর,
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস, কহই মাধবী দাস,
বিদগধ মাধব রাধে ॥"

(দ্বিতীয় পদ)

"রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস, পরশ রস পিবই, কমলিনী মধুকররাজ॥ ধ্রু॥
সচকিত নাগর, কাঁপই থর থর, শিথিল করল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে, রাই ভেল অদরস, কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥
সো ধনী চাঁদবদন কিয়ে হেরব, শুনব অমিয়ময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয়, তাপ কিয়ে মিটব, সোই করব কিয়ে কোল॥
ঐছন কতহুঁ, বিলাপই মাধব, সহচরী দূর হি হাস।
অপরূপ প্রেমে, বিষাদিত মাধব, কহত হি মাধবী দাস॥"

এখন পাঠক, বঙ্গভাষার প্রাচীন স্ত্রী-কবি মাধবীদেবীর স্থান, পদকর্ত্তাগণের মধ্যে কোথায়? আপনিই তাহা নির্দ্দেশ করুন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন।

গতবারে মদনপালদেবের তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছি। সেই প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছিলাম, মদনপাল ও মহীপালদেবপ্রদত্ত দুই প্রস্থ তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়া দিনাজপুরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় পরিষৎকার্য্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। আজ যে মহীপালদেবের তাম্রশাসনের পরিচয় দিতেছি, এখানি বসু-মহাশয়-সংগৃহীত তাম্রশাসনদ্বয়ের অন্যতর। কিরূপে এই তাম্রশাসনদ্বয় পাওয়া যায়, পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি মাননীয় বসু মহাশয় আমাদিগকে এইরূপে প্রাপ্তিসংবাদ দিয়াছেন,—

গত ১২৮২ সালে দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলী গ্রামে কোন উদ্যান মধ্যে পুষ্করিণী-খননকালে একখানি বৃহৎ তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই তাম্রশাসনখানি সংগ্রহ করেন এবং এতদিন তাঁহারই নিকট ছিল। গত বারের পত্রিকায়, এই তাম্রশাসনখানির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

অপর (বর্ত্তমান আলোচ্য) তাম্রশাসনখানি বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নবাবাজারের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয়ের নিকট এতদিন ছিল।

নন্দকৃষ্ণবাবু দিনাজপুরে অবস্থানকালে উক্ত তাম্রশাসনদ্বয়ের সন্ধান পাইয়া সংগ্রহ করেন এবং যথাযথ পাঠ ও অনুবাদসহ প্রকাশ করিবার জন্য পরিষৎকার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ইতিপূর্ব্বে একখানির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এখন অপর খানির বিবরণ যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

মদনপালদেবের তাম্রশাসনোক্ত বিবরণ যেমন সম্পূর্ণ নূতন[১], এবং পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, আমাদের আলোচ্য এই মহীপালদেবের তাম্রশাসনের বিষয় সেরূপ নূতন নহে। ছয় বর্ষ হইল, অধ্যাপক কিল্‌হোর্ণ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীগিরিধারী বসু মহাশয়, বর্ত্তমান তাম্রশাসন হইতে কতকগুলি ছাপ তুলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই ছাপ দেখিয়া, ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর দোষে, ইহার পাঠোদ্ধার করিতে, সমর্থ হন নাই। তৎপরে ডাক্তার হোর্‌নলি সেই ছাপগুলি কিল্‌হোর্ণ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি সেই ছাপগুলি দেখিয়া পাঠোদ্ধার করেন।[২]

তিনি যে পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই ঠিক হইয়াছে। তবে যেখানে যেখানে ভাল ছাপা উঠে নাই, সেই সেই স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে একটু গোল হইয়াছে। সেই জন্যই মূল তাম্রশাসনদৃষ্টে একটী যথাযথ পাঠ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পাঠ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাম্রশাসন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার আছে।

তাম্রফলকখানি দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ও প্রস্থে ১ ফুট ২½ ইঞ্চ। মদনপালের তাম্রফলকের ন্যায় শাসনপত্রের শিরোভাগে একটী অলঙ্কৃত ধর্ম্মচক্র সংলগ্ন আছে। মদনপালের তাম্রফলকে ধর্ম্মচক্রটী যেমন স্বতন্ত্র ভাবে আবদ্ধ, বর্ত্তমান ফলকে সেরূপ নহে; ইহার ধর্ম্মচক্রখানি ৬ পঙ্‌ক্তি লিপির ঠিক মধ্যস্থলে বদ্ধ করা আছে। প্রতিলিপির অক্ষরবিন্যাস দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ইহার অক্ষরগুলি দেখিলেই মদনপালের তাম্রশাসনের লিপি অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার গ, জ, ন, ম, ক্ষ প্রভৃতি দেখিলেই আধুনিক বঙ্গাক্ষর বলিয়া মনে হয়। আবার দুই তিন শতবর্ষ পূর্ব্বে মল্লভূম অঞ্চলে যে লিপি প্রচলিত ছিল, ইহার ক, স, শ, র ও ল দেখিলেই, সেই লিপি মনে পড়ে। অপর লিপিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত, ধর্ম্মপালদেবের লিপির সদৃশ;[৩] কিন্তু তত প্রাচীন নহে।

কোন্ সময়ে এই তাম্রশাসন লিখিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে অংশে মহীপালদেবের সংবৎজ্ঞাপক অঙ্ক ছিল, সেই অংশ কে তুলিয়া ফেলিয়াছে। তবে সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায়, মহীপালদেব ১০৮৩ সম্বতে (অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেন।[৪] এরূপস্থলে তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে এই তাম্রশাসনখানি উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে।

---

(১) এই তাম্রশাসনখানি সংগ্রহ করিয়া নন্দকৃষ্ণ বাবু ঐতিহাসিক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1892, pp. 77—87.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1895.

(৪) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 140.

বিলাসপুর নামক জয়স্কন্ধাবার হইতে, বিষুবসংক্রান্তিকে গঙ্গাস্নান করিয়া পরমসৌগত পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব ভট্টপুত্র হৃষীকেশের পৌত্র, মধুসূদনের পুত্র, পবাশর গোত্রজ (শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশরপ্রবরভুক্ত) যজুর্ব্বেদান্তর্গত বাজসনেয়-শাখাধ্যায়ী চাবটীগ্রাম-বাসী ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মাকে বর্ত্তমান তাম্রশাসন দান করেন। এই তাম্রশাসন দ্বারা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটীবর্ষ বিষয়ের অধীন গোকলিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত কুরটপল্লিকা গ্রাম (চূটপল্লিকা গ্রাম বাদে) প্রদত্ত হয়। মদনপালদেবের তাম্রশাসনে শাসনগৃহীতাকে যে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান শাসনেও কৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মা সেই সেই অধিকার পাইয়াছেন।

মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থান কোথায় ? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিলহোর্ণ সাহেব কোন কথা লেখেন নাই। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া কএকটী স্থানের বর্ত্তমান অবস্থান এইরূপ বাহির করিয়াছি ;—

১। কোটীবর্ষবিষয়—এই স্থান এখন 'দেওকোট পরগণা' নামে খ্যাত। পালরাজগণের সময়ে এই পরগণা আরও অনেকটা বড় ছিল।

২। গোকলিকা—বর্ত্তমান নাম 'গোঅলা'। এখন নিতপুর ডাকঘর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫´ ৬´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৩৪´ ২০´´ পূ। পূর্ব্বে যে গোকলিকামণ্ডল ছিল, ইহা তাহারই কিয়দংশমাত্র বোধ হয়।

৩। কুরট বা কুরুণ্টপল্লী—বর্ত্তমান নাম 'কুরণ্ড', উপরোক্ত 'গোঅলা' গ্রামের কিঞ্চিদধিক ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

৪। চূটপল্লী (চূড়াপাড়া)—এখন 'চুহাড়া' নামে আখ্যাত। উক্ত কুরণ্ডগ্রামের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

গত বারের মদনপালদেবের তাম্রশাসনে যে রামাবতীপুরের উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমান রামপুর বলিয়া অনুমিত হয়। এই রামপুর (অক্ষা° ২৭°৩৩´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°৩৫´৪৫´´ পূঃ) মহীপালদীঘী হইতে কিছু কম ২ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে ও ধর্ম্মপুরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

মহীপালদেবের তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক অংশ সমস্তই প্রায় মদনপালদেবের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল তাহাতে ৯ম ও ১১শ এই দুইটী মাত্র শ্লোক নাই। সে দুইটী শ্লোক ও তাহার অনুবাদ এই—

"যং স্বামিনং রাজগুণৈরনূনমাসেবতে চারুতরানুরক্তা।
উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বীং সপত্নীমিব শীলয়ন্তী ॥ ৯ ॥
দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥" ১১

(অনুবাদ—উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তিসম্পন্না লক্ষ্মী পৃথিবীকে সপত্নীর ন্যায় শীল-সম্পন্না করাইয়া রাজগুণবিভূষিত যে স্বামীকে মনোহরগুণে অনুরাগিণী হইয়া সেবা করেন।৯

শুভ্রতুল্য যাঁহার সেনাগজেন্দ্র সকল প্রচুর জলযুক্ত পূর্ব্বদিকে ইচ্ছানুসারে জলপান করিয়া

তৎপরে মলয়পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে চন্দনতরুতলে মৃদুমন্দগতিতে ভ্রমণ করিয়া ঘনীভূত শীকরদ্বারা বৃক্ষসমূহে জড়ত্ববিধান করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ আশ্রয় করিয়াছিল।(১১।)

উপরোক্ত দুইটী শ্লোক, শাসনগৃহীতার পরিচয়, জয়স্কন্ধাবার ও শাসনগ্রামের বিবরণ ছাড়া আর সকল অংশই প্রায় মদনপালদেবের তাম্রশাসনে খোদিত আছে। এই কারণে অনাবশ্যক বোধে সমস্ত অনুবাদ দেওয়া হইল না, কেবল যথাযথ পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

(সম্মুখভাগ।)

শ্রীমহীপালদেবস্য।

১ম ওঁ স্বস্তি। মৈত্রীং কা রুণ্যরত্নপ্রমুদি-
২য় তহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দ- ধানঃ সম্যক্সম্বোধিবি-
৩য় দ্যাশরিদমলজলক্ষা- লিতাজ্ঞানপঙ্কঃ। জি-
৪র্থ ত্বা যঃ কামকারিপ্র ভবমভিবং শাশ্বতী-
৫ম প্রাপ শান্তিং স শ্রীমা- ন্লোকনাথো[২] জয়তি দ-
৬ষ্ঠ শবলোহন্যশ্চ গোপা- লদেবঃ॥ [১] লক্ষ্মীজন্মনি-

৭ম কেতনং সমকরো বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাম্।
মর্য্যাদাপরিপা-
৮ম লনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূ-
দ্দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥ [২]
রামস্যেব
৯ম গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্ন-
১০ম. য়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শক্রপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ॥ [৩]

(১) 'সরিদ' হইবে। (২) শ্রীমাঁল্লোকনাথো।

তস্মা-

১১শ দুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।

ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ

১২শ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ [৪]

শ্রীমান্বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।

শত্রুবনিতাপ্রসাধ-

১৩শ নবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ ॥ [৫]

দিক্পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্ গুণান্

১৪শ য়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং সপ্রভম্।

যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং

ন্যায়ো-

১৫শ পাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনম্ ॥ [৬]

তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈ

দ্দে(৩)বালয়ৈশ্চ

১৬শ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ।

বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপালইতি মধ্যমলোকপালঃ।

তস্মা-

১৭শ ৎপূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দো-

স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্র-

১৮শ সূতঃ।

শ্রীমান্গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো

ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধু-

১৯শ চিত্রাংশুকায়াঃ ॥ [৮]

যং স্বামিনং রাজগুণৈরনূনমাসেবতে চারুতরানুরক্তা।

উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বীং স-

---

(৩) র্দেবালয়ৈশ্চ।

২০শ　　　　　　　　পত্নীমিব শীলয়ন্তী ॥ [৯]

তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী
কালেনচন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।
নেত্রপ্রিয়ে-
২১শ　　ণ বিমলেন কলাময়েন
যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥ [১০]
দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তো-
২২শ　　য়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু [।]
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়াদ্রে-
২৩শ　　ঃ কটকমভজন্ যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥ [১১]
হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা-
দনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমা-
২৪শ　　সাদ্য পিত্র্যম্।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মা-
দভদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ [১২]
স খ-
২৫শ　　লু ভাগীরথপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতু-
বন্ধনিহিতসৈলসিখর[৪]শ্রেণীবিভ্রমা
২৬শ　ৎ। নিরতিশয় ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্তত-
জলদসময়সন্দেহাৎ।
২৭শ　উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাত-
ধূলীধূসরিতদিগন্তরা-
২৮শ　লাৎ। পরমেশ্বরসেবাসমায়াতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাত-
ভরনমদবনেঃ। বিলাসপুরসমা-

---

(৪) 'শৈলশিখর' হইবে।

২৯শ বাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো
মহারাজাধিরাজশ্রীবিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পর-
৩০শ মেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্মহী-
পালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ। কোটীব-
৩১শ র্ষবিষয়ে। গোকলিকামণ্ডলান্তঃপাতিস্বসম্বন্ধাব-
চ্ছিন্নতলোপেত-চূটপল্লিকাবর্জ্জিতকুরটপল্লি-
৩২শ কাগ্রামে। সমুপগতাশেষরাজপুরুষান্। রাজরাজ-
ন্যক। রাজপুত্র। রাজামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহি-
৩৩শ ক। মহাক্ষপটলিক। মহামন্ত্রি[৫]। মহাসেনাপতি।
মহাপ্রতিহার। দৌঃসাধসাধনিক। মহাদণ্ডনা-
৩৪শ য়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক।
দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপা-

(পশ্চাদ্ভাগ)

১ম সিক[৬]। সৌল্কিক[৭]। গৌ- ল্মিক। ক্ষেত্রপ। প্রা-
২য় ন্তপাল। কোট্টপাল। অঙ্গরক্ষ। তদাযু-
৩য় ক্তবিনিযুক্ত। হ- স্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যা-
৪র্থ পৃতক। কিশোরবড়বা- গোমহিষ্যজাবি-
৫ম কাধ্যক্ষ। দূতপ্রেষণি ক। গমাগমিক।
৬ষ্ঠ অভিত্বরমাণ। বিষয়পতি। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়। মালব।
খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট।
৭ম চাট। ভট। সেবকাদীন্। অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ রাজপাদোপজীবিনঃ
প্রতিবাসিনো ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ। মহত্ত-
৮ম মোত্তমকুটুম্বিপুরোগমেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্। যথার্হং মানয়তি।
বোধয়তি। সমাদিশতি চ বিদিত-

(৫) মহামন্ত্রী। (৬) পাশিক। (৭) শৌল্কিক।

৯ম মস্তু ভবতাং। যথোপরিলিখিতোঽয়ং গ্রামঃ
স্বসীমাতৃণপূ্যুতিগোচরপর্য্যন্তসতলঃ। সোদ্দেশঃ সাম্রম-
১০ম ধূকঃ। সজলস্থলঃ। সগর্ত্তোষরঃ। সদশাপরাধঃ। সচৌরো-
দ্ধরণঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ। অচাট-
১১শ ভটপ্রবেশঃ। অকিঞ্চিদ্গ্রাহ্যঃ। সমস্তভাগভোগকর-
হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ। ভূমিচ্ছিদ্রন্যা-
১২শ য়েন। আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালম্। মাতাপিত্রোরাত্মন-
শ্চ পুণ্যযসো[৮]ভিবৃদ্ধয়ে। ভগবন্তং বুদ্ধভট্টার-
১৩শ কমুদ্দিশ্য। পরাসর[৯]সগোত্রায়। শক্তি। বশিষ্ঠ।
পরাসরপ্রবরায়। যযুর্ব্বেদ[১০]সব্রহ্মচারিণে। বাজ-
১৪শ স্ব শাখাধ্যায়িনে। মীসান্সা[১১]ব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিদে।
হস্তিপদগ্রামবিনির্গতায়। চাবটিগ্রামবাস্তব্যা-
১৫শ য়। ভট্টপুত্ররিষিকেশ[১২]পৌত্রায়। ভট্টপুত্রমধুশূদন[১৩]-
পুত্রায়। ভট্টপুত্রকৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মণে বিশুব[১৪]সংক্রা-
১৬শ ন্তৌ বিধিবৎ। গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তো-
ঽস্মাভিঃ। অতোভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্য
১৭শ ম্। ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দ্দানফলগৌরবাৎ।
অপহরণে চ মহানরকপাতভয়াৎ।
১৮শ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্। প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ।
আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং
১৯শ সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যায়োপনয়ঃ
কার্য ইতি॥ সম্বৎ[১৫]ন দিনে। ভবন্তি চাত্র
২০শ ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য

(৮) পুণ্যযশো। (৯) পরাশর। (১০) যজুর্ব্বেদ। (১১) মীমাংসা। (১২) হৃষীকেশ। (১৩) মধুসূদন। (১৪) বিষুব। (১৫) সম্বতের পর যে অঙ্ক ও মাস তারিখ ছিল, কে চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে।

২১শ তদাফলম্ ॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বগর্গগামিনৌ।
২২শ গামেকাং স্বর্ণমেকঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
হরন্নরকমাযাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥
ষষ্টিংবর্ষসহস্রা-
২৩শ ণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥
স্বদত্তাম্পরদত্তাং বা যো হরেত
২৪শ বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূ-
২৫শ য়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ
সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মশেতু(১৬)র্ন্নৃপাণাং কালে কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ ॥
ইতি কমলদ-
২৬শ লাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্যমনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্ত-
২৭শ য়ো বিলোপ্যাঃ ॥
শ্রীমহীপালদেবেন দ্বিজশ্রেষ্ঠোপপাদিতে।
ভট্টশ্রীবামনো মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ কৃতঃ ॥
২৮শ পোষলীগ্রামনির্যাতবিজয়াদিত্যসূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীমহীধরশিল্পিনা ॥

(১৬) ধর্ম্মসেতু।

চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী*।

[১]

পিরীতি বলিয়া তিনটী আখর
শ্রবণে সুনিলাঙ্ কথা।
পিরীতি-কমল হিয়াএ ফুটিল
পরাণপুত্তলি যথা॥
পিরীতি করিল জগতে ভাসিল
ধোবিনী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল কলঙ্ক ভাসিল
কানাকানি লোক জনে॥
গুপত পিরীতি ব্যকত আরতি
বসতি গ্রামের মাঝ।
দ্বিজের পাড়াতে বসতি তাহাতে
কথার হইল লাজ॥
পিরীতি চরচা লোকজনে করে
কুটম্বে দুই এক বলে।
সে কথা শুনিয়া দ্বিজগণ বলে
কলঙ্ক ভাসিল কুলে॥
সকল মেলিয়া একত্র হইয়া
সন্ধ্যাকালে সভে আসি।
নকুল সাক্ষাতে সভাই বলিছে
চণ্ডীদাস কাছে বসি॥ ১॥

—

বলে দ্বিজগন করি নিবেদন
সুন সুন চণ্ডীদাস।
তোমার লাগিয়া আমরা সকল
ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাস॥
তোমার পিরীতে আমরা পতিত
নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটম্ব ভোজন
করিঞা উঠাব কুলে॥
পিরীতির পাড়া বেদবিধি ছাড়া
বিধির ভিতরে নাঞি।
পিরীতি জাহার বিধি অগোচর
ব্রজপুরে তার ঠাঞি॥
সুনি চণ্ডীদাস ছাড়িয়া নিস্বাস
ভিজিয়া নয়ান জলে।
ধোবিনী সহিতে আমি যেন তাথে
উদ্ধার হইব কুলে॥
পিরীতি আলম্ব পিরীতি কুটম্ব
পিরীতি সমুদ্র বিধি।
পিরীতে উন্মাদ পিরীতি আস্বাদ
পিরীতে পাইব নিধি॥
পিরীতি আচার পিরীতি ব্যভার
পিরীতে তোমরা ভাই।
পিরীতের তরে দুয়ারে দুয়ারে
আদর করিতে চাই॥ ২॥

—

* এই চতুর্দ্দশ পদাবলীর দুই দফা পুথি সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই পদাবলী কয়টীও পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ এই পদাবলী কয়টীতে চণ্ডীদাসের নিজ চরিত্রের কতকটা পরিচয় থাকায় আমরা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

(আদর্শ পুথি দুই খানি বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে।)

স্থন হে নকুল ভাই।
কুটম্ব ভোজন সব তুমি জান
সে সব তোমার ঠাঞি ॥
আমার এ চিত্তে খাইতে স্থইতে
কেবল পিরীতি সার।
জা করে পিরীতি তাহা মোর মতি
আপনে কি বল আর ॥
তুমি এক্‌জন বিজ্ঞ মহাজন
সকলে পূজিত বট।
ধোবিনীআশ্রয় চণ্ডীদাস কহে
কেনলে পিরীতি ছোট ॥ ৩ ॥

স্থনিয়া নকুল কহিতে লাগিল
স্থন চণ্ডীদাস ভাই।
কুটম্বের ছল অতি মহাবল
সকল সভাতে চাই ॥
তোমার বাড়িকে যদি কেহো গেল
সে যদি না খাল্য ঘরে।
তবে সে বিসম হইল কেমন
কুটম্বে গঞ্জিয়া মারে ॥
জে জন অঙ্কিত সে জদি বেষ্টিত
কুটম্ব লোকেতে ভজে।
তাহার ব্যভার সকলের সার
সে জনে লোকেতে পূজে ॥
তুমি এক জন সকলে উত্তম
দ্বিজকুলে উপাদান।
কুটম্ব সকলে বিজ্ঞ সভে বলে
বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম ॥
আমি সে তোমার তুমি সে আমার
ক্রিয়া বেদমার্গে হই।
এ ঘোর সংসারে বলিবে আমারে
আপন করিয়া লই ॥
শ্রীগুরুচরন জার দঢ় মন
পিরীতি হইল তায়
নকুল সঙ্গেতে চণ্ডীদাস সাথে
দুজনে বিচার জায় ॥ ৪ ॥

স্থনি চণ্ডীদাস ছাড়িয়া নিস্বাস
ধীরি ধীরি কিছু বলে।
পিরীতি সংসার পিরীতি ব্যভার
পিরীতে কুটম্ব মিলে ॥
তুমি বড় লোক জানে তোমা লোক
আমার পিরীতি কুল।
তোমার আজ্ঞাতে পাঞাছি পিরীতে
পিরীতি সকল মূল ॥
পিরীতি জ্ঞাতি পিরীতি জাতি
পিরীতি কুটম্ব হয়।
পিরীতি স্বভাব পিরীতি বিভব
পিরীতে এমন বয় ॥
তোমার বচন অমৃত সিঞ্চিল
কাটিতে না পারি আমি।
তুমি সে আমার সকলের সার
জা কর তার তুমি ॥
স্থনিয়া নকুল হইল আকুল
ভিজিয়া নয়ন জলে।
তোমার চরিত্র জগতে পবিত্র
উদ্ধারিবে যেন কুলে ॥
তোমার কারণে সকল চরণে
বসন বান্ধিব গলে।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি ঘরে ঘরে
কেবা তাহে কিছু বলে ॥
যে জন বলিব সকল শুনিব
আমন্ত্রণ আগে করি।

ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
তোমার গুনেতে মরি ॥ ৫ ॥

ঠাকুর নকুল মনেতে বাড়িল
আমন্ত্রন ঘরে ঘরে।
আপনে আসিয়া বসন বান্ধিয়া
কুটম্বগৃহেতে ফিরে ॥
সকলে বসিল আমন্ত্রন দিল
বচন উঠাল্য তায়।
দসজনে বলে ঠাকুর নকুলে
কি কাজ করিবে রায় ॥
সব দ্বিজগনে একত্র আসনে
কিংকাজ করিবে ঘরে।
কি কাজ না গিয়া বসন বান্ধিয়া
এতটা কাতর কারে ॥
তুমি একজন সভার পূজন
দশজনে তোমা মানে।
সকলে পূজিত কুটম্বে বেষ্টিত
এমন কাতর কেনে ॥
সুনিয়া নকুল সকলে বলিল
তোমরা আগার গোড়া।
ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে
জাতিপাতে হল্য ছাড়া ॥ ৬ ॥

সুনিয়া বচন বলে দসজন
সুনহ নকুল রায়।
উত্তম করন করে জেইজন
সেজন দুখ কি পায় ॥
নীচের মনেতে আসক তাহাতে
জাহার ডুবিল মন।
ইহকালে তার পরকালে পার
করে কোন মহাজন ॥
তুমি একজন ষ. . দুজন
সকল করিতে পার।
তোমার বচনে ডুবে কোনজনে
এতটা করিবে কার ॥
আপনার জে করিবেক সে
মজাবে আপনা জাতি।
আমি নিজে বলি কুলে জলাঞ্জলী
জাহার এমন মতি ॥
আমরা নারিব এমন করিতে
বাভারে দিতে সে পানি।
কহিব উচিত বড় বিপরীত
বাভারে সে অপমান ॥
পুত্র পরিবার আছএ সংসার
তাহারা সম্মতি নহে।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
বড় বিপরীত কহে ॥ ৭ ॥

অতি সে কাতরে নিবেদন করে
নকুল দ্বিজের মনি।
তোমরা সকলে উদ্ধারিবে কুলে
আজ্ঞা দেহ সভে জানি ॥
আমি সে অধম অতি নরাধম
তোমরা সকল সার।
তোমরা নহিলে কি গতি হইব
কোন জনে করে পার ॥
দসজনা জারে আপনার করে
সেজন জগতে ধন্য।
সুমেরু হেলাতে পারএ বাহুতে
কি করিতে পারে অন্য ॥
আজ্ঞা দেহ মোরে জাই দ্বিজ ঘরে
দৃঢ় করি দেহ পান।

পান সিরে ধরি জাই ধীরি ধীরি
সামগ্রী করিতে চান্ ॥
নকুল তহিতে দসজনা তাথে
কায় মনে দিল পান।
তোমাতে হইতে পার হল্য জাতে
তোমার হইল নাম ॥
তুমি সে ধন্য তোমা বিনে অন্য
হেন কাজ কেবা করে।
ধোবিনী সহিতে উদ্ধারিলে জাতে
দস জনে সব পারে ॥
আমি সে নফর হইব দসের
সকল জনের জন।
দসজন-বলে ভবে জাব হেলে
চরনে রহুক মন ॥
এই কথা বলি দিঞা করতালী
প্রনাম করিল তায়।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
পিরীতে সমান জায় ॥ ৮ ॥

দ্বিজের ভবনে করিল গমনে
নকুল আইল তথা।
চণ্ডীদাস ঘরে কিবা কাজ করে
জেথানে জে থাকে জেথা ॥
সকল ব্রাহ্মন করাব ভোজন
সকলে দিলেন পান।
সকলের মুল সামগ্রী করিলে
আমি হই পরিত্রান ॥
তুমি সে কি'বল ভাঙ্গিয়া সকল
অন্তর বাহির মনে।
আওজন করি সামগ্রী আবরি
তবে সে কুটম্বে জানে ॥
ধন্য পিরীতি আওজন তথি
সামগ্রী পিরীতি সার।
জে ধন মাগিবে সে ধন পাইবে
পিরীতি হঞাছে জার ॥
নকুল বলিল কেমন পিরীতি
কিবা সে ধনের ধন।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
নকুল পাইল মন ॥ ৯ ॥

নকুল সঙ্গেতে বকুলতলাতে
গমন করিল তায়।
বিরলে দুজনে বসি একাসনে
কি ধন মাগিছ রায় ॥
নকুল বলিছে কিবা ধন আছে
সে বিনে পিরীতি ধনে।
জে ধন মাগিবে সে ধন পাইবে
জদি দড়াইবে মনে ॥
নকুল বচন সুনিয়া তখন
কহিছে দ্বিজের রায়।
ভজন জজন পিরীতি সাধন
পিরীতি সেবিলে পায় ॥
ভজিব পিরীতি স্বভাব আরতী
পিরীতি পরান সার।
পিরীতি করম পিরীতি ধরম
এ ভবে পিরীতে পার ॥
পিরীতি সাধনে আপনার মনে
জদি দড়াইতে পারি।
ই দেহেতে এই সে দেহেতে সেই
পিরীতি কিসোরি গুরি ॥
সাধক দেহেতে সাধিতে সাধিতে
সাধন পিরীতি নাম।

বলিতে বলিতে হেদে আচম্বিতে
নকুল হইল আন ॥
নকুল সরীর হইল অস্থির
হৃদয়ে দেখিলুঁ দুই।
নকুল মনেতে দঢ় হৈল চিতে
মন কথা মনে থুই ॥
আপন মনেতে উদয় তাহাতে
কেবল সাধন জার।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
নারীর জনম সার ॥ ১০ ॥

নকুল তখন করে আওজন
কুটম্ব ভোজন লাগি।
নিজ এক মনে করে আওজনে
কত দিবানিশি জাগি ॥
সামগ্রী করিল সকল হইল
গুড়িয়া বসাল্য ঘরে।
নানা উপহার ঘৃত পক্ক আর
গুড়িয়া বনান করে ॥
জিলেফি মালপা কচোরি আলফা
পুরি খিরি চিনী কলা।
সীতা মিশ্র আদি পিরীতি ঔষধি
তাহার গাথিব মালা ॥
সামগ্রী পিরীতি উপহার তথি
সীতামিশ্রী নামে মেওআ।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
পিরীতি চয়ন ধেআ ॥ ১১ ॥

ধোবিনী নিকটে স্নান করি ঘাটে
দেখিল নকুল রায়।
নকুল দেখিঞা আকুল হইল
ধোবিনী উলটি চায় ॥
ধোবিনী জপিছে পিরীতি পিরীতি
পিরীতি জপিল জলে।
জলেতে পিরীতি স্থলেতে পিরীতি
যেখানে পিরীতি মিলে ॥
পিরীতি দেখিল ঠাকুর নকুল
মনের ভিতরে রাখে।
তা দেখি ধোবিনী কহে কিছু বানী
এ কথা কহিব কাথে ॥
সুনি নাকি ভাস পিরীতি নৈরাস
কুটম্ব ভোজনে মন।
ঠাকুর নকুল হয়েছে সকল
তুমি এক মহাজন ॥
তোমার চরিত্রে জগত পবিত্র
তোমার সাধু সে বাদ।
তুমি সে সকল জাত্যে পাত্যে তোল
নীচ প্রেমে উনমাদ ॥
বর্নাশ্রম ছাড় পিরীতিকে দঢ়
জাহার পিরীতি হয়।
এ সব ভাবিঞা জে জন করিল
সে কেন ভারতে রয় ॥
এ কথা বলিয়া ধোবিনী চাহিয়া
গমন করিল ঘরে।
নয়নের জলে কান্দিয়া বিকল
মনে বোধ দিতে নারে ॥
গৃহেকে জাইঞা পালঙ্ক পাড়িয়া
সয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে
পৃথিবী ভিজিয়া যায় ॥
নকুল আসিয়া দ্বিজেরে দোখঞা
ভাবিল আপন মনে।
ধোবিনী আবেসে পিরীতির পাসে
চণ্ডীদাসে কান্দে কেনে ॥ ১২ ॥

ধোবিনী উঠিয়া কুলীবে আনিয়া
বকুলতলাতে বসি।
পৃথিবী উপরে লেখে দ্বিজবরে
পিরীতি বলিয়া ফাঁসি॥
বিরলে একলা বকুলের তলা
দাঁড়াঞা নিশ্বাস ফেলে।
তা দেখি নকুল হইল আকুল
ভিজিছে নয়ান জলে॥
জিজ্ঞাসে নকুল হইঞা আকুল
বসিয়া ধোবিনী পাসে।
বিকল হইয়া ধোবিনী কান্দিয়া
কেবল নিশ্বাস ভাসে॥
নকুল পাএতে ধরি দুটি হাথে
ধোবিনী কান্দিয়া বলে।
তুমি মহাজন শুনহ ব্রাহ্মন
পিরীতির কিবা মূলে॥
আমি অতি হীন পিরীতি অধীন
পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আখর হৃদয়ে যাহার
সে জনা কলপতরু॥
পিরীতি ভজিল পিরীতি সাধিল
পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে ধোবিনী সহিতে
মিশ্রিত একুই প্রাণে॥ ১৩॥

বিনোদ রায় বন্ধু বিনোদ রায়।
ভাল হল্য ঘুচাইলে পিরীতের দায়॥
ভালই করিলে বন্ধু ভালই করিলে।
করিঞা নবীন প্রেম পিরীতে ডোর দিলে॥
ভাল হল্য ঘুচাইলে পিরীতের দায়।
খুটিয়া লইলা কালী সেকি ধুল্যে জায়
একটু নগরে ঘর পরিচয় আছে।
দেখা শুনা বড় ভাল কেবাকারে দিছে॥
তুমি সে পুরুষ জাতি চঞ্চল মতি।
পাসানে নিসান রৈল তোমার পিরীতি॥
তোমার পিরীতি লাগি তনু ক্ষোভ আইলাঙ্।
আপনার তনু দিঞা তোমা না পাইলাঙ্॥
সঘনে নিশ্বাস রাখি ধোবিনী ফুকরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজ তবে নিজ দেহ ফিরে॥ ১৪॥

পত্র দিয়া গেল ব্রাহ্মন বসিল
অন্ন আন চণ্ডীদাস।
তোমার অন্নেতে বিক্ষিত(?)জগতে
পুরিল সভার আস॥
দিঞা করতালি হরি হরি বলি
অন্ন দিলে সর্ব্ব পাতে।
ধোবিনী দেখিছে ডাণ্ডাইঞা নাছে
ভালে দিঞা দুটি হাথে॥
ব্যঞ্জন কটোরা সাকসুপ ভরা
ঝাল নাফরাদি আনে।
আনিল ঘণ্টের ব্যঞ্জন সকল
সুখে খায় দ্বিজগণে॥
হাথে বেতে পাতে ভোজন করিতে
রন্ধন বাখানে দ্বিজে।
ধোবিনী দাঁড়াঞা দ্বিজপানে চাঞা
পিরীতি পিরীতি ভজে॥
দ্বিজগণে ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে
ধোবিনী তখন ধায়।...[১]

(১) ইহার পর নিতান্ত অস্পষ্ট থাকায় পাঠোদ্ধার করা হইল না।

চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ-পদাবলী।

[২].

সরূপ রূপেতে একত্র করিঞা
মিসাল করিঞা থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে ছীমতী পাবে॥
রসের সরূপ প্রেমের নিঅড়
তাহাতে রাখিবে রূপ।
তাহার উপরে ছীমতী রাখিআ
প্রেমসরোবররূপ॥
তাহাতে আসক নাঅক রসিক
সিঙ্গার আবেসে রবে।
রূপে রূপ তিনে একু করি...
আসাদিলে রস পাবে॥
স্থানে স্থানে রস বিলাসএ বস
আসে কিনে সদা রবে।
নহে কামানুগা বটে রাগানুগা
আসক করিলে পাবে॥
রূপের সরূপ কৃপা অনুগত
রূপ রতি অঙ্গে থুবে।
তবে সে জানিঅ চইতরূপায়
সিদ্ধদেহে প্রাপ্তি পাবে॥
পরকিআ জত আসক সহিত
সরূপে এ রতি থুবে।
কহে চণ্ডীদাসে রসের উল্লাসে
রজকিনী সঙ্গে রবে॥ ১॥

প্রেমসরোবরে জন্মিঞা সে করে
তাহাতে বাড়িল আসক বিলাস
করে রাধিকাএ সঙ্গ॥
সেই রসামৃতে মিলিল জাহাতে
আসক সহিত টানে।
আসক সরূপে আসিক মরএ
রতি মুগ্ধ হৈলে জানে॥
সরূপের রতি রূপের বসতি
অকৈতব সে কথাএ।
এ কথা বুঝিলে পরান সংসয়
সরূপ পাঞাছে সাএ॥
নিতি অনুরাগ প্রেম বিঅোগ
পরান সংসয় তাএ।
সরূপে মিসাতে জে জন রসিক
আছএ এমন তাএ॥
রসিকে জনম রসিকে পত্তন
রসিকে জনম হঅ।
তবে সে জানিঅ সরূপের রতি
উদঅ করন সঅ॥
সরূপ বলিঞা রসের আধার
একজনা হএ সেঅ।
বুঝিতে না পারি রূপের মাধুরী
অঙ্গেতে পাঞাছে লেঅ॥
কহে চণ্ডীদাসে সরূপ বিশ্বাসে
আর কি বলিব কারে।
মনের মানসে রজকিনী তারে
নিজ গুরু করি ধরে॥ ২॥

সকল ত্যাগ করি আসকে রবে।
তবে সে জানিঅ নিউড় পাবে॥
পিতৃগোত্র আদি কিছু না রঅ।
রসের দেহেতে রস আশ্রঅ॥
রসের বিলাস নাইকে হবে।
কুলটা বিচার গোউনে রবে॥
গোউনে রাখি তাহা আস করিত।
ফুল সে ফুটি গেল ফল সহিত॥
ফল সে পাকিলে কিছু না রবে।
সভারে দেখাঞা কুলটা হবে॥
কার সনে সেঅ মিসিবে নাহি।
এই সে কলঙ্ক আসক-দাঈ॥
এই সে আসক করিএ থুবে।
আসকে মরিলে আসক পাবে॥
সুরসিক হঞা করিবে কাজ।
জেন না পড়ে রসেতে বাজ॥
এ সব বুঝিঅ আসকে রবে।
তবে সে জানিঅ রসিক পাবে॥
এ রস ভাঙ্গিলে আর না হবে।
বিরসিক জনে প্রেম না থুবে॥
কহে চণ্ডীদাসে নিউঢ় সার।
রজকিনী সঙ্গে হইব পার॥ ৩॥

প্রেমের সরূপ প্রেমেতে জনম
রসের মানুস সে জে।
চৌসট্টি রসের একটি মানুস
হিআঅ মাঝারে জে॥
রাগের মানুস নিজের মানুস
একত্র করিঞা নিবে।
পরসি পরসে একত্র করিঞা
রূপে মিসাইঞা থুবে॥

এই সে মানুসে আসক করিঞা
রতি সে বুঝিঞা নিবে।
রূপ রতি তাহে একান্ত করিঞা
হিঅতে মানুস হবে॥
আমার প্রকৃতি করিঞা রতিতে
মিসাল করিঞা নিবে।
নহে কামানুগা বুঝিবে ইহাতে
রাগের মানুসে পাবে॥
সরূপে সরূপ আসকে আসক
মরিঞা জনম হবে।
তবে সিদ্ধদেহে সখীর সঙ্গিনী
আসক সরূপে পাবে॥
কহে চণ্ডীদাসে সুন রজকিনি
(বলিএ তোমারে) তুমি সিখা জদি দিবে।
তবে সে পাইব ছীরূপ মাধুরী
মিসাল করিঞা নিবে॥ ৪॥

রূপ রতি তাএ, জদি কেঅ পাএ
অন্তরঙ্গা বলি জারে।
রূপেতে সরূপে এই একু করি
মিসাল করিঞা থুবে॥
চইত রূপার সব রতি সার
ছীরূপমঞ্জরী হএ।
নারীর মিসালে নারী হঞা যদি
মানুস সোধনে রএ॥
সোধন করিঞা হিঅতে বাটিঞা
রসিক মানুসে নিবে।
নহে কামানুগা আসাদন করি
আপনি করিবে আলা॥ (?)
সকলচন্দ্র বরন মানুস
এ কথা বুঝিবে কেঅ।

যে জন্য পাঞাছে এই সে মানুস
মরিঞা রঞেছে সেঅ॥
কহে চণ্ডীদাসে সুন রজকিনি
আপনা করিঞা নিবে।
তুমার পরানে আমার পরানে
একত্র বাঁধিঞা থুবে॥ ৫॥

অধরে অধর মিসাল করিঞা
আস্বাদন করি নিবে।
মানুস জন্মিলে আপনা হিঅতে
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
একটি করিঞা প্রেমেতে জন্মাঞা
আবেস করিঞা থুবে।
জতন করিঞা মানুস জন্মাঞা
গমন হইলে পাবে॥
প্রেমের ডুবারু জে জন হইবে
রসের ডুবারু আর।
রসিক বিহনে না জন্মএ রতি
সখীর সঙ্গিনী জার॥
চইত রূপাতে কেবল জানিঅ
রাগ সরোবর আর।
ইহার মাঝারে মন ভৃঙ্গ হঞা
জাএ জদি হএ পার॥
তবে সে হইব চইত রূপার
রাগ রতি দসা আর।
মুখ্য পরকীআ চইত রূপাতে
প্রেমে অনুগত জার॥
ইহাতে বুঝিঞা মনেতে জন্মাঞা
জখনি দেখিতে পাবে।
মন বাস্থ দুই অন্তদ্দসা সেই
প্রকৃতি হইঞা রবে॥
আপনার দেঅ করি প্রেমলেঅ
আসক করিঞা থুবে।
জে কালে জেমন রূপ রতি কলা
সেমতে বুঝিলে পাবে॥
কহে চণ্ডীদাসে প্রেমের উলাসে
রজকিনী রাধা হএ।
ইহাতে বুঝিলে সকলি আছএ
বুঝি জদি সেঅ রএ॥ ৬॥

তুমার চরনে আমার পরানে
একত্র করিঞা থুব।
হিআর মাঝারে রতন কমল
তুমারে করিঞা নিব॥
আচ্ছঅ হইঞা সিক্ষা সে করিব
দুই মন একু করি।
তুমি জদি কৃপা করহ আমারে
রূপেতে মিসিতে পারি॥
তুমা বিনে আর কে আছে আমার
নিউড় বসতে রব।
অকিঞ্চন করি তুমি সে কিসোরি
জতন করিঞা থুব॥
জে কালে জে ভাব করিঞা এ সব
চইত রূপাতে রব।
রাধার মাধুর্জ্জ রূপের সহিত
একান্ত করিঞা থুব॥
কহে চণ্ডীদাসে সুন রজকিনি
তুমার চরণ সার।
তুমার চরণ আচ্ছঅ হইঞা
তবে সে হইব পার॥ ৭॥

তুমার চরনে আমার পরানে

রাগ রতি দিঞা   বসন লইঞা
সেবা সে করিঞা রব ॥
ফুলক্রীড়া জত   তুমার সহিত
আর কিছু নাই মনে।
অকিঞ্চন করি   রাখঅ কিসোরি
সাধ আছে মোর মনে ॥
স্থুল অভিমান -   নাহি মোর জ্ঞান
না দেখি জখন তোরে।
তুমার আসকে   জতন করিঞা
বিরতি করাএ মোরে ॥
তুমার পারা   করিঞা আমারে
সঙ্গিনী করিঞা নিবে।
তিলেক বিচ্ছেদে   সতবার মরি
চরন একান্ত দিবে ॥
চণ্ডীদাসে কএ   মনে হেন লএ
বলিব কি আর তোরে।
আসক দিঞা সে   সুন রজকিনি
রহিলুঁ চরন তলে ॥ ৮ ॥

সনাএ সোহগা   একত্র করিঞা
পুড়িলে উজল হএ।
রাঙ্গের মিসালে   পরেস না মিসে
একথা বুঝিঞা লএ ॥
জতন করিঞা   প্রেম বাড়াইঞা
রতি সুদ্ধ দিনে তাঅ।
আপনা করিঞা   রাখিবে আমারে
আপনা করিঞা রাখ ॥
রাগের অনুগা   করিঞা আমারে
সখীর আচ্ছঅ দিবে।
আসক স্বরূপে   চরন কমল
নিছনী আমারে দিবে ॥

তুমার সহিতে   আসক আসঅ
নিস্চঅ আছএ মোর।
অবতীর স্থিতি   জত উতপতি
তুমার লাগিঞা আর ॥
কহে চণ্ডীদাসে   পাবে অবসেসে
রজকিনী কেবল সার।
ইহার গুন সে   রজকিনী জানে
সেই করিবেক পার ॥ ৯ ॥

এক অন্য রতি   উপজে কাহাতে
তাহার মানুস কেঅ।
তাহারে বাছিঞা   নিউঢ় করিঞা
সতার সরূপ সেঅ ॥
সেই সে মানুসে   অঙ্গের সহিতে
রাগের জনম হএ।
নাই গুরু তার   নাইখ উদেস
বীজাশ্রঅ নাই রএ ॥
আপহিঁ ধার   আপহিঁ রাগ
আপহিঁ রাগ উদঅ।
জনম নাইথ   আছএ রতিতে
অঙ্গের সৌরবে রএ ॥
আপন করন   আপনি করএ
কারে না সে অন্য কএ।
আপনা হইতে   জে কিছু করন
সাক্ষাতে রাগ উদঅ ॥
কহে চণ্ডীদাসে   রজকিনী বেসে
আমারে করিঞা নিবে।
রাগের জনম   অঙ্গ হইতে উঠে
আসক সরূপে পাবে ॥ ১০ ॥

তাহে এক আছে   মন সরোবর
কিসে উপজল আর।

গাছ সে নাইখ   ফল সে ধরএ
বুঝিতে বিসম তার ॥
মন রতি দিঞা   বিসেতে রহিঞা
অমৃত রতিতে পাবে ।
জতন করিঞা   পরেস ধরিঞা
মথিঞা সে ধন নিবে ॥
সেই সে মথিলে   নানা রাগ তাএ
বাছিঞা লইবে তার ।
রূপসরোবরে   জদি মন চরে
তবে সে হইবে পার ॥
কেবল জানিঅ   রতি সে আনিঅ
সে রাঁধাচরন হৈতে ।
ঢাকা দিঞা তাএ   তুলিবে ই দাএ
রাখিবে রূপের হাথে ॥
একদিগে তাএ   সাধক ইথাএ
আসকে কথাঅ তাএ ।
রতি সে রূপেতে   আধার করিঞা
আসক রতিতে পাএ ॥
চণ্ডীদাসে কএ   এ রতি আশ্রঅ
সোলআনা জদি হবে ।
রজকিনী পাসে   উধার করিঞা
রূপে মিসাইঞা থুবে ॥ ১১ ॥

এমতি সে দেঅ স্থিতি ইহা নাহি মিলে কতি
সুদ্ধ জনম অতিসঅ ॥
কটাক্ষ নয়ন সরে সে অঙ্গ সে রসে ভরে
গন্ধে পুরএ সেই দেহ ।
মহাভাব রস সার   সুলভ জনম তার
সেই গর্ব্বে হএ তার লেহ ॥
অখিল রসের সার কেহোঁ নাই পাএ পার
হেন রসে জার দেহ হএ ।
কামগন্ধ সকপট   গন্ধ নাহিঁ জার বট
সুদ্ধ মাংস তারে কএ ॥
অখিল অমৃত কি   আমারে বুঝাএ ঐ
মহাভাব কেমনে সে হএ
সুগন্ধ সুমনোহর   নঅান কটাক্ষ বর
এইরূপে জার জন্ম কএ ॥
নাইকার জন্মমাত্র   অষ্টভাব ভুসা জত্র
কুন্দনে কলিত জার দেহ ।
সদা অনুরাগ মন   গন্ধোন্মাদ ঘুরনন
নাইকার সিরোমনি সেহ ॥
অকথন কথা সুনি   রাখি ভনএ বানী
সুনি সুনি চণ্ডীদাস ভোর ।
তাকর বচনে   অবস কলেবর
মুরুছি পড়ল তহিঁ ঠোর ॥ ১২ ॥

দুঁহে এক স্থলে বসি
কহে কিছু রস
পুরুসরতন জেই   রসিকসেখর সেই
তার জন্ম কেমনে সে কঅ ॥
স্থাবর সে জন্ম ধন্ত   মলঅ পবন গন্য
তার গন্ধ অঙ্গ সে ভরঅ ॥
প্রসবএ ফুল ফল   ধন্ত তার কলেবর
কামপর্স নাই তার হঅ ।

সৌরবে পাঅল পরম সুখ ।
পরসে মিটল নঅন দুখ ॥
অমৃত তাপিত বচন ভাস ।
শ্রবন হরস বাড়ল পিআস ॥
এ তিন সে অঙ্গে পরস ভেল ।
তিনে এক হঞা করল মেল ॥
উভঅ ঘটন দুহুঁর অঙ্গ ।
অখিল রসেতে রূপতরঙ্গ ॥

আচ ভাব হএ এমাত্ত তার।
মহাভাব রূপে অঙ্গ সে জার॥
পিরীতি পাইলে পরসি রুএ।
পিরীতি বিহনে সুন্য সে রুএ॥
রসের প্রধান এইত তার।
সঅন সপনে কারন সার॥
এ সব বচন শ্রীবেস কানে।
রামু চণ্ডীদাস এই সে ভনে॥ ১৩॥

—

পহিল মিলনে সরস নঅনে
তাতে উপজল পিক।
রসের সাঅরে রতির উদঅ
হিআঅ রসের বিন্দু॥
চরন কমল সরস হইতে
সখিতে নারিলাহু কি।
নীল উত্তপল অতি সে বিমল
তাহাতে দেখলু তি॥
ত্রিনাচ আখর সমান করিতে
রসের সাঅরে পসি।
উকটি নঅনে বঅান হেরিতে
নঅনে পসিল সসী॥
অপরূ সরসে সরস পরসে
মনেতে হইল ভোর।
পিপাসিত চাতক চাতকী পাইলে
নব জলধরে জোর॥
অনুদিনে রতি আরতি পিরীতি
নিতই নূতন সার।
রসিআ নাগরী রসের সাগরী
তাহাতে পিরীতি সার॥
ত্রিজগত তরি আনন্দ লহরী
এই সে রসের সার।
অদভুত রীত ইহার চরিত
দাস চণ্ডীদাস তার॥ ১৪॥

—

পাওয়া গিয়াছে। পুথি দুই খানি একত্র থাকিলেও এক ব্যক্তির লেখা নয়। প্রথম ১৫টী পদ কাহার লেখা এবং কোথায় লিখিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। তবে লেখা ও পুথির অবস্থা দেখিলে অন্যূন দুই শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শেষের ১৪টী পদ যে পুথিতে আছে, তাহার শেষে এইরূপ লেখকের নাম ধাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়,—

"ইতি শ্রীচণ্ডীদাসস্য চতুর্দ্দশপদাবলী সমাপ্তং। লেখক শ্রীগণেশরাম শর্ম্মণঃ সাং কুতুলপুর। পঠনার্থে শ্রীদৈবকীনন্দন ঠাকুর মহাশয়। ইতি সন ১০০৯। তারিখ ২ বৈশাখ। বেলা ৪ দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল।"

চণ্ডীদাস বঙ্গের একজন সর্ব্বপ্রধান ও অতিপ্রাচীন কবি। তাঁহার সময়ে বঙ্গভাষার বিশেষতঃ তাঁহার লীলাস্থল নানুরের চলিত বা লিখিত ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। এমন কি পাঠ মিলাইবার জন্যও আমরা স্বতন্ত্র আর এক খানি পুথি বহু চেষ্টায়ও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই সকল কারণে পুথি দুই খানিতে আমরা যেরূপ পাইয়াছি, কিছুই সংশোধন না করিয়া সেই রূপই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। বাস্তবিক প্রাচীন পুথির উপর রঙ্ ফলাইতে আমাদের বিবেচনায় কাহারও অধিকার নাই। প্রাচীন পুথি ছাপাইতে গেলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। হঠাৎ কোন স্থলে বর্ণাশুদ্ধি, বর্ণ-

বিপর্য্যয় বা প্রচলিত ব্যাকরণদুষ্ট পদ দেখিয়া বিচলিত হওয়া উচিত নহে। ভাষার পূর্ব্বাপর অবস্থা বুঝিয়া ধীরভাবে তাহার সমালোচনা করাই উচিত। কারণ আজ যাহা আমরা ভুল বুঝিলাম, কাল তাহাই হয়ত ঠিক হইতে পারে। আজ যে ভাষা আমরা ব্যবহার করিতেছি, কিছু দিন পূর্ব্বে ঠিক এরূপ ভাষা ছিল না, কোন কোন অংশে অনেক প্রভেদ ছিল, তাহা ভাষাবিদ্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সেই জন্যই আমরা বঙ্গভাষার প্রাচীনতম অবস্থার কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণদুষ্ট পদ আছে ভাবিয়াও সংশোধন করিতে সাহসী হই নাই। যদি ভুল বাহির হয়, সে দোষ প্রাচীন পুথিলেখকের,—বর্ত্তমান প্রকাশকের সে দায়িত্বগ্রহণ না করাই ভাল। এরূপ স্থলে তাঁহার যাহা যাহা বক্তব্য, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে তাহা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক ১০০৯ সনের পুথির পদযোজনা, ভাষা ও অক্ষরবিন্যাসদর্শনে বঙ্গভাষার প্রাচীনতম অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের মনে উদিত হইয়াছে। তবে এই সরস পদাবলীর সহিত নীরস ব্যাকরণের আলোচনা করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। এখানে দুই একটী কথা বলিয়া অবসর লইতে ইচ্ছা করি।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা, বঙ্গভাষা যেমন সংস্কৃতের নিকটবর্ত্তী এবং সংস্কৃতমূলক, এমন আর কোন ভাষা নহে। বাস্তবিক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে একথা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় আমরা অধিকাংশ যে শব্দ ব্যবহার করি, তাহা সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক বটে, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় স্থানে স্থানে সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহৃত হইলেও সর্ব্বত্র প্রাকৃতমূলক পদই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম বঙ্গীয় কবিগণ অনেক স্থলে প্রাকৃত ভাষার অনুসরণ করিয়াই চলিতেন। আজ যে পুথি খানির কথা বলিতেছি, ইহাতে অধিকাংশ স্থলে প্রাকৃত ভাষার অনুকরণে অনেক শব্দ ও পদবিন্যাস আছে।

১। প্রাকৃত ভাষায় 'য' স্থানে "জ" হয়।[১] আলোচ্য পুথির সর্ব্বত্রই এইরূপ "য" স্থানে "জ" লিখিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃত ভাষায় শ ও ষ স্থানে স হয়।[২] এই পুথিতেও সর্ব্বত্রই শ ও ষ স্থানে 'স' ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। প্রাকৃত ভাষায় নিয়মে 'দ' স্থানে 'ড' হয়।[৩] এই পুথিতেও অনেক স্থানে বর্ত্তমান নিয়মে 'দাণ্ডাইয়া' না হইয়া 'ডাণ্ডাঞা' লিখিত হইয়াছে।

---

(১) 'যস্য জঃ।' (চণ্ডপ্রাকৃত ৩।১৫) যথা সূর্য্যঃ=সুর্জ্জো, যাত্রা=জাত্তা।

(২) 'রশষাণাং সঃ।' (চ° প্রা° ৩।১৮) 'রেফশকারষকারাণাং স্থানে সকারো ভবতি। যথা,—শিরং=সীসং, শশী=সসী, আশিষং=আসিসং।'

(৩) 'তবর্গস্য চ টবর্গো'।' (চ° প্রা° ৩।১৬) যথা=দণ্ডঃ ডণ্ডো।

৪। প্রাকৃত ভাষায় য ও বকারের পর হকার থাকিলে হকারের লোপ হয়।[৪] এই নিয়মে পুথিতে 'ব্যবহার' স্থানে 'ব্যভার' লেখা আছে।

৫। প্রাকৃত ভাষায় সর্ব্বত্রই "ন" স্থানে "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে *। কিন্তু এই পুথিতে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য এই উভয় নকারের স্থানেই কেবলমাত্র "ন" লিখিত আছে। চণ্ডের প্রাকৃত ব্যাকরণে সূত্র আছে, "পৈশাচিকী ভাষায় 'র' স্থানে ল এবং 'ণ' স্থানে 'ন' হয়।"[৫] অর্থাৎ পৈশাচিকী ভাষায় কেবল মাত্র 'ন'র ব্যবহার আছে। তবে কি এই পুথির 'ন'কার পৈশাচিক প্রাকৃত অনুসারে গৃহীত হইয়াছে, তাহাত ঠিক বুঝা গেল না। বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় 'ণ' কারের প্রকৃত উচ্চারণ নাই, একমাত্র 'ন' কারের উচ্চারণই প্রচলিত। তাই বোধ হয় দেশী উচ্চারণ অনুসারে সর্ব্বত্র 'ন' গৃহীত হইয়াছে।

৬। এই পুথির বহু স্থলেই 'য়' স্থানে 'অ' দেখা যায়। যেমন নঅন, নাঅক প্রভৃতি। মৃচ্ছকটিক, ভবভূতির বীরচরিত, রত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতাংশে এই নিয়ম পালিত হইয়াছে। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশে ও হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে য়, দ প্রভৃতি কএকটীর বর্ণের স্থলে 'অ' হইবার ব্যবস্থা আছে।[৬]

৭। এইরূপে প্রাকৃতের অনুরূপ 'স্ব' স্থানে 'স'[৭]; 'হৃদয়' স্থানে 'হিআ'[৮] ও শব্দের শেষে তৃতীয়া ও সপ্তমীতে 'এ'[৯] বিভক্তি দেখা যায়।

৮। সংস্কৃত 'স ইদং' স্থানে প্রাকৃত ভাষায় 'সেঅং' লিখিত আছে, এই পদাবলী মধ্যেও অনুস্বারহীন 'সেঅ' 'কেঅ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯। এ ছাড়া নানাস্থানে 'মরএ', 'আছএ' প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় উক্ত পদান্ত 'এ' পূর্ব্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'মরে' 'আছে' ইত্যাদি পদসিদ্ধ হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, বাহুল্যভয়ে এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন। পত্রিকা-সম্পাদক।

(৪) 'হাদ্‌যবৌ লোপ্যৌ।' (চ° প্রা° ৩।৭) যথা—বিহ্বলঃ—বিব্‌ভলো।

* কেবল যেখানে 'ন'কার শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ শব্দেরই দুই এক স্থলে দন্ত্য 'ন'কারের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(৫) 'পৈশাচিক্যাং রণয়োর্লনৌ।' (৩।৩৮) পৈশাচিক্যাং রেফস্য লকারো ভবতি ণকারস্য নকারঃ॥

(৬) এই পুথিতে 'বআন' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা প্রাকৃত 'বঅণ' শব্দের রূপ বলা যাইতে পারে।

(৭) যেমন স্বর্গ স্থানে 'সগ্গ'। [৯ সংখ্যক পদ দেখ।]

(৮) প্রাকৃত ভাষায় 'হিঅঅ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

(৯) যেমন—বিলাসএ [১ সংখ্যক পদ দেখ।] মহাবীরচরিতের প্রাকৃতাংশে ঠিক এইরূপ 'ভূমিএ' প্রভৃতির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

ধোয়ী কবির পবনদূত।

জয়দেব বাঙ্গালার সুপরিচিত কবি। যাঁহারা কিছুমাত্র সংস্কৃত পড়িয়াছেন, জয়দেবের নাম তাঁহাদের কাছে সুপরিচিত। গীতগোবিন্দের পদাবলী কোমল ও কমনীয়। গীতগোবিন্দের তৃতীয় শ্লোকটী অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। কবিতা যথা—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

এই কবিতাটীতে জয়দেবের ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী চারিজন কবির নাম আছে। জয়দেবের পরিচয় অনাবশ্যক, তাঁহার গীতগোবিন্দে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার নিবাস বীরভূম, অজয়নদতীরে কেন্দুলীগ্রামে। তথায় তাঁহার স্মরণার্থ এখনও প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে। কথিত আছে, তিনি ভরসা করিয়া যে কথা কয়টী লিখিতে পারেন নাই, স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ আসিয়া সেই কথা কয়টী লিখিয়া তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতিপূর্ণ করিয়া যান। জয়দেব লিখিয়াছিলেন,—

"স্মর গরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং" তাহার পর কি লিখিব বলিয়া আর লিখিতে পারেন নাই। নারায়ণ লিখিয়া গেলেন,—

"দেহি পদপল্লবমুদারং।"

বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস জয়দেবের গীতাবলীর প্রেমোচ্ছ্বাসে ভগবানেরও ভাবোচ্ছ্বাস হয়। কিন্তু অপর চারিজন কবি কে? শুনা যায়, ইহারা সকলেই লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন, সকলেই এককালে কবিতার মাধুর্য্যে বঙ্গদেশ মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায়? জয়দেবের ঐ কবিতাটী না থাকিলে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইত।

বহুকাল ধরিয়া এই চারিজনের বিষয় কিছু অবগত হইবার জন্ত বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটী কাব্যসংগ্রহ নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতী ছিল। আর্য্যাসপ্তশতীতে সেনবংশের উল্লেখ আছে যথা,—

"সকলকলাঃ কলয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলক-ভূপতিরেকো রাকাপ্রদোষশ্চ॥"

অর্থাৎ—একমাত্র সেনবংশীয় ভূপতি এবং পূর্ণিমাতিথির সন্ধ্যাকাল প্রবন্ধ এবং চন্দ্রের সকল কলা প্রকাশ করিতে সমর্থ।

এই কাব্যখানিতে সাতশত আর্য্যা-শ্লোক আছে—৫৪টী শ্লোক মুখবন্ধে এবং ৬টী উপসংহারে, অবশিষ্টগুলি অকারাদি ক্রমে লিখিত; যথা,—অকারে ৭৩, আকারে ৩৩, ইকারে ৭, ঈকারে ৩, উকারে ২২, ঊকারে ১, ঋকারে ২, একারে ৮, ককারে ৪৩, খকারে ১, গকারে ২৪, ঘকারে ৩, চকারে ১২, ছকারে ২, জকারে ১১, ঝকারে ১, ঢকারে ১, তকারে ২৮, দকারে ২৮, ধকারে ৪, নকারে ৩৮, পকারে ৫৭, বকারে ৬, ভকারে ১৬, মকারে ৩৫, যকারে ২৮, রকারে ১৪, লকারে ৯, বকারে ৫২, শকারে ২৪, ষকারে ১, সকারে ৯৮, হকারে ৮ ও ক্ষকারে ৩। অর্থাৎ মুখবন্ধ এবং উপসংহার বাদ দিলে ৬৯৬টী আর্য্যা কবিতা এই প্রবন্ধে লিখিত আছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই শৃঙ্গাররসপূর্ণ, তাই জয়দেব গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পরিচয়স্থলে "শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়-রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন" বলিয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ তিনি শৃঙ্গার রসের অনেক ভাল কথা বলিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য সপ্তশতী ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু অনুমানে বোধ হয় আর করেন নাই, করিলে উপসংহারে একথা বলিতেন না—

"উদয়নবলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্যসোদরাভ্যাং মে।
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্ম্মলীকৃত্য॥"

অর্থাৎ—যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশকে পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন, তেমনি আমার শিষ্য উদয়ন আর সোদর বলভদ্র সংশোধন করিয়া আমার এই সপ্তশতী প্রকাশ করিলেন।

লক্ষ্মণসেনের সামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তৎকালবিখ্যাত কবিগণের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটী করিয়া কবিতা আছে; উহাতে গোবর্দ্ধনেরও পাঁচটী কবিতা আছে।

শরণ কবির কোন গ্রন্থাদি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহারও প্রণীত পাঁচটী কবিতা আছে, সুতরাং শ্রীধরদাসের সময় তাঁহার কবিতা যে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতির নাম নাই, বোধ হয় উমাপতি কোন কাব্য লিখেন নাই, কিন্তু সেনবংশীয় বিজয়সেনের প্রশস্তি তাঁহার লিখিত। দেওপাড়া হইতে একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহাতেই ওই প্রশস্তি খোদিত আছে এবং তাহাতেই উমাপতির নাম জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। আর জয়দেব উমাপতির যে গুণ বর্ণন করিয়াছেন (বাচঃ পল্লবয়তি) তাহাও তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাকি ধোয়ী কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার পাঁচটী কবিতা আছে।

কয়েক বৎসর সন্ধানের পর বিষ্ণুপুরস্থ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুনাথ তর্করত্নের নিকট ধোয়ী কবির একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থখানির নাম পবনদূত।

কালিদাস যেমন মেঘকে বিরহী যক্ষের দূত করিয়াছেন, সেইরূপ ধোয়ী কবি মলয়পবনকে বিরহিণী কুবলয়বতীর দূত করিয়া চন্দনাদ্রি (মলয়পর্ব্বত) হইতে লক্ষ্মণসেনের নিকট নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেন নাকি একবার দিগ্বিজয় করিতে গিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে মলয়গিরিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুবলয়বতী তাঁহাকে দেখিয়াই কুসুম-শরের কিঙ্করী হইয়াছিলেন;—

"তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং কুসুমশরতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ী বভুব॥"

অর্থাৎ—সেই পর্ব্বতে কুবলয়বতী নামে এক গন্ধর্ব্বকন্যা ছিলেন, মদনের কুসুমশর অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর রাজা লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয়ক্রমে দক্ষিণদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সেই বালা মন্মথের কিঙ্করী হইয়াছিলেন।

বসন্তের সমাগমে তাঁহার মনের অবস্থা বিকৃত হইয়া আসিলে তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাঁহার নিকট দূতপ্রেরণার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, দেখিলেন মলয়পবন উত্তরাভিমুখে যাইতেছে। তিনি এই মলয় মারুতকেই কান্তের নিকটে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মেঘদূতে যেমন প্রথম রাস্তার বর্ণনা, তাহার পর মনের ভাব প্রকাশ, ইহাতেও তাই। যাঁহারা কালিদাসের মনোমোহিনী বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ধোয়ী কবির বর্ণনায় সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না, কিন্তু বাঙ্গালী হইবেন, কারণ কবি বাঙ্গালী, কবির নায়ক বাঙ্গালী। যে সময়ের বাঙ্গালা দেশের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না, সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের অনেক কথা একজন বাঙ্গালীর মুখে শুনিতে কোন্ বাঙ্গালীর না আগ্রহ হয়? তাহাতে আবার কবি লক্ষ্মণসেনকে গন্ধর্ব্বকন্যার প্রণয়পাত্র করিয়া বাঙ্গালীর মান আরও বাড়াইয়াছেন।

কুবলয়বতী আপনার সখীদিগের নিকটেও আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু মলয়পবনকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মলয় পবনের স্তুতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—

"ত্বত্তঃ প্রাণাঃ সকলজগতাং দক্ষিণত্বং প্রকৃত্যা
জজ্ঞানং ত্বাং পবন মনসোঽনন্তরং ব্যাহরন্তি।
তস্মাদেবং ত্বয়ি খলু ময়া সংপ্রণীতোঽর্থিভাবঃ
প্রায়ো ভিক্ষা ভবতি বিফলা নৈব যুষ্মদ্বিধেষু॥"

অর্থাৎ—তোমা হইতে সকল জগতের লোক প্রাণ পায়, তুমি স্বাভাবিক দক্ষিণ—সরল, দ্রুতগতি পদার্থসমূহের মধ্যে মনের পরই তোমার নাম, এই জন্যই আমি তোমার নিকট অর্থিভাবে উপস্থিত হইয়াছি। প্রায় তোমাদের মত লোকের নিকট ভিক্ষা করিলে তাহা বিফল হয় না।

আর বিরহবিধুরগণের উদ্ধার তোমার বংশে পূর্ব্বে আরও হইয়াছে। তোমারই পুত্র না বিরহবিধুর রামচন্দ্রের জন্য সমুদ্রও লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন।

"বীক্ষ্যাবস্থাং বিরহবিধুরাং রামচন্দ্রস্য হেতো-
র্যাতঃ পারং পবন সরিতাং পত্যুরপ্যাঞ্জনেয়ঃ।
তত্তাতস্যাপ্রতিহতগতের্যাস্যতস্তে মদর্থং
গৌড়ক্ষৌণী কতিনু মলয়ক্ষ্মাধরাদ্‌যোজনানি॥"

অর্থাৎ রামচন্দ্রের বিরহবিধুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জন্য অঞ্জনানন্দন হনুমান্ সমুদ্রও পার হইয়া গিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার পিতা, তোমার গতি অপ্রতিহত, তুমি যদি আমার জন্য যাইতে স্বীকার কর, তবে এ মলয়পর্ব্বত হইতে গৌড়রাজ্য তোমার পক্ষে কয় যোজন?

সেখানে যাইলে—সে দেশে বুলিয়া বেড়াইলে তোমারও তৃপ্তি আছে।

"তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ
সান্দ্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণো গৌড়দেশঃ।"

(গগন যদি অট্টালিকা হয়) তাহা হইলে সমতল গৌড়দেশ তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। সে উঠান বাগানে বাগানে ভরিয়া রহিয়াছে, এখন ফুল ফুটিবার সময় তুমি সেইখানে বুলিয়া বেড়াইবে। তুমি প্রস্থান কর, চন্দনের গন্ধ লইয়া যাও, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিলে বসন্তে মদমত্ত অহিকুল তোমায় পান করিয়া ফেলিবে। অতএব যত শীঘ্র পার যাও। এখান হইতে দুই ক্রোশ গেলেই তুমি ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে,—

"শ্রীখণ্ডাদ্রেঃ পরিসরমতিক্রম্য গব্যূতিমাত্রং
গন্তব্যস্তে কিমপি জগতীমণ্ডনং পাণ্ড্যদেশঃ।
তত্রাখ্যাতং পুরমুরগমিত্যাখ্যয়া তাম্রপর্ণ্যা-
স্তীরে মুগ্ধক্রমুকতরুভির্বদ্ধরেখৈর্ভজেথাঃ॥" ৮॥

এই শ্রীখণ্ডপর্ব্বতের পাদদেশ পরিত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ গেলেই জগতের অলঙ্কার পাণ্ড্যদেশ। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে উহার রাজধানী, নাম উরগপুরী। উহা অতি প্রসিদ্ধ। উহার চারিদিকে শারিবন্দী সুপারি গাছ।

তাহার নিকটে শ্রীরামচন্দ্রের সেতু।

"ক্রীড়াশৈলং ভুজগনগরী-যোষিতাং কৌতুকঞ্চেৎ
সেতুং যায়া জলধিকারিণঃ শৃঙ্খলাদামদীর্ঘম্।
ভাতি স্নেহাদবনিতনয়া জীবনাশ্বাসহেতো
লঙ্কাদ্বীপং প্রহিত ইব যো বাহুরেকঃ পৃথিব্যাঃ॥" ৯॥

উরগনগরবিলাসিনী বারাঙ্গনাদিগের ক্রীড়াশৈল দেখিবার জন্ত যদি তোমার কৌতুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সেতু দেখিতে যাইও। সমুদ্র উন্মাদ হস্তীর ন্যায় সদাই চঞ্চল ও সদাই উদ্দাম সেতুটী দেখিলে বোধ হয় যেন এই উদ্দাম হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্ত দীর্ঘ শৃঙ্খলা বিস্তার করা হইয়াছে। উহা দেখিলে আরও বোধ হয় সীতাকন্তা কি না। তাই তাঁহার ঘোর দুঃখের সময় অপত্যস্নেহে পীড়িতা পৃথ্বীদেবী তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য যেন একটী হাত লঙ্কাদ্বীপে পাঠাইয়াছেন।

সেখানে রামেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করিলে অনেক পুণ্যলাভ হইবে। সেখান হইতে কাঞ্চী।

"লীলাগৌরৈরমরনগরস্যাপি গর্ব্বং
গচ্ছেঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ।
নক্তং যত্র প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং
কুর্ব্বন্ পাণিপ্রণিহতধনুর্জায়তে পঞ্চবাণঃ॥" ১২॥

সেখান হইতে দক্ষিণদিকের ভূষণসদৃশ কাঞ্চীনামক পুরীতে গমন করিও; উহা সুধা-ধবলিত প্রাসাদসমূহে অমরাবতীরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে। সেখানে পঞ্চবাণ ধনু হাতে করিয়া প্রহরীর ন্যায় সকল রাত্রি জাগিয়া থাকেন।

সেখানে তোমায় পাইলে চোলকামিনীরা সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, তুমিও তাহাদের চন্দনচর্চ্চিত গণ্ডস্থলে পিছলাইয়া পড়িবে—সহজে উঠিতে পারিবে না।

কাঞ্চী ছাড়িয়া তুমি কাবেরী নদী ধরিয়া চলিয়া যাইবে।

"হিত্বা কাঞ্চীমবিনয়বতীভুক্তরোধোনিকুঞ্জাং
তাং কাবেরীমনুসরখগশ্রেণিবাচালকূলাম্।
কান্তাশ্লেষাদপি খলু সুখস্পর্শমি[illegible]মোহপি
স্বচ্ছং ভিক্ষা প্রবণমনসোপ্যাম্বু যস্যা নবীয়ঃ॥" ১৫॥

কাঞ্চী ত্যাগ করিয়া কাবেরী ধরিয়া চলিয়া যাইবে; উহার দুই কূল পক্ষিগণের কলরবে কলকলায়িত। দুই তীরেই নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে চোলরমণীগণের অবিনয় চিহ্ন প্রকাশিত আছে।

উহার জল কান্তার আলিঙ্গন হইতেও সুখস্পর্শ, চন্দ্রকিরণ হইতেও স্বচ্ছ এবং ভিক্ষুকের মন হইতেও লঘু। সেখান হইতে মাল্যবান্ পর্ব্বত-—

"স্নিগ্ধশ্যামং তরুভিরুপলৈঃ পর্ব্বতং মাল্যবন্তং
পশ্যেরুত্তম্ভিতমিব পুরঃ কেশপাশং পৃথিব্যাঃ।
তত্রাদ্যাপি প্রতিসরজলৈর্জ্জর্জরাঃ প্রস্থভাগাঃ
সীতাভর্ত্তুঃ পৃথুতরশুচঃ সূচয়ন্ত্যশ্রুপাতান্॥" ১৮॥

সেখান হইতে গাছ ও পাথরে ঢাকা মাল্যবান্ পর্ব্বত দেখিবে, উহার সুন্দর রঙ্ দেখিলে তোমার চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে, বোধ হইবে, যেন পৃথিবী আপন কেশকলাপ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। উহার চারি পাশ দিয়া ঝরণা ঝরিতেছে, বোধ হইতেছে, যেন রামের দুঃখ দেখিয়া আজিও এ পর্ব্বত কাঁদিতেছে।

মাল্যবান্ অতিক্রম করিয়া পঞ্চাপ্সর সরোবর। এই সরোবরের চারিদিক্ সরলতরুতে আবৃত। এই খানেই পাঁচটী অপ্সরা প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এখনও রাত্রিতে সেখানে অপ্সরারা আসিয়া গান করে এবং হরিণগণ মুগ্ধ হয়।

সেখান হইতে তুমি নানাপল্লী দেখিতে দেখিতে উত্তরমুখে যাইবে। পল্লীর চারিদিকে বাগানে বাগানে অশোক ও সুপারিগাছ এবং পথিকেরা সরলা পল্লীবাসিনীদিগের প্রেমলোভে ঘুরিয়া বেড়ায়। তথা হইতে—

"অন্ধ্রান্ হিত্বা জলনিবিড়বধূগাঢ়গোদাবরীকান্
কালিঙ্গস্যানুসর নগরীং নাম তাং রাজধানীং॥" ২১॥

সেখান হইতে অন্ধ্রদেশ—যথায় বহুসংখ্যক রমণী গোদাবরীর জলে অবগাহন করিতেছে। সেই অন্ধ্রদেশ ছাড়িয়া কলিঙ্গনগর নামে কলিঙ্গরাজের রাজধানীতে যাইবে।

উহার নিকটেই সমুদ্রতীরে সুপারিমালা ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে এবং সিদ্ধাঙ্গনারা গান করিয়া পথিকগণের কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।

সেখান হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে গমন করিবে, দেখিবে লতার কিসলয়গুলিও যেন মদভরে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখিবে মদমত্ত হস্তীর বিকট চীৎকারে শবররমণীগণ হঠাৎ মান ত্যাগ করিয়া স্বামীর ক্রোড়দেশে লুকাইতেছে। সেখানে কলনাদিনী রেবানদী প্রবাহিত, উভয় তীরে বেণুবন, বেণুবনের বর্ণ শুকপক্ষীর বর্ণকেও লজ্জিত করিয়া দেয়। যুবকযুবতীর এমন ক্রীড়াস্থল বুঝি ভুবনে আর নাই।

সেখান হইতে যযাতিনগর বা যাজপুর—

"লীলাং নেতুং নয়নপদবীং কেরলীনাং রতেশ্চেদ্-
গচ্ছেঃ খ্যাতাং জগতি নগরীমাখ্যয়া তাং যযাতেঃ।

গাঢ়াশ্লিষ্টক্রমুকতরবঃ প্রাঙ্গণেনোগ্রবল্ল্যো
বালাং যত্র প্রিয়তমপরীরম্ভমধ্যাপয়ন্তি ॥” ২৬ ॥

যদি কেরলরমণীগণের ক্রীড়া দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সেখান হইতে যযাতির প্রসিদ্ধ নগর যাজপুরে যাইবে। এই নগরে উঠানে উঠানে লতাগুলি সুপারিগাছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বালিকাদিগকে আলিঙ্গনবিদ্যা শিক্ষা দিতেছে।

তথা হইতে সুহ্মদেশ—

“গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংশো
হধ্যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ঃ সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র ভাতি ॥ ২৭
তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মাদ্ বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি সুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥” ২৮ ॥

সেখান হইতে সুহ্মদেশ, উহার পরিসর ভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত। সুধাধবলিত প্রাসাদ-রাজি উহার কর্ণভূষণ স্বরূপ। সেই রসময়দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে। সেখানে নবশশিকলার ন্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণাঙ্গণাগণের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে। সেখানে সেনবংশীয় নরপতির ইষ্টদেবতা মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত। তিনি সুহ্মদেশেই থাকেন। সেখানকার বাররামাগণের হস্তে সকল সময়েই লীলাকমল বিরাজ করে; তাহাদের দেখিলেই নারায়ণের লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হয়।

শ্রীখণ্ডপর্ব্বত হইতে সুহ্মদেশ পর্য্যন্ত ধোয়ী কবি যে সকল স্থানের উল্লেখ করিলেন এই সকল স্থান কোথায় জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতের নামই শ্রীখণ্ডপর্ব্বত বা চন্দনাদ্রি। উহা পাণ্ড্যদেশেরও বাহিরে, কারণ শ্রীখণ্ডাদ্রির পরিসর অতিক্রম করিয়া দুইক্রোশ গিয়া তবে পাণ্ড্যদেশ। পাণ্ড্যদেশের রাজ-ধানীর নাম উরগপুর। কালিদাসও উরগপুর পাণ্ড্যদেশের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে “অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং দৌবারিকী দেবসরূপমেত্য” বলিয়াই “পাণ্ড্যোহয়মংশার্পিতলম্বহারঃ” বলিয়াছেন। টীকাকারেরা উরগপুরকে নাগপুর বলিয়াছেন। এ নাগপুর যদি নাগপত্তন হয়, তবে তাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বরের অনেক উত্তরে এবং সেতুবন্ধের নিকটে তাম্রপর্ণীনদীর তীরে উরগপুর বলিয়া বোধ হয় কোন পুরী ছিল। য়ুএল সাহেব প্লিনি প্রোক্ত ‘উরইউর’ অর্থাৎ উরগপুরকে চোলদেশের রাজধানী বলিয়াছেন, সুতরাং উরগপুর লইয়া

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের পুঁথিখানির পার্শ্বেও উরগপুরের টিপ্পনীতে নাগপুর লেখা আছে। রামেশ্বর শিব এখনও সেতুবন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু বহুকাল হইতেই পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মদুরা তাম্রপর্ণীনদীর উপরে স্থাপিত। মদুরারই আর এক নাম উরগপুর হইলে সকল গোলই মিটিয়া যায়।

পাণ্ড্যদেশের রাজধানী হইতে পবনদেব একবারে চোলদেশে উপস্থিত হইবেন। লক্ষ্মণসেনের সময়ে কাঞ্চী চোলদেশের রাজধানী ছিল। খৃষ্টের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে উহা অশ্বত্থামাবংশসম্ভূত পল্লবদিগের রাজধানী ছিল। পল্লবগণ প্রথমে অতি পরাক্রান্ত, পরে হীনবল হইয়াও দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কাঞ্চীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর উহা সূর্য্যবংশীয় চোড়রাজগণের রাজধানী হয়। একজন চোড়রাজ দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া বাঙ্গালা ও মগধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাজেন্দ্রচোড়।

দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজগণের অসীমপরাক্রমে চোড়গণ হীনবীর্য্য হইলেও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে চোড়গণ কাঞ্চীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কাঞ্চীনগর অতিক্রম করিয়া ধোয়ী কবি পবনকে কাবেরীর অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বোধ হয় সংস্কার ছিল কাবেরী কাঞ্চীনগরীর উত্তরে। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়, কাবেরী কাঞ্চী হইতে অনেক দক্ষিণে।

কাবেরী হইতে মাল্যবান্। মাল্যবান্ পর্ব্বত মহিসুরের পশ্চিমাংশে পম্পাসরোবরের নিকটে; সুতরাং এখানেও কিছু গোল। তাহার পর পঞ্চাপ্সরতীর্থ। বেগলার সাহেব Archæological Surveyর ১৩শ ভাগে বলেন, উহা সারগুজার নিকট। তাহা হইলে ছোট নাগপুরের নিকট। ধোয়ী কবি কিন্তু উহাকে গোদাবরীর দক্ষিণে রাখিয়াছেন। গোদাবরীর উভয় প্রান্তে অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রদেশের পর কলিঙ্গদেশ ও কলিঙ্গপত্তন। কেরল দেশ হইতে কোঙ্গু বা গঙ্গবংশীয় একজন রাজা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কলিঙ্গ দেশে রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাজরাজ দেব রাজেন্দ্রচোড়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, এই বিবাহের সন্তান চোড়গঙ্গদেব উড়িষ্যা বিজয় করেন (১১১৮ খৃঃ।) সুতরাং লক্ষ্মণসেনের সময় ধোয়ী কবি পবনদেবকে উড়িষ্যার রাজধানীতে কেরলীগণের বিলাস দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কলিঙ্গ হইতে উড়িষ্যা আসিবার পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয় পবনরাজকে একবার কিছু পশ্চিমে লইয়া গিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত ও রেবানদী দেখাইয়া আনিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে সুহ্মদেশ বেশী দূর নহে। সুহ্মদেশের রাজধানী তাম্রলিপ্তী। দশকুমারচরিতে আছে—"অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী।" কবিরাজ মহাশয় পুঁথি দেখিয়াই পুঁথি লিখিয়াছেন, দেশ ভ্রমণ করেন নাই—নহিলে এতগুলি ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই বার গৌড়দেশের বর্ণনা শুনিব। সেখানে দেখিবে, মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাবলীতে কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্দ্ধগৌরীশ্বরমূর্ত্তি বিরাজিত। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্পদূর, কিন্তু ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাঁধ

বল্লাল নরপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছে। গঙ্গায় স্নান করিতে আসিবার সময় বাঁধে উঠিলে দুইরূপেই স্বর্গনগরের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। সেখানে তুমি গঙ্গার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। সুপরিপুষ্ট হংসকুল তাঁহার অলঙ্কার, তিনি তরঙ্গ হস্তে ফেনময় দর্পণ ধারণ করিয়াছেন। সেখানে গঙ্গা উত্তালতরঙ্গমালা সমাকুল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ যমুনায় জলক্রীড়া করিতে আসিলে তাঁহাদিগের স্তনস্থিত মৃগমদতরঙ্গে ধৌত হইয়া যমুনার জল আরও কাল করিয়া দিত। যমুনা ভাগীরথী হইতে বহির্গত হইয়া দেশান্তরে ধাবিত হয়েন। তুমি সেই গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থলে গমন করিবে; দেখিবে, কৃষ্ণসলিলা যমুনা আঁকিয়া বাঁকিয়া কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় সাদা খোলস ছাড়িয়া গমন করিতেছে, দেখিয়া যেন ভীত হইও না।

সেখান হইতে আরও উত্তরে গিয়া বিজয়পুর নামে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে উপস্থিত হইবে ও প্রকাণ্ড ছাউনি দেখিবে। সেখানকার রমণীরা দেখিতে অতি সুন্দরী, তাহাদের স্বভাব অতি মধুর। সেখানে অট্টালিকার উপর চিলেঘর, সে ঘরে দেয়ালে খোদা অনেক পুতুল। সেখানে গৃহপ্রাঙ্গণে সুপারি গাছ, কিন্তু এ গাছে জলসেচন করিতে হয় না, রাত্রিকালে চন্দ্রকান্তমণির জলস্রাবেই তাহাদের সেচনক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে। সে বড় পবিত্রদেশ, গঙ্গার অবস্থানে উহার প্রকৃতি নির্ম্মল হইয়াছে, তাহাতে আবার লক্ষ্মণসেন রাজা, ইহলোক বা পরলোক কোন লোকেই তাহাদের ভয় নাই। সেখানে নিম্নলিখিত বস্তু সকল যুবকদিগের আনন্দ প্রদান করে। যথা,—কুঙ্কুমনির্ম্মিত অঙ্গরাগ, দোলা, সুন্দরীসমূহ, ক্রীড়াবাপী (জল অল্প), মালতীমালা, রাত্রি এবং জ্যোৎস্না। অভিসারিকারা রজনীতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেও তাহাদের চরণস্থিত আলতার দাগ সকালবেলা দেখা যায় না; কারণ সকাল বেলা সূর্য্যের কিরণ রক্তাশোকের ন্যায় লাল হয়, তাই লালে লাল মিশাইয়া যায়।

এখানে রত্নাকরের বড়ই বিপদ্, কারণ এখানকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করে। প্রথম হরণ করেন মুক্তা, তাহার পর মরকত, তাহার পর মহানীল, পরে শঙ্খ (ইহাতে বলয় রচনা বড়ই সুন্দর হয়)।

তুমি মদনের গুরু, তুমি সেখানে বসিলে রমণীরা বাগানে নাগরদোলা খাটাইয়া ক্রীড়া করিবেন। বোধ হয়, যেন স্বর্গসুন্দরীদিগকে জয় করিবার জন্য মদন বঙ্গদেশে একদল সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহারা নাগরদোলায় চড়িয়া কেমন করিয়া আকাশে যাইতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতেছে।

সেখানে রমণীরা কেতকীপত্রে কর্ণভূষণ নির্ম্মাণ করেন, কর্ণ হইতে সেটী খসিয়া পড়িলে বোধ হয় যেন মুখচন্দ্রের একটী অংশ খসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে লক্ষ্মণসেনের সাতমহল বাড়ী, উহার মস্তকে মেঘ বিশ্রাম করে, তাহাতে বিদ্যুৎ ঝলসিলে বোধ হয় যেন পতাকা উড়িতেছে।

সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, বোধ হয় উহা যেন ইন্দ্রনীলমণিতে নির্ম্মিত, উহাতে অনেক রাজহংস কেলি করে। সেখানে লক্ষ্মণসেনের নূতন রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ মনসিজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন—

"দেবং সাক্ষান্মনসিজমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেথাস্ত্বং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ।
যস্য স্নিগ্ধস্ফুরদসিলতাস্মারগত্যা জনানাং
লব্ধঃ সংখ্যে রিপুকুলবধূলোচনে সংবিভাগঃ ॥" ৫৫ ॥

সেই সময়ে যদি রাজা নির্জনে মন্ত্রণাকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে, হে পবন! আমার সন্দেশ তাহাকে দিও না। মন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে প্রেমের কথা স্থান পায় না। বেশ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আমার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবে। এই বলিয়া কুবলয়-বতী আপনার অবস্থা জানাইতেছেন। সে অনেকগুলি কবিতা নমুনার স্বরূপ দুই একটী দিতেছি—

"ধত্তে দ্বেষং শশিনি কুরুতে নগ্রহং কেশহস্তে
দুরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়া চন্দনস্য।
বক্তুং দেব ত্বয়ি পরমসৌ মামবস্থাং কথঞ্চিদ্
গাঢ়োদ্বেগা নয়তি কবিতাচিন্তয়া বাসরাণি ॥ ৭৩
পীনোদ্যানে বিতরতি ভৃশং যত্নসংরুদ্ধবাষ্পা
সান্দ্রে চন্দ্রার্চ্চিষি নিবিশতে চন্দনাভ্যক্তগাত্রী।
ক্রীড়াবাপীমরুন্দভিমুখং ধাবতি ব্যাকুলাসৌ
কিংবা নার্য্যো রমণবিরহে সাহসং নাচরন্তি ॥ ৮৯
সন্দেশোঽয়ং মনসি নিহিতঃ কশ্চিদামুষ্মতা মে
কিংবা ভূয়স্ত্বয়ি বিরচিতে বঙ্গভিক্ষাপ্রকারৈঃ।
পারার্থৈকপ্রবণমনসস্তদ্বিধা বাষ্পমিশ্রা-
নাপন্নানাং ন খলু বহুশঃ কাকুবাদান্ সহন্তে ॥" ১০০ ॥

এই পর্য্যন্ত কাব্যশেষ—ইহার পর কবির প্রশস্তি। তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়া কবিরাজচক্র-বর্ত্তী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়েন্দ্রের নিকট অনেক হস্তী সুবর্ণ চামর ইত্যাদি পাইয়াছিলেন। তিনি বড় সুখী ছিলেন, সকল কবির সহিত তাঁহার ভাব ছিল, তাঁহার কবিতা বিদর্ভী-রীতি অনুসারে লিখিত, তাঁহার গঙ্গাতীরে বাস, ধন সম্পদ যথেষ্ট, স্নেহভাজন লোকেরও অভাব ছিল না। তাঁহার প্রার্থনা যে, তিনি এইরূপে জন্মজন্মান্তর কাটাইতে পারেন, নারায়ণে যেন তাঁহার ভক্তি থাকে। গঙ্গাতীরে যেন বাস করিতে পান, ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।*

(৩)

৩৪। অদ্বৈততত্ত্ব। শ্যামানন্দপুরী।

আ—"বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়ং গৌরং ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।" পরে—

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু প্রবর্ত্তসাধন।
নাম মন্ত্র দিয়া কৈল শরীরপালন॥"

শে—"শ্রীরূপ রঘুনাথ কৃপা অনুসারে।
লিখিল এ গ্রন্থ পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে॥"

প—"ধরেন্দাবাহাদুরপুর"বাসী দুরীকানন্দন প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ বিরচিত।

বি—গ্রন্থখানি তত্ত্বকথায় পূর্ণ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর অদ্বৈতপ্রভুকে উপদেশদান-প্রসঙ্গ ও উপদেশগুলি লিখিত আছে।

ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা, কানাইবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট।

৩৫। আত্মজিজ্ঞাসা। কৃষ্ণদাস।

("অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য" ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক।)

আ—"জীবকে জিজ্ঞাসেন তুমি কে? আমি জীব" ইত্যাদি।

শে—"সহজরস আস্বাদিতে মোর বহু আশ।
আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি সম্পূর্ণ স্বাক্ষর শ্রীরসময় বাউল্যা সাং সরাতি। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ১০ আষাঢ়।"

বি—দেহতত্ত্ব।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৩৬। কালিকাপুরাণ। দ্বিজ দুর্গারাম।

আ—"ওঁ নমো গণেশায় নমঃ"।
"নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥
প্রণমহো নারায়ণ দেব ভগবান্।
যাহা হইতে উৎপত্তি হইল সর্ব্ব প্রাণ॥

ভ—কালিকাপুরাণকথা করিল প্রচার।
দ্বিজ দুর্গারামে কহে রচিয়া পয়ার॥"

শে—(পুস্তকখানি খণ্ডিত মাত্র ১১টি পাতা ও একটি পাতার কতকঅংশ লিখিত আছে।)

ঠি—ফরিদপুরজেলাস্থ তিলৈ সাধারণ পুস্তকালয়।

৩৭। ক্রিয়াযোগসার। রামেশ্বর নন্দী।

আ—"স্বর্গে দেবকন্যা সব পরমসুন্দরী।
ধূপদীপ আদি করি সবে হস্তে ধরি॥"

শে—"পদ্মপুরাণের খণ্ড ক্রিয়াযোগসার।
রামেশ্বর নন্দী কহে ভব তরিবার॥"

"শ্রীগোপীচরণ মজকুর পুস্তক সমাপ্ত সন ১২১৯ বাঙ্গালা মাহে ২১ 'মগের্ত্তইঙ্গাবতী' রোজ সোমবার তিথি প্রতিপদ্ দিবসে সমাপ্ত।"

---

* এবার যে কয়খানি পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল, পরিষদের 'প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কেবল তিলৈ সাধারণ-পুস্তকালয়ের পুথির বিবরণ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সুবিধার জন্য এবার এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইল। যথা—আ=আরম্ভ, শে=শেষ, ঠি=যে ঠিকানায় পুথি আছে, বি=বিষয়, প=পরিচয়, ভ=ভণিতা ইত্যাদি।

বি—বৈষ্ণববর্গের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা, কানাইবাজার পোঃ. শ্রীহট্ট।

৩৮। গোপিকামোহন। বৃন্দাবন দাস।

আ—"জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
ব্রজ শিশুগণ সঙ্গে করি যত গোপিগণ॥
জয় জয় নন্দঘোষ গোয়াল প্রধান।
যাহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র জগতের প্রাণ॥

শে—"সিন্দুর কাজল আনি সকল মুছিয়া।
রাধিকা আপন বেশ থুইলেক গিয়া॥
ভোজন করিল তবে কৌতুক করিয়া।
কৃষ্ণকে পাইতে শ্রীদাম গেলেক চলিয়া॥
গৃহ (?) সেবা করি রাধা করিল শয়ন।
বৃন্দাবনদাসে কহে গোপিকামোহন॥
ইতি গোপিকামোহন সমাপ্ত।

যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। সহস্কর শ্রী ছিরি বল্লভ সরকার। ১১২০ সন ৮ বৈশাখ, বুধবার। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে সমাপ্ত।" পত্র সংখ্যা ৭।

ঠি—তিলৈ সাধারণ পুস্তকালয়।

৩৯। চৈতন্যমঙ্গল। বৈরাগ্যখণ্ড। জয়ানন্দ।

আ—"একদিন গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তনে নাচে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥"
(শেষ নাই। পাত সংখ্যা ৩০।)

প—"বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মর্ন হৈল চৈতন্যমঙ্গলে॥
শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথি বৈশাখমাসে।
জয়ানন্দের জন্ম হৈল এইত দিবসে॥

বি—শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী।

ঠি—শ্রীগোপালচন্দ্র দে, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৪০। জগদীশচরিত্রবিজয়। আনন্দ দাস।

আ—"জগজ্জনা জ্ঞানহরা করোতি" ইতি তৎপরে—
"গুরুদেব বন্দি করি মঙ্গলাচরণ।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥"

শে—"তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল,
সেই মত গ্রন্থ কৈল,
দীন হীন এ আনন্দদাস।
আর কিছু নাহি চাই,
গৌর গুণ সদা গাই,
পূর্ণ কর এই অভিলাষ॥"

(১৭৩৭ শকাব্দে প্রতিলিপিখানি লিখিত হয়, এই মাত্র জানা যায়।)

প—জগদীশপণ্ডিত হইতে শিষ্য পর্য্যায়ে—গ্রন্থকার ষষ্ঠ স্থানীয়।

বি—গৌরপার্ষদ জগদীশপণ্ডিতের চরিত্র।
"২৯এ ভাদ্রে আমি নিদ্রায় কাতর।
হেনকালে দেখিনু অপূর্ব্ব কলেবর॥"
* * * *
হাসিয়া কহেন মোরে মধুর বচন।
জগদীশচরিত্র তুমি করহ বর্ণন॥"

ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা, কানাইবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট।

৪১। দাতাকর্ণের পালা। কবিচন্দ্র।

আ—"একদিন কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত হৈলা মুনি কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥"

শে—"ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
সদাই বিরাজে লক্ষ্মী কৃষ্ণের কৃপায়॥
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।

ভক্ত নারেকেরে প্রভু হবে বর দায় ॥"
(লেখার কাল ১২৪২ সাল।)
ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৪২। নরোত্তমবিলাস। নরহরি দাস।

প্রথম কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ—

আ—"জয় জয় শ্রীগৌর গোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর।
ভুবনমোহন প্রেমময় কলেবর ॥"

শে—"নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥"

বি—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৪৩। শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার। শ্রীবৃন্দাবনদাস।

"আজানুলম্বিতভুজৌ, কনকাবদাতৌ" ইতি।

তৎপরে—

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সর্ব্বানন্দকন্দ ॥
কৃপা করি মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে।
নিত্যানন্দচন্দ্রের গুণ গাহিবার লোভে ॥
বীরচন্দ্রের গুণ গাহিত মনোহর।
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয় ॥

শে—"পঞ্চম পুরুষার্থ নিত্যানন্দের চরণ।
সভে কৃপা কর যেন তাহে রহে মন ॥
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশবিস্তার কহে শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥"

হুগলী বদনগঞ্জবাসী ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ সংগৃহীত ১৪৯৪ (?) শকের লিখিত প্রতিলিপিদৃষ্টে ভক্তিনিধি মহাশয় স্বহস্তে ৪০৮ চৈতন্যাব্দে এই নকল করিয়াছেন।

বি—নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহাদি চরিত্রকথা ও তৎপুত্র বীরভদ্র প্রভৃতির বিবরণ আছে।

"নিত্যানন্দ চৈতন্য লীলার যে রহিল শেষ।
ইচ্ছা হয় তাঁর কিছু কহিব বিশেষ ॥"

ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা, কানাইবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট।

৪৪। প্রেমভক্তিসার। গুরুদাস দত্ত।

আ—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়বিলসৎ
প্রেমরূপাবতীর-
সুগুপ্তস্বর্ণদ্যুতিহরতনু-
রক্তকৌপীনবাসাঃ।
উচ্চৈঃকণ্ঠে রটতি সততং
শ্রীহরের্নামমন্ত্রং।
তং বন্দে শ্রীলগৌরং কলিমল-
মথনং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রম্ ॥

শে—"গুরু গুণমণি হেমমঞ্জরী আশ্রয়।
প্রেমভক্তিসার গ্রন্থ গুরুদাস কয় ॥"

বি—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধ্যসাধননির্ণয়।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৪৫। ভগবদ্গীতা। বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী।

"জিনিতে শমের দায়, ধরণী লুটাঞা কায়,
বন্দ গুরুদেবের চরণ।
যার যোগ্য কর্ম্ম জ্ঞান, শ্রবণ মঙ্গল ধাম,
গুরুভক্তি মুক্তির কারণ ॥
ইন্দু কুন্দ শ্বেত দেহ, কেবল করুণাগেহ,
শুক্লবর্ণ মাল্যানুলেপন।
স্মরণে পূরয়ে কাম, সহ আরি নিজ ধাম,
দীনবন্ধু পতিতপাবন ॥" ইত্যাদি

শে—গুরু গোপীনাথপদে করি নমস্কার।
রচিল গীতার ভাষা কৃপায় যাহার ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষায়াং সারঙ্গরঙ্গদা-দানপুণ্যপরমার্থ নাম অষ্টাদশাধ্যায় ॥

সাধুজন আগে বহু করি পরিহার।
ক্রমভঙ্গে দোষ যদি থাকয়ে আমার ॥
যত্ন করি পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া।
শোধন করিলা পুন সদয় হইয়া ॥
শ্রীধরগোস্বামী পদে প্রণতি আমার।
গীতা ভাগবত জানি প্রসাদ যাঁহার॥
ভাষ্যকারগণে করি অনেক প্রণতি।
যাঁহার প্রসাদ জানি গীতার্থ সঙ্গতি ॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ চারি বেদসার।
জীবনে মরণে (গীত) সেইত আমার ॥
অধিকারি মহাশয় বড় দয়াময়।
যাঁহার কৃপায় গীতা পাইলাম নিশ্চয় ॥

ইতি শ্রীমুকুটী গৌড়দেশনিবাসী বিদ্যা-বাগীশ ব্রহ্মচারিবিরচিত শ্রীভগবদ্গীতাভাষা সমাপ্তা। *। সন ১২৪৬ সাল শকাব্দা ১৭৬১ সকলম শ্রীনরোত্তমদাস বৈরাগী সাং কলিকাতা, তালার বাগান।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৪৬। ভারত-সাবিত্রী। শিবচন্দ্র সেন।

আ—"অথো ভারত-সাবিত্রী লিখ্যতে।
নমো নারায়ণ শ্রীমধুসূদন
নন্দের নন্দনকানু।
সুচিরকিরণে সচকিত মনে
মিলন হইল ভানু ॥
মীন অবতারে আসিলা সংসারে
বেদ উদ্ধারিলা তাঁয়া।
কূর্ম্মরূপ ধরি ভূমি পৃষ্ঠে করি
রহিলা সৃষ্টি রাখিয়া ॥"

ভ—"ধারা বহে আঁখি ঝরে নিরবধি খেদ করে
শিবচন্দ্রসেনে কহে সার।"

শে—"নারায়ণপদে মন মজুক আমার।
দূর কর দীনবন্ধু অসার সংসার ॥

ইতি ভারত-সাবিত্রী সমাপ্ত। যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীরামশিব বসু, সাকিন সোণার দেউল। দৃষ্টি-পুস্তক শ্রীরামলোচন দের, সাকিন তথা। বেলা আন্দাজ দেড় প্রহরের কালে সমাপ্ত করিয়া। ইতি।"

ঠি—তিলৈ সাধারণ পুস্তকালয়।

৪৭। রসভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস।

আ—"আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চ-প্রকার" ইত্যাদি।

শে—রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।
রসভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥"

বি—ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতির বর্ণন।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৪৮। রামস্বর্গারোহণ। ভবানন্দ।

আ—"শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। *।
মঙ্গলং নাম যস্য বা * প্রবর্ত্ততে।
তস্য ভবতি বাজি ইন্দ্র মোহাপাতক
"প্রণাম করিয়া বীর শ্রীরামচরণে।
রামের চরিত্র কহে দাস ভবানন্দে ॥
রামকার্য্য বোলে ভবানন্দ দাসে।
হনুমান বীর কান্দে সকরুণ ভাসে ॥

শে—"এতেক বলিয়া গোসাই অন্তর্ধান হৈল।
বর পাইয়া হনুমান এথায় রহিল ॥"

ইতি রামস্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬৯৬, সন ১১৮২। সসাক্ষর শ্রীনরোত্তম শর্ম্মা। সকিয় পুস্তক শ্রীহরেকৃষ্ণ বণিক। যথা দৃষ্টং ইত্যাদি।

ঠি—তিলৈ সাধারণ পুস্তকালয়।

৪৯। রামায়ণ। (বালিবধ) অদ্ভুতাচার্য্য।

আ—"শ্রীরামগণেশায় নমঃ।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্র গীয়তে॥
শুন শুন পূর্ব্ব কথা হরিভক্ত জন।
সীতার কারণে ভ্রমে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অদ্ভুত আচার্য্য কহে করিয়া কৌতুক।
তাহার পাছে গেলা রাম পর্ব্বত ঋষ্যমুক।"

শে—"রামজয় বলিয়া ডাকে যত বানরগণ।
সুখে রাজ্য করে রাজা রামের কারণ॥
ইতি বালি রাজার বধ সমাপ্ত।

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দূষকঃ। লিখিতং শ্রীগঙ্গাধরশর্ম্মা। সন ১১৮২, ৭ই ভাদ্র, রোজ সোমবার, বেলা দের পরে কালে হইছে। শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মা সঅক্ষর।" (পত্রসংখ্যা ২৬।)

ঠি—পোঃ এড়িকাটি, তিলৈ সাধারণ-পুস্তকালয়।

৫০। রামায়ণ। রামানন্দ যতি।

আ—"গণেশ সরস্বতী লক্ষ্মী শিবদুর্গা গঙ্গা কৃষ্ণ চৈতন্যবন্দনা এবং দিগ্বন্দনা। মঙ্গলচণ্ডিকাতে পাইবা। বাগেশ্বরী ধুয়া। প্রভু রাম কি আমার মনোদুঃখ কিছু জানে নারে।

দয়াল রাম কিছু জানে নারে॥
রামপদে মন নামে কাঁপে যম
চিদানন্দ অবতার
দেব মুনি ভয় [illegible] হৃদয়
ধ্রুব হইলা গুণপার॥
মায়ারূপধারী রাবণসংহারি
দিলা মুক্তি পদধাম।
অহল্যার শাপ নিবারিলা তাপ
মোরে দয়া কর রাম॥
ওঁ যৎ পাদপঙ্কজরজপ্রভয়া সুতাপং
শান্তিং প্রযাতি ভবভূস্মৃতিমাত্রতোপিতং।
রামচন্দ্রমনিশং সততং প্রণম্য
শ্রীরামচন্দ্রতত্ত্বমমলং বিতনোতি ভিক্ষুঃ।"

ভ—"রামানন্দযতি কয় অই রূপ হৃদে রয়
তবে জানি মনমোহিনী॥"

শে—"এইরূপে হরিশ্চন্দ্র রহিলা আকাশে।
রাজামাত্র একবার যায় স্বর্গবাসে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজার কল্লাম বিবরণ।
রাম রাম বল জীব এরাবা শমন॥
রাম নামে জীবন্মুক্ত রাম অন্ত্যা গাইন।
তার মুখে শুনিলে কারুর নাহি হাইন॥
প্রমাণ ভাগবত গীতা ব্রহ্মগীতা আর।
ভাষাতে কত না আমি করিব বিচার॥"

ধুয়া। জয় জয় রাম॥ পঞ্চদশ গ্রন্থ শঙ্খ্যা।

১ গীতার টীকা। ২ শান্তিশতকটীকা। ৩ ষট্চক্রটীকা। ৪ মোহমুদ্গার টীকা। ৫ গায়ত্রীর টীকা। ৬ কুণ্ডতত্ত্বপ্রকাশিকা। ৭ তন্ত্রসার। ৮ জ্ঞানবৈভবতন্ত্র। ৯ অদ্বৈতরহস্য। ১০ জ্ঞানাবলী। ১১ অধ্যাত্মসার। ১২ ভাগবতাসর (?)। ১৩ যোগসারাবলী। ১৪ অত্যাচারদীধিতি। ১৫ তৎপর রামায়ণ-ভাষা।

"বসু পক্ষ শৈলচন্দ্র (১৭২৮) শকে রামায়ণ।
বাণ মাস ভাদ্রপদে কুজে হল্য সমাপন॥
যুগ্মচন্দ্র দিবসেতে শুক্লা ত্রয়োদশী।
হইল পুস্তক চণ্ডীমণ্ডপেতে বসি॥
রাজচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর হৈল্য ভাসা।
প্রভু রামচন্দ্র মোর পূর্ণ কর আশা॥
দুর্গাপুরনিবাসী দুর্গার পদে মতি।
কাশীনাথ দ্বিজের পাঠার্থ হল্য পুথি॥

মনের বাসনা ছিল পুথি লিখাবার।
প্রভু রামচন্দ্র আশা পূর্ণ কল্যা তার॥
পাঠক পণ্ডিত জানে এই পরিহার
শুদ্ধাশুদ্ধ অকারণ লিখিতে পয়ার॥
পরাৎপর হলে ভাসা হয় ব্যভিচার।
মূল ভাসার ছায়া নহে এই পরিহার॥
দুর্গাচরণ সরোজে মম ভক্তিরস্তু।
শ্রীগুরুচরণারবিন্দে মন বস্তু॥
শ্রীরামচন্দ্রচরণরুহে ভক্তিরস্তু॥"

বি—গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। ১৯৫ পত্রে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার সুকবি ও কৃতবিদ্য ছিলেন।

ঠি—পোঃ এড়িকাটি তিলৈ সাধারণ-পুস্তকালয়।

৫১। শ্রীরূপমঞ্জরীসংপ্রার্থনা। কৃষ্ণদাস।

আ—"হে রূপমঞ্জরী তোমা ঈশ্বরাঈশ্বরী।
বৃষভানুসুতা আর প্রিয় গিরিধারী॥
এ দুহার পাদপদ্ম সেবামৃতরসে।
পরিপূর্ণ হয় তুমি রজনী দিবসে॥"

শে—"কৃষ্ণপ্রীতিজলসার সখী শ্রীরাধিকা।
কবে দৃষ্টি বিক্ষেপণ করিবে অধিকা॥"
সন ১২৪৪ সালে লিখিত।

বি—শ্রীরূপের অন্তর্দ্ধানে বিলাপ।

ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী, মৈনা, শ্রীহট্ট

৫২। বিলাপকুসুমাঞ্জলি। শ্রীরঘুনাথ রাধাবল্লভ দাস।

আ—"শ্রীরতিমঞ্জরী পুছেন শ্রীরূপমঞ্জরী।
ব্রজপুরে খ্যাতা তুমি পতিব্রতা করি।

শে—"মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা পদসেবা আশ।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি কহে রাধাবল্লভ দাস॥
ইতি বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবসম্পূর্ণ।"

বি—শ্রীরঘুনাথদাসের সংস্কৃত শ্রীরাধিকার স্তবের পদ্যানুবাদ।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৫৩। বিলাপবিবৃতিমালা। কৃষ্ণচন্দ্রদাস।

আ—বন্দে গুরুং মহামন্ত্রপ্রদাতারং" ইত্যাদি।
শ্রীগুরুচরণ দ্বন্দ্ব, ভজ মন গৌরচন্দ্র ইত্যাদি।
"গাথিয়া তাহার মালা, মনসুতে অতি ত্বরা,
শুন দেবি আপনা শোধিতে।
তব ভক্ত পথ দেখি, মুঞি পঙ্গু কান্দে আঁখি,
হেন মতি না পারি চলিতে॥
তুমি কৃপা নরে করি, কৃষ্ণচন্দ্রদাসে তারি,
কোনরূপে কর অঙ্গীকার।
হৈয়া যোগ্য দেহপরা, বিলাপবিবৃতিমালা,
অর্পিব কি চরণে তোমার॥

স্বাক্ষর শ্রীগোলোকনাথদাসস্য সাং হ্যানৎ-পাড়া তরফ মাঝাদিয়াড় পরগণে গরের হাট সরকার বার্ব্বকাবাদ। সন ১২০২ সাল তারিখ ৫ শ্রাবণ রোজ ৭ শনিবার।

প—মঙ্গলাচরণের পরে একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহা এই
"মুকুন্দনন্দনান্বয়াগতস্য ভক্তিদায়কে,
মনীশখণ্ডবাসিন শ্রীকৃষ্ণদাসপাপিনঃ"

শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দবংশোদ্ভব গ্রন্থকারের গুরুর নাম লালবিহারী। কোনস্থানে আছে, 'মৎ প্রপিতামহস্য জ্যেষ্ঠেন পরাপরগুণা শ্রীরতি-
...
'সতের শত [illegible] শকে কৃষ্ণচন্দ্র দাসে।"

বি—শ্রীরাধিকার স্তব। শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিকৃত সংস্কৃতবিলাপকুসুমাঞ্জলির ভাষা।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৫৪। বৃন্দাবনপরিক্রমা। কৃষ্ণদাস।

"বাম্বর্য্য হৈতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবনপ্রদক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে॥
শে—ইহার শ্রবণ ফল মনের উল্লাস।
বৃন্দাবন বাস আশ করে কৃষ্ণদাস॥"

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৫৫। বৃন্দাবনপরিক্রম্মা। দুঃখীকৃষ্ণদাস। (শ্যামানন্দ প্রভু)

আ—"শ্রীগুরুচরণ, করিয়ে বন্দন,
পরম লালস চিতে।
যার কৃপা হৈতে পতিত দুর্গতে
চক্ষু হৈল প্রকাশিত॥
শে—সভে নিজগুণে উদ্ধার এ দীনে
রাখহ চরণ পাশ।
হৃদয় আনন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র
তাঁর পদ সেবা আশ॥
শ্রীগুরুচরণে একান্ত স্মরণে
কহে দুঃখী কৃষ্ণদাস॥"

বি—শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বন, কুণ্ড, তীর্থ-প্রভৃতির বিবরণ ও মাহাত্ম্য।

ঠি—শ্রীকালিদাস নাথ, ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৫৬। সারদামঙ্গল—শিবচন্দ্র সেন।

আ—"গুরু নাম গুরু ধাম মনে ভাব যাহে।
নারী ধন পরিজন কেহ সঙ্গী নহে॥
* * *
শুন সবে এক ভাবে সারদামঙ্গল।
যাহার শ্রবণে হয় চিত্ত নিরমল॥
হিমালয় নামে গিরি পর্ব্বতরাজন্।
মেনকা তাহার জায়া বিদিত ভুবন॥"
—"বৈদ্যকুলে জন্ম হিন্দুসেনের সন্ততি।
সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণ ধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণ যারে তাহার তনয়।
রতন সরূপ কুলে হইলা উদয়॥
এহান তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত।
রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল।
রামগোপাল নাম উত্তম শুদ্ধকুল॥
গঙ্গাদেবদত্ত পুত্র তাহার পবিত্র।
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদসেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
এহান তনয়া মহামায়া নাম তান।
সৎকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্।
জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম॥"

ঠি—ফরিদপুর জেলায় তিলৈ সাধারণ-পুস্তকালয়।

৫৭। স্বরূপ-বর্ণন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আ—"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয়াদ্বৈতাদি গণ শুন হঞা একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ॥
শে—শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥
"এ পুস্তক লিখিত শ্রীগৌরিচরণ দত্ত। সাকিম কণ্ডলপুর। সন ১০৭১ সাল। তাং ২৭ আষাঢ়।"

নৈহাটীর নিকট মামটপুরের অধিবাসী। গ্রন্থখানি ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়।

প—"পতিত অধম আমি নীচ নীচাচারে।

প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈল যারে।
মস্তকে চরণ দিয়া কহিলা আমারে॥"
বি—শ্রীমহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের পূর্ব্ব পরিচয় লিখিত আছে। যথা-
"আট আট করি সব চৌষট্টী গণন।
সবার কথা কহি শুন সর্ব্বজন॥
বিস্তার না করিও ইহা রাখিও গোপন॥"
ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী, মৈনা, শ্রীহট্ট।

৫৮। সীতাচরিত্র। লোকনাথ গোস্বামী।
"বন্দেহং শ্রীগুরু শ্রীযুতপদকমলং ইতি"
শ্লোকের পরে—
"প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণবচরণ।
সে পদকমলরেণু করিয়ে ভূষণ॥
শে—শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ পদে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥"
প—যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামবাসী লোকনাথ প্রভু কর্ত্তৃক প্রায় ৩০০ বর্ষ এই গ্রন্থ রচিত হয়।
বি—শান্তিপুরবাসী শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও তাহার পূর্ব্বে পত্নী সীতার চরিত্র বর্ণন। যথা
"চৈতন্তের লীলারস সমুদ্র আকর।
কিঞ্চিৎ বর্ণিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥"
ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী মৈনা, শ্রীহট্ট।

৫৯। সুদামাচরিত্র। পরশুরাম দ্বিজ।
আ—"কহ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে।
যে যে কর্ম্ম গোবিন্দ করিলা কুতূহলে॥
শে—লোক রক্ষিবারে কৈল ভারতপুরাণ।
সুদামাচরিত্র দ্বিজ পরশুরাম গান॥
সাক্ষর শ্রীধর্ম্মদাস প্রতিবর সাং বাবহাট
সন ১১৪২ সাল বাং ২৯ বৈশাখ।
ঠি—শ্রীগোপালচন্দ্র দে ১৫ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, কলিকাতা।

৬০। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র কবিরাজ।
"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য" এই শ্লোকের পর
প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণপ্রাপ্তির যেই হয় মূল।
অজ্ঞান তিমির নাশে দীপ্তি করি পরকাসে
বন্দে সেই চরণ রাতুল॥
শে—শুনরে রসিক ভাই, স্মরণদর্পণ এই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাস॥"
"সন ১১৭২ সনে মাহে ২ অগ্রহায়ণ সোমবারে লিখা সমাপ্ত।"
বি—গুরুতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, লীলরহস্য, ভগবত্তত্ত্ব।
প—বুধুরীবাসী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের অগ্রজ। ৩০০ বর্ষের কিছু কম হইল, ইহা রচিত হয়।
ঠি—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী, মৈনা, শ্রীহট্ট।

৬১। হরিবংশ। ভবানন্দ।
(১২ পাতা পর্য্যন্ত) নষ্ট হইয়া গিয়াছে।
ভ—"সত্যবতীসুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
লোকে বোঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে॥
শে—শ্রীভাগবতে একান্ত কথা ধর্ম্ম অংশ।
গুহ্যাতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশ॥
মনোহর শ্লোক ভাঙ্গি রচিল পদবন্ধে।
শিবানন্দসুত সে যে দীন ভবানন্দে॥
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি। শ্রীজয়দেব দাসস্য স্বাক্ষর পুস্তক শ্রীইন্দ্রনারায়ণরায় ওলদে * * *। পিতামহ মধুসূদন রায়। পরগণে পরিপুর। নিবাস * * গ্রাম। সন ১১৬১ তারিখ ৫ ভাদ্র রোজ সোমবার একপ্রহর উদয় তিন প্রহর থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ হয়।" (পত্রসংখ্যা ১৬২।)
ঠি—তিলৈ সাধারণ-পুস্তকালয়।

পাঁচালিকার ঠাকুরদাস।

পরিষদের কৃপায় আজ কএকমাস অনবরত কেবল প্রাচীন কাব্যের বিবরণই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ সদস্যগণের যত্নে এবং তাঁহাদের চেষ্টায় কএকখানি লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার ও সেই সকল গ্রন্থকার কবির বিবরণ প্রকাশ হওয়াতে, বাঙ্গালা সাহিত্যও গৌরবান্বিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রতি মাসেই কেবল লুপ্ত গ্রন্থের বিবরণ শুনিয়া শুনিয়া আমাদের মন যেন ঐ এক বিষয়াভিমুখ হইয়া পড়িতেছে। পরিষদের উন্নতির প্রতি এখন যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্ন আছে, তাঁহারাও সকলেই যেন প্রাচীন কাব্যের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলেই নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্নের সুফলতা অনুভব করিয়া সুখী হন। এই গতি লক্ষ্য করিয়া পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক-সুহৃদ্বর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই মাসে কোন এক নূতন বিষয়ক প্রবন্ধ যাহাতে পঠিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, আজ কবি ৺ ঠাকুরদাসের জীবনী সম্বন্ধে কিয়দংশ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। ইনিও কবি, সুতরাং ইহার জীবনী আলোচনাতেও কাব্যালোচনাই হইয়াছে, এজন্য ইহা যে বিশেষ বিষয়ান্তরঘটিত প্রবন্ধ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, তবে এ প্রবন্ধে কোন একখানি বিশেষ কাব্য অবলম্বন করিয়া কবিকীর্ত্তি আলোচিত হয় নাই, ইহাতে কবির জীবনীসংগ্রহের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা গিয়াছে বলিয়া, ইহাকে বিষয়ান্তরসূচক প্রবন্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

কবি ৺ ঠাকুরদাস বড় বেশী প্রাচীনকালের কবি নহেন, তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল, তাঁহাকে দেখিয়াছে, এমন লোক এখনও অনেক আছেন। তিনি কবি ছিলেন; কিন্তু কবি বলিলে এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোকের কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীতে কবি কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্রাদি ও অপর শ্রেণীতে মাইকেল হেমচন্দ্রাদি। এতদুভয়ের মধ্যে আরও এক শ্রেণীর কবি ছিলেন, সে শ্রেণীতে কবি রামবসু হরুঠাকুরাদির স্থান। ইহারা "কবিওয়ালা" কবি নামে খ্যাত। ৺ দাশরথী রায় প্রভৃতি "পাঁচালিকার" কবিগণও এই শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকেন। আমার অদ্যকার আলোচ্য কবি ৺ ঠাকুরদাসও "পাঁচালিকার" ছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্থানও এই শেষোক্ত শ্রেণীতে। ৺ দাশরথীর কীর্ত্তিমালা তাঁহার রচিত পালাগুলি—সমস্ত সংগৃহীত ও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ৺ ঠাকুরদাসের ভাগ্যে আজিও সেরূপ কিছু হয় নাই, আমি তাঁহার রচিত বিবিধ-বিষয়ক কতকগুলি গানমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

---

* এই প্রবন্ধ ১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাসের অধিবেশনে পঠিত হয়। (১৩০৫। বৈশাখের পত্রিকায় ফাল্গুনমাসের কার্য্য-বিবরণী দ্রষ্টব্য)—পত্রিকা-সম্পাদক।

কবি ঠাকুরদাস কীর্ত্তিমন্দিরে "পাঁচালি-ওয়ালা" নামে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহাকে কেবলই পাঁচালিকার বলিতে পারা যায় না। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যতটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা এই যে, তাঁহাকে কেবল পাঁচালি-কর্ত্তা বলিলে, তাঁহার প্রভূত কবিত্ব-শক্তির একাংশের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। তিনি হরুঠাকুরাদির ন্যায় গীতকর্ত্তা, দাশরথী রায়াদির ন্যায় পাঁচালিকর্ত্তা এবং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির ন্যায় যাত্রার সাট (পালা) রচয়িতা ছিলেন। ঠাকুরদাসকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, এরূপ লোক আজও অনেক জীবিত থাকিলেও অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট ইঁহার পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বাঙ্গালার অনেক কবির ভাগ্যই এইরূপ, কিন্তু ঠাকুরদাস অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্। তাঁহাকে জানেনা, তাঁহার নাম শুনে নাই, এরূপ লোকের মধ্যে কিন্তু শত সহস্র লোক তাঁহার গীতিমালা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পাঁচালির গান, তাঁহার যাত্রার গান, এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় শতকরা ১ জনেরও কণ্ঠে বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয়, সে সমস্ত এখনও পুস্তকাকারে মুদ্রিত বা হস্তলিখিত খাতায় কোথাও রক্ষিত হয় নাই। তবে একটু সুখের বিষয় যে শীঘ্রই তাহা হইতে পারিবে। কবি ভাগ্যবান্ ছিলেন, তাঁহার বংশাভাব ঘটে নাই। ঈশ্বর কৃপায় কবির দুই পুত্র, তিন পৌত্র বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারাই এই প্রবন্ধলেখকের আগ্রহে বাধ্য হইয়া পৈতৃক কীর্ত্তিরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি কবিতা যেমন বাঙ্গালায় অনেকাংশে প্রবাদবাক্যরূপে চলিয়া গিয়াছে; সেইরূপ কবি ঠাকুরদাসেরও কতকগুলি গান আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে, অথচ কে তাহার রচয়িতা, তাহা অনেকেই জানে না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য-ভাণ্ডারে এখন অনেকগুলি মুদ্রিত গীতসংগ্রহপুস্তক দেখা যায়; তাহাদের অনেকের মধ্যেই কবি ঠাকুরদাসের গীতমালা সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোনটীতে রচয়িতার নামের উল্লেখ নাই। সংগীতমুক্তাবলীতে আবার ঠাকুরদাসের গান অপরের নামসংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ হইবার প্রধান কারণ, কবির নাম অনেকেই জানেন না এবং গানগুলিতে কোন ভণিতা নাই; কচিৎ কোনটীতে যেন অসতর্কতা-বিন্যস্ত "দাস"শব্দের ভণিতাও আছে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কবি ঠাকুরদাস অধিক পুরাতনকালের লোক নহেন। তাঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু মৃতাহ পাওয়া গিয়াছে। ১২৮৩ সালের ২১এ বৈশাখ তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ঠিক কত বৎসর হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথামত ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহা হইলে আনুমানিক ১২০৮ (১৮০১ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার জন্মকাল গণনা করা যাইতে পারে। কবি দাশরথী রায় ইঁহার সমসাময়িক ও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ১২১১ সালে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং দত্ত মহাশয়কে, রায় মহাশয় অপেক্ষা ৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ মনে করা যাইতে পারে। কেবল

বয়োজ্যেষ্ঠ নহে, কবি খ্যাতিতেও তিনি রায় মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া, রায় মহাশয় দত্ত মহাশয়কে "দাদা মহাশয়" বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল, পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল।*

কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার অপরপারে হাবড়ার অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে কবি ঠাকুরদাস দত্তের বাড়ী। গ্রামের উত্তরপাড়ায় কবির কৃত অট্টালিকায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এখনও বাস করিতেছেন। ইঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, স্বগ্রামে বিশেষ সম্মানার্হ। ইঁহার বংশলতা এইরূপ,—

৺ রামকানাই

৺ রামমোহন

৺ ঠাকুরদাস (কবি)

- শ্রীশ্যামাচরণ (ব্যাঁটরা)
  - শ্রীহরিদাস
- শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ (বাগবাজারনিবাসী)
  - শ্রীহরিপদ
  - ৺ নগেন্দ্রনাথ
  - শ্রীকিরণচন্দ্র
- কন্যা

কবির পিতা রামমোহনের সহিত কবি রামবসুর বিশেষ বন্ধুতা ছিল, উভয়ে উভয়কে মিতা সম্বোধন করিতেন। বসুজ যে কবির দল করেন, তাহাতে রামমোহনদত্তও যোগ

* অনেকের মতে ৺দাশরথীরায়ই পাঁচালির প্রথম রচক বলিয়া গণ্য। কিছু দিন হইল, বঙ্গবাসীতে "আগমনী" এবং জন্মভূমিতে "মানভঞ্জন" নামক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দাশরথীরায়ের পাঁচালি হইতে ঐ দুই পালার আলোচনাই উহার উদ্দেশ্য। উভয় প্রবন্ধের লেখকও একব্যক্তি কিনা জানি না, কিন্তু উহাতে দাশরথী রায় হইতেই পাঁচালির উৎপত্তি ও শেষ এইরূপ মত প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলাম। লেখক এরূপ কথার কোন প্রমাণ দেন নাই। কৃত্তিবাসাদি যে ছন্দে নিজ রামায়ণাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সুরসংযোগে গীত হইত এবং কবিগণ কর্ত্তৃক "পাঁচালিপ্রবন্ধ" নামে উক্ত হইয়াছে। অতএব রায় মহাশয়কে পাঁচালির সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় না। রায় মহাশয়ের পাঁচালিতে ব্যবহৃত ছড়া ও গান কিছুই নূতন নহে। ছড়াগুলি সেকালে পাঁচালিপ্রবন্ধের 'লাচাড়ি' ছন্দের সুরহীন অবস্থা মাত্র, আর গানগুলি ভারতচন্দ্রাদির ব্যবহৃত প্রতিপালায় ধুয়ার গানের প্রতিরূপ। তবে এই দুয়ের মিশ্রণে অভিনব কাব্যোৎপত্তির প্রণালী দাশরথী রায়ের কিনা, তাহাও বিচার্য্য। কবি ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট শুনিয়াছি, এই নব্য ধরণের প্রথম পাঁচালিকর্ত্তার নাম গঙ্গানারায়ণ লস্কর (১)। তৎপরে রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তাহার পর দাশরথী রায় পাঁচালিকাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।—প্রবন্ধলেখক।

(১) প্রবন্ধপাঠের পর আলোচনাকালে তাৎকালিক সভাপতি মহাশয়ও এই মত সমর্থন করেন। (১৩০৫ শ্রাবণের কার্য্যবিবরণী দ্রষ্টব্য)—পত্রিকাসম্পাদক।

দিয়াছিলেন। রামমোহন তখনকার ফোর্ট উইলিয়মে কার্য্য করিতেন, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জনও করিতেন। এক জগদ্ধাত্রীপূজা ব্যতীত বাড়ীতে আর সকল পূজাই হইত। কবি ঠাকুরদাস রামমোহনের একমাত্র সন্তান ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে গ্রামান্তরে পড়িতে যাইতে দেওয়া অর্থশালী রামমোহন, পুত্রের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া ভাবিতেন, সুতরাং ইংরাজী পড়াইবার জন্য বাড়ীতেই একজন শিক্ষক রাখিয়া দিয়াছিলেন। সে কালে নিয়ম ছিল, গ্রামে বা নিকটে কোন ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকিলে, (আর তত প্রাচীনকালে ছিলও না বোধ হয়,) কোনও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে একজন ইংরাজী জানা লোক গ্রাসাচ্ছাদন এবং অল্প বেতন লইয়া বাস করিতেন। সে কালে পারসী পড়াইবার জন্য আখনজী রাখিবার প্রথা হইতে এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রামস্থ যাহারা নিজ পুত্রকে ইংরাজী পড়াইতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা ঐ শিক্ষকের হস্তে বালকদিগকে অর্পণ করিতেন, সময়ে সময়ে ভিন্ন গ্রামের ছেলেরাও পড়িতে আসিত। শিক্ষক আশ্রয়-দাতার বালকবৃন্দ ব্যতীত অপরাপর বালকদিগের অধ্যাপনার জন্য কিছু কিছু পাইতেন; গ্রামবাসী একজনের অন্ন ধ্বংস করিতেন বলিয়া গ্রামের অপরাপর পাঠার্থির পিতার নিকটেও তাঁহাকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইত এবং সময়ে সময়ে সে কৃতজ্ঞতা ভিন্ন গ্রামেও বিস্তার করিতে বাধ্য হইতে হইত। কবি ঠাকুরদাসের জন্য রামমোহন বোড়ালনিবাসী রামময় মুখোপাধ্যায়কে ঐরূপ "মাষ্টার মহাশয়" নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামময়ের যত্নে ঠাকুরদাস বাল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কবির ইংরাজী হস্তাক্ষর যেমন ভাল ছিল, বাঙ্গালা হস্তাক্ষর তেমনই অস্পষ্ট ছিল।

বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরদাস সংগীতপ্রিয় হইয়াছিলেন, সর্ব্বদাই কবি পাঁচালি শুনিয়া বেড়াইতেন। অল্প বয়সে সংগীতানুরাগ লেখাপড়া শিখিবার বড়ই বিরোধক, কাজেই ঠাকুরদাসেরও লেখাপড়ায় বড়ই অমনোযোগিতা ছিল। রামমোহন নিজে রামবসুর কবির দলের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও, পুত্রের এতটা সংগীতানুরাগ ভালবাসিতেন না। উহা কমাইবার জন্য তিনি পুত্রকে ফোর্ট উইলিয়মে একটা চাকুরী করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতেও ঠাকুরদাসের সংগীতানুরাগ কমে নাই, এমন কি, আফিস কামাই করিয়া গ্রামান্তরে তিনি পাঁচালি শুনিতে যাইতেন। একবার ঐরূপ আফিস কামাই করিয়া অন্যগ্রামে পাঁচালি শুনিতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে রামমোহন ক্রোধান্ধ হইয়া ঠাকুরদাসকে খড়মপেটা করেন, তাহাতে ঠাকুরদাসের দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তবুও ঠাকুরদাস পাঁচালি শুনিতে নিবৃত্ত হন নাই। এইরূপে রামমোহন কোন উপায়েই পুত্রকে চাকুরীতে সংযত রাখিতে না পারিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ ভাবের কারণ কি? ঠাকুরদাস উত্তর দিলেন,—পরাধীনতা ভাল লাগেনা, চাকুরী করিব না। একমাত্র পুত্রের স্নেহেই হউক বা বিরক্ত হইয়াই হউক, রামমোহন আর তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। শেষে অনুপস্থিতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া আফিসের

সাহেবেরা ঠাকুরদাসের চাকুরী বাধিয়া ভাল করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে কবির পিতৃবিয়োগ হয়।

পিতৃ-বিয়োগের দুএক বৎসর পরে ঠাকুরদাস এক সথের যাত্রার দল করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৯।৩০ বৎসর। তিনি নিজেই বিদ্যাসুন্দরের এক পালা রচনা করেন এবং নিজ দলে তাহাই গাওয়াইতেন। এই তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি। ব্যাটরা-নিবাসী ৺ উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সাজিতেন। কবি প্রথমেই বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার কারণ,—তখন গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের গাওনা অতি বিখ্যাত ছিল। সর্ব্বত্রই ইহার আদর হইয়াছিল। ঠাকুরদাস ইহা দুইবার শুনিয়া বিদ্যাসুন্দরের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ গোপাল উড়ের কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। শুনিয়াছি, তখন কলিকাতাবাসী ৺ বীর-নৃসিংহ মল্লিকের গোপাল নামে এক উড়িয়া ভৃত্য ছিল। এই গোপাল নানা কারণে প্রভুর বড় প্রিয় হইয়া উঠে। বীর-নৃসিংহ বাবু এক সময়ে বিদ্যা-সুন্দরের যাত্রার দল গঠন করেন। খিদিরপুর-নিবাসী ৺ ভৈরবচন্দ্র হালদার নামক এক ব্যক্তি ইহার পালা ও গান রচনা করেন। এখন যে বাড়ীটায় Spence's Hotel আছেতে, * সেই বাড়ী তখন উক্ত বীর-নৃসিংহ মল্লিকেরই সম্পত্তি ছিল। ঐ বাড়ী বিক্রয় করিয়া সেকালেই এক লক্ষ কয়েক সহস্র টাকা হয়। সেই টাকা ব্যয় করিয়া ঐ যাত্রার দল গঠিত হয়। উহার তিন আসরমাত্র গাওনা হইয়াছিল। গোপাল এক সময় প্রভুর কোন প্রিয় কর্ম্ম করিয়া পুরস্কারপ্রার্থী হয়। বীর-নৃসিংহ বাবু গোপালকে ইচ্ছামত পুরস্কার চাহিতে বলায় সে বিদ্যাসুন্দর পালাটী প্রার্থনা করে। বীরুবাবু (বীর-নৃসিংহবাবু সাধারণতঃ "বীরুমল্লিক" নামে খ্যাত ছিলেন) এই সামান্য প্রার্থনা শুনিয়া হৃষ্টমনে সেই পালা ও দলগঠনের জন্য কয়েক সহস্র টাকা দান করেন। তাহার পর গোপাল মল্লিক-মহাশয়ের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া যাত্রার অধিকারী হইয়া অতুল ধন ও যশোলাভ করে। গোপালের পর তাহার দলের দুই ব্যক্তি উমেশচন্দ্র দাস ও ভোলানাথ দাস দুইটী দল করে। উমেশের দল কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু "ভুলোর দল" নামে ভোলানাথ দাসের দল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দলের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান, তবে কিছুদিন হইল ভোলানাথের মৃত্যু হওয়ায় তাহার দুই পুত্র দুই স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়াছে। এই দুই দলের পালাই সেই ভৈরব হালদারের রচিত বিদ্যাসুন্দর।

কবি ঠাকুরদাসও বিদ্যাসুন্দরের পালা লিখিয়া নিজের সখের দলে গাওয়ান। কবির এই প্রথম কীর্ত্তির রচনাদি কিরূপ ছিল, জানিতে পারা যায় নাই, কারণ তাহার পুস্তকতো নাই-ই, বা তাঁহার গান জানে, এমন কোন লোকও আজ জীবিত নাই। এই সখের দল ২।৩ বৎসর জীবিত ছিল। ইহাতে পরে কবির রচিত "লক্ষণবর্জ্জন" ও অন্যান্য পালাও গাওয়া হয়।

* বড়গাটের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তার উপর।

ইহার ২।৩ বৎসর পরে গঙ্গার ভট্টাচার্য্য-জমীদার-মহাশয়দিগের যত্নে এক সখের দল হয়, ঠাকুরদাস এই দলের জন্য আর একখানি বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করেন। ৺কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতেই ইহার প্রথম গাওনা হয়। বাঁটবানিবাসী ৺বৈকুণ্ঠ দত্ত ঐ দলে মালিনী সাজিতেন। ইহারও কোন নমুনা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ইহার পর টাকীর প্রসিদ্ধ জমীদার মুন্সী ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে টাকীতেই এক সখের যাত্রার দল বসে। দলের পালা কে লিখিয়া দিবে, এই কথা উঠিলে কবি ঠাকুরদাস দত্তের নাম উঠে। মুন্সী মহাশয় কলিকাতায় তখন দুএক স্থলে কবির নিজদলের গাওনা ও গঙ্গার দলের সুনাম শুনিয়াছিলেন, সুতরাং নাম শুনিয়া আগ্রহ-পূর্ব্বক লোক পাঠাইয়া কবিকে টাকী লইয়া যান। ঠাকুরদাস এখানেও বিদ্যাসুন্দরের পালা লিখিতে অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু পুরাতন গান অর্থাৎ তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের আর দুইখানি পালায় যে সকল গান আছে, তাঁহা ব্যবহারে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হন। কবির ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, তিনি সমস্ত সম্পূর্ণ নূতন গান দিয়া আর একখানি বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া দেন। অতি অল্পদিনেই ইহা রচিত হয়। ইহার আরও একটু বিশেষত্ব ছিল। ভৈরব হালদারের রচিত পালায় যে অশ্লীলতা দোষ ছিল, তাহা পরিহার করিবার জন্যই মুন্সী বাবুরা এই দল গঠন ও বিশুদ্ধ রচনা করান। ঠাকুরদাসও যত্নসহকারে অশ্লীলতা-বর্জ্জিত রচনা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করেন। প্রথম তিন আসর গাওনায় মুন্সীবাবুদিগের ১৮০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহারও কোন নমুনা সংগৃহীত হয় নাই। এই দলেই বিখ্যাত গায়ক গোবরহাঁড়ার কুঁচিল মিত্র এবং বেলুড়ের যদুঘোষ ছিলেন*।

ইহার পর কবির কীর্ত্তিমালার পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া বর্ণনা করা অসাধ্য। কবির কোন পুত্রও আমাকে সে বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার রচনাগুলিকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া একে একে এক এক শ্রেণীর বিবরণ দিতেছি। তাঁহার রচনাগুলিকে আমি প্রধানতঃ সখের দলের জন্য রচিত পালাসমূহ, পেশাদারী যাত্রার জন্য রচিত পালাসমূহ ও পাঁচালির পালাসমূহ, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম।

১। সখের দলের রচনার বিবরণ।

টাকীর দলে বিদ্যাসুন্দর রচনার পর, হাবড়ার অন্তর্গত কোণার জমীদার ৺দীননাথ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত এক সখের দলে ঠাকুরদাস পালা বাঁধিয়া দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

---

* পরিষদের অন্যতম সদস্য টাকীর বর্ত্তমান জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে প্রবন্ধলেখক এই বিদ্যাসুন্দরের গান টাকী হইতে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। যতীন্দ্রবাবু তদুত্তরে লিখিয়াছেন যে তাঁহার নিকট সংগ্রহ কিছুই নাই, তবে সেই যাত্রাদলের কোন কোন গায়ক ও অভিনেতা আজিও জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।—পত্রিকা সম্পাদক।

এখানে তাঁহার রচিত হরিশ্চন্দ্রের পালা অভিনীত হয়। এই পালার সমস্ত গান সৌভাগ্যক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে। যথাস্থানে নমুনাস্বরূপ ২।১টী গীত সন্নিবেশিত হইল। কবির কনিষ্ঠ পৌত্রের নিকট তাহা আছে। এই পালার আসল খাতাখানি বহুদিন বর্ত্তমান ছিল; একবার কলিকাতা-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গাহিতে গিয়া হারাইয়া যায়। এই দল যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন এই কবির রচিত ঐ হরিশ্চন্দ্রের পালাই গাহিত।

ইহার পর উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কুলেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এক সখের দল গঠন করেন। পালা লেখাইবার জন্য আশুবাবু দত্তজ মহাশয়ের শরণাগত হন। ঠাকুরদাস তাঁহাকে "লক্ষ্মণ-বর্জ্জন" পালা লিখিয়া দেন। যতদিন না আশুবাবু সখের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, ততদিন এই দল ছিল এবং এই পালাই গাহিতেন। কবি স্বীয় সখের দলের জন্য যে "লক্ষ্মণ-বর্জ্জন" ইতিপূর্ব্বে রচনা করেন, আশুবাবুকে সেখানি দেন নাই, সুতরাং এখানি আর একখানি স্বতন্ত্র রচনা। এই লক্ষ্মণবর্জ্জনের গানগুলি এখনও দুষ্প্রাপ্য হয় নাই, কারণ আশুবাবুর নিকট চেষ্টা করিলে বোধ হয় এখনও সমস্ত পালাটাই উদ্ধার হইতে পারে।

ইহার পর হাওড়া শিবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ বসু মহাশয় এক সখের যাত্রার দল করেন। ইহা বড় বেশীদিনের কথা নহে; সম্ভবতঃ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই দল সংস্থাপিত হইয়াছিল। কবি ঠাকুরদাস এই দলের জন্য "শ্রীবৎস-চিন্তা"র পালা রচনা করেন। ইহার গানগুলি অতি মনোহর।

২। পেশাদারী যাত্রার জন্য লিখিত পালাসমূহ।

এই শ্রেণীর রচনা কবি টাকী হইতে আসিয়াই আরম্ভ করেন। সেকালের অনেকগুলি বিখ্যাত যাত্রার দল, এই কবির প্রসাদে অশেষ যশ ও ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছে।

৺ দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের (দুগো ঘড়েলের) যাত্রার দল সেকালে বিখ্যাত ছিল। তাহার গাওনার এত সুখ্যাতি ও আকর্ষণী শক্তি ছিল যে সহরের এমন ধনীগৃহ নাই যেখানে এই দলের গাওনা একবারও হয় নাই। ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে এই দলের এক-চেটিয়া বন্দোবস্ত ছিল। এই দুর্গাচরণ দত্তবংশীয় কায়স্থ সন্তান। ইহার বাড়ী কলিকাতা ছাড়কাটায় ছিল। এই ব্যক্তি প্রথমে ঘড়িমেরামত, ঘড়িবিক্রয় ইত্যাদি কার্য্য করিতেন বলিয়া "ঘড়িয়াল" নামে খ্যাত হন*। ইনি তিনটী পালা গাহিতেন—"নলদময়ন্তী"

* "ঘড়িয়াল" শব্দ লইয়া কিছু রহস্য আছে। দুর্গাচরণদত্তের "ঘড়িয়াল" উপাধি কেন হয়, তাহা আমি জানিতাম না, কেহ আমায় নিশ্চয় বলিয়া দিতেও পারেন নাই, সুতরাং যেদিন এই প্রবন্ধ পরিষদের সভায় পড়ি, সেদিন এই উপাধি সম্বন্ধে আমি এরূপ মত প্রকাশ করি—"ঘড়িয়াল" উপাধি কেন হইল, জানিনা, "বোধ হয় তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন রাজসংসারে ঘড়িয়ালের কার্য্য করিতেন। তদবধি এই

"কলঙ্ক-ভঞ্জন" ও "শ্রীবৎসের দর্শন"। এই তিন পালাই ঠাকুরদাসদত্তের রচিত। এই দলেই তখন লোকনাথ দাস ও কালীনাথ হালদার নামে দুইজন সুকণ্ঠ গায়ক ("ছোকরা") ছিল। ইহারাই পরে বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা "লোকাধোপা"* ও "কালী হালদার" নামে খ্যাত হয়। দুগো ঘড়েল যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ঐ তিন পালা ভিন্ন আর কিছু গাহেন নাই। শেষে দুর্গাচরণের মৃত্যু হইলে লোকানাথ ও কালীনাথ উভয়ে দুই স্বতন্ত্র দল করেন। লোকনাথ গুরুর দলের (দুগো ঘড়েলের দলের) তিনটি পালাই গাহিতেন এবং গুরুরই ন্যায় আর কখনও কাহারও কোন পালা গাহেন নাই। এই তিন পালা এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, যে যে স্থানে ইঁহার গাওনা হইত, সে স্থানে ৫।৬ ক্রোশ দূর হইতেও লোক শুনিতে আসিত। লোকনাথের যাত্রার এক সময় এত গৌরব হইয়াছিল, যে এখন উহাই তুলনাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকনাথ দাস এখনও জীবিত, এখন আর তাঁহার যাত্রার দল নাই, তবু তিনি এখনও কবি

খ্যাতি হইয়া থাকিবে।"—আমার এই অভিপ্রায় শুনিয়া শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় দুঃখিত হইয়া বলেন যে, "যখন নিশ্চয় জানা নাই তখন অনুমান করিয়া তাঁহাকে "ঘড়িপেটা" ঘড়িয়াল বলাটা অসম্ভ্রম-সূচক।" সভাপতি মহাশয় উত্তরে বলিয়াছিলেন যে "দুর্গাচরণের পূর্ব্ব-পুরুষেরা নিজে ঘড়ি পিটিতেন না, সেই কার্য্যে তত্ত্বাবধায়ক।"—এইটুকু মাত্র ঘটনা। সেদিন পরিষদের অন্যতম গণ্যমান্য সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সভায় যথাজ্ঞান কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু গত বৈশাখমাসের নব্যভারতের ৪১ পৃষ্ঠায় "সাহিত্য সংবাদ" লিখিতে গিয়া পরিষদের প্রতি অযথা শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সেদিন পরিষদে (১) দুর্গাচরণ না দুর্গাদাস এক [illegible] মীমাংসা হয় দুর্গা চরণ, (২) দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল নামক জলজীবের সন্তান না ঘড়ীপেটা ঘড়িয়ালের সন্তান, অধিকাংশের মতে স্থির হইল ঘড়ীপেটা ঘড়িয়ালের সন্তান। (৩) সভাপতির মীমাংসা লইয়াও শ্লেষ করিয়া বলেন "সভাপতি মহাশয় নিজেই এ গোলযোগ মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে যাহারা ঘড়ি পিটিত, দুর্গাচরণের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য রাজসরকার হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঘড়িয়াল এটী হিন্দুরাজ প্রদত্ত উপাধি, ইহাতে যাবনিকতা কিছু দেখা যাইতেছে না। সুতরাং যখন বাঙ্গালা দেশে হিন্দুরাজত্ব ছিল, তখন দুর্গাচরণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যাপতির সাতশত উনপঞ্চাশ বৎসর ছয় মাস নয়দিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকলে করতালি দিয়া এ মীমাংসা অনুমোদন করিলেন।"—পরিষদে ১ম ও ২য় [illegible] মীমাংসার [illegible]। সভাপতির কথা বলিয়া ক্ষীরোদ বাবু বক্তা [illegible] করিয়াছেন, [illegible] "এটি হিন্দুরাজপ্রদত্ত উপাধি" এই স্থান হইতে শেষাংশ [illegible]। ক্ষীরোদ বাবুর সাহিত্য [illegible] নব্য-ভারতে সমস্ত উক্তিই এইরূপ কুৎসিত রসিকতা, দ্বেষ ও মিথ্যা পরিপূর্ণ। তিনি যদিই দুর্গাচরণ সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য অবগত ছিলেন, তবে সভায় সে কথা প্রকাশ না করিয়া, নিজেও যে সভার সদস্য তাহার সম্বন্ধে একখানি বিশিষ্ট পত্রিকায় ওরূপ অযথা নিন্দা ও দ্বেষপূর্ণ মিথ্যা রসিকতা করিয়া সাহিত্য-সংবাদ লিখিয়া কি শ্রেষ্ঠ দেশা সকল করিলেন বুঝা গেল না।—লেখক।

* লোকনাথ ধোপা—[illegible]ছেন, চাষাধোপা জাতীয়, সংক্ষেপে ধোপা নামেই খ্যাত। ইনি আজও জীবিত আছেন, কলিকাতা বেণেপুকুরে বাড়ী।

ঠাকুরদাসের নাম শুনিলে উদ্দেশে প্রণাম করেন। এই তিনপালা ৩০।৪২ বৎসর গাহিয়া লোকনাথ এখন লক্ষপতি। আজ ২০।২২ বৎসর তাঁহার যাত্রার দল বন্ধ হইয়া গিয়াছে*।

৺ কালীনাথ হালদারের দলও সেকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই দলেও প্রথমতঃ ঐ তিন পালা গাওনা হইত। পরে কালীনাথ কবি ঠাকুরদাসের শরণাগত হইয়া তাঁহাদ্বারা একখানি "রাবণ বধ" পালা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। এই "রাবণবধ" গাহিয়া কালীনাথ যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়ানিবাসী ৺ কৈলাসচন্দ্র বারুই (কৈলাস বারুই নামে খ্যাত) সে কালের আর একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রাসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, এই দলের জন্য কবি ঠাকুরদাস আর একখানি "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। ইহা কবিকৃত ৪র্থ বিদ্যাসুন্দর। পূর্ব্বরচিত তিনখানি বিদ্যাসুন্দর হইতে এখানি স্বতন্ত্র। এই বিদ্যাসুন্দর গাহিয়াও কৈলাস বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন ভোলানাথ দাসের বিদ্যাসুন্দরের দল খুব জোরে চলিতে ছিল, সে সময়ে প্রতিযোগিতায় যশোলাভ করা অবশ্যই কবির গুণপনার পরিচায়ক। এই বিদ্যাসুন্দরে কবির এক অদ্ভুত ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়া ছিল। এই বিষয় লইয়া একই ধরণে চারি খানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করা কিরূপ কবিত্বশক্তি থাকিলে সম্ভব হয়, তাহা আমি ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, এ চারিখানির কোন খানির একটী গানও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

হাবড়ার অন্তর্গত মাকড়দহ গ্রামনিবাসী ৺ বেণীমাধব পাত্র এক যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের জন্য কবি "অক্রূর আগমন" ও "দুর্গামঙ্গল" নামক দুইটী পালা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

সাধু ও বোকো নামে মুসলমান জাতীয় দুই সহোদর সেকালের আর এক বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী ছিল। কবি ঠাকুরদাস এই দলের জন্য "লবকুশের পালা" রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোণানিবাসী ৺ গোপীনাথ দাস এক যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কবি ঠাকুরদাস রচিত "রামচন্দ্রের বনাগমন" গাহিতেন।

বাগবাজারনিবাসী শ্রীকড়ু দাস অধিকারী কবি ঠাকুরদাসের নিকট হইতে 'অক্রূর আগমন' ও 'রাবণবধ' এই দুই পালা গ্রহণ করেন। এই রাবণবধ কালীনাথ হালদারের দলের রাবণ-বধ হইতে স্বতন্ত্র। কড়ু অধিকারী এখনও জীবিত। তাঁহার ন্যায় নৃত্যবিশারদ সেকালের

* কবি ঠাকুরদাসের গানগুলি বাস্তবিক ঠাকুরদাসের রচিত কিনা এ সম্বন্ধে সে দিন পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির পুত্রোক্তি ব্যতীত অন্য প্রমাণ চাহিয়াছিলেন। আমি তৎসংগ্রহের জন্য লোকনাথ বাবুর সহিত দেখা করি। তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায়, "দুর্গাচরণ বড়িয়াল ঠাকুরদাস রচিত 'মদনমঞ্জরী' 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'শ্রীমন্তের মশান' এই তিনটী পালা গাহিতেন। এই তিন পালা একাদিক্রমে ৩০।৪২ বর্ষ গাওনা হইয়াছিল। দুর্গাচরণ ৺ অক্রূরচন্দ্রের জ্ঞাতি।"

কোন যাত্রার দলে ছিল না। সেকালে "গাইয়ে লোকা, নাচিয়ে ঋড়ু, কত্তৃতায় গোবিন্দ" প্রবাদবাক্য হইয়াছিল। ঋড়ুর গৃহীত দুই পালা সংগৃহীত হইতেছে।

৩। পাঁচালি রচনাবলী।

টাকী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কবি নিজে এক সখের পাঁচালির দল বসান। দুই তিন বৎসর পরে ঐ দল পেশাদার হয়। এই দলের জন্যই 'পাঁচালিওয়ালা ঠাকুরদাস' নামে তাঁহার কবি-খ্যাতি দিগন্ত প্রসারিত হয়। পাঁচালির দুইটী ভাগ ;—ছড়া ও গীত। কবির জীবদ্দশায় এই দলের সহিত তখনকার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গীতসমর হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কখনও তাঁহার দল পরাজিত হয় নাই। কবির কৃতিত্বই ইহার প্রধান কারণ। কবির মৃত্যুর পরও এই দল লোপ হয় নাই। এখনও বর্তমান। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাচরণ বাবুর তত্ত্বাবধানে এই দল চলিতেছে। কবির জীবদ্দশায় সাতক্ষীরার ৺ প্রাণনাথ চৌধুরী, উলার ৺ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, বড়িসার সাবর্ণচৌধুরী, গঙ্গার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মালঞ্চগ্রামের জমীদার ৺ গৌরীপ্রসাদ মৈত্র, কলিকাতার সিমলাবাসী ৺ কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং চোরবাগানে ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বাড়ীতে ও পাইকপাড়ার ৺রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে প্রায়ই তাঁহার দলের গাওনা হইত। এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, হালিসহর, বাঁশবেড়িয়া, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ঐ দলের গাওনাও বহুবার হইয়া গিয়াছিল। কবির মৃত্যুর পরও এই দল অতি সুখ্যাতির সহিত নড়ালের জমীদার ৺রামরতন রায়ের কাশীপুরের বাড়ীতে গাহিয়া আসিয়াছেন এবং পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে বঙ্গেশ্বরের আগমন উপলক্ষে যে নানাপ্রকার দেশীয় সঙ্গীত প্রদর্শিত হয়, সেই সময়ে ছোট লাটের সম্মুখে এই দল পাঁচালি গাহিয়া আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা কবির বাসগ্রামের জমীদার। কবির জীবদ্দশা হইতে প্রতিবৎসর এখনও পূজার সময় তাঁহাদিগের বাড়ীতে এই পাঁচালির দলের গাওনা হইয়া থাকে।

কবির কবিত্বগুণে ৺ কালীপ্রসাদ ঘোষ (যিনি নিজে কবিত্বগুণে Indian Bard খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি) এবং ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক কবিকে রত্ন বলিয়া সম্বোধন ও বিশেষ আদর করিতেন। রাজা রাজেন্দ্রের নিকট ইহার সম্মান সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। কবির দলে তিনি ইহাকে উচ্চাসন দিতেন। পণ্ডিত সমাজেও কবির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিশেষ ছিল, তখনকার মধ্য বাঙ্গালার সমস্ত পণ্ডিতগ্রামে তাঁহার আহ্বান হইত। নবদ্বীপের ৺ গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি ও কলিকাতাবাসী গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ৺ শম্ভুচরণ ন্যায়রত্ন তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতেন।

কবি ঠাকুরদাস এই পাঁচালির দলের জন্য শিববিবাহ, মার্কণ্ডেয়চণ্ডী, রামের দেশাগমন, পারিজাতহরণ, অক্রুর আগমন, দান, মান, মাথুর, ধ্রুবচরিত্র এবং প্রেম ও বিরহবিষয়ক নানা গীত রচনা করেন।

কবি এই নিজ দল ব্যতীত হাবড়া বাক্সাড়ার পাঁচালির দলে এবং দমদমার নিকটবর্ত্তী সিঁথীর সখের পাঁচালির দলের গানও বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

কবির অশেষ কীর্ত্তিরাশির মধ্যে তাঁহার নিজ দলের পাঁচালির পালাগুলিই কেবল পুস্তকাকারে বিদ্যমান আছে।

কবির কীর্ত্তিমন্দির কতটা উচ্চ ছিল, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু কোন নিদর্শন পাইলাম না। অধিকাংশ রচনার নিদর্শন পাইবার উপায় নাই। কএকটী গান-মাত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

লোকনাথ দাসের (মূলতঃ দুর্গাচরণ ঘড়িওয়ালের) দলের "শ্রীমন্তের মশান" হইতে;—

১। ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল, কোথায় গেল, কমলদলবাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশিবদনী॥
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথায় লুকাল সে করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, সে নারী কার রমণী।
দেখেছি কালীদয়ে জাগিছে রূপ হৃদয়ে
অপরূপ এমন মেয়ে দেখিনি কোথায়,—
এখন সে কালীদয় হেরি সব শূন্যময়
কেবল জলে জলময় কোথায় সে করীধারিণী॥ *

এই গানের ন্যায় সুপরিচিত আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠস্থ দ্বিতীয় গান আর সেকালে ছিল না।

২। বিভাস—আড়াখেমটা।

তোর রাজার কি রাজ্য করিস্ তাব কি মাৎসর্য্য
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য কি তা জান না।
জান না রাজ্যখণ্ড শুন রে পাষণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের বদনে,—
বিধি যার আজ্ঞাকারী কুবের হন যাঁর ভাণ্ডারী
ত্রিপুরারি করেন যাঁদের সাধনা॥
চরণে দিলে বল ধরা যায় রসাতল
মহাপ্রলয় হয় কেহ বাঁচে না॥ †

---

* বহুকাল অতীত হওয়ায় এ গানে অনেক পাঠান্তর হইয়া গিয়াছে। "বসুমতীকার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত সঙ্গীত-কোষে ৮৪৭ পৃষ্ঠায় [illegible] সংখ্যায় এই গানটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক ভুল আছে। লোকনাথদাসের নিকট [illegible] উপরি উক্ত পাঠ গৃহীত হইল। সঙ্গীতমুক্তাবলীতে এই গানের রচয়িতা বলিয়া যে নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ভুল না জালিয়াতী।

† সঙ্গীত-কোষে ৯০৯ পৃষ্ঠায় এই গীতটীতে ৩৯৪৭ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহারও পাঠ ভুল আছে।

এই গানের তৃতীয় কলি প্রবাদ বাক্যের মত বাঙ্গালার ভক্তিমতী রমণীকুলের মুখেও সর্ব্বদা শুনা যায়।

৩। (সুর সংগৃহীত হয় নাই।)

যার মায়ের বাস রে শ্মশানে।
পিতা মৃত্যুঞ্জয় কালের ভয়
সে কি করে ভয় রাজা শালবানে।
(ওরে) যা ধরে ভালে অর্দ্ধশশী,
রণমাঝে দাঁড়ায় হয়ে এলোকেশী,
তার তনয় ডরায় দেখে তোদের হাসি,—
(ওরে) গয়া গঙ্গা কাশী আমার মায়ের চরণে॥
ভয় করি কিরে দেখে তোদের মুখ,
আমার মায়ের পদে পড়ে পঞ্চমুখ,
স্তুতিপর হয়ে আছেন চতুর্ম্মুখ,
কাল অধোমুখ যে নাম স্মরণে॥

এমন দিন গিয়াছে, যে ভরসাহীন বাঙ্গালী গুন্ গুন্ করিয়া মনে মনে এই গান গাহিলে বাস্তবিকই ভরসা পাইত। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা একদিন এই সকল গান মহাআদরে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত।

তাহার পর "নলদময়ন্তী" হইতে;—

৪। মিলন ভৈরবী—একতালা।

বিচ্ছেদ ভুজঙ্গে দংশেছে এ অঙ্গে আবার তুমি দংশন করবে তাহে,—
হবে বিষে বিষক্ষয় যদি হে আমার প্রাণ যায়
ভাবনা কি তায়?
খেদ এই দেখা হবে না পতির সঙ্গে।
বিচ্ছেদ-বিষে প্রাণ দেহে নাহি রবে,
তুমি দংশন কর তাতেও মরণ হবে,
নারীবধের ভাগী তোমায় হতে হবে,
আমিত ভেসেছি অকুল তরঙ্গে॥

এই গানটী কবির সম্ভাববর্ণনার সুন্দর দৃষ্টান্ত, বর্ণনাপারিপাট্যও আছে।

"কলঙ্কভঞ্জন" হইতে,—

৫। বিভাস—আড়াঠেকা।

যা জান তাই কোরো নাথ আমিত চলিলাম জলে।
বড় লজ্জা পাবে হরি দাসী তোমার লজ্জা পেলে॥
চলিলাম লয়ে ছিদ্রঘটে, যদি কোন ছিদ্র ঘটে,
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ত্যজিব প্রাণ কৃষ্ণ বলে।

একে বুদ্ধিশূন্য ঘটে　　অঘটন ঘটনা ঘটে
যদি পড়িছে সঙ্কটে　　রেখহে সে সময়,—
কমলিনীর হৃদ্‌কমলে　　দাঁড়াও একবার বাঙ্কে হেলে
দেখে যাই যমুনার জলে　　দেখি কি ঘটে কপালে॥

কি সরল প্রাণভরা ঈশ্বরনির্ভরতা!

এই বার কবির পাঁচালির পালাগুলি হইতে কয়েকটি গান উদ্ধার করিতেছি।

দানলীলা হইতে,—

১। সুরঠ মল্লার—একতালা।

কালরূপ দেখে ভয় করে।
ওহে কর্ণধার, কেমন করে পার, হবে গোপিনীরে।
একে তুমি নব নীরদবরণ, তাহে যদি বাদী হয় হে পবন,
ভগ্নতরী মগ্ন হইবে তখন, বাঁচিব কি করে॥
স্বয়ং সিন্ধু নহ তাতেই মনে বাধে,
অন্ধ স্কন্ধে গতি শাস্ত্রেতে নিষেধে,
তোমার দোষে আমরা পড়িলে বিপদে, ডাকি তখন বল কারে।
ছকুল হলেও বরং ত্যজেও পেতাম কূল,
কাল অঙ্গ তোমার তাতেই হে আকুল,
তোমা প্রতি পবন হলে প্রতিকূল, মজে দুঃখিনীরে।

সখীরা নীরদবরণের উপর যে আশঙ্কার হেতু আরোপ করিলেন, তাহার উত্তর দেওয়া কৃষ্ণের একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাঁহার ভগ্নতরীতে কেহ উঠে না।—কৃষ্ণ বলিলেন,—

২। আলেয়া—আড়াঠেকা।

(তোমরা) কি দোষে দুষিছ বল কালো ভাল নয়।
কালো যে জনে বাসে ভাল, থাকে না তার কাল ভয়॥
কালপাশে মুক্ত হতে, কালো পাশে হয় হে যেতে,
বুঝে লোক চরমকালেতে কালোতে কত ফলোদয়।
কালের পক্ষে কালো হয় কালের স্বরূপ, বিশ্বজনে বলে তাল কালো বিশ্বরূপ,
যেরূপে সবার উদ্দেশ, সে রূপে কিরূপে দ্বেষ,
হইলে জীবন শেষ যে রূপেতে বাসনা হয়॥

কৃষ্ণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা জ্ঞানগর্ভ হইলেও সখীদের কথার উত্তর হয় নাই। সখীরা কালোরূপ ভাল নয় একথা বলে নাই, তাহারা কালোরূপে মেঘাশঙ্কা করিয়া ভগ্নতরীতে ঝড়ের ভয় করিতে ছিল। কৃষ্ণ "কালভয়বারণ" হইতে পারেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে "ঝড় ভয়বারণ" হইতে পারিলেন না। উত্তর প্রত্যুত্তরের ভাব ছাড়িয়া দিলে গান ছুটি বেশ সুকৌশলে রচিত।

মানলীলা হইতে,—

১। বারোঁয়া—পোস্তা।

কোথায় ছিলেহে নিশীথে, এলে সুপ্রভাতে সু-প্রভাতে।
আধ আধ কালশশী তোমার বাসিহাসি শ্রীমুখেতে॥
উদয় হ'লে দিননাথ, উদয় হলে দীননাথ,
কারেঁ করে দীন অনাথ শুভ আগমন,—
এদেশে প্রকাশ হলে, এবে সে প্রকাশ পেলে
তোমার সাধে কুটিলে কুটিল বলে,
বলে হে অতি দুঃখেতে॥

গানটীর বড় সুন্দর রচনাকৌশল। ইহার "আধ আধ কালশশী তোমার বাসিহাসি শ্রীমুখেতে" চরণটীর কথার ভাবের তুলনা নাই। এত অল্প কথায় এরূপ স্পষ্টভাব ফুটাইতে যে সে কবি পারেন না। কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই গানটী শুনিয়া ঠাকুরদাসকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তোমার "বাসিহাসির" মূল্য নাই, উহা কোন দিন "বাসি" হইবে না।

২। মূলতান—আড়াঠেকা।

(আজি) মান-রাহু রাই-চাঁদে গ্রাস করেছে।
এ স্থিতির অস্থিতি সখি মুক্তির কি আর যুক্তি আছে॥
এ গ্রহণে হয় অনুমান দণ্ডের নাহি পরিমাণ
জীবনদণ্ড হয় বা বিধান লক্ষণে জান হতেছে।
যত দিন এ দেহ রবে রাহু তত দিন
স্বতন্ত্র উভয়ের হওয়া সুকঠিন
উভয়ে মিলিত দেহ প্রভেদ হওয়া সন্দেহ
যদি পারেন নীলদেহ, তবে প্যারী প্রাণে বাঁচে॥

সেকালে রূপক ও অনুপ্রাসের বড়ই আদর ছিল, এই গানটীতে রূপকের এবং কবির অন্যান্য গানে অনুপ্রাসের ক্ষমতার যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

'ধ্রুবচরিত্র' হইতে,—

ঝিঝিট মল্লার—যৎ বা পোস্তা।

ধন দিয়ে কি এসেছ মন ভুল্‌তে।
সামান্য ধন দিয়ে বল পরম ধনে ভুল্‌তে॥
শ্যামরূপ ত্রিভঙ্গ বাঁকা হৃদয়ে রয়েছে আঁক
জল দিয়ে পাথরের লেখা পারবে নাহে তুল্‌তে।
সে ধনে ভক্তি কপাটে যতনে রেখেছি এঁটে
(আজি) ও কপটে সে কপাট পারবে নাহে খুল্‌তে।

ধ্রুবের দৃঢ়তা কবি যে ভাবে ফুটাইয়াছেন, তাহা ধ্রুবের বয়সের উপযুক্ত না হইলেও বড়ই চমৎকার হইয়াছে। গানটীর মনোহারিত্ব শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়।

'হরিশ্চন্দ্র' হইতে,—

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা ।

ওহে মহারাজ চিনিবার এক গুণ নিদর্শন ।
দেখ সাকার নহে মন, কেমন করে পরস্পরের মনে মনে মিশে মন ॥
মধু চিনে মধুকরে, চকোর চিনে সুধাকরে,
যে যার প্রিয় সে চিনে তারে,—
চাতক চিনে যে নীরদরে জীবনে পাবে জীবন ।
তব শুভ আগমনে, নিশ্চিত জেনেছি মনে
মর্ম্মপীড়ায় বাঁচিব এ দিনে,—
আগে ডাকে ভেকে যে নীরদে হবে বরিষণ ॥

গানটীতে সারল্যের ছবি ও আন্তরিকভাব অতি সুন্দর ফুটিয়াছে।

'পারিজাতহরণ' হইতে,—

ভৈরব—একতালা ।

ওহে কেশব এ সব কত সব আর ।
অধীন জনেরে কেন করা নমস্কার ॥
দাসীর দায়ে দাসত্ব করা এতে কি প্রাণ যায় হে ধরা
জীরের জন্যে হীরের ভরা করা অঙ্গীকার ।
চল হে মান থাকে যাতে, কাজ কি এ ছার পারিজাতে,
নাগাকুলের দাগা চিতে জ্বলবে অনিবার ॥

ইহার শেষ চরণটী শুনিয়াও কালীপ্রসাদ বাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন, এরূপ শব্দবিন্যাস ক্ষমতার পরিচায়ক।

কবির প্রত্যেক পালা হইতে একটী গান উদ্ধার করিতে গেলেও পরিষৎ-পত্রিকার ৮।১০ পৃষ্ঠা ভরিয়া যাইবে, সুতরাং আর আমরা তাঁহার কোন পালার গান তুলিব না। এখন তাঁহার অন্যান্য ক্ষমতার পরিচায়ক দুএকটী গান উদ্ধৃত করিতেছি।

কবির একটী বিরহবর্ণনা,—

আলেয়া—একতালা ।

সই লো সই লো শেল বক্ষে রইলো গাঁথা ।
এই যুগ্ম গিরি, ক্রমে হল ভারি, যার ভার সেতো নাহি দেখ.
যার তরে অন্তর এ দুঃখ পাচ্ছি, কার করে পড়ে তার এ বাঁচি,
ঐ ভেবে অন্ধ হইল আঁখি, কারে বল বলি মনের কথা।
আর কে করিবে এর যতন, বিদ্যাগিরির ন্যায় হয়েছে পতন,
সে তো করে গেছে অগস্ত্যের গমন, ভূধরে রাখিয়ে ধরায় মাথা ॥

গানটী সেকালোচিত শ্লীলতাবর্জ্জিত হইলেও বিরহিণীর অবস্থাপরিচায়ক বটে। বর্ণনার ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য। রাজা কান্তিচন্দ্র এই গানটী একদিন নিজে গাহিতে গাহিতে বলিয়াছিলেন, এই গানের রচয়িতাকে একবার এনে দেখাতে পার।

প্রেমের স্বরূপবর্ণনা,—

রিভাস—শ্লথ কাওয়ালী।

একরূপ প্রেমধন নয়।
বহুরূপ বহুজন যে যা রূপ বেছে লয়॥
পুরুষ-প্রকৃতিপ্রেম শশীর সম উদয়,
যৌবন পূর্ণিমা তারে কলাক্ষয় লোকে কয়।
কুসুম ফুটিলে যেমন বাসি হলে বাস ক্ষয়
নিশীথে সৌরভ যত প্রভাতেতে তত নয়॥
জোয়ার ভাঁটার বারি কোনখানে স্থিতি রয়,
(ওলো) ঠিকে প্রেমের মুখে আগুন কিছু সুখ দুখময়॥
আর এক প্রেমেতে দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়
সুখ ত্যজে শুকদেব গৃহবাসী কভু নয়॥
ধ্রুব ধ্রুবজ্ঞানে এক প্রেমে হয়ে মত্ত,
চরমেরি ধন পেলে পরম পদার্থ,
সেরূপ প্রেমেতে মন মজে যার যথার্থ
আপদ কি তার ঘটে ত্রিলোকে সুখ্যাতি রয়॥

একটী আগমনী গীত,—

মূলতান—একতালা।

গিরি কারে আনিলে।
এনে কার তনয়া প্রবোধিলে॥
অপরূপ রূপ এযে দশভুজা, কুসুম চন্দন পায়ে, কে করেছে পূজা,
শুনহে পাষাণ হয়ে হতজ্ঞান সকলি ভুলিলে।
নারায়ণী বাণী দাঁড়ায়ে দুপাশে, দশভুজে পাশ শোভা পায়
বলে গেলে হে গিরি যা, আনিগে গিরিজা, সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়,—
রবি শশী আসি উদয় পদে পদে, উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে
দাসের আশয় আসা হয় সায় ও পদ পাইলে॥

আর গান তুলিব না। গানের পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে। কেবল একটা রসিকতাসূচক গান উদ্ধৃত করিতেছি,—

মাধবগিরি (তারকেশ্বর মোহান্ত) জেলে গেলে বাজারে একটা গান উঠিয়াছিল;—

"মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক কোঁটা দিলে টাক ধরে না চুলে
কাণায় চোখে দেখতে পায়॥"

কবি ঠাকুরদাস এই মোহাড়ার পর অন্তরা গাঁথিয়া দেন :—

"বিলাতী ঘানি নূতন আমদানী
শিবের ষাঁড় জুড়েছে তেলে ভোলে কামিনী
হয়েছে ল্যাজে-গোবরে বৃষ কখন কি দায় ঘটায়॥"

গান এই পর্য্যন্ত। এখন কবি সম্বন্ধে কয়টি ক্ষুদ্র গল্প বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কোন বিশ্বাস্য লোকের মুখে শুনা গিয়াছে,—সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালিকার রসিকচন্দ্র রায় একবার যাত্রাওয়ালা লোকনাথের সহিত দেখা করিয়া বলেন,—"লোকনাথ সেই দুর্গাচরণের আমল হইতে তুমি দত্তজার ঐ তিন পালাই গাহিতেছ, আর উহাতে রস আছে কি? অনেকেই উহা শুনিয়াছে। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার একটা পালা গান কর। লোকনাথ শুনিয়া বলিলেন, "রায় মহাশয় যাহা আজ্ঞা করেছেন, তাহা যথার্থ, পালা তিনটী বড় পুরাতন হইয়াছে, কিন্তু সুরগুলার জন্য ছাড়িতে মায়া হয়। এখন আর ওরূপ ললিতপদবিশিষ্ট গান বাঁধিবার লোক দেখি না। আমি একটা সুর দিতেছি, আপনি সেই সুরে আমায় একটা গান শুনাইয়া দিন।"* শুনা যায়, এক ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও নাকি রসিকবাবু সেই সুরে খাপাইয়া গান বাঁধিতে পারেন নাই। তখন লোকনাথ বলিলেন, "রায় মহাশয় মাপ করিবেন, আমি এই সুরের জন্যই গাই, লোকে এই সুরের জন্যই শুনে, নতুবা কথাগুলা তাঁহারও কিছু মন্দ নাই বা আপনার আরও ভাল হইতে পারে; তাতে বড় আসে যায় না" *।

কবির রচনাশক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

* কবির বংশধর ও তাঁহার পাচালির দলের অনেক লোকের নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রন্থ।

কিছুদিন হইল, পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে একখানি রসায়ন গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির সহিত বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে দেখিয়া উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য ইংরাজ মিশনারিদের নিকট নানাকারণে ঋণী। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্যুদয়ের আরম্ভে প্রায় সর্ব্বত্রই মিশনারিদের হাত দেখা যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। সেকালের মিশনারিরা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে দেশীয়জনগণের সহিত আত্যন্তিকভাবে মিশিতে চাইতেন। একালের মিশনারিরা আর দেশীয়দের সহিত মিশিতে চাহেন না। ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই এবং তজ্জন্য আমাদের মাথাব্যথারও প্রয়োজন নাই।

উপস্থিত গ্রন্থ মার্শমান প্রভৃতি মিসনারিদের প্রযত্নেই প্রচারিত। গ্রন্থের নাম Principles of Chemistry by John Mack of Serampur College—কিমিয়া বিদ্যার সার, শ্রীযুত জান মাক সাহেব কর্ত্তৃক রচিত ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। গ্রন্থ শ্রীরামপুর যন্ত্রে ১৮৩৪ অব্দে মুদ্রিত। বর্ত্তমান পুস্তক ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল কি না জানি না। সম্ভবতঃ লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকার মধ্যে এ বিষয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।*

---

* লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকার অনুবাদ পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিছু দিন হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়াছে। আশা করি, পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় ইহার পুনঃ প্রচারে মনোযোগী হইবেন। উক্ত তালিকা আজকাল দুর্লভ গ্রন্থ। যতদূর জানি, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত একখণ্ড গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহা অদ্যাপি পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।

ডিমাই বার পেজী আকারে গ্রন্থের পৃষ্ঠসংখ্যা ১৯—১৬৯, প্রথম উনিশ পৃষ্ঠায় ভূমিকা ও সূচী আছে। ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত। সূচী ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের দুই ভাগ। প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যায় প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'কিমিয়া-প্রভাব' chemical forces, যথা "আকর্ষণ", "তাপক", "আলোক", "বিদ্যুতীয়-সাধন", বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—"কিমিয়া-বস্তু"—Chemical substances ; তন্মধ্যে দুই অধ্যায়ে "বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু" (electro-negative substances), "ধাতুভিন্ন বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু" (unmetallic electro-positive substances) বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অন্য সমুদয় মূল পদার্থকে অর্থাৎ non-metal দিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণী-বিভাগ আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রথম শ্রেণী বা electro-negative শ্রেণী মধ্যে Oxygen, Chlorine, Bromine, Iodine, Fluorine স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বা electro-positive শ্রেণী মধ্যে Hydrogen, Nitrogen, Sulphur, Phosphorus, Carbon, Boron, Selenium স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ধাতু সকলের ও জৈব পদার্থের—"সেন্দ্রিয় সম্পর্কীয় বস্তু" সকলের—বিবরণ থাকিবে, গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ আভাস আছে। গ্রন্থশেষে "ক্রোড়পত্র" (Appendix) মধ্যে চিত্রসম্বলিত বাষ্পীয় এঞ্জিনের ব্যাখ্যা আছে।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূমিকা মধ্যে নিম্নোদ্ধৃতরূপ কথা আছে,—"Mr. Marshman having proposed some years ago, to publish an original series of elementary works on history and science, for the use of youth in India, I count it a privilege to be assosciated with him in the undertaking and cheerfully promised to furnish such parts of the series as were more intimately connected with my own studies. Other engagements have retarded the execution of our project, much against our will. He has therefore been able to do no more than bring out the first part of his Brief Survey of History ; and now, at length, I am permitted to add to it, this first volume of the Principles of Chemistry."

গ্রন্থকার শ্রীরামপুরকলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীরামপুর কলেজে তৎকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহকারে শিক্ষাদান ঘটিত। স্কটলণ্ডনিবাসী জেম্‌স্ ডগ্‌লাস্ যন্ত্রাদি ক্রয়োদ্দেশে পাঁচশত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রচার গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছিল জানি না। বোধ করি, উল্লিখিত লঙ্ সাহেবের তালিকায় এই বিষয়েরও মীমাংসা হইতে পারে। শ্রীরামপুরে ছাত্রগণের নিকট ও কলিকাতায় গ্রন্থকার রসায়ন সম্বন্ধে যে 'লেক্‌চার' দিতেন, তাহাই অবলম্বনে বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

রসায়ন শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় এই আদি গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "Be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour ; and

their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them." গ্রন্থকার এক জায়গায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা—এমন কি—কোন শিক্ষাই চলিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যিনি সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত সদস্যবৃন্দের অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে সেদিন বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃস্তন্যের স্থানীয়; কিন্তু জননী বহুদিন হইতে রুগ্না; তাঁহার স্তন্য এখন বিষবৎ পরিহার্য্য। রুগ্নার অন্য চিকিৎসা আবশ্যক, কিংবা রুগ্নাকে একবারে যমমন্দিরের পথ প্রদর্শন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, তাহা চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ সভাপতি মহোদয় স্থির করিয়া বলেন নাই।

এই গ্রন্থখানির অধ্যয়নে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়। চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানের বাল্যকাল ছিল। বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থার একটী ক্ষুদ্র চিত্র বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অঙ্কিত দেখিতে পাই। তখন যাহা অজ্ঞাত ছিল, তাহা এখন জ্ঞাত; তখন যাহা অস্পষ্ট ছিল, এখন তাহা স্পষ্ট। তাপ তখনও দ্রব পদার্থ মধ্যে গণ্য হইত; আলোক দ্রুতগামী ক্ষুদ্র কণিকার বর্ষণ হইতে উৎপন্ন, এ বিশ্বাস এখনও সম্পূর্ণ যাব নাই; তাড়িতের অধিকাংশ ধর্ম্মই অজ্ঞাত ছিল। তাড়িতের সহিত রাসায়নিক আকর্ষণের কি একটা রহস্যময় সম্বন্ধ আছে, ইহা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছিল। রসায়নশাস্ত্রের দ্বৈতবাদ তখন আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, ডাল্টনের পরমাণুবাদ আঁধারে আলোক আনিতে গিয়া আঁধারকে আরও ঘনাইয়া তুলিতেছিল। অধিকাংশই মূল পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব তখনও নির্ণীত হয় নাই। নাইট্রজেনের এক পরমাণুর সহিত অক্সিজেনের পাঁচ পরমাণু যোগে নাইট্রিক এসিড জন্মে। এইরূপ বিবিধ তত্ত্ব তখন রসায়নজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছিল। এখন সে সমস্ত মত উল্টাইয়া গিয়াছে। রসায়নশাস্ত্র নানা রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া, নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়া এখন মহাবিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হায়, বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এখনও অপূর্ণ ও জীর্ণ। বর্ত্তমান গ্রন্থে বাঙ্গালায় রসায়ন শাস্ত্রের যে অবস্থা দেখিতে পাই, তাহা অপেক্ষা বড় অধিক উন্নতির চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাই না।

গ্রন্থের ভাষা সত্তর বৎসরের পূর্ব্বতন বাঙ্গালা; গ্রন্থের বিষয় বিজ্ঞান; গ্রন্থকার ইংরাজ। সুতরাং গ্রন্থের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই প্রচুর আমোদের সঞ্চার করে। বাঙ্গালা ভাষা আজকাল সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য প্রচারে সাহসী হয় না। এখনও বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষা সাধারণের বোধগম্য হয় না। যাঁহারা বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৈন্য বুঝিতে পারেন। এখনও এই অবস্থা!—সত্তর বৎসর পূর্ব্বে একজন বৈদেশিক কিরূপে সাহস অবলম্বন করিয়া, এই দীন হীন ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয় বিষয়। তাহাতে শিখিবার কথা আছে। বৈদেশিকের যে

সাহস ছিল, আমাদের সে সাহস আছে কি? থাকিলে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের এরূপ অবস্থা হইত না।

ভাষার নমুনা স্বরূপ দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিমিয়া বিদ্যা দ্বারা এই এই শিক্ষা হয়, বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু, যে যে ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।" ৩ পৃঃ।

"কিমিয়া প্রভাব চারিপ্রকার। ১ আকর্ষণ। ২ তাপক। ৩ আলোক। ৪ বিদ্যুতীয় সাধন। অনুমান হয় যে অপর একপ্রকার চুম্বকীয় গুণ।" ৫পৃঃ।

"দ্রব হওনকালে কতক তাপক দ্রব বস্তু মধ্যে লীন হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা দ্রব বস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং সেই দ্রব বস্তু পুনর্ব্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়। এই এক মহার্ঘ কথা বিষয়ে পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক।" পৃঃ ৩১।

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর যে আছেন এবং তাঁহার অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধি ও ভদ্রতাতে লোক সকলকে দৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন ঐ সকল প্রমাণেতে তাঁহাকে স্তুতি-বাদ কে না করিবে।" ৪১ পৃঃ।

"আলোকের চলন ও কার্য্যদ্বারা অনেকে বোধ করে যে সে একপ্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, সে বস্তু নহে, কেবল বস্তুর মধ্যগত একপ্রকার বিশেষ সংলাড়ন দ্বারা উৎপন্ন।" ৫০ পৃঃ।

"আলোকের চলন শীঘ্র বটে তথাপি মাপিত হইতে পারিবে। অপর আলোক চলত বাধিত কিম্বা অন্য দিগে পরাবর্ত্তিত হইতে পারিবেক।" ৫০ পৃঃ।

"সামান্য আকাশের মধ্যস্থ অক্সিজানের দ্বারা তাবৎ জীব জন্তুর প্রাণ রক্ষা হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের ব্যবহারকর্ম্মনিমিত্তক তাবৎ অগ্নি জাজ্বল্যমান হয়, অতএব আমারদের ভদ্রদ স্রষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের হিতজনক কার্য্যের মধ্যে সামান্য আকাশকে বিশেষরূপে গণনা করিতে হয়।" ১১১ পৃঃ।

"সোদিয়মের খ্লোরিণ, অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর গুড়াকৃত মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদের ৩ ঔন্স হামামদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া, তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সে মিশ্রিত গান্ধকিকাম্লের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্পে অল্পে উত্তপ্ত কর তাহাতে খ্লোরিণ আকাশ নির্গত হইবে।" ৭২ পৃঃ।

এই যথেষ্ট। আধুনিক কালে লিখিত কোন কোন পুস্তকের ভাষার সহিত মিলাইলে এই ভাষাকে বড় বেশী দুর্ব্বোধ মনে হইবে না।

রসায়ন খণ্ডের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে আধুনিক গ্রন্থকারদের যে সমস্যা উপস্থিত হয়, ম্যাক সাহেবেরও তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—"In composing this volume, my primary object has been to introduce chemistry into the range of Bengalee literature, and domesticate its terms and ideas in this language. The attempt will be generally acknowledged to have been attended with no

small difficulties * * * * The names of chemical substances are, in the great majority of instances, perfectly new to the Bengalee language; as they were but few year ago to all languages. The chief difficulty was to determine, whether the European nomenclature should be merely put into Bengalee letters, or the European terms be entirely translated by Sungskrit, as bearing much the same relation to Bengalee as the Greek and Latin do to the English * * * I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, merely changing the prefixes and terminology, so as decently to incorporate the new words into the language."

কটক কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "সরল রসায়ন" বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত রসায়ন সম্বন্ধীয় শেষ গ্রন্থ। ইহার মুদ্রণের তারিখ ১৮৯৮। এই গ্রন্থেও ম্যাক্ সাহেবেরই প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে যোগেশ বাবুর মত, মৎ-প্রণীত রাসায়নিক পারিভাষার সমালোচনা উপলক্ষে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি কিন্তু অদ্যাপি আমার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই।

ইংরাজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া উচিত, কি তাহাদের অনুবাদ আবশ্যক, এই কথা লইয়া তর্ক। রসায়নশাস্ত্রে যে হাজার হাজার পারিভাষিক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদের চেষ্টা বৃথা শ্রম মাত্র। এ বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কতকগুলি মূল ও যৌগিক পদার্থ আমাদের জীবনযাত্রায় ও সাংসারিক কার্য্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আমি সেই পদার্থ গুলির নামের অনুবাদের পক্ষপাতী। অর্থাৎ স্থূলতঃ, যে সকল পদার্থ পৃথিবী মধ্যে তেমন বিরল নহে, প্রচুর পরিমাণে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, তাহাদের নামের অনুবাদ করিয়া, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে। আর অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ গুলিকে একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া মোলায়েম করিয়া লইতে হইবে। যোগেশ বাবু কোন স্থানেই অনুবাদে রাজী নহেন; অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে অধিক কাটা ছাঁটারও পক্ষপাতী নহেন। অন্ততঃ তাঁহার রসায়নগ্রন্থ দেখিলে সেইরূপই বোধ হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একটা অঙ্গ পাণ্ডিতদিগের জন্য অর্থাৎ খাঁটী বৈজ্ঞানিকের জন্য, সে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য। কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে সাধারণের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হইয়া পড়ে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে, যাহা সকলের পক্ষেই অবশ্য জ্ঞাতব্য; সেটুকু না জানিলে কেবল যে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হইবে তাহা নহে, সে টুকুর জ্ঞান জীবনধারণ, জীবনরক্ষা ও সংসারযাত্রার জন্যই নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পরিচিত করা লোকশিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় ঘটাইতে হইলে বিজ্ঞানের

ভাষাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। উৎকট পারিভাষিক-শব্দ-ভীষণ ভাষা পাণ্ডিতদের জন্য। সাধারণকে বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে পারিভাষিকত্ব যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ভাষাকেও সুশ্রাব্য ও মোলায়েম না করিলে চলিবে না। তথাপি বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞান উহার পারিভাষিকত্ব কতকটা থাকিবেই। সেই পারিভাষিকত্ব যদি আবার শ্রুতিকঠোর দুরুচ্চার্য্য বৈদেশিক ভাষার আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার কোন আশাই থাকিবে না। প্রায় আশী বৎসর হইল, বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম রসায়ন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও বাঙ্গালীর নিকট রসায়নশাস্ত্র একবারে অপরিচিত; তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, যে ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর ভাষা নহে; কোনকালে তাহা বাঙ্গালীর ভাষা হইবে না। যাঁহারা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে, বাঙ্গালী জনসাধারণ এককালে ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবে, তখন আর বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যতা থাকিবে না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাঙ্গালার জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী ধরুক, সে আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজির স্থান বাঙ্গালা গ্রহণ করিবে, বাঙ্গালী বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে শাস্ত্রাধ্যয়নে ঘৃণা বোধ করিবে, আমি সেই দিনের আশা করি ও আকাঙ্ক্ষা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সে শুভদিন শীঘ্র আসিবে না, হয়ত কখনই আসিবে না; কিন্তু বাঙ্গালীর চেষ্টার অভাবে বা উৎসাহের অভাবে যদি সেদিন না আসে, তবে বাঙ্গালীর ন্যায় অধম জীব সংসার হইতে লুপ্ত হউক।

যোগেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষাকে মৃতভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।" যেখানে সংস্কৃতমূলক শব্দ পাওয়া গেল না, সেখানে ম্লেচ্ছভাষায় শব্দ গ্রহণ কর; আপত্তি নাই। কিন্তু যদি একটু চেষ্টা করিলে সংস্কৃতমূলক শব্দ পাওয়া যায়, তাহা না করিয়া একবারে ম্লেচ্ছ ভাষার আশ্রয় লইলেই জীবনী শক্তিটা একবারে বাড়িয়া উঠিবে কিরূপে, বুঝিলাম না। উলঙ্গ হইয়া থাকা অপেক্ষা হ্যাট কোট পরা ভাল; কিন্তু ধুতি চাদর বর্ত্তমান থাকিতে যে হ্যাট কোট পরে, তাহার মনুষ্যত্বটা অনেকটা কপিত্বের কাছাকাছি। এই সোজা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। পুনশ্চ যোগেশ বাবু বলেন, "অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি নামগুলিকে কি কারণে অম্লজান, উদজান প্রভৃতি নাম পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে উপলব্ধ হইতেছে না।" পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন হিন্দুগণ গ্রীকগণের নিকট রাশিচক্রের বিষয় লিখিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাশির নামের জন্য ক্রিয়, তাবুরি প্রভৃতি একসেট যাবনিক শব্দ গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু সে নামগুলি চলে নাই; মেষ, বৃষ প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক নামই চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ভাষারই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইংরাজিতে যাহাকে বলে genius. কোন শব্দ সেই বৈশিষ্ট্যসঙ্গত না হইলে ভাষার মধ্যে মিশে না ও স্থান পায় না। এই সঙ্গতির জন্য ইংরাজেরা সিপাহী শব্দকে 'সেপাই' করিয়া লইয়া-

ছেন; আমরা স্কুলকে ইস্কুল ও টেব্‌লকে টেবিল করিয়া লইয়াছি। এইরূপ কাটা ছাঁটা না করিলে ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় না; বৈদেশিক শব্দ বৈদেশিকই থাকিয়া যায়; স্বদেশিকের সহিত মিলিতে পারে না। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাসায়নিক গবেষণা দ্বারা বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাকে পারিভাষিক বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। গত কার্ত্তিক মাসের প্রদীপ পত্রে তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে অনুমোদন করি। দুঃখের বিষয় তিনি বর্ত্তমান পরিভাষার কএকটী ত্রুটি দেখাইয়াছেন মাত্র; সংশোধনের পথ দেখান নাই।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ম্যাক্ সাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতির ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণেতাদের প্রয়োজনে আসিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিবে, তজ্জন্য তাহার একখানি তালিকা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

Chemistry	কিমিয়া বিদ্যা	Mass	রাশি, বস্তু
Optics	দৃষ্টি বিদ্যা	Volume	অবয়ব, রূপ, পরিসর
Heat	তাপক	Solid	কঠিন
Temperature	তাপ	Liquid	দ্রব
Light	আলোক	Gas	আকাশ
Electricity	বিদ্যুতীয় সাধন	Gaseous	আকাশীয়
Magnetism	চুম্বকীয় গুণ	Vapour	বাষ্প
Element	মূল বস্তু	Common air	সামান্য আকাশ
Compound	সঙ্কর বস্তু	Standard	পরিমাপক
Combination	লয়	Specific gravity	স্বাভাবিক গুরুত্ব
Combining weight	লয়যোগ্য ভাগ	Solution	গলন
Equivalent	তুল্য ভাগ	Crystal	স্ফটিক
Atom	পরমাণু	Water of crystallisation	স্ফাটিক জল
Atomic weight	পরমাণু সম্পর্কীয় ভার	Deliquescent	গলনশীল
Law	ব্যবস্থা	Property	গুণ
Analysis	ব্যস্তকরণ	Decomposition	বিভাগ
Synthesis	সমস্তকরণ	Density	নিবিড়ত্ব,
Force	প্রভাব	Pressure	চাপনি
Attraction	আকর্ষণ	Barometer	বারোমেতর
Cohesion	সংলাগাকর্ষণ	Thermo-meter	তেরেমোমেতের
Gravity	গুরুত্বাকর্ষণ	Surface	মুখ

Tetrahedron	ঘনাষ্টমুখ	Air-pump	আকাশ বোমা
Experiment	পরীক্ষা	Pure	নির্ভাজ
Saturation	প্রচুরতা	Alloy	কুধাতু
Proportion	ভাগ	Salt	লবণ
Denominator	হারক	Acid	অম্ল
Movement	সংলড়ন	Alkali	ক্ষার
Expansion	বৃদ্ধি	Retort	রিটোর্ট
Melting	দ্রবত্ব	Friction	
Evaporation	বাষ্পীভাব	Reflection	পরাবর্ত্তন
Ignition	অগ্নীভাব	Orange	নারাঙ্গী
Freezing point	জমাট অংশ	Indigo	বাগুনীয়া
Boiling point	স্ফোটন অংশ	Violet	বিওলা
Contraction	সঙ্কোচন	Solar spectrum	সৌর ব্যস্ত বর্ণ
Melting ice	গলনীয় বরফ	Positive	সভাবরূপ
Freezing water	জমনীয় জল	Negative	অভাবরূপ
Elasticity	স্থিতিস্থাপকীয় শক্তি	Positive pole	সভাবি পার্শ্ব
Combustion	দহন	Negative pole	অভাবি পার্শ্ব
Supporter of combustion	দহনপোষক	Cell	কেটুয়া
Radiation	কিরণত্ব	Sattery	মূর্চ্চা
Source	আকর	Conductor	সঞ্চারক
Sea-level	সমুদ্রজল তুল্য উচ্চস্থান	Non-conductor	অসঞ্চারক
Conductor	তাপসঞ্চারক	Insulated	অলগ্ন
Metal	ধাতু	Electric machine	বিদ্যুতের কল
Equator	রেখাভূমি	Leyden-jar	লেইডেন পাত্র
Pole	কেন্দ্র	Spark	স্ফুলিঙ্গ
Lens	মৃদঙ্গাকৃতি বস্তু	Ruantity	যতিত্বা
Specific heat	স্বাভাবিক তাপক	Intensity or Tension	তেজ
Heat capacity	তাপকধারণ শক্তি	Dispersion	ভিন্নীকরণ
Latent heat	অব্যক্ত তাপক	Amber	কহরুবা
Sensible heat	ব্যক্ত তাপক	Electrometer	বিদ্যুন্মাপক যন্ত্র
Condensation	ঘনসার সম্পাদন	Voltaic pile	বল্‌তার স্তম্ভ
Pump	বোমা	Steam engine	বাষ্পীয় কল

Boiler	হাঁড়ি
Cylinder	চুঙ্গি
Beam	আড়া
Furnace	অগ্নিকুণ্ড
Safety valve	রক্ষক কপাট
Tank	কুণ্ড
Piston	পালিস
Condenser	জমায়ন পাত্র
Handle	হাতোল
Lever	তরাজু
Fulcrum	আল
Fly wheel	মহাচক্র
Electro-negative substance	বিদ্যুৎসম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু
Electro-positive substance	বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু
Organic	সেন্দ্রিয়
Strong acid	শক্ত অম্ল
Dilute acid	দুর্ব্বল অম্ল
Ash	ভস্ম
Volatile	উড্ডীয়মান
Neutralise	পরিতৃপ্তকরা
Bleaching	শুক্লকরণ
Oxygen	অক্সিজান
Chlorine	খ্লোরিণ
„ protoxide of	খ্লোরিণের প্রথমাক্সিদ
„ peroxide of	পরমাক্সিদ
Chloric acid	খ্লোরিকাম্ল
Perchloric acid	প্রেখ্লোরিকাম্ল
Bromine	ব্রোমিণ
Iodine	ঐয়োদিন
Iodious acid	ঐয়োদাম্ল
Iodious acid	ঐয়োদিকাম্ল
Chloriodic acid	খ্লোরিয়োদিকাম্ল
Fluorine	ফলুওরিণ
Hydrogen	হৈদ্রজান
„ Deutoxide	দ্বিতীয়াক্সিদ
Muriatic acid	সামুদ্রিকাম্ল
Hydrobromic acid	হৈদ্রব্রোমিকাম্ল
Hydroiodic acid	হৈদ্রিয়োদিকাম্ল
Fluoric acid	ফলুওরিকাম্ল
Nitrogen	নৈত্রজান
Nitrous oxide	নৈত্র্যাক্সিদ
Nitric oxide	নৈত্রিকাক্সিদ
Nitrous acid	নৈত্রাম্ল
Nitric acid	নৈত্রিকাম্ল
Chloride	খ্লোরিদ
Iodide	ঐয়োদিদ
Ammonia	আম্মোনিয়া
Muriate	সামুদ্রায়িত
Nitrate	নৈত্রায়িত
Sulphur	গন্ধক
Periodide	প্রৈয়োদিদ
Perchloride	প্রখ্লোরিদ
Hyposulphurus acid	উপগান্ধকাম্ল
Sulphurous acid	গান্ধকাম্ল
Sulphoric acid	গান্ধকিকাম্ল
Hyposulphuric acid	উপগান্ধকিকাম্ল
Sulphate	গান্ধকায়িত
Sulphuretted hydrogen	হৈদ্রজানের গন্ধকুরেত
Phosphorus	ফোস্ফোরস
Hypophosphorous acid	উপফোস্ফোরাম্ল
Phosphorous acid	ফোস্ফোরাম্ল

Phosphoric acid	ফোস্ফোরিকাম্ল	Cyanic acid	কিয়ানিকাম্ল
Phosphuretted hydrogen	হৈদ্রজানের ফোস্ফুরেত	Chloro-cyanic acid	খ্লোরোকিয়ানিকাম্ল
Subphosphuretted-hydrogen	হৈদ্রজানের উপফোস্ফুরেত	Hydro-cyanic acid	হৈদ্রকিয়ানিকাম্ল
Carbon	অঙ্গার	Sulphos-cyanic acid	গান্ধকিয়ানিকাম্ল
Carbonic oxide	আঙ্গারিক অক্সিদ	Sulphuret of carbon	অঙ্গারের গন্ধকুরেত
Chloro-carbonic acid	খ্লোরাঙ্গারাম্ল	Boron	বোরণ
Phosgene gas	ফোশজান আকাশ	Boracic acid	বোরাকিকাম্ল
Carbonic acid	আঙ্গারিকাম্ল	Fluoboric acid	ফলুও বোরিকাম্ল
Carburetted hydrogen	হৈদ্রজানের অঙ্গুরেত	Selenium	সেলেনিয়ম
Bicarburetted hydrogen	হৈদ্রজানের দ্বিটঙ্গুরেত	Potassium	পটাষিয়ম
Coal gas	কয়লার আকাশ	Sodium	সোদিয়ম
		Antimony	রসাঞ্জন
		Alcohol	মদসার
		Ether	ইতর

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপসর্গের অর্থ-বিচার অবলম্বন করিয়া পরিষদের দুইটী অধিবেশনে দুইটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী পত্রিকার ৪র্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যা ও দ্বিতীয়টী ৫ম ভাগের ২য় সংখ্যায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দুইটী প্রবন্ধে উপসর্গ সম্বন্ধে অনেক কথা ও প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৎসমস্তই এই সমালোচনার বিষয়। সমালোচনা কার্য্য বড়ই দুরূহ ও অপ্রীতিকর। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবার প্রবন্ধকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক, তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনা একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়ের গুরুতা ও নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অল্পতা স্মরণ করিয়া যথাজ্ঞান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ঃ—

প্রবন্ধকার বলেন যে, তিনি উপসর্গের অর্থনিষ্কাশনের জন্য এক নূতন প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী। উহা প্রবন্ধে ‘সাংসাধিক ও দার্ষ্টান্তিক’ প্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহাদিগকে এই বলিলেই চলিবে যে, ঐ প্রণালীদ্বয়কে যথাক্রমে ইংরাজীতে ‘Deductive ও Inductive’

প্রণালী বলে। আর যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা এই বলিলেই বুঝিবেন যে, প্রথমটী সাধারণতঃ অনুমানপ্রণালী, যেমন—পর্ব্বত বহ্নিমান, কারণ উহাতে ধূম আছে ও দ্বিতীয়টী ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রণালী, যেমন—গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে বহ্নি ও ধূমের একত্রাবস্থান দর্শন করিয়া যে যে স্থানে ধূম আছে, সেই সেই স্থানেই বহ্নি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্তনির্ণয়। নিজে এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এই কথা বলায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা ঐ প্রণালী অনুসরণ করেন নাই, এইরূপ অনুমান একপ্রকার স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হইলেও উহা নিঃসন্দেহ না হইতে পারে; কিন্তু প্রবন্ধকার স্বয়ংই ঐ সন্দেহের ভঞ্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠের দিবস ঐ প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া পরিষদের অধিবেশনে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলাম, তাহার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন (২য় প্রবন্ধের শেষাংশ দেখুন—পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যা ১৩৭ পৃঃ) যে, এদেশীয় পণ্ডিতেরা আগে একটী সিদ্ধান্ত করেন, পরে সিদ্ধান্তিত বিষয়ের উদাহরণগুলিকে যেরূপে হউক সিদ্ধান্তের অনুগত করিতে চেষ্টা করেন; অর্থাৎ প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিচার প্রভৃতি না করিয়া একটা সিদ্ধান্ত অর্থাৎ Theory করিয়া বসেন। পরে Facts অর্থাৎ 'বৃত্তান্ত' গুলিকে (এইটী তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত শব্দ) গড়িয়া পিটিয়া তাহার সহিত মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এই প্রণালীকে তিনি Scholastic প্রণালী নামে অভিহিত করিয়াছেন ও ঐ প্রণালী যে "কঠোর সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে" তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং যদি তাঁহার কথা সত্য হয়, অর্থাৎ যদি এ দেশীয় পণ্ডিতেরা উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশন বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহারা কেবল ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়াছেন ও তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্তগুলি অপসিদ্ধান্ত বলিয়া সকল প্রামাণিক ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের সমালোচনাকালে শাকটায়ন, গার্গ্য, যাস্ক প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীনতম শব্দাচার্য্যের মতের উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্তই বোধ হয়, তিনি ঐ সমালোচনার উত্তরে 'বার মুনির বার Theory'র কোন একটীকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করার অপরাধে আমাকে অপরাধী করিয়াছেন।" ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কেবল এখনকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা নহে, প্রাচীন শাব্দিকেরাও তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শব্দশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল অপসিদ্ধান্ত ও প্রামাণিক ব্যক্তি মাত্রেরই হেয়। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার নিজের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল কত দূর দৃঢ় ও ভারসহ। পাঠকগণ তাঁহার প্রথম প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি করিবেন;—

ঐ প্রবন্ধের প্রথমেই বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়দিগের উপর কটাক্ষ আছে। তাঁহারা কোন উপসর্গ বিশেষের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইলে, সোপসর্গ কোন একটী শব্দ দ্বারা ঐ উপসর্গের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মনে করুন, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল 'প্র' এই উপসর্গের অর্থ কি? তাঁহারা বলিলেন, 'প্রকৃষ্টরূপে', ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল 'বি' এই উপসর্গের অর্থ কি?

উত্তর, বিশেষরূপে, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল 'সম্' এই উপসর্গের অর্থ কি? উত্তর, 'সম্যক্‌রূপে' ইত্যাদি। এইরূপ উত্তর তাঁহার মতে "উত্তরই নহে" কারণ যে 'প্র' 'বি' ও 'সম্' এই সকল উপসর্গের অর্থই জানে না, সে আবার ঐ সকল উপসর্গযুক্ত পদের অর্থ কেমন করিয়া জানিবে? এক একটী করিয়া গ্রহণ করা যাউক। 'প্র' ইহার অর্থ প্রকৃষ্টরূপে, কিন্তু 'প্রকৃষ্টরূপে' কি তাহা জানিতে হইলে 'প্র' ও 'কৃষ্ট' এই দুইটী শব্দের অর্থ জানিতে হইবে, সুতরাং 'প্র'র অর্থই যখন অজ্ঞাত, তখন প্রকৃষ্টরূপে বলিলে উহার অর্থ কিরূপে জানা যাইবে? এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। এই যুক্তিটী আপাততঃ শুনিতে বেশ বোধ হয়। যুক্তির মূল কথা এই যে, "প্রকৃষ্ট" শব্দের অর্থজ্ঞান 'প্র' ও 'কৃষ্ট' এই দুই শব্দের অর্থজ্ঞান সাপেক্ষ এবং এই মূল কথা (Major Premiss) সত্য হইলে প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বলিলে 'প্র'র অর্থ বলা হইল না, ইহাও সত্য হইবে। কিন্তু এক্ষণে কথা এই যে, ঐ মূল যুক্তিটী সত্য কি? প্রকৃষ্ট পদার্থ কি তাহা জানিতে হইলে যে, 'প্র' ও 'কৃষ্ট' এই দুই শব্দের অর্থ জানিতেই হইবে, এ কথাই আমাদের মতে সমীচীন নহে। অনেকে 'প্রকৃষ্ট' পদের প্রকৃতি প্রত্যয় কিছুই জানেননা অথচ প্রকৃষ্ট পদের অর্থ কি তাহা জানেন। 'আহার' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি, তাহা অনেকেই জানেন না, কিন্তু আহার পদার্থ কি তাহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। মূল কথা এই যে, কোন শব্দের অর্থ জানিতে হইলে যে, উহার প্রকৃতি প্রত্যয় ও ঐ সকল প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ জানিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা অসার কথা আর কিছুই নাই। 'গো' শব্দে কি বুঝায় সকলেই তাহা জানেন, কিন্তু উহা যে গম্ ধাতুর উত্তর ডো প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন তাহা কয়জন জানেন? আর যাঁহারাও জানেন তাঁহাদেরও ঐ জ্ঞাননিবন্ধন অর্থ বুঝিতে সাহায্য না হইয়া বরং বিলম্বই হয়; কারণ তাঁহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, 'গো' শব্দে যদি গমনকারী জীব বুঝায় তবে মনুষ্যই বা 'গো' না হইবে কেন? এই জন্যই প্রাচীন শাব্দিকেরা বলিয়াছেন, 'অন্যচ্চ প্রবৃত্তিনিমিত্তং শব্দানাং অন্যচ্চ ব্যুৎপত্তিনিমিত্তং' অর্থাৎ শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক ও ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত এক নহে; অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার সর্ব্বত্র উহার ব্যুৎপত্তির অনুযায় নহে। যাস্কের নিরুক্তে এ বিষয়ের একটী বিস্তৃত বিচার আছে, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে। ফল কথা এই, যদি প্র ও প্রকৃষ্ট, বি ও বিশেষ, সম্ ও সম্যক্ এই ছয়টী শব্দের প্রত্যেক দুইটীর অর্থজ্ঞান পরস্পরের অর্থজ্ঞানসাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রণালীকে দোষ দিতে পারা যাইত; কিন্তু যখন তাহাদের অর্থজ্ঞান পরস্পরের অর্থজ্ঞানের সাপেক্ষ নহে, তখন তাঁহাদের প্রণালীকে দোষ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি নিজে যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয় আরও বিশদ বুঝা যাইবে। 'প্র' কি না 'প্রকৃষ্টরূপে' এইরূপ ব্যাখ্যায় দোষ দিবার সময় তিনি ইহার অনুরূপ বিবেচনা করিয়া একটী উদাহরণ দিয়াছেন, সেই উদাহরণটী এই,—'ঘোড়া কি?' না 'ঘোড়ার গাড়ি'। 'ঘোড়ার গাড়ি' কি? না 'ঘোড়া পূর্ব্বক গাড়ি' ইত্যাদি। এখানে দেখুন, ঘোড়ার গাড়ি দুইটী শব্দ, ঐ দুইটী শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুর জ্ঞান করিতে হইলে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে 'ঘোড়া', 'গাড়ি'ও ষষ্ঠী

বিভক্তির চিহ্ন 'র' ইহাদের অর্থের জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা অর্থজ্ঞানের উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এ স্থলে 'ঘোড়া' শব্দের প্রতিশব্দে 'ঘোড়ার গাড়ি বলিলে 'ঘোড়া' শব্দের তঃ পরিচয় দেওয়া হইলই না, অধকন্তু আর দুইটী অতিরিক্ত শব্দ বলা হইল। ঐ দুইটী অতিরিক্ত শব্দের জ্ঞান থাকিলেও 'ঘোড়া' শব্দের জ্ঞান হইবে না। 'প্র'র অর্থ 'প্রকৃষ্ট' এ স্থলে কিন্তু 'প্রকৃষ্ট' একটী পদ, ঐ পদের অর্থজ্ঞান, যে দুইটী শব্দ লইয়া ঐ পদটী গঠিত, তাহাদের অর্থের জ্ঞানের সাপেক্ষ নহে; সুতরাং এ স্থলে পৃথক্‌ভাবে 'প্র' ও 'কৃষ্ট' শব্দের জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই; অতএব ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান না হইয়াও অবয়বী 'প্রকৃষ্টের' জ্ঞান হইতে পারে। অতএব দেখা গেল যে, প্র=প্রকৃষ্ট ও ঘোড়া=ঘোড়ার গাড়ি এ দুই কথা এক নহে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলিব, 'প্র'র অর্থ প্রকৃষ্টরূপে এইরূপ সোপসর্গ পদ দ্বারা উপসর্গের অর্থ করিবার প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই প্রণালী ভগবান্ ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও দার্শনিকপ্রবর ভট্টকুমারিল প্রভৃতি কুশাগ্রবুদ্ধি মহাত্মগণ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকার "সমর্থঃ পদবিধিঃ" (পা, সূ ২।১।১) এই পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যায় 'সমর্থ' পদের অন্তর্গত সম্ উপসর্গের অর্থ কি তাহার নির্ণয় স্থলে সঙ্গতার্থং সমর্থং, সংসৃষ্টার্থং সমর্থং, সংপ্রেক্ষিতার্থং সমর্থং, সম্বদ্ধার্থং সমর্থং এইরূপ সমর্থশব্দের যতগুলি প্রতিশব্দ দিয়াছেন সকল-গুলিই সম্ উপসর্গঘটিত। ভট্টকুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকের ৪র্থ সূত্রের ৩য় শ্লোকে বলিয়াছেন, "সম্যগর্থে চ সম্‌শব্দো দুষ্প্রয়োগনিবারণঃ" অর্থাৎ "সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম" এই প্রত্যক্ষ লক্ষণে 'সম্প্রয়োগ' শব্দের অন্তর্গত 'সম্' শব্দের অর্থ 'সম্যক্', সুতরাং 'সম্প্রয়োগ' শব্দের অর্থ 'সম্যক্ প্রয়োগ' ও ঐ শব্দটী ইন্দ্রিয়গণের দুষ্প্রয়োগ নিবারণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন। যদি ঐরূপ পরিচয় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্ট হইত তাহা হইলে তাঁহাদিগের ন্যায় মনীষিগণ উহার আদর করিতেন কি?

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রবন্ধকারের প্রণালী বস্তুতঃই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি না এবং ঐ প্রণালীতে উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশনে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সমালোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উপসর্গসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। 'উপসর্গ' এই শব্দটী উপপূর্ব্বক সৃজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। উহার ব্যুৎপত্তি হইতে নিম্নলিখিত অর্থ পাওয়া যায়ঃ—যাহারা ধাতুকে অবলম্বন করিয়া ঐ ধাতুরই নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি করে, তাহারা উপসর্গঃ—"আখ্যাতমুপগৃহ্যাঽর্থবিশেষমিমে তস্যৈব সৃজন্তীত্যুপসর্গ"ঃ—দুর্গাচার্য্য। আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্য্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই উপসর্গের ধাতুভেদে, প্রয়োগভেদে, নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ঐ সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (Generalise) করিয়া, তাঁহারা এক একটী উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধ-কারের ন্যায় এক একটী উপসর্গের সর্ব্বস্থলেই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে উপসর্গগণ সাধারণতঃ ধাতুর অর্থের অনুবর্ত্তন, বাধ ও বিশেষ করিয়া থাকে। অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উপসর্গযোগনিবন্ধন ধাত্বর্থের কোন বিশেষ লক্ষিত হয়

না। যেমন,—হত, নিহত। এস্থলে হন্ ধাতুর যাহা অর্থ, 'নি' উপসর্গবিশিষ্ট হন্ ধাতুরও তাহাই। বাধ করে, অর্থাৎ ধাতুর যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহার ব্যত্যয় করে, যেমন,—দান, আদান। বিশেষাধান করে, অর্থাৎ ধাত্বর্থকে কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করে। যথা কোপ, প্রকোপ ইত্যাদি। কোপ শব্দ কুপ্ ধাতু নিষ্পন্ন, উহার অর্থ ক্রোধ আর প্রপূর্ব্বক কুপ্ ধাতু নিষ্পন্ন প্রকোপ শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপ, অর্থাৎ বিশেষরূপ কোপ। তাঁহাদের মতে 'প্র' এই উপসর্গটীর অনেকগুলি অর্থ আছে; যেমন গতির আরম্ভ, উৎকর্ষ, সর্ব্বতোভাব ইত্যাদি। 'নি' এই উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, আধিক্য, নিষেধ ইত্যাদি। এক্ষণে প্রবন্ধলেখক মহাশয় কি বলিয়াছেন তাহার বিচার করা যাউক। তাঁহার মতে 'প্র' উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে ও 'নি' উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে, ইংরাজিতে বলিতে গেলে 'প্র'র অর্থ 'Forth' এবং 'নি'র অর্থ 'In'। 'লক্ষ্য সম্মুখের দিকে ও লক্ষ্য ভিতরের দিকে' বলিলে যে উপরি উক্ত উপসর্গদ্বয়ের অর্থ একরূপ বলা হয় না এ কথা বোধ হয় প্রবন্ধকারস্বয়ংই উপলব্ধি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অনেক বিচার আচারের পর 'প্র'*র অর্থ, সম্মুখ-প্রবণতা ও 'নি'র অর্থ অন্তর্নিষ্ঠতা স্থির করিয়াছেন (পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠা)। আমরাও ঐ দুইটী অর্থই গ্রহণ করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'সম্মুখপ্রবণতা' এই কথাটীর অর্থ কি ? 'প্রবণতা' শব্দের অনেকগুলি অর্থ আছে, এ স্থলে সেই অর্থগুলির মধ্যে কোন্‌টী গ্রাহ্য ? যখন প্রবন্ধকার স্বয়ং কোন্ অর্থ লইতে হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই, তখন যে অর্থটী সচরাচর গৃহীত হয়, তাহাই বোধ হয় গ্রহণীয়। 'সম্মুখ' শব্দে দিগ্বিশেষের বোধ হয়, সুতরাং 'প্রবণতা' এ স্থলে 'দৈশিকপ্রবণতা, অর্থাৎ সম্মুখপ্রবণতা শব্দে দিগ্বিশেষের প্রতি প্রবণতা' বুঝিতে হইবে। 'প্রবণতা' শব্দে সাধারণতঃ 'স্বাভাবিক গতি বা অনুকূলতা' বুঝায়, 'যেমন—জল নিম্নপ্রবণ বলিলে নিম্নের দিকে গতি জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা গুণ এইরূপ বুঝায়। কাচ ভঙ্গ-প্রবণ বলিলে কাচ স্বভাবতঃ ভঙ্গের অনুকূল অর্থাৎ কাচে এমন একটী বিশেষ গুণ আছে, যাহাতে উহা সামান্য কারণেই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ অর্থ বুঝায়। প্রবন্ধকার যখন দৈশিক প্রবণতা অর্থ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বাভাবিক অনুকূলতারূপ প্রবণতার দ্বিতীয় অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, উপরি উক্ত অর্থ দুইটী প্রবন্ধকার মহাশয়ের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কিরূপ সঙ্গত হয়। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি তাঁহার প্রদত্ত অর্থের পোষক। যথা—

প্রশ্বাস	নিশ্বাস
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
প্রবাস	নিবাস
প্রবেশ	নিবেশ

* 'সম্মুখ-প্রবণতা' এই পদটী 'প্র' উপসর্গঘটিত, সুতরাং ঐ পদ দ্বারা 'প্র' উপসর্গের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধকার শিক্ষকমহাশয়দিগের দলে পড়িলেন না কি? সমালোচনাপ্রবন্ধপাঠের দিবস মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধকারের এই স্বোক্তিবিরোধ প্রদর্শন করেন।

প্রক্ষেপ নিক্ষেপ
প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট ইত্যাদি।

তাঁহার মতে 'প্রশ্বাস' শব্দের অর্থ "Breathing forth" ও 'নিশ্বাসের' অর্থ 'Inhaling', 'অর্থাৎ প্রশ্বাসের অর্থ ভিতরের বায়ু বাহিরে ফেলা ও নিশ্বাসের অর্থ বাহিরের বায়ু গ্রহণ করা। 'প্র' ও 'নি'র মধ্যে অর্থগত বিরোধ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই দুই দুইটী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। প্রথম শব্দ দুইটী গ্রহণ করা যাউক ঃ—প্রশ্বাস ও নিশ্বাস।—'প্রশ্বাস' শব্দের অর্থ 'শ্বাসত্যাগ' বটে কিন্তু 'নিশ্বাস' শব্দের অর্থ 'শ্বাস গ্রহণ' নহে। উহাও প্রশ্বাসের সমার্থক অর্থাৎ উহারও অর্থ ভিতরের বায়ু বাহিরে ফেলা। এবিষয়ে প্রমাণ ঃ—বাচস্পত্যে ৪১১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সুবিখ্যাত কোষকার হেমচন্দ্রের মতে 'নিশ্বাস' শব্দে প্রাণবায়ুর বহির্গমন রূপ ব্যাপার বুঝায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এই অর্থেই 'নিশ্বাস' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ—'ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ' অর্থাৎ যেন দুঃখের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মেঘদূত—'নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা' অর্থাৎ অধরকিশলয়ের ক্লেশদায়ী নিশ্বাস। দুঃখ ও শোকজ নিশ্বাস উষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই জন্যই উহা অধরকিশলয়ের ক্লেশদায়ী। এস্থলে নিশ্বাস শব্দে বাহ্য বায়ুর গ্রহণ হইলে 'অধরকিশলয়ের ক্লেশী' এই বিশেষণটী সংলগ্ন হয় না। মাধবনিদান, রক্তপিত্তাধিকার—২য় শ্লোক ;—'লৌহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি' অর্থাৎ এই রোগ হইবার উপক্রমে নিশ্বাস লৌহগন্ধি হয় বা নিশ্বাসে লৌহের গন্ধের ন্যায় গন্ধ অনুভূত হয় ; এস্থলে নিশ্বাস শব্দে বাহ্য বায়ুর গ্রহণ হইতে পারে না। 'নিশ্বাস' এই শব্দটী কোন কোন স্থলে 'নিঃশ্বাস' এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত হয়, কিন্তু উভয় শব্দেরই অর্থ এক। আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থে প্রাণবায়ুর ত্যাগ ও বাহ্যবায়ুর গ্রহণ এই বিরোধ প্রদর্শন স্থলে 'শ্বাস প্রশ্বাস, উচ্ছাস প্রশ্বাস' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের কথায় শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্বাসের অর্থ বাহ্যবায়ু গ্রহণ ও প্রশ্বাসের অর্থ অন্তর্বায়ুর নিঃসারণ। তবে সাধারণ বাঙ্গালায় যে স্থলে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে কোন ভেদ দেখাইবার প্রয়োজন না হয়, সে স্থলে শ্বাস, নিশ্বাস এই উভয় শব্দই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শ্বাস গ্রহণ, শ্বাস ত্যাগ, নিশ্বাস গ্রহণ, নিশ্বাস ত্যাগ। তবে 'নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই,' 'নিশ্বাস আর পড়ে না' এইরূপ প্রকৃত অর্থে নিশ্বাস শব্দের প্রয়োগও বহুস্থলে লক্ষিত হয়। সুতরাং সাধারণপরিগৃহীত অর্থ লইলে চলিবে না। প্রামাণিক প্রয়োগ আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, 'নিশ্বাস' শব্দের অর্থ 'শ্বাসত্যাগ'। সুতরাং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুই শব্দই একার্থ। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ এই দুই ভিন্ন অর্থ বুঝাইতে হইলে 'শ্বাস প্রশ্বাস' বা 'উচ্ছ্বাস প্রশ্বাস' এইরূপ প্রয়োগই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। সুতরাং 'নি'র অর্থ এস্থলে অন্তর্নিষ্ঠতা না হইয়া বরং বহির্নিষ্ঠাই হইল ও 'প্র' ও 'নি'র অর্থগত বিরোধও প্রতিপন্ন হইল না। আর যখন প্রবন্ধকারের মতে 'প্র'র অর্থ সম্মুখপ্রবণতা ও 'নি'র অর্থ অন্তর্নিষ্ঠতা তখন উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে, এ কথাইবা কিরূপে সংলগ্ন হয়?

কারণ একই বস্তু একই কালে সম্মুখপ্রবণ ও অন্তর্নিষ্ঠ উভয়ই হইতে পারে। প্রাণায়ামের কুম্ভক প্রক্রিয়াস্থলে একই শ্বাস অন্তর্নিষ্ঠও বটে এবং সম্মুখপ্রবণও বটে। তবে যদি প্রবন্ধকার 'প্র'র অর্থ বহির্নিষ্ঠতা ও'নি'র অর্থ অন্তর্নিষ্ঠতা বলিতেন, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ বিরোধ থাকিতে পারিত, সে বিরোধও দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত বিরোধ নহে। দার্শনিকেরা যাহাকে বিরোধ বলেন, তাহাতে ভাব ও অভাব এই দুইটী কোটি থাকে, যেমনঅন্তর্নিষ্ঠতা, অনন্তর্নিষ্ঠতা, সম্মুখপ্রবণতা, অসম্মুখপ্রবণতা। এরূপ স্থলেই দার্শনিকেরা বিরোধ স্বীকার করেন।

'প্রশ্বাস' শব্দের এক্ষণে পরীক্ষা আবশ্যক। উহার অর্থ 'শ্বাসত্যাগ' বা 'ত্যক্ত শ্বাস' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ঐ অর্থের মধ্যে 'সম্মুখ প্রবণতা' রূপ 'প্র'র অর্থ আছে কিনা তাহাই অনুসন্ধেয়। প্রবন্ধকারের অর্থের অনুসরণ করিলে 'প্রশ্বাস' শব্দে 'সম্মুখপ্রবণতাবিশিষ্ট শ্বাস' অর্থাৎ 'সম্মুখপ্রবণ-শ্বাস' বুঝাইবে। সম্মুখপ্রবণ-শ্বাসের অর্থ বোধ হয় এইরূপ, যে শ্বাসের গতি স্বভাবতঃ সম্মুখের দিকে অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ সম্মুখের দিক্ দিয়া প্রবাহিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এ কোন্ শ্বাস? যে শ্বাস আমরা শ্বাসযন্ত্র হইতে বাহিরে ত্যাগ করি? না যে শ্বাস আমরা নাসারন্ধ্রাদি দ্বারা শ্বাসযন্ত্রে গ্রহণ করি? কারণ আমরা ত দেখিতেছি যে, উভয়বিধ শ্বাসেরই স্বাভাবিক গতি বা প্রবণতা সম্মুখের দিকে; কারণ সম্মুখেতর কোন দিক্ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণাদির কথাত এপর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। এস্থলে হয়ত প্রবন্ধকার বলিবেন, আমি ত বলিয়াছি 'প্র'র ইংরাজি অর্থ Forth এবং প্রশ্বাস শব্দের অর্থ breathing forth, তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ "Forth" শব্দের নানা অর্থ, ঐরূপ নানার্থ শব্দ দ্বারা শব্দান্তরের অর্থের পরিচয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত নহে। দ্বিতীয়তঃ 'প্রশ্বাস' এই শব্দ-স্থলে 'প্র' অর্থ 'Forth' বলিলে একরূপ অর্থ সঙ্গতি হইলেও, প্রকৃত, প্রহৃত, প্রলীন, প্ররূঢ় প্রভৃতি শত শত স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ তিনি স্বয়ংই যখন অনুগম (generalisation) করিয়া 'প্র'র অর্থ সম্মুখ-প্রবণতা স্থির করিয়াছেন, তখন সেই অর্থের সর্ব্বত্র সঙ্গতি হইল কিনা তাহাই বিচার্য্য ও তদনুসারে আমরা ঐ অর্থেরই সঙ্গতি আছে কি না, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব দেখা গেল, প্রথম দুইটী উদাহরণের মধ্যে 'নি'র উদাহরণটী প্রবন্ধকার মহাশয়ের প্রতিকূল ও 'প্র'র উদাহরণটীও অনুকূল নহে। সূক্ষ্ম বিচার পরিত্যাগ করিলেও 'সম্মুখপ্রবণ শ্বাস' বলিলে শ্বাস বা প্রশ্বাস কোনটীরই পরিচয় দেওয়া হয় না।

অতঃপর আমরা প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন শব্দাচার্য্যদিগের মতে 'প্রশ্বাস' এই শব্দস্থ 'প্র' পদের অর্থ কি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। "প্রাদয়ো গত্যাদ্যর্থে প্রথময়া" এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে 'প্রশ্বাস' এই শব্দের অন্তর্গত 'প্র' উপসর্গের অর্থ 'প্রগত', অর্থাৎ প্রশ্বাস কিনা প্রগত শ্বাস। এস্থলে 'প্রগত' এই পদের অর্থ কি তাহা অনুসন্ধেয়। যাস্ক বলেন, "আ ইত্যর্বাগর্থে প্র পরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যে" [যাস্ক প্রথমাধ্যায় প্রথম পাদের শেষ]। টীকাকার দুর্গাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, 'প্রপরা ইত্যেতাবুপসর্গৌ এতস্য আঙোঽর্থস্য প্রতিলোম্য মাহতুঃ প্রগতঃ পরাগতঃ" অর্থাৎ আ' এই উপসর্গের অর্থ নৈকট্য, 'প্র ও পরা' এই দুই উপসর্গে ঐ অর্থের

বিপরীত 'দূরত্ব' রূপ অর্থ প্রকাশ করে। যাস্কের মতে অনেক স্থলে 'আ' এই উপসর্গের সহিত 'প্র' ও 'পরা' এই দুই উপসর্গের অর্থগত প্রাতিলোম্য অর্থাৎ প্রতিকূলতা লক্ষিত হয়। যেমন আগত শব্দে যে কাছে আসিয়াছে তাহাকে বুঝায় ও প্রগত বা পরাগত বলিলে যে নিকট হইতে দূরে গিয়াছে তাহাকে বুঝায়, যেমন প্রপর্ণ (প্রপতিত পর্ণ)—অর্থাৎ যে পত্র পড়িয়া গিয়াছে, বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়াছে। প্রবাস অর্থাৎ 'দূরে বাস', সম্মুখপ্রবণ বাস বা যে বাসের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে এরূপ বাস নহে। প্রপাত অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান হইতে দূরে পাত, যেমন জলপ্রপাত, সম্মুখপ্রবণ পতন নহে। প্রণায়ক অর্থাৎ যে নায়ক চলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ব্বে ছিলেন সে স্থান হইতে দূরে গিয়াছেন। (৫।৪।৫৯ পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় কাশিকাকার 'প্রনায়কো দেশঃ' এই প্রয়োগের 'প্রগতো নায়কোঽস্মাৎ দেশাৎ' অর্থাৎ যে দেশ হইতে নায়ক চলিয়া গিয়াছেন এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। উদাহরণটীতে 'আ'র প্রাতিলোম্য রূপ 'প্র'র অথ পরিস্ফুট বলিয়া উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রস্থান—দূরে যাওয়া, প্রচার—দূরে চরণ বা ব্যাপন, প্রয়াণ=দূরে গমন, প্রেত=দূর গত, অর্থাৎ এই জগৎ হইতে বহু দূরে গিয়াছে, আর ফিরিবেনা অর্থাৎ মৃত। ইত্যাদি নানাস্থলে 'প্র'র এই 'দূরত্ব রূপ অর্থ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তদনুসারে 'প্রশ্বাস' অর্থ 'প্রগত শ্বাস' অর্থাৎ 'যে শ্বাস দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে' অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত শ্বাস' বুঝায়। উপরি উক্ত স্থলসমূহে প্রবন্ধকারের উদ্ভাবিত অর্থ অনুগত করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি যাস্কোক্ত আঙের প্রাতিলোম্যরূপ অর্থই 'প্র'র একমাত্র অর্থ, ঐ অর্থ দ্বারা কি সকল প্রয়োগের সমাধান করা যাইবে? প্রখ্যাত, প্রকাশ, প্রদীপ্ত, প্রতনু, প্রধ্বংস, প্রক্ষালিত প্রভৃতি শত শত স্থলেও কি 'প্র'র অর্থ দূরত্ব হইবে? দুর্গাচার্য্য উত্তর করেন 'না'। "অনেকার্থত্বেঽপি সত্যুপসর্গানাং একৈকোঽর্থঃ উদাহরণত্বেনোচ্যতে অর্থবত্ত্বপ্রকাশনার্থং" অর্থাৎ উপসর্গসমূহের নানা অর্থ থাকিলেও এস্থলে কেবল অর্থপ্রদর্শনাভিপ্রায়ে এক একটী মাত্র অর্থ প্রদর্শিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল 'আঙের' অর্থ নিকট' ও 'প্র ও পরার' অর্থ 'দূর' এরূপ বলিলে সকল প্রয়োগের উপপত্তি হইবেনা। উপপত্তি সম্ভব হইলে প্রাচীনেরা উপসর্গের নানার্থতা স্বীকার করিতেন না। প্রখ্যাত প্রভৃতি উপরি উক্ত স্থল গুলিতে 'প্র'র সম্মুখ-প্রবণতারূপ অর্থ একেবারেই লাগে না। দুই একটী উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। প্রতনু=অত্যন্ত তনু অর্থাৎ ক্ষীণ; প্রবন্ধকারের মতে উহার অর্থ সম্মুখ-প্রবণ তনু। প্রধ্বংস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস; কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে উহার অর্থ সম্মুখ-প্রবণ ধ্বংস। অর্থাৎ তাঁহার মতানুসরণ করিলে, ঐ সকল শব্দের অর্থবোধ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। উপরি উক্ত স্থলগুলিতে "পণ্ডিত মহাশয়দিগের" পরিগৃহীত 'প্রকৃষ্ট রূপ' অর্থই সংলগ্ন হয়। 'প্রখ্যাত' অর্থাৎ 'প্রকৃষ্টরূপ বা ভালরূপ খ্যাত,' প্রক্ষালিত' অর্থাৎ 'ভাল করিয়া ক্ষালিত'। ফল কথা রূঢ় প্রয়োগ ব্যতীত অন্য সকল স্থলেই 'প্র'র 'প্রকৃষ্ট' রূপ অর্থ অনায়াসেই সংলগ্ন হয়, ইহা সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন।

প্রবন্ধকারের উদাহৃত আর দুই একটী স্থল পরীক্ষা করিলেই তাঁহার মতের অযুক্তিসহতা আরও বিশদ হইবে। দ্বিতীয় উদাহরণটী গ্রহণ করা যাউক, 'প্রবৃত্তি' 'নিবৃত্তি'। প্রবন্ধকারের মতে 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ 'সম্মুখের দিকে ঝোঁক' অর্থাৎ সম্মুখ-প্রবণতা, কারণ তাঁহার মতে 'প্র'র ঐরূপ অর্থ। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে হইলে 'ঘোড়ার গাড়ির' অর্থ 'ঘোড়া' বলা যাইতে পারে'। কারণ দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মত অনুসরণ করিলে 'প্রবৃত্তি' শব্দের অন্তর্গত 'বৃত্তি' শব্দটী নিরর্থক হইয়া উঠে। 'নিবৃত্তি' শব্দের অর্থ তাঁহার মতে 'ভিতরের দিকে বৃত্তি টানিয়া লওয়া'। কিন্তু তিনি 'নি'র যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে অন্তর্নিষ্ঠা বৃত্তি অর্থাৎ যে বৃত্তি ভিতরে আছে এইরূপ হওয়া উচিত। যে বৃত্তি ভিতরে আছে ও বৃত্তিকে ভিতরে লইয়া যাওয়া এই দুইটী কথার অর্থগত ভেদ স্পষ্ট। মনে করুন আমি বলিলাম 'আমি মাংস-ভোজনে নিবৃত্ত হইয়াছি' তাহার অর্থ প্রথম কল্পে আমি মাংসভোজন-বিষয়িনী বৃত্তি বা চেষ্টা ভিতরে লইয়া গিয়াছি ও দ্বিতীয় কল্পে ঐ বৃত্তি আমার ভিতরে আছে। প্রথম কল্পে এককালে ঐ বৃত্তি বাহিরে ছিল অর্থাৎ পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু আমি এক্ষণে উহা ভিতরে লইয়া গিয়াছি অর্থাৎ দমন করিয়াছি এইরূপ বুঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় কল্পে উহা সর্ব্বদাই আমার ভিতরে আছে, তবে কোন বিশেষ কারণবশতঃ বাহিরে পরিস্ফুট হয় না এইরূপ বুঝায়। অর্থাৎ দারিদ্র্য, রোগ বা অন্য কারণবশতঃ আমার মাংসভোজনের বৃত্তি প্রকাশ হইতে পারে না। এক্ষণে এই দুই কল্পের কোন্ কল্প আমাদের গ্রাহ্য? সম্ভবতঃ শেষ কল্প, কারণ উহা প্রবন্ধ-কারের অনুগমের (Generalisation) ফল। এক্ষণে প্রবন্ধকার যদি প্রথম কল্প আশ্রয় করেন, তাহা হইলে 'নি'র অর্থ 'অন্তর্নিষ্ঠতা' এই মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, আর যদি দ্বিতীয় কল্প গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বজনস্বীকৃত অর্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই উভয়তঃ পাশারজ্জু (Dilemma) হইতে উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না।

'প্রবৃত্তি' শব্দের প্রধান অর্থ 'চেষ্টা, কার্য্যারম্ভ, কার্য্যে উন্মুখতা' ইত্যাদি। ইহাদের কোন একটী অর্থ গ্রহণ করিলে প্রবন্ধকার একরূপে 'প্র'র অর্থসঙ্গতি করিতে পারিতেন; কারণ ঐ স্থলে যদি 'প্র'র অর্থ 'সম্মুখপ্রবণতা' গ্রহণ করা যায়, ও 'বৃত্তি' শব্দে চেষ্টা অর্থ করা যায়, তাহা হইলে 'প্রবৃত্তি' শব্দে 'সম্মুখপ্রবণ চেষ্টা' এইরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে চেষ্টা বা কায়িক ব্যাপার বাহিরে পরিস্ফুট হইবার নিমিত্ত উন্মুখ, অর্থাৎ কার্য্যে উন্মুখতারূপ অর্থলাভ করা যায়। প্রবন্ধকার কিন্তু এ অর্থে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সিদ্ধান্ত 'প্র'র অর্থ 'সম্মুখপ্রবণতা' সুতরাং যখন দেখিলেন, প্রবৃত্তি শব্দের ঝোঁকরূপ একটা অর্থ আছে, তখন বিবেচনা করিলেন ঐ অর্থই তাঁহার মতের অনুকূল ও ঐ অর্থই লইয়াছেন। কিন্তু উহাতে যে ধাত্বর্থের একেবারেই পরিত্যাগ ঘটিয়া উঠে, তাহা অনুধাবন করেন নাই। আর এক কথা, তিনি যেরূপে অর্থ দেখাইয়াছেন, তাহাতে 'প্র' ও 'নি'র সহিত 'বৃত' ধাতুর যোগ নাই, 'বৃত্তি' শব্দের সহিত যোগ, সুতরাং উহারা উপসর্গপদ বাচ্য হইতে পারে না। যদি বলেন, 'প্রশ্বাস' শব্দের আমরা যে অর্থ দেখাইয়াছি, তাহাতেও ঐ আপত্তি। তাহাতে বক্তব্য এই

যে, সেস্থলে 'প্র'র সহিত 'শ্বস্' ধাতুর যোগ না থাকিলেও 'গম' ধাতুর যোগ আছে। কারণ আমাদের মতে সেস্থলে 'প্র'র অর্থ 'প্রগত" সুতরাং উহার উপসর্গ বলিয়া গণ্য হইবার বাধা নাই।

আমাদের মতে 'প্রবৃত্তি', 'নিবৃত্তি'র উপপত্তি অন্যরূপ। 'বৃত্' ধাতুর অর্থ 'বর্ত্তন' বা 'স্থিতি', কিন্তু 'প্র' পূর্ব্বক বৃত্ ধাতুর অর্থ 'আরম্ভ'। এস্থলে "প্র" আরম্ভার্থক ও উহার যোগে ধাত্বর্থের বাধ হইল, সুতরাং 'প্র পূর্ব্বক বৃত্ ধাতুর' অর্থই আরম্ভ হইল। যদি বলেন যে, একল্পেও ত ধাতুর অর্থ রহিল না; তাহাতে বক্তব্য এই যে, আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থলবিশেষে উপসর্গের যোগে ধাত্বর্থের বাধ হয়। প্রাদিসমাস করিয়াও প্রশ্বাসের ন্যায় প্রবৃত্তির উপপত্তি করা যায়, অর্থাৎ 'প্রবৃত্তি' কিনা 'প্রকৃষ্টা বৃত্তি' অর্থাৎ ভাল করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্ব্বদবস্থা) (State of action) কোন বস্তুর স্থিতির বা সত্বার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃত্তি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে। আর প্রবৃত্তি শব্দের আসক্তি (Inclination বা ঝোঁক) অর্থ স্থলে প্রকৃষ্টাবৃত্তি বলিলেই বেশ উপপত্তি হয়। 'নিবৃত্তি' স্থলেও উক্ত দুই প্রকার ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা যাইতে পারে। অথবা নি-নিতরাং বর্ত্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণভাবে চেষ্টাদি শূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টা বিরাম এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিবৃত্তিস্থলে বেশ সংলগ্ন হয়। 'নি' ইহার 'নিতরাং' রূপ অর্থ আমার স্বকপোলকল্পিত নহে; নিরুক্ত ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য নিবিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে নি-নিতরাং এইরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নিবিৎ' শব্দের অর্থ 'বাক্ বা কথা'। উহার ব্যুৎপত্তি দুর্গাচার্য্যের মতে 'নিতরাং বেদয়তি' অর্থাৎ 'যাহা ভাল রূপে—সম্পূর্ণ রূপে মনের ভাব বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম নিবিৎ বাক্ বা কথা'। স্থলান্তরে 'নি'র নিশ্চয়ার্থতাও আছে, যেমন—নিগম। 'নিগম' শব্দের অর্থ 'নিঘণ্টু' অর্থাৎ বৈদিক শব্দের কোষ। দুর্গাচার্য্যের মতে ঐ শব্দের অর্থ এইরূপ :—"নিগমা ইমে ভবন্তি, নিশ্চয়েনাধিকং বা নিগূঢ়ার্থা এতে পরিজ্ঞাতা সন্তঃ মন্ত্রার্থান্ গময়ন্তি ততো নিগমসংজ্ঞা নিঘণ্টবো ভবন্তি।" অর্থাৎ যাহারা নিশ্চয়রূপে মন্ত্রার্থের অর্থ বুঝাইয়া দেয়। এই সকল স্থলে প্রবন্ধকারের অভিপ্রেত 'অন্তর্নিষ্ঠতা' বা 'অন্তঃ' রূপ অর্থ সংলগ্ন করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা। যদি বলেন, 'নিবাস' শব্দে 'নি'র অন্তর্নিষ্ঠতারূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঐ স্থলে 'নি'র কোন বিশেষ অর্থই দেখা যায় না। বাস বলিলেও যাহা বুঝায়, নিবাস বলিলেও তাহাই বুঝায়। অন্তর্নিষ্ঠ বা ভিতরে বাস বুঝায় না, আর অন্তর্নিষ্ঠ বাসের কোন অর্থই নাই। নিবেশ স্থলেও ঐ কথা। বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। প্রবেশ করা বলিলে কোন বস্তু বা পদার্থ বিশেষের ভিতরে গমন বুঝায়। সুতরাং তিনি পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন, এস্থলে বিশ্ ধাতুর অর্থ দ্বারা নিবেশের অর্থ বেশ সঙ্গত হয়, 'নি'র কোন অর্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই নিমিত্ত নি শূন্য কেবল বিশ্ ধাতুর প্রবেশ অর্থে ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ :—'বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্'—কুমারসম্ভব; 'উপদা বিবিশুঃ শশ্বৎ নোৎসেকা কোশলেশ্বরম্'—রঘুবংশ। এইরূপ নিখাত, নিগূঢ় ইত্যাদি স্থলেও ধাত্বর্থদ্বারাই

অর্থ উপপন্ন হয় ও 'নি'র অর্থান্তর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। বরং প্রয়োজন হইলে 'নিতরাং খাত', 'নিতরাং গূঢ়' এইরূপ 'নিতরাং' অর্থেই 'নি'র প্রয়োগ বলা অধিকতর সঙ্গত।

প্রবন্ধকার কিন্তু উপসর্গ ব্যাখ্যা করিবার সময় ধাতুর অর্থের দিকে একেবারেই দৃষ্টি করেন নাই ও এই নিমিত্ত সময়ে সময়ে বড়ই গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। (প্রথম প্রবন্ধের ২৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। 'প্রগাঢ়' শব্দের স্থল বিশেষে ইংরাজি প্রতিশব্দ Intense হয়, কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে 'নি'র অর্থ In সুতরাং 'প্র'র অর্থও In এই ইংরাজি শব্দ দ্বারা অনূদিত হইলে তাঁহার নিজের মতের অসামঞ্জস্য হয়; এই নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "একদিক্ দিয়া দেখিলে যাহা 'প্র', অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে তাহা 'নি' এইরূপ দিক্ পরিবর্ত্তনের গতিকে অনেকগুলি প্র-পূর্ব্বক দেশীয় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ In পূর্ব্বক ('নি'-পূর্ব্বক) হইয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষী প্রভাব = Influence, প্রগাঢ় = Intense." এস্থলে দিক্ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিয়া নিজের মত পরিবর্ত্তন করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। প্রগাঢ় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দে in কোথা হইতে আসিল, আমরা তাহার উপপত্তি করিব। প্রগাঢ় শব্দটী প্র-পূর্ব্বক গাহ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় নিষ্পন্ন। গাহ্ ধাতুর অর্থ ভিতরে প্রবেশ, জলে প্রবেশ—ডুব দেওয়া ও 'প্র' উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে, সুতরাং প্রগাঢ় শব্দের অর্থ দাঁড়াইল ভালরূপে ভিতরে প্রবিষ্ট। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রগাঢ় বিদ্যা ইত্যাদি সকল স্থলেই এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অর্থের উপপত্তি করা যাইতে পারে। এক্ষণে বুঝা গেল যে, গাহ্ ধাতুর অর্থ হইতেই প্রগাঢ় শব্দের প্রতি শব্দে in আসিয়াছে, 'প্র'র অর্থ হইতে আসে নাই। 'প্রভাব', এস্থলেও 'প্র'র অর্থের বেশ উপপত্তি করা যায়, প্রকৃষ্টোভাবঃ প্রভাবঃ। ভাব শব্দের অনেক অর্থ আছে, তাহার মধ্যে পদ, সামর্থ্য, শক্তি প্রভৃতি অর্থও লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রকৃষ্ট পদ, সামর্থ্য বা শক্তি বলিলেই প্রভাব শব্দের অর্থের বেশ উপপত্তি হয়, দিক্ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় না।

অতঃপর প্রবন্ধকারের উদাহৃত 'নিদান' শব্দের অর্থ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'নিদান' শব্দের অর্থ কি? তাহা প্রবন্ধকার বলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে, ঐ শব্দে 'নি'র অর্থ স্পষ্ট নহে ও 'নিদান' ভিতরের সামগ্রী। ইহাতেও হয়ত অনেকে বুঝিবেন না, (না বুঝিবারই কথা) এইজন্য প্রবন্ধকার ঐ শব্দের অর্থজ্ঞানের এক সঙ্কেত করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই:—'অমুক' Consisting in 'এই সামগ্রী' বলিলে বুঝায় যে, সেটী তাহার নিদান, তাহার সাক্ষী, "Humanity consists in rationality" বলিলে বুঝায় যে প্রজ্ঞা Rationalityর (মনুষ্যত্বের) নিদান (৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠা।) এস্থলে নিদান শব্দ নিতান্ত দুষ্প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। ঐ শব্দের অর্থ আদিকারণ, কারণ, হেতু, লিঙ্গ, ইত্যাদি, উহা স্থলবিশেষে ভিতরের সামগ্রীও হইতে পারে ও স্থলবিশেষে বাহিরের সামগ্রীও হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সাধারণতঃ উহা রোগের কারণ ও লক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সকল রোগেই নিদান পরিবর্জ্জন আবশ্যক অর্থাৎ যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই কারণ পরিহার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাঁহার উক্ত সঙ্কেত পর্য্যালোচনা করা যাউক।—উপরি উক্ত ইংরাজি বাক্যটীর প্রকৃত অর্থ,—'প্রজ্ঞা

লইয়াই মনুষ্যত্ব' বা 'প্রজ্ঞাই মনুষ্যত্ব'—সুতরাং সে স্থলে প্রজ্ঞা মনুষ্যত্বের নিদান বলিলে 'নিদান' শব্দটীর যথার্থ ব্যবহার করা হয় না। মনে করুন আমি বলিলাম 'The Vow of একাদশী Consists in abstaining from food on a certain day.' অর্থাৎ দিন বিশেষে উপবাস করাই একাদশীব্রত। এস্থলে কিন্তু প্রবন্ধকারের মতে 'দিন বিশেষে উপবাস করাই একাদশীর নিদান'! এইরূপ বলিতে হইবে। মনে করুন আমি বলিলাম অতিরিক্ত জলপান করা অজীর্ণ রোগের নিদান বা হেতু। এস্থলে প্রবন্ধকার বলিবেন 'Dyspepsia consists in drinking a large quantity of water.'! নিদান শব্দের অর্থ কি তাহা একবার অভিধানে দেখিলেই বোধ হয় ঐরূপ প্রয়োগের অসমীচীনতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আর পূর্ব্বোক্ত অর্থগ্রাহক সঙ্কেত স্থাপন করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী স্থলে ঐরূপ consists in বলিলে কিরূপ শুনায়, তাহা পর্য্যালোচনা করা উচিত ছিল। অতএব প্রমাণ হইল যে, প্রবন্ধকারের দ্বিতীয় উদাহরণদ্বয়ের একটীও তাঁহার মতের পোষক নহে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রবন্ধকার বুঝিতে পারিতেন যে প্রখ্যাত, প্রক্ষালিত, প্রধ্বংস, প্রবিরল, প্রতনু, প্রকোপ, প্রমেহ, প্রেত, প্রশংসা, প্রবাদ, প্রচার প্রকম্প, প্রমত্ত প্রভৃতি শত শত স্থলে 'প্র'র সম্মুখপ্রবণতা ও নিগদ, (recitation) নিনাদ, নিবন্ধ, নিগলিত, নিপাত, নিগম, নিবরা প্রভৃতি শত শত স্থলে 'নি'র অন্তর্নিষ্ঠতারূপ অর্থ একেবারেই সঙ্গত হয় না ও তিনি যে অনুগম করিয়াছেন তাহা কয়েকটী মাত্র উদাহরণ পর্য্যালোচনার ফল ও একেবারেই বৈজ্ঞানিক অনুগম নহে। অতঃপর আমরা আর একটী উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিব ;—

পরিষৎপত্রিকা ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার প্রতি শ্রোতৃমহাশয়গণ দৃষ্টিপাত করিবেন,—ঐ স্থলে প্রক্ষেপ ও নিক্ষেপ শব্দের অর্থগত ভেদ প্রদর্শন করিবার সময় প্রবন্ধকার মহাশয় বলিয়াছেন, নিক্ষেপ অর্থাৎ to throw in অর্থাৎ ভিতরে ফেলা। তাঁহার মতে 'নি'র অর্থ in ও ক্ষিপ্ ধাতুর অর্থ to throw বলিয়া সমস্ত শব্দের অর্থ to throw in হইল। কিন্তু 'প্রক্ষেপ' শব্দেও 'ভিতরে ফেলা' রূপ অর্থ বুঝায় যেমন এই শ্লোকগুলি এস্থানে প্রক্ষিপ্ত, 'সুতরাং 'প্র' ও 'নি' একার্থক হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, যে স্থলে নিক্ষিপ্ত পদার্থের সহিত স্বকীয় আধারের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সেই স্থলেই 'নি' হইবে ও যে স্থলে সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই সে স্থলে 'প্র' হইবে। 'গোলা দুর্গে নিক্ষিপ্ত' হইল, এই স্থলে গোলা প্রক্ষিপ্ত না হইয়া নিক্ষিপ্ত হইল, কারণ নিক্ষিপ্ত পদার্থ গোলক স্বকীয় আধার অর্থাৎ দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে, ও দুর্গের সহিত উহার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু 'শ্লোক পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইল' এইরূপ বলিতে হইবে ও এইরূপই উক্ত হয়, কারণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সহিত নিজ আধার অর্থাৎ পুস্তকের কোনরূপ আন্তরিক সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ত আর পুরের পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্য লিখিত হয় নাই। 'প্র' ও 'নি'র এইরূপ অর্থগত ভেদ কেবল ক্ষিপ্ বা তদর্থক ধাতুর সহিত যোগ হইলে হয় বা সকল স্থলেই হয় তাহা প্রবন্ধকার বলিয়া দেন নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র হউক বা না হউক অন্ততঃ ক্ষিপ্ ধাতুর প্রয়োগ স্থলে যে হয় তাহাতে বোধ হয় কোন

সন্দেহ নাই। এক্ষণে দুই একটা ক্ষিপ্ ধাতুর প্রয়োগ গ্রহণ করা যাউক "চোর রাজপুরুষদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল"। এস্থলে নিক্ষেপ হইল, কারণ লোকের চক্ষুতে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই ধূলির জন্ম ও ধূলির সহিত চক্ষুর আন্তরিক সম্বন্ধ আছে! 'রাত্রিতে শর্করাপ্রক্ষেপ করিয়া দধি ভোজন করা উচিত' এস্থলে প্রক্ষেপ হইল, কারণ শর্করা ত দধিতে প্রক্ষিপ্ত হইবার হয় জন্য উৎপন্ন হয় নাই ও শর্করার সহিত দধির ত কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই! "তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনাথ পুত্রকে দূরস্থ আত্মীয়ের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন" এ স্থলে নিক্ষেপ হইল, কারণ দূরস্থ আত্মীয়ের হস্তে সমর্পিত হইবার জন্যই তাঁহার পুত্রের জন্ম ও সেই আত্মীয়ের হস্তের সহিত তাঁহার পুত্রের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। 'দুগ্ধে দধি প্রক্ষেপ করিয়া ছানা প্রস্তুত করে', এস্থলে প্রক্ষেপ হইল কারণ দধি ত আর দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্য উৎপন্ন হয় নাই এবং দুগ্ধের সহিত দধির ত কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই! এক্ষণে শ্রোতৃমহোদয়গণ দেখিলেন, প্রবন্ধকারের অর্থগত ভেদ অনুসরণ করিলে কিরূপ ব্যসনপরম্পরায় পতিত হইতে হয়। তাঁহার নিজের উদাহরণ লইয়াই দেখুন; গোলা নিক্ষেপ হইল, কারণ দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই গোলার জন্ম, বেশ্ কথা, কিন্তু তাহা হইলে শ্লোক নিক্ষিপ্ত কেননা হইবে? কারণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি কেবল পরের পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্যই রচিত হয় নাই কি? কে বলিল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সহিত পুঁথির কোনপ্রকার আন্তরিক সম্বন্ধ নাই—আমরা ত দেখিতে পাই ঐ সম্বন্ধ স্থল বিশেষে এতদূর 'আন্তরিক' যে কোন্‌টী প্রক্ষিপ্ত কোন্‌টী মৌলিক তাহা অনেক সময় নির্ণয় করাই দুরূহ হইয়া উঠে। আর প্রবন্ধকার দার্শনিক হইয়া কি করিয়া ঐরূপ স্থলে 'আন্তরিক সম্বন্ধ' শব্দ প্রয়োগ করিলেন? আন্তরিক সম্বন্ধের অর্থ কি? অর্থবিশ্লেষণের চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে ঐরূপ সম্বন্ধ বিশেষের নির্বচন অসম্ভব। এই ত গেল ভেদের বিচার। এক্ষণে হয়ত প্রবন্ধকার বলিবেন 'নিক্ষেপ', এইস্থলে 'নি'র অর্থ যে in তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তাহাতে বক্তব্য এই যে ঐ অর্থ ক্ষিপ্ ধাতু হইতে আসিতেছে ও আসিতে পারে। উহার জন্য 'নি'র অর্থ স্বীকারের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। দুর্গে গোলা নিক্ষিপ্ত হইল বলিলেও যাহা বুঝায়, ক্ষিপ্ত বলিলেও তাহাই বুঝায়, আর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এই স্থলে কেন নিক্ষিপ্ত হইল না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাদৃশ ব্যবহারের অভাব, অর্থাৎ শ্লোকের সম্বন্ধে 'নিক্ষিপ্ত' শব্দ প্রয়োগের কোনরূপ বাধা বা অসামঞ্জস্য আছে বলিয়াই যে ঐরূপ প্রয়োগ হয় না, তাহা নহে, কেবল অনেকে ঐরূপ স্থলে 'প্রক্ষেপ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ঐরূপ স্থলে প্রক্ষেপ শব্দ ব্যবহারের একটী রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ ঐরূপ স্থলে 'নিক্ষেপ' শব্দের ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিরাগত রীতি ভঙ্গের দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। এই নিমিত্তই শ্লোকের সম্বন্ধে 'প্রক্ষেপ' শব্দই প্রয়োগ হয়। সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার idiom হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধকার যে এক যাত্রায় পৃথক্ ফলের কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ এককার্য্য করিয়াও সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষ বা পদার্থ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা আখ্যা হয়, তাহার উপপত্তি অন্যরূপ। ঐ উপপত্তি প্রদর্শন করিতে হইলে

শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অনেক জটিল কথার অবতারণা করিতে হয়, সময়াভাবে অস্ত সেরূপ অবতারণা করা অসম্ভব। যাস্কের নিরুক্তে এই বিষয়ে এক বিস্তৃত বিচার আছে, উহা এতদূর সমীচীন যে, পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলর সাহেব উহার একটী ইংরাজি অনুবাদ করিয়া স্বকৃত History of Ancient Sanscrit Literature অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে নিবেশ করিয়াছেন।

প্রথম প্রবন্ধের কয়েকটী কথামাত্র সমালোচিত হইল, অবশিষ্ট সমস্তই অনালোচিত রহিল; দ্বিতীয় প্রবন্ধে ত হস্তক্ষেপই হইল না। কিন্তু ঐ প্রবন্ধের একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ প্রবন্ধের ১২৩ পৃষ্ঠায় 'পরামর্শ' শব্দের অন্তর্গত 'পরা' উপসর্গের ব্যাখ্যায় প্রবন্ধকার ভাষাপরিচ্ছেদ নামক ন্যায়গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোকার্দ্ধ বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহার এক অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ ও তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—"নৈয়ায়িক ভাষায় পরামর্শ শব্দের অর্থ ব্যাপ্যস্য পক্ষত্বধর্ম্মধীঃ অর্থাৎ ব্যাপ্য বিষয়ের পক্ষত্বধর্ম্ম অবধারণ। পক্ষত্ব কি না Partyত্ব এখানে পৌরুষেয় ভাব (Personality) বাদ দিয়া Party শব্দের অর্থগ্রহণ করা হউক", ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল শ্লোকার্দ্ধ কি ও তাহার অর্থই বা কি, তাহার এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রবন্ধকারের ন্যায় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি কিরূপে ঐরূপ বিকৃতভাবে শ্লোকার্দ্ধটী উদ্ধৃত করিলেন ও উহার অর্থাদি একেবারেই পর্য্যালোচনা না করিয়া স্বকৃত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এইরূপ গৌতমসূত্র হইতেও স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও উদ্ধৃতাংশের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। সময়ান্তরে ও প্রবন্ধান্তরে তৎসমস্ত আলোচ্য। প্রবন্ধকার উপসর্গের অর্থনিষ্কাসন বিষয়ে যত্ন, পরিশ্রম ও গবেষণার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রাচীন শব্দাচার্য্যদিগের প্রতি অনাস্থাবশতঃ শব্দতত্ত্বের মূল পান নাই ও আলোচ্য বিষয়ের গুরুতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই উপসর্গের অর্থানুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সুতরাং এরূপ স্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। সমালোচকের কর্ত্তব্য বড়ই দুরূহ ও অপ্রীতিকর; কেবল অনুরুদ্ধ হইয়াই এই অপ্রীতিকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সম্মানার্হ প্রবন্ধকারের নিকট অবিনয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা।

(কাল-ক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত)।

নিতান্ত নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন দুর্গম গিরি-গহ্বর, যেমন ভীষণ,—প্রাচীন সমাচার-পত্রিকার ইতিহাসও, তদ্রূপ দুষ্প্রবেশ্য। সংবাদ-পত্রের ইতিবৃত্ত—কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়—আমাদের সমাদরের সামগ্রী। অশেষ আয়াস স্বীকার করিলে—প্রকৃষ্ট প্রয়াস পাইলে—অসাধ্য-সাধনেও, কৃতকার্য্যতা ঘটে। বিশেষ উদ্যমে সবই সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। রীতিমত চেষ্টায় কি না সম্ভবে? ঐ মহাবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, য়ুরোপীয়গণ, ইতিবৃত্ত-উদ্ধারে সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন। আমরাও, প্রয়াস পাইলে, কেনই না সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিব?

এতদ্দেশে যে সমুদায় বঙ্গীয় বার্ত্তাবহের প্রচার হয়, তাহার আদর্শ য়ুরোপে। কিন্তু প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদ্-গণ, একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, "এসিয়া"-মহাদেশেই উহার প্রথম প্রকাশ। সমগ্র "এসিয়ায়" কিন্তু উহার প্রভাব, প্রচারিত হইতে পায় নাই। "চীন"-দেশই, সংবাদ-পত্রের জন্মভূমি। ইটালি ও গ্রেটবৃটন্, উহার পরিপুষ্টি-ক্ষেত্র। যখন মুদ্রাযন্ত্রের গন্ধ-বাষ্পও কেহ পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই, তখনও ইটালির অন্তর্গত ভিনিস-নগরী হইতে অ-মুদ্রিত সমাচার-পত্র প্রকটিত হইত।

অতি প্রাচীন কালে য়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। অতএব সেই পুরাকালে মুদ্রিত সংবাদ-পত্রিকার সত্তা অনুসন্ধান করিয়া, কি ফলোদয় হইবে?

বলিয়াছি—সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রচার, ইটালি হইতেই হইয়াছিল। এতদর্থে সভ্যসমাজ, ইটালির নিকট কৃতজ্ঞ। সংবাদ-পত্রের উৎপত্তি-বিষয়ে ত্রিবিধ মত প্রচলিত। যথা,—

১। সাধারণতঃ বার্ত্তাবহ-সমূহের মূল—"গেজেটা"। "গেজেটার" মূল—"গেজেরা" (Gazara)—অর্থ ম্যাগপাই। উহা বিহঙ্গম-বিশেষ। বুঝি তাহা সকলেরই জ্ঞাত। "ম্যাগ্‌পাই" শব্দের অর্থ গল্পকারক।

২। ল্যাটিন "গজা" (Gaza) হইতে "গেজেট" উৎপন্ন। "গজা" অর্থে সমাচারের ক্ষুদ্রাকার ভাণ্ডার। স্পেনীয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি-নিচয়ের মতে ঐ মতই, সাধু বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। ভিনিস নগরীতে প্রচলিত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মুদ্রাই, সাধারণতঃ প্রতি খণ্ড সংবাদ-পত্রের মূল্য-রূপে নির্দ্ধারিত ছিল বলিয়া, কেহ কেহ, উক্ত অর্থজ্ঞাপক শব্দ হইতে সংবাদ-পত্রের নামকরণ হইয়াছে, এমন অনুমান করেন। অনেকের বিবেচনায় ইহাই সমধিক সঙ্গত।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, লাটিন "গজা" শব্দ হইতে গেজেটের ব্যুৎপত্তি লব্ধ হয়। "গজা" অর্থেসমাচারের অল্পায়তন ভাণ্ডার। কোন কোন ভাষা-তত্ত্ব-বিদের মতে সংবাদ-পত্রের ঐ আখ্যা, সঙ্গত ও সমীচীন।

ভিনিসের সংবাদ-পত্র, ধনবান্দিগের পরিচালিত পদার্থ। প্রজাতন্ত্র-রাজত্বের শাসনাধীন বর্ত্তমান যুগের রাজনীতি-বিশারদ-গণের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ইটালিতে ভিনিসীয় ধরণে সর্ব্ব-প্রথমে উহা প্রকাশিত হয়। সংবাদ-পত্র, তখন রাজ্যের মুখ-পত্র-স্বরূপে প্রতি-মাসে প্রচারিত হইত। ভিনিসীয় নামের অনুকরণে ও ঠিক্ তাহার ধরণে অপরাপর পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশেও, ইহার পর সংবাদ-পত্র-প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ভিনিসীয় সংবাদ-পত্রের কলেবরের কথা এখন কহিব। জর্জ্জ চামারস্, ভিনিসীয় এই রাজকীয় সংবাদ-পত্র-সকলের সমালোচনা-সম্বন্ধে স্ব-সঙ্কলিত "রুডিম্যান্-জীবনীতে" বিস্তারিত লিখিয়াছেন।

সংবাদ-পত্র বলিলে, সচরাচর আমরা যে অর্থ বুঝি, আইনে তদপেক্ষা কিছু অধিক বুঝায়। স্বল্প-সময়-ব্যাপক কালে যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় এবং কিছু অধিক মাত্রায় রাজনীতি-সম্বন্ধে সমাচার, যাহার অবয়বীভূত থাকে, আইনানুসারে তদ্বিধ পত্রকেই সচরাচর সমাচার-পত্র কহে। সাধারণতঃ, কিন্তু বলিতে গেলে, উহার লক্ষণ, সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। রাজ-নিয়মানুসারে ইহার সংজ্ঞা, দ্বিবিধ। যথা,—

(ক) যে সমস্ত প্রকাশ্য-সমাচার, ঘটনা বা সাধারণ বৃত্তান্ত, বৃটিশ্ রাজ্যের সীমা-মধ্যে পত্রে নিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত হয়, সেই সমস্ত প্রকাশ্য-সমাচার, ঘটনা বা বৃত্তান্ত, যে পত্রিকার উপকরণ ও সমষ্টি, সেই পত্রিকা, "সংবাদ-পত্র" নামে অভিহিত।

(খ) যে পত্র, ২৬ (ছাব্বিশ) দিবস মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে, আর বিজ্ঞাপনই যাহার প্রধান অবলম্বন, তাহাকেও 'সংবাদ-পত্র' বলা যায়। (১)

বর্ত্তমান কালের বৃহদাকার পত্রিকা-সকলের সহিত, পূর্ব্বতন পত্রিকার অবস্থা, একবার তুলনা করা যাউক। আদালতের সংবাদ-দাতা অপেক্ষা প্রথমকার সংবাদ-ব্যাপার, কিছু ভাল। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে অতি সামান্য সামান্য সংবাদ-সকল, অসম্বদ্ধ-ভাবে নিবদ্ধ হইত। কোন বিষয়ের প্রয়োজনানুরূপ মতামত থাকিত না। তাহা হইতে স্পষ্ট কোন ভাবার্থের উপলব্ধি করে, সাধ্য কার? রচনার ও সমাচারের অভাবে অলীক অমূলক বিষয়-সকল, পত্রিকায় বিবৃত হইত। এক দিনের এই ঘটনা। পর দিবস হয় তো সেই মিথ্যাব্যাপার, রহিত করিতে হইত।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপে রাজত্ব-রক্ষার্থে বা তাহার শাসন-পক্ষে রাজ-ক্ষমতা, পার্লেমেণ্ট ও সৈন্য-দল—এই শক্তি-ত্রয়ের ন্যায়, সংবাদ-পত্র, রাজনীতি-বিশারদদিগের নিকট চতুর্থ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়।

গ্রেট্-বৃটেনের সংবাদ-পত্র।

যাঁহারা, প্রথমে সংবাদ-পত্র-পরিচালনে ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ-সংক্রান্ত লেখক নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বিত্তবান্ ও বিদ্যাবান্দিগের অধীনে যে সমস্ত কর্ম্মচারী,

---

(১) উপরি-উক্ত আইনটি, কেবল সংবাদ-পত্রের মাশুল-নির্দ্দেশ-কালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

নিযুক্ত থাকিত, তাঁহারা স্ব স্ব প্রভু-বৃন্দের বা অভিভাবক-গণের অনুপস্থিতিতে সমাচার-সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। ইহা প্রথমে কর্ত্তব্যের মধ্যেই বিবেচিত হইত। উহা, পরে যখন ব্যবসায়ে পরিণত হইল, তখনই উহার লিপি-কর্ম্মের জন্য লোকেরা, সময়ে সময়ে চাঁদা আদায় করিতেন। যাঁহার গ্রাহক-সংখ্যা যেরূপ হইত, তাঁহাকে ততগুলি পত্র লিখিতে হইত। এক পত্র লিখিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেন না। এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা উদ্যম-শীল, তাঁহাদিগের কেহ কেহ সংবাদ-ভবন (Intelligence-office) স্থাপিত করিতেন।

প্রাচীন সংবাদপত্রের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠ করিলে, কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

গ্রেট্-বৃটেনের বার্ত্তাবহের তালিকা।

(ক). সার্জন্ ফেনের পাষ্টন্ লেটার্স।

(খ) আর্থার কলিনের সংগৃহীত লেটার্স এণ্ড মেমোরিয়েল্ অব্ ষ্টেট্। (সিড্নি পেপাস)

(গ) নলেজের ষ্টাফোর্ড-লেটার্স এণ্ড ডেস্‌পাচেস্।

(ঘ) ডায়েরি অব্ নার্কিসস্ লট্রেল্। ইত্যাদি।

সমাচার-পত্রিকায় প্রথমে রাজ্যের অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইত।

প্রথম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্য-কালে বার্ত্তাবহ, প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। স্পেন কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-আক্রমণে উহার সূত্রপাত। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ জুলায়ের সংবাদ-সংবলিত মুদ্রিত বার্ত্তা-পত্রিকা, অদ্যাবধি বৃটনের কৌতুকাগারে [বৃটিশ মিউজিয়মে (British Museum)] দৃষ্ট হয়।

এইখানে "এসিয়া" মহাদেশের কথা, পুনশ্চ সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইতেছে।

১। সুলতান আজিম ওয়াসানের সময় ভারতে সংবাদপত্র ছিল।

২। ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র—"ইণ্ডিয়া-গেজেট"। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহা মুদ্রিত হইত। তৎপরেই "হিকিজ্ গেজেট"। ১৭৮০।৩১এ জানুয়ারিতে উহার প্রবর্ত্তনা। উহার কিঞ্চিৎ পর—অর্থাৎ—

৩। ১৭৮৪। ৪ঠা মার্চ্চে "কলিকাতা গেজেট" প্রকটিত হইতে থাকে।

ঐ তিন্-খানিই, ইংরাজি-ভাষায় চালিত হইত। অতঃপর বাঙ্গালা-সমাচার-পত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ আবশ্যক।

১ম। বেঙ্গল গেজেট।

(১২২৩ সাল হইতে ১২২৫ সাল,—১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ)

এত-ক্ষণের পর আমরা, বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার আমলে আসিয়া পড়িলাম। বঙ্গদেশেই

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারিতে এক সংবাদ-পত্রিকার উদ্ভব হয়। উহার নাম "হিকিজ্ গেজেট"। উপরে তাহার কথা এক-বার বলিয়াছি। "হিকিজ্ গেজেট" ইংরাজি-পত্রিকা; সুতরাং উহার সম্বন্ধে আমরা নিঃসম্পর্কীয়। যাহার সঙ্গে আমাদের অব্যবহিত সম্বন্ধ, সেখানি "বেঙ্গল্ গেজেট" বা 'বাঙ্গালা গেজেট'। উহার অর্থ—বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র। নাম শুনিবা-মাত্র উহাকে একখানি বৈদেশিক ভাষার পত্রিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহা নয়।

"মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্" যৎকালে বঙ্গের মস্‌নদে আসীন, (তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের পদ, সুশোভিত করিয়াছিলেন।) সেই সময়ের অন্তরালে—১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) "বেঙ্গল গেজেট" বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, "বেঙ্গল গেজেটের" জনয়িতা। প্রকৃত গঙ্গাধর—মহান্ দেব, দেবাদিদেব শঙ্কর। আদিম গঙ্গাধর, গঙ্গাদেবীর বেগধারণ না করিতে পারিলে, ভগীরথের সাধ্য কি, স্বর্ণদী গঙ্গাদেবীকে—মন্দাকিনীকে—জাহ্নবী কি ভাগীরথী সংজ্ঞার আধার করেন! ভট্টাচার্য্য গঙ্গাধর, না থাকিলেও, বঙ্গ-মণ্ডলে সংবাদ-পত্রিকা-প্রবাহিনীর স্রোতঃ, প্রবহমান হইতে পাইত না। ইংরাজাধিকারে ইংরাজই আমাদের বিবিধ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু বড়ই গুরুতম গৌরবের বিষয় এই যে,—এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ-প্রবর্ত্তক। আর—বাঙ্গালা-মুলুক, "বেঙ্গল গেজেটের" লীলা-খেলার ক্ষেত্র। এই সংস্রবাধীন দুইটী বিষয়, আমাদের মনে রাখা উচিত,—

(ক) বেঙ্গল গেজেটের নাম, সমাচার-পত্রিকা-তালিকার প্রথমেই উল্লেখ্য।

(খ) ১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) উহার প্রথম প্রচার।

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার ইতিবৃত্তে—

(১) "বেঙ্গল গেজেট"

(২) "১২২৩ সাল"

এই দুইটী, সাতিশয় চিরস্মরণীয় বিষয়।

দুই বৎসরের অনধিক কাল, উহার আয়ুঃ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে উহার জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল।

পাদরি-কুল-তিলক লঙ্ সাহেব, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ্ ক্যাটালগ্ অব্ বেঙ্গলি বুক্‌স্" (Descriptive Catalogue of Bengali books) অর্থাৎ "বঙ্গীয় পুস্তক-চয়ের বিবরণাত্মক তালিকা" নামক পুস্তকে সমাচার-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন্ সুযোগে সাহেব, উহার সঙ্কলন সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত-বর্ণনকালে সাহেব, পাঠকদিগকে ইহাই জ্ঞাত করিয়াছেন যে, "উত্তর-পাড়ার" বিদ্বান্ বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 'কলিকাতাস্থ প্রকাশ্য পুস্তকালয়ে' ("মেটকাফ্

হলে") যে সমুদায় বাঙ্গালা পুস্তক ও বার্ত্তাবহ সম্প্রদান করেন, সেইগুলির সাহায্যে তাঁহার ঐ পুস্তকখানি সঙ্কলিত হয়; কিন্তু আমরা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণেও "বেঙ্গল্ গেজেটের" সন্ধানে বঞ্চিত হইলাম। যে যে স্থানে প্রাচীন বস্তুর সমাদর আছে, সেগুলির নাম একে একে বলিতেছি।

১। এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল।

২। "কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরি" অর্থাৎ মেটকাফ্ হল।

৩। ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরি।

৪। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ বাবুর পুস্তকালয়।

৫। রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকালয়। ইত্যাদি।

ভাল ভাল এই কয়টী পুস্তকাগার। বড়ই দুঃখের বিষয়, কুত্রাপি এই পত্রিকার সংবাদ মিলিল না।

২য়। সমাচার-দর্পণ।

(১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ (শনিবার) হইতে ১২৫৮ সাল

অর্থাৎ

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ, ২৩এ মে হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥"

উক্ত কবিতাটী, সমাচার-দর্পণের মুকুট-মণ্ডন। সুতরাং "দর্পণ" উহাতে বিলক্ষণ শোভমান হইয়াছিলেন। "দর্পণ" প্রথমাবধি ষষ্ঠ বার ঐ শিরোভূষণ বিনা দেখা দিয়াছিল। ফলতঃ, এই কবিতা, মুকুরের মুকুট-প্রদেশের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকার উদ্ভব। ঐ অব্দ, তিন প্রধান প্রধান কারণে খ্যাতিমান্ ছিল ও আছে।

১ম—শ্রীরামপুর কালেজের প্রতিষ্ঠা।

২য়—স্কুলবুক সোসাইটির স্থাপনা।

৩য়—এই "সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তি।

প্রথমটী দ্বারা তদঞ্চলীয় মানব-নিচয়ের অশেষ উপকার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বিষয়ে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের বিবিধ-বিষয়িণী উপকার-কারিণী একটী মহতী সমিতির সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তৃতীয় বা শেষোক্ত ব্যাপারে বঙ্গ-সাহিত্য, কত উপকৃত, প্রবন্ধের অনুশীলনে তাহারই প্রতীতি করিয়া দিবে।

"সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তির পূর্ব্ব-কথা, কথঞ্চিৎ কৌতূহলোদ্দীপিকা। হিন্দু-মুসলমান,

জৈন-বৌদ্ধ, শিখ-মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতীয় প্রজা-সাধারণের বিষয় বলিব না। কেন না, তাঁহারা একে বিজিত, তাহাতে আবার বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী। কিন্তু রাজ-পুরুষ-গণের সজাতীয় সুশিক্ষিত—অথচ তাঁহাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়ী—পাদরি-পুঙ্গব-পুঞ্জেরও গবর্মেণ্টের প্রতি কীদৃশ ভয়ের ভাব, এই উপলক্ষে তাহার পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি।

তৎকালে শ্রীরামপুরই, খৃষ্টান মিসনরিগণের নিবসতি-স্থল ছিল। শ্রীরামপুরেই, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র। উহাই—ডাক্তার মার্শমান, ডাক্তার ওয়ার্ড, ডাক্তার কেরি ইত্যাদি বিদ্বান্ পাদরিগণের লীলা-খেলার ভূমি। বহু-কালাবধি বাঙ্গালা-ভাষায় এক-খানি বার্ত্তা বিষয়িণী পত্রিকার প্রচার নিমিত্ত তাঁহাদের ব্যাকুলতা ছিল। ইতিপূর্ব্বে যে "বেঙ্গল গেজেটের" প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইল, তাহার প্রাণান্ত না হইলে, হয় তো তাঁহাদের এতটা ব্যগ্রতা ঘটিত না। কিন্তু ভীরু বাঙ্গালী অপেক্ষা সাহসিক পাদরিদের আন্তরিক আতঙ্ক অত্যন্ত অধিক।

বঙ্গ-ভাষায় সপ্তাহে সপ্তাহে "রাজনীতি" প্রকাশিত হইতে থাকিলে, পাছে রাজ-পুরুষদের সরোষ বিষ-দৃষ্টিতে নিপতিত হইতে হয়, এই এক আত্যন্তিকী আশঙ্কা, তাঁহাদের অন্তর অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল কল্পনা-মূলক মানসিক বিভীষিকায় তাঁহাদিগকে বিচলিত করে নাই। তাঁহাদের অন্যতম উদ্যোগ-কর্ত্তা ডাক্তার কেরি সাহেবকে একাদিক্রমে ২৫ (পঞ্চবিংশতি) বৎসর ব্যাপিয়া উচ্চতম রাজপুরুষ মহোদয়-গণের একপ্রকার নজর-বন্দীর মত অবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ী অপর পাদরিরা, পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে যুগল উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

(ক) তাঁহারা তদা-প্রচলিত ইংরাজি সংবাদ-পত্রিকা-সমূহে ভবিষ্য "সমাচার-দর্পণের" উদ্দেশ্য ও উহা কি প্রকারের পদার্থ হইবে, তাহার তাৎপর্য্য, বিজ্ঞাপন-ভাবে এবং সংবাদ-স্বরূপে মুদ্রিত করিতে থাকিলেন। কার্য্য-কালের পূর্ব্বে বা পরে বিজ্ঞাপকদিগকে তিরস্কৃত, শাসিত বা কোন রূপেই দণ্ডিত হইতে হইল না!

এইটীই প্রথম উপায়। দ্বিতীয় উপায় এই—

(খ) পত্রিকা-প্রচারের পূর্ব্ব-রজনীযোগে (১২২৫ সাল, ৯ই জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ, ২২এ মে শুক্রবারে) কেরি সাহেব, শেষ প্রুফ সন্দর্শন সময়ে নৈশ-সমিতিতে পুনরায় পূর্ব্ব বিভীষিকার কথা উত্থাপিত করিলেন।

ডাক্তার মার্শম্যান, ঐ সংস্রবে কহিলেন, "আগামী কল্য শনিবার প্রাতে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে ভাবী পত্রের সূচী সহিত এক খণ্ড নমুনা প্রেরিত হউক।" প্রস্তাব-মতই কার্য্য হইল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে, পদস্থ কোন কর্ম্মচারীই, কোনই আপত্তি জ্ঞাপন করেন নাই। বরং গবর্ণর্ জেনেরল্, স্বহস্তে সম্পাদককে পত্র লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

"It is salutary for the Supreme authority to look to the control of Public Scrutiny."

"সমাচার-দর্পণ" সাধারণ পাঠকের, এমন কি, হিন্দু-ভাবাপন্ন পাঠকেরও, বরাবর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম গ্রাহকশ্রেণীর তালিকার শীর্ষ-স্থানে থাকায়, ইংরাজ-সমাজে বঙ্গবাসি-বৃন্দের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়াছিল। তখন রাজধানী ও তাহার পার্শ্বস্থ স্থান-সমূহে সংবাদ-পত্রের ডাকমাশুল ।০ (চারি) আনা ধার্য্য ছিল। লর্ড হেষ্টিংস্‌-সমীপে উক্ত ডাক-মাশুল কমাইতে আবেদন প্রেরিত হইলে, তিনি শৈলাবাস হইতে প্রেসিডেন্সিতে আসিয়া উহার সুবিধা করিয়া দেন। স্থির হইয়াছিল, এক আনায় প্রতি-সংখ্যা বিক্রি হইবে। (১)

পার্সী ও ইংরেজী ভাষা, যখন "দর্পণের" অঙ্কে প্রতিফলিত হইত, তখনকার এই ব্যবস্থা ছিল। ইতিপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কেরি সাহেব, এই পত্রিকার প্রচারে ব্রতী হইয়া, প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত রাজনীতি-সংক্রান্ত এই সংবাদ-পত্র ("সমাচার-দর্পণ") রাজ-পুরুষ-বৃন্দের তৃপ্তিপ্রদ হইবে না। কেন না, উহা বঙ্গীয় ভাষায় আলোচিত হইবে। ও রকমে আপামর নর-নারী রাজনীতির আস্বাদ পাইয়া এদেশে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি প্রভৃতি উপস্থিত করিবে। কিন্তু শ্রীরামপুরের অন্যতম পাদরি, উক্ত মার্শম্যান্ ("সমাচার-দর্পণের" প্রথম সম্পাদক), সাহস-সহকারে উহার প্রথম সংখ্যা, যেমন লর্ড হেষ্টিংসের গোচরস্থ করিলেন, তিনি স্বীয় রাজোচিত অভ্যর্থনায় ঐ প্রস্তাবের সমাদর করিয়াছিলেন।

এক স্থলে লঙ্‌ সাহেব, ভ্রম-ক্রমে "সমাচার-দর্পণ" না লিখিয়া, "শ্রীরামপুর-দর্পণ" লিখিয়াছেন। এই ভ্রান্তির হেতু নির্দ্দেশিত হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" অর্থাৎ 'শ্রীরামপুরের দর্পণ' লিখিত হয়। এখানে "সমাচার-দর্পণকে" সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল "দর্পণ" লেখা হইয়াছে। ইহার পাঁচ বৎসর পর, "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" সাহেব কর্তৃক "শ্রীরামপুর-দর্পণ" নাম ধারণ করিয়াছিল। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত বলিয়া, স্থূলতঃ উহা "শ্রীরামপুরের দর্পণ" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লঙ্‌ সাহেবের 'বাঙ্গালা-পুস্তক-বিষয়ক তালিকা' প্রচারের পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদ্বিষয়িণী এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে 'সমাচার-দর্পণই' লিখিত হইয়াছিল। লঙের পুস্তক, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের (১২৬২ সালের)। গুপ্ত কবির উক্ত সন্দর্ভ, ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখে প্রচারিত হয়। ফলতঃ "সমাচার-দর্পণ" অনেক বিষয়ে 'শ্রীরামপুর দর্পণই' হইয়াছিল।

"সমাচার-দর্পণ" সাহেব পাদরিদের সম্পাদিত পত্রিকা। সুতরাং ইহার প্রচারের অব্দ, মাস ও দিন পর্য্যন্ত যথাযথ পাওয়া বিধেয়। কিন্তু সেই আশায় আমরা নিরাশ্বাস। এ সম্বন্ধে ৫ (পাঁচ) মত বিদ্যমান।

---

(১) এই বৎসরেই ডাক্তার মার্শম্যান "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রথমে উহাব মাসে মাসে প্রচার হইত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও ঐ ভাবে প্রচার হইয়াছিল। কিছু কাল পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উহার ত্রৈমাসিক আকার হয়। তৎপরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সাপ্তাহিক হইয়া অনেক দিন চলিয়াছিল। কিছু কাল হইল, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সঙ্গে উহা সংলগ্ন হইয়াছে।

(ক) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মে শুক্রবার।　(খ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ মে শনিবার
(গ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ আগষ্ট শুক্রবার　(ঘ) ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৩১এ মে রবিবার
(ঙ) ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে।

প্রথম মতটী, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরে প্রচারিত ক্লার্ক মার্শম্যান্ সাহেবের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" পরিব্যক্ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের একাদশ সংস্করণের সাহায্যে ঐ কথা, পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলাম। (১)

দ্বিতীয় মত। "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বরে "সমাচার-দর্পণের" ইতিহাস দেখিলে, সবিশেষ বিদিত হওয়া যাইবে।

তৃতীয় মত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রচারিত লঙ্ সাহেবের পুস্তকের তালিকার ৬৬ পৃষ্ঠায় ঐ মত ঘোষিত।

চতুর্থ মত। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে পরিগৃহীত।

পঞ্চম মত। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়ের পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা"-নামক স্বীয় গ্রন্থে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দকে "সমাচার-দর্পণের" প্রকাশ-কাল বলিয়াছেন। ইহা, হয় মুদ্রাকর-প্রমাদ, না হয় গ্রন্থকারের অনবধানতা। কেন না, লঙ্ সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই, তিনি "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা" সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও "১৮১৮ খৃষ্টাব্দই" "সমাচার-দর্পণের" প্রকাশাব্দ নিবদ্ধ।

প্রথমতঃ, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ-সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই। দ্বিতীয়তঃ, "শনিবার" নিশ্চয়ই "সমাচার-দর্পণের" প্রথম প্রকাশের দিন। উক্ত তারিখ-গুলির মধ্যে ২৯এ মে ও ২৩এ আগষ্ট "শুক্রবার"। ৩১এ মে "রবিবার"। ২৩এ মে তারিখই "শনিবার"।

মার্শম্যান্ প্রভৃতি সাহেবদের বিষয়-বর্ণনায় "৩১এ মে" তারিখে "সমাচার-দর্পণের" প্রচার-দিন বলিয়া যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম-ময়। তাহার কারণ, ৩১এ মে "রবিবার।" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে "শনিবার"। লঙ্ সাহেবের আরও একটু ভুল হইয়াছে। তাঁহার মতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট "সমাচার-দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাও ভ্রম-মাত্র। কেন না, দেখিতেছি—২৪এ আগষ্ট "শুক্রবার"। "শনিবারে" ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের জীবন-বিবরণ পুস্তকে তাহা স্পষ্টই উল্লেখিত। অতএব ইহাই নির্ভুল (২)।

"সেরিফ সেলের" বিজ্ঞাপন পাইবার নিমিত্ত আবেদন প্রদত্ত হইলে, গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তক-কুলের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন, এবম্ভূত ভরসা ছিল না। তাঁহাদের সেই ভরসা কিন্তু নির্মূল হয় নাই। রাজপুরুষেরা, তাঁহাদিগকে ঐ বাঞ্ছিত বর দিয়া, তাঁহাদের মান বাড়াইয়া দিয়াছিলেন (৩)। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

---

(১) ঐ পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) "সমাচার-দর্পণের" ফাইল পাইয়াও, ঐ বুদ্ধি-বিচারেরই সাফল্য হইল।
(৩) "সমাচার-দর্পণের" প্রবর্ত্তকেরা, প্রকৃষ্ট চেষ্টায় যে প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া গেলেন, সেই পথ দিয়া

তদানীন্তন ভারতেশ্বর (বড় লাট) আমহার্ষ্ট মহোদয়ের আমলের মধ্যে (১৮২০-২৮ খৃঃ) গবর্ণমেণ্ট হইতে ১০০ (এক শত) খণ্ড পত্র ক্রীত ও বিতরিত হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তদবধি বহুকাল ঐ নিয়ম অব্যাহত থাকে। রাজ-কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের ভাগ্য ভাল ছিল। বিনা মূল্যে সংবাদ-পত্রিকা তাঁহারা পাইতেন। মূল্য না দিয়া পত্রিকা পাওয়া কি একটা মহাসুযোগ নয়?

"সমাচার-দর্পণের" ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। তাহার একটা দৃষ্টান্তও, অন্ততঃ দিতে হইল। বর্ষীয়ান্ বয়োজ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন,—

"আমাদের স্মরণ হয়, আমরা বাল্যকালে এই "সমাচার-দর্পণ" অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদের গ্রামে "কজারিয়া দল" নামে পরপীড়ক এক দল গাঁজাখোর ছিল। "সমাচার-দর্পণ" তাহাদের বিষয় লেখাতে, দারোগা আসিয়া সুরথাল করে। তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়া যায়।"

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১৯এ সেপ্টেম্বরে "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রে "সমাচার-দর্পণের" ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এই;—

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে তারিখে "সমাচার-দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হইয়া, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেও বিদ্যমান ছিল। লণ্ড্ সাহেবের মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্পাদক জে, মার্শম্যান, অপর কর্ম্মে ব্যাপৃত হওয়ায়, এই পত্রিকার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার গ্রাহক, সাড়ে তিন শত (৩৫০)। মফস্বলে এক শত ষাটী ১৬০ জন গ্রাহক ছিল। উহার বার্ষিক মূল্য ১২৲ বার টাকা। চাঁদার টাকায় ও "সেরিফ সেলের" বিজ্ঞাপন দ্বারা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। "ইংলিশ্ম্যান্" পত্রিকা, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারিতে এই কথাগুলি আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন সামগ্রীর কার্য্য-কারিণী ক্ষমতা, অনেক সময় খর্ব্ব হয়। "সমাচার-দর্পণও" পুরাতন হওয়ায়, অল্পে অল্পে উহার কার্য্যকরী ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিল। অবশেষে একেবারেই বিলুপ্ত হইল। প্রবর্ত্তক-গণকে শেষ দশায় "সমাচার-দর্পণের" প্রকাশ রহিত করিতে হইল। ইহার পর কলিকাতার শিক্ষিত কোন ভদ্র ব্যক্তি, উহার দ্বিতীয়বার প্রচারে মনোনিবেশ করিলে, পত্রিকাখানি পুনর্জীবন লাভ করে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহা হস্তান্তরিত হয়। পাদ্রিদের সময়াভাবই, এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ (১)।

এখানে পাঁচটী বিষয় আমাদের স্মরণীয়।

(ক) "সমাচার-দর্পণ" জন্মাবধি ১১ একাদশ বৎসর (১৮১৮ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) কেবল বাঙ্গালা ভাষারই সেবা করিয়াছিলেন।

পরম আনন্দে তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা চলিতে লাগিলেন। "সমাচার-চন্দ্রিকা" "সংবাদ-প্রভাকর" "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" "সংবাদ-ভাস্কর" এই সকল পত্রও, উত্তর-কালে গবর্ণমেণ্টীয় বিজ্ঞাপন-মুদ্রণে অনুমতি পাইয়াছিলেন? মৃত "ভাস্কর" ব্যতীত অদ্যাবধি ঐ সকল মুমূর্ষু পত্রিকাগুলি, সেই অধিকারে বঞ্চিত নয়।

(1) "Friend of India", 19th Sept. 1850.

(খ) ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ সালে) তিনি বিমাতার সেবায় মনোযোগী হইলেন। তবে আশার বিষয়, তিনি গর্ভ-ধারিণীর শুশ্রূষায় অবহেলা করেন নাই। "সমাচার-দর্পণ" যেমন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, অমনই (১৮২৯ খৃঃ হইতে ১৮৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত) ১৩ (তের) বৎসর ক্রমাগত তাঁহাকে আমরা মাতা ও বিমাতা উভয়ের সেবক হইতে দেখিলাম। মধ্যে কিছু দিন আবার পূর্ব্ব বিমাতাও (পারসী ভাষাও), উপেক্ষিত হয়েন নাই।

(গ) ১৪৮২ খৃঃ তিনি জন্মদাতৃ-গণের যত্ন-বঞ্চিত হইয়া, কোন এক অজ্ঞাতনামা মানবের হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই সময়ের পরই "দর্পণের" মরণ।

(ঘ) ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা।

(ঙ) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রেতোদ্ধার-মাত্র হয়। সে কিন্তু নাম-মাত্র নব-জীবন-লাভ। জীবন-দাতারা, জীবন-রক্ষা-বিষয়ে এবার তেমন যত্নবান্ হয়েন নাই। সুতরাং—

"ভগ্নস্নেহেন যা মৈত্রী, ন সা কল্যাণদায়িকা"।

এই মহাবাক্যের সার্থকতা অবলোকিত হইতে লাগিল। যেহেতু, ইহার পর তাহার জীবনী শক্তির পরিচয়াভাব।

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মফঃস্বল-সংক্রান্ত বিস্তর "প্রেরিত পত্র" ইহাতে প্রকাশার্থ উপস্থিত হইত। বঙ্গ-দেশের প্রত্যেক জেলায় ও ৩৬০টী ষ্টেশনে ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সহর-মফঃস্বলের সমাচার মুদ্রিত থাকিত। তাহা ছাড়া—ইতিহাস, রাজনীতি, ভূগোল-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে ইহা ভূষিত হইত। সুতরাং সাধারণ জন-গণ, এতদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল। ইহার প্রকাশ অবধি কলিকাতার—বিশেষতঃ, মফঃস্বলের—অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। রাজ-কর্ম্ম-চারীরাও, নিজ নিজ ত্রুটির প্রকাশ-ভয়ে সদাই সশঙ্ক রহিতেন।

"সমাচার-দর্পণের" কোন ফাইল প্রথমতঃ পাই নাই। এ বিষয়ে আমাদের স্নেহাস্পদ সাহিত্য-জীবী সত্যেন্দ্রনাথ পাইন্‌কে উহার অন্বেষণ-নিবন্ধন ভারার্পণ করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরপাড়ার লাইব্রেরী ও শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরীতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও, কোন সন্ধান পান নাই।

"সমাচার-দর্পণ"-সম্বন্ধে লোকে যে ভুল করিয়াছেন, নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। মার্শম্যান্ সাহেবের ইংরাজি ভাষায় সঙ্কলিত বঙ্গীয় ইতিহাস।

২। "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" (Friend of India) নাম্নী সমাচারপত্রী উহাতে "সমাচার-দর্পণকে" বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম বার্ত্তাবহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

৩। "কলিকাতা-রিভিউ" পত্রিকার ১৩শ খণ্ডে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে "Early Bengali Literature and Newspaper" অর্থাৎ "প্রাথমিক বঙ্গ-সাহিত্য ও প্রাথমিক বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র"-সম্বন্ধে লঙ্ সাহেবেরও ঐ ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পুনরায় বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের বৃত্তান্ত (১) লেখেন, সেই সময় এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

পাদরিদের এই অনুত্তম উদ্যম, প্রথম ও প্রশংসনীয় নয়। সহমরণের বিবরণে মার্শম্যান্, রামমোহন রায়ের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। ফলতঃ, এ সকলকে ভ্রম, বিদ্বেষ বা অজ্ঞতার পরিচায়ক বৈ আর কি বলা যাইবে? আমাদের মতের পোষকতার্থে লঙ্ সাহেবের শেষ লেখাই, আমাদের সাক্ষী।

৪। "বেঙ্গল্ একাডেমি অব্ লিটারেচারে" নানা ভুল রহিয়াছে।

"সমাচার-দর্পণ"-পরিচালনায় কেবলই যে পাদরিদের প্রাধান্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। সংস্কৃতজ্ঞ বিস্তর পণ্ডিতের রচনাও, উহাতে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। পাদরিদের চালিত পত্রিকা হইলেও, উহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত, সমর্থিত হইত না। বরং হিন্দুয়ানীর পোষকতা উহাতে দেখিয়াছি।

"সাহিত্য-পরিষদের" অন্যতম উৎসাহশীল সদস্য আমাদের প্রাচীন প্রবীণ সাহিত্য-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মিত্রজ ও নিপুণ ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী এল্, এম্, এস্, মহাশয়-দ্বয়ের যত্নে আমরা "সমাচার-দর্পণের" প্রথমাবধি কতিপয় বর্ষের মূল পত্রিকা পাইয়াছি। তাহা হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল। তাঁহাদের এই সহৃদয়তার যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া, নিঃশেষ করা যায় না। লেখার নমুনা, পশ্চাৎ দেখান যাইতেছে।

"এই সমাচারের পত্র, প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে। তাহার মধ্যে এই এই সমাচার দেওয়া যাইবে।

১। এতদ্দেশের কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।

২। শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব যে যে নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩। ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশ হইতে যে যে নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪। বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫। লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬। ইউরোপ দেশীয় লোক কর্ত্তৃক যে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে যে নূতন পুস্তক, মাসে মাসে ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে, সেই সকল পুস্তকে যে যে নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির কথা থাকে, তাহাও ছাপান যাইবে।

৭। এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান্ লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে। তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা।

প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র, বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক, তিনি আপন নাম, শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে, প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।" (২)

---

(1) Descriptive Catalogue of Bengali works.

(২) "সমাচার-দর্পণের" অন্যান্য প্রবন্ধ, "পরিষদ্" হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।

প্রথম সংখ্যা ।

ইস্তাহার ।

"এই সপ্তাহের সমাচারের পত্র অতি ত্বরায় ছাপা হইল । সে কারণ অধিক সমাচার নাই । আগামী ২ সপ্তাহেতে অধিক দেয়া যাইবেক ।"

দ্বিতীয় সংখ্যা ।

ইস্তাহার ।

"এই সমাচারপত্র যাহার লইতে অভিলাষ হয়, তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইবেন । তবে তাঁহার নিকটে প্রতি সপ্তাহের সমাচারপত্র পাঠান যাইবে এবং যদি কোন জন এই সমাচারের পত্রে কোন নূতন সমাচার ছাপাইতে ইচ্ছা করেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপখানায় তাহা পাঠাইয়া দিবেন ইতি ।"

"বিবাহের নূতন ব্যবস্থা ।"

"ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে আলজিয়র নামে এক নগর । সেখানকার রাজা যথার্থ মত চলে না । তাহারও আপন মাথার স্থৈর্য্য নাই । গত বৎসর যে রাজা ছিল, তাহাকে মারিয়া এক ব্যক্তি সিংহাসনে বসিল ; পরে তাহাকে অন্য এক জন মারিয়া সিংহাসনে বসিল । শেষ রাজার সমাচার শুনা যায় যে, এক মরক দ্বারা তাহার নগরে অনেক লোক মরিল এবং তিনি আজ্ঞা করিলেন যে, কুড়ি বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক যে সকল লোকের বিবাহ না হইয়াছে, তাহাদিগের বাজারের মধ্যে লইয়া হস্তপদ বন্ধন করিয়া পাদ নীচে দণ্ডাঘাত করা যাইবেক ।"

তৃতীয় সংখ্যা ।

"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে । পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে । আগামী শনিবারের মধ্যে যে যে লোক, বহীতে সহী করিয়াছেন, কিম্বা মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইবেন, সেই সকল লোক নিকটে সপ্তাহ সপ্তাহ কাগজ পাঠান যাবেক ।"

এস্থলে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা তুলিয়া দিলাম—

বিষয় ।	কোন্ দেশে ।	খৃষ্টাব্দ ।
১ । ইংলণ্ডে কৃষ্যারম্ভ	ইংলণ্ডে	৬৪০ *
২ । হিসাবের অঙ্কারম্ভ	ইউরোপে	৯৯১ †

---

* কোন কোন অক্ষর খণ্ডিত ।

† ইহার পূর্ব্বে "অক্ষর" দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইত ।

বিষয়।		কোন্ দেশে।	খৃষ্টাব্দ।
৩।	তুলার বস্ত্রের নেকড়া দ্বারা কাগজ	ইংলণ্ড	১০০০
৪।	বাদ্যের তাল-মান-চিহ্ন	,,	১০৭০
৫।	পাট-নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা কাগজ	,,	১১৭০
৬।	খড়ের গৃহ ছাড়িয়া অট্টালিকা	ইংলণ্ড	১২৩৩
৭।	কোম্পাস প্রকাশ	ইউরোপে	১৩০২
৮।	তোপ ও বারুদ	ইংলণ্ড	১৩৪০
৯।	তৈল রঙ্গ দ্বারা ছবি লেখন	,,	,,
১০।	স্বর্ণমোহর নির্ম্মাণ	,,	১৩৪৪
১১।	কয়লা পোড়ান আরম্ভ	,,	১৩৫৭
১২।	তাস খেলা	ফ্রান্স দেশে	১৩৯১
১৩।	ছাপা কর্ম্ম কাষ্ঠ-হরফ দ্বারা	ইউরোপে	১৪৩০
১৪।	ছবি খোদা আরম্ভ	ইংলণ্ডে	১৪৬০
১৫।	আমেরিকা-দর্শন	—	১৪৯২
১৬।	তামাকু ব্যবহার	ইংলণ্ডে	১৫৮৩
১৭।	গাড়ি সৃষ্টি	,,	১৫৮৯
১৮।	ঘড়ি সৃষ্টি	,,	১৫৯৭
১৯।	ডাক সৃষ্টি	,,	১৬৩৫
২০।	চা খাওয়া	,,	১৬৬৬
২১।	লাটরি আরম্ভ	,,	১৬৯৩
২২।	ষ্টাম্প কাগজ	,,	১৬৯৪
২৩।	বসন্তবারণার্থ টীকা	,,	১৭২৭
২৪।	শ্রীযুত এন্‌সন সাহেব জাহাজ দ্বারা পৃথিবী বেষ্টন করে	,,	১৭৭৪

চতুর্থ সংখ্যা।

তিন সংখ্যা বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়। মাসিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১২ টাকা।

"এই সমাচার-দর্পণ, শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওয়া আবশ্যক থাকে, তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে, সপ্তাহে সপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাইবেক। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন, যদি হরকরা কাগজ তাহার নিকট না দেয়, তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে দেওয়া মাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাইবেক।"

"কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ ।"

"এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে। সে সপ্তাহে দুই বার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরাবর ঐ কাগজ লইবেন, তাহারা মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরাবর না লইবেন, তাঁহারা যে মাস লইবেন, সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।" (১)

সংবাদ-পত্র-খানির নাম কি, বলিয়া দেওয়া হইল না। ভাষাটা ভারি কৌতুকাবহ ! "তাঁহারা" সম্ভ্রান্ত-ভাবে প্রযুক্ত। কিন্তু "যাহারা" অসম্ভ্রান্ত !

১২২৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮১৮, ২৩এ মে) হইতে ১২২৮ সালের ৩২এ আষাঢ় (১৮২১, ১৪ই জুলাই) পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত "সমাচর-দর্পণের" ফাইল, আমাদের অধিগত।

১২২৮ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে শেষাশেষি কথার উপর নজর রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ১২২৮ সালের ২৫এ আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে—

"সমাচার-দর্পণ

অর্থাৎ

সর্ব্বহিতপ্রয়োজক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সংবাদপত্র।"

এই কথা কয়টী মুদ্রিত হইতে থাকে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত যে সংখ্যাগুলির ফাইল, ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পাঠার্থ প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা দুই ভাষার সমাবেশ রহিয়াছে।

৩য়। সংবাদ-কৌমুদী।

(১৮১৯ জুলাই হইতে ১৮৪৭ খৃঃ, অর্থাৎ ১২২৬ সালের, আষাঢ় হইতে ১২৪৪ সাল)।

"দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিণা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥"

এক্ষণে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি যে কেবল ধর্ম্ম-বিষয়েই চিত্তার্পণ করিয়াছিলেন, এমন নয়। ভীষণ কুটিল গতি, যেমন সকলেরই পরিত্যাজ্য,——জটিল বিষয় যেমন সদাই লোকের চক্ষুঃশূল, সেইরূপ অপ্রশস্ত মত বা সঙ্কীর্ণ কার্য্য, কদাপি তাঁহার অনুষ্ঠান-যোগ্য ছিল না। যাহা কিছু উদার ও উন্নত——বিশাল ও দীর্ঘ——মহান্ ও প্রশস্ত, তাহাই তাঁহার করণীয় ছিল। তাঁহার পবিত্র-চিত্ত, যে নানা বিষয়ে ধাবিত হইত, পূর্ব্ব-কথিত সমাচার-পত্রিকাতেই তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। যে সংবাদ-পত্র, সভ্য জাতির এক প্রধান অবলম্বন,——যাহা বিদ্যমান জ্ঞান-

---

(১) সমাচার-দর্পণ, ১২২৫ সাল, ১১ই আশ্বিন (১৮১৮।২৬এ ডিসেম্বর), ১৯ সংখ্যা।

সমুজ্জ্বল কালে রাজত্ব-স্থিতির চতুর্থ পন্থা বলিয়া স্থিরীকৃত ঃ—ভারতের সেই উদারচেতা, শ্রেষ্ঠ-পুরুষ, জননী বঙ্গভাষায় শিশুকালেই তাঁহার ক্রোড়দেশে বর্ত্তমান কালের সেই প্রয়োজনীয় ফল, সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ কথা মনে করিলে, কি আহ্লাদই হয়! অন্তরে কত আশার সঞ্চার হয়! তাঁহার উদ্ভাবিত পত্রিকার নাম "সংবাদ-কৌমুদী"। "ক্রিশ্চিয়ান্ অব্‌জারভার্" পত্রিকা, লঙ্ সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (Descriptive Catalogue of Bengali works) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত সংবাদ-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রচারের পূর্ব্বে "সংবাদ-কৌমুদী" পুস্তক, কি বার্ত্তা-বিষয়ক পত্রিকা, তাৎকালিক লোকবর্গের তাহার স্থিরতা ছিল না। ঐ সব লেখাতেই লোকের জানিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উহা পুস্তকের নাম নহে; কিন্তু এক খানি সংবাদ-পত্র।

"সংবাদ-কৌমুদীর" অগ্রে "সমাচার-দর্পণ" সম্ভূত হয়। আর "বেঙ্গল্-গেজেট" 'সমাচার-দর্পণের' অগ্রজাত। 'সমাচার-দর্পণের' জন্মকাল ১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮-৮।২৩ মে)। "বেঙ্গল-গেজেট" ১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং "বেঙ্গল-গেজেটের" বয়ঃক্রম, "সমাচার-দর্পণ" অপেক্ষা দুই বৎসর অধিক। "কৌমুদী" পত্রিকা, অগ্রজ "দর্পণ" ও সর্ব্বাগ্রজ "গেজেট" অপেক্ষা অল্পই বয়ঃকনিষ্ঠ। ইহা এক্ষণে বোধ হয়, সকলের প্রতীতি জন্মিল।

ইতিপূর্ব্বে রাজধানীতে (কলিকাতা সহরে) "সংস্কৃত-প্রেস" নামে এক মুদ্রাযন্ত্র বিদ্যমান ছিল। "কৌমুদীর" মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য, সেই যন্ত্রেই সমাহিত হইত। উক্ত যন্ত্রের কোন রূপ বিবরণ পাওয়া দুর্ঘট।

এখানে একটা বিচার আবশ্যক। কোন এক গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসায় অভিনিবেশের প্রয়োজন উপস্থিত। অবসর ঘটিতেছে, সুতরাং তদ্বিষয়ের অবতারণা করা দোষাবহ হইবে না। বরং খুলিয়া না বলিলে, তত্ত্ব-বস্তু, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে। তথাবিধ উদ্যম অত্যন্ত অধম। যে উপায়ে নির্ব্বিরোধ অব্দে "সংবাদ-কৌমুদীর" জন্ম ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি, সেটী বহুল তর্ক-বিতর্কের ফল। অনেক আয়াসে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে।

(১) প্রথমতঃ "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের লেখক, প্রচার করিয়া দেন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দ "কৌমুদীর" আবির্ভাব-কাল। ঐ প্রবন্ধ-লেখকের নাম পাদরি লঙ্ সাহেব। প্রবন্ধের কোন স্থানে লেখকের নাম নাই—অথচ আমাদের তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল—বোধ-গোচরে আসিল, এ কেমন কথা? "রিভিউ" পত্রের অন্য প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই ঘোষণা প্রকটিত হয়।

(২) তৎপরে প্রসিদ্ধ পাদরি লঙ্ সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি আপনার ভ্রম বুঝিলেন। বুঝিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দকে "কৌমুদীর" জন্ম-সময় অবধারণ করেন। এটী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা। এখানে একটা কথা বলিতে বাকী থাকিতেছে। সাহেব, কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার পূর্ব্ব ভ্রান্তির উল্লেখে পরাঙ্মুখ।

(৩) তাহার পর রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, আসরে নামিলেন। সুতরাং একটা উত্তম মীমাংসা করিবার অবসব জুটিল। ঈশানচন্দ্র বসুজের প্রচারিত "রামমোহন-গ্রন্থাবলীর" মতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ, উহার জন্ম-সাল অবধারিত হইল। এই সুযোগে প্রকাশকেরা, ঐ অদ্ভুত মত জাহির করিতে ত্রুটি করিলেন না।

(৪) গতিক দেখিয়া আমিও ইত্যগ্রে প্রচার করিয়া দিয়াছিলাম—১৮২১ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদী" বঙ্গীয় জনের মানস-ভূমিতে প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত মতামতের সার-সংগ্রহ করিলে, যে যে মতান্তর লব্ধ হয়, তাহা এই,——

১।	১৮২৩ খৃষ্টাব্দ।	১৮২০ খৃষ্টাব্দ।
২।	১৮২১ খৃষ্টাব্দ।	১৮১৯ খৃষ্টাব্দ।

আমরা অনেক অনুসন্ধানে এখন সাব্যস্থ করিতে পারিয়াছি যে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দই (১২২৬ সালই), যথার্থ মত। উহাই "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রকৃত প্রকাশাব্দ। ইহাই লঙ্ সাহেবের শেষ লিপি। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে "প্রাথমিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও প্রাথমিক সমাচার পত্র" (১) নামক প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, উহাও লঙের লেখনীমুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত। সাহেব, ঐ সন্দর্ভের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদী" প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি বলিয়াছেন,—১৮২১ খৃষ্টাব্দের "কৌমুদী" অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন! যাহার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম, তাহার দেখা দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) পাওয়া যাইতেছে কিরূপে? এ ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারেন কি? ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লোকের "কৌমুদী"-সংস্পর্শ প্রথম ঘটিযাছিল। আবার কিছু পরে—পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি লিখিলেন, এতদ্দারা আমার অমুক সালের অমুক মত খণ্ডিত হইল না। ফলে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদীর" জন্ম হইয়াছিল। অথচ খুলিয়া বলিলেন না, "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার কথা অগ্রাহ্য। ঐ প্রবন্ধে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইল। কিন্তু উহার শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা আছে,—

"১৮২১ খৃষ্টাব্দের সংবাদ-কৌমুদী"

অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিতেছি। অথচ তিনি বলিতেছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদীর" বিকাশ!

এখন বিচার্য্য এই;—যদি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেই "কৌমুদীর" প্রথম প্রকাশ-কাল তিনি স্থির করিলেন, তবে তাহার দুই বৎসরের পূর্ব্বের (১৮২১ খৃষ্টাব্দের) পত্রিকা কেন আশ্রয় লওয়া হয়? তাহা তবে আদর্শ স্থলে কেন গৃহীত? এটা একটা উন্মত্ত-প্রলাপ। এত দূর গলদ্ হইল কেন? উহা লেখাপড়ায় স্থান পাওয়া অনুচিত। বিশেষতঃ, সুশিক্ষিত পাদরি সাহেবের লিপিতে এবং "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে তাহার অধিকার হওয়া দুঃখের বিষয়। ফলতঃ, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দই প্রামাণিক। কেন না, লঙ সাহেবের শেষ মতকে আমরা মস্তকে ধারণ

---

(1) Early Bengali Literature and News-paper.

করিতেছি না (১)। উহার প্রামাণিকতায় আস্থা-স্থাপনের অপর প্রবল যুক্তির অভাব নাই। সেই কারণেই ঐ খৃষ্টাব্দ, অতিশয় অবলম্বনীয়! ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে রাজা রামমোহন রায়ের "সহমরণ-সম্বাদ"-নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের নির্দ্দেশ আছে। কেবল নির্দ্দেশ নয়—সে স্থানে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, উহা কোন সংবাদ-পত্রের পুনর্মুদ্রণ। সেই সংবাদপত্রের নাম—"সংবাদ-কৌমুদী" বৈ আর কিছুই নয়। কেন না—ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, রামমোহন রায়ের লেখনী, "সংবাদ-কৌমুদীতে" সতীদাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। "সংবাদ-কৌমুদীর" পিতার সঙ্গে তাঁহার অন্যতম উপযুক্ত সহকারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্রব রহিত হইবার উহাই প্রধান কারণ। ইহাও ইতিহাস-প্রথিত বিষয়। সুতরাং স্থির হইল, "সংবাদ-কৌমুদীর" ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই বা তৎপূর্ব্বের কোন মাসে প্রচার হইয়া থাকিবে। ইহা অবধারিত যে, ঐ অব্দের জুলাই মাসের পরে কখনই "কৌমুদী" প্রকাশিত হইতে পারে না। কেন না, তাহা না হইলে "কৌমুদী" হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত "সহমরণ-সম্বাদ" কেমন করিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" উল্লিখিত হইতে পারে? লঙের শেষ মত, প্রধান প্রমাণ নয়। যে সাহেব, এক প্রবন্ধের দুই স্থানে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত করিতে পারেন,—যিনি নির্ভুল মত ঘোষণা না করিয়া পূর্ব্ব ভ্রমেরই পুনঃ-প্রসঙ্গ করেন, পাঠক! আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, বলুন দেখি—তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও সরলতার কত অভাব!

ভাগ্যে "কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান্ অব্জার্" পত্রে "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রচার কালের নিদর্শন রহিয়াছে, তাই এ যাত্রা সুনিষ্পত্তির উত্তম অবসর হইল। তাহাতেও ঐ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেই "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রচারের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ঐ প্রবন্ধটী প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে এই একটী নয়, আরও তত্ত্ব প্রচারিত আছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "কৌমুদীর" বিলোপ ঘটে। কত পূর্ব্বে নিরূপণের সম্ভাবনা নাই। তবে যে একটা সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে কিছু ইঙ্গিত যদি পাই, তাই বা ত্যাগ করিব কেন? "বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের" মতে রামমোহনের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে "কৌমুদী" আর আবির্ভূত হয়েন নাই। এই প্রবন্ধের লেখক বাবু নবগোপাল মিত্র। তিনি এখন জীবিত নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং ইহার বর্ষদ্বয় পরে অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উহা রহিত হইবার কথাই লেখক বলিয়াছেন। "ক্রিশ্চিয়ান্ অব্জারে" যাহা লেখা আছে, তন্মতের সহিত যেন এই মত মিলিতেছে। কেন না, অব্জারভার বলেন, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "কৌমুদী" গতাসু। কেন না, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। তা হউক। তথাপি এই মত বিশ্বাস্য নয়। উক্ত প্রবন্ধ—প্রবন্ধ-মধ্যে এত ভুল, অসাবধানতা, অসারতা, অলসতা প্রদর্শিত যে—তাঁহার কোন্‌টী ঠিক্ মত, কোন্‌টী ভুল, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া উঠাই দুরূহ। যাহাতে রাশি রাশি ভ্রম,

(১) সাহেব, আরও এক ভ্রান্তিতে জড়িত। এখানে বলিতেছেন, চন্দ্রিকার প্রভাব খর্ব্ব করিতে "কৌমুদীর" প্রচার। ইহাও ভুল।

তাহা কিরূপে বিশ্বাস-যোগ্য হইবে? এতদ্ভিন্ন আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে—দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া রহিয়াছে যে, তাঁহার বিলাত-গমনের কিছু পরেই পত্রিকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।

এইখানে "কৌমুদীর" প্রবন্ধগুলির তালিকা দিলাম।

(১) "সহমরণ-সম্বাদ" নামক এক প্রবন্ধ। "সংবাদ-কৌমুদীতে" ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" তাহার নির্দ্দেশ আছে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম আট সংখ্যার প্রবন্ধতালিকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলিরই উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীন কাহিনী, নিশ্চয়ই এখন মনোহারিণী হইবে। এই কারণে এখানে সে-গুলির সমাবেশ করা গেল। "কলিকাতা-রিভিউ" পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ড হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ-সমুহ সংগৃহীত হইল।

(১৮২১ খৃষ্টাব্দ, প্রথম সংখ্যা)।

(২) গবর্ণমেণ্ট, যাহাতে বিনা বেতনে একটী বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্য প্রস্তাব। এই প্রবন্ধে কোন ব্যয়-কুণ্ঠ ভূপতির উপাখ্যানও নিবেশিত ছিল।

(ঐ অব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা)।

(৩) সংবাদ-পত্রে বঙ্গবাসীদের উপকার হইবে, এরূপ প্রদর্শন।

(৪) চিৎপুরে জল-সেচনাদির ব্যবস্থার কথা।

(৫) গুরুভক্তি।

(৬) পোনের বৎসরে উত্তরাধিকারস্বত্ব না পাইয়া, বাইশ বৎসরে পাইলে ভাল হয়, এ বিষয়ের প্রসঙ্গ।

(৭) কৃপণ বাবুদের উপর বিদ্রূপ-বাণ। তাঁহাদের জীবন-লীলার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিত্ত ব্যয় হয়, ইহা উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শিত।

(ঐ অব্দ, তৃতীয় সংখ্যা)।

(৮) হিন্দুর শবদাহ-স্থান এবং খৃষ্টানদের গোরস্থান প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যকতা।

(৯) চাউল হিন্দুর প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য। সুতরাং তাহার রপ্তানি-রাহিত্যের ঔচিত্য।

(১০) হিন্দুরা যাহাতে অর্থ ব্যয় না করিয়াই, ডাক্তারি নিয়মে চিকিৎসিত হইতে পারেন, তদর্থে আবেদন।

(১১) দেবতা-প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময়ে সাহেবেরা যাহাতে দ্রুত শকট-চালনা না করেন, তাহার প্রতীকার-প্রার্থনা।

(ঐ অব্দ, চতুর্থ সংখ্যা)।

(১২) নেটিভ ডাক্তারদের (এতদ্দেশীয় চিকিৎসকদের) পুত্রগণের সাহেব-ডাক্তারদের অধীনে শিক্ষিত হওয়ার প্রস্তাব।

(১৩) কৌলীন্য-মূলক বিবাহের অগুণ।

(১৪) বিত্তবশালীরা, অর্থের অসদ্ব্যবহার করেন, অথচ শিক্ষাকার্য্যে তাঁহাদের দৃষ্টির অভাব।

(১৮২১ অব্দ, পঞ্চম সংখ্যা)।

(১৫) নূতন উদ্ভাবিত নাটকে কুপথে গমন।

(১৬) কাপ্তেন বাবুগণের অধোগতি।

(ঐ অব্দ, ষষ্ঠ সংখ্যা)।

(১৭) স্বদেশগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতির, বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে নৃত্য-ভোজ্য ও তৌর্য্যত্রিক কার্য্য অর্থাৎ গীত-ভক্ষ্য ভোজ্যাদির প্রসঙ্গ।

(১৮) এক পঞ্চম-বৎসরীয় বালকের বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে অভিজ্ঞতা।

(১৯) বিদ্যা-চর্চ্চায় কি কি সুযোগ হয়।

(২০) আগরার তাজমহলের বিবরণ।

(২১) সত্যপরায়ণতা।

(২২) সাহেব ডাক্তারদের কর্তৃত্বাধীনে বাঙ্গালী যুবকদের শিক্ষানবিশি।

(২৩) মৃত দুঃখীদিগকে পোড়াইবার জন্য চাঁদা-সংগ্রহ।

(২৪) নিঃসহায়া হিন্দু-বিধবাগণের নিমিত্ত ধন-সংগ্রহের আয়োজন।

(ঐ অব্দ, সপ্তম সংখ্যা)।

(২৫) শবদাহের ঘাটে দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়ন।

(২৬) দাস-দাসীদিগকে প্রশংসাপত্র-প্রদানের আবশ্যকতা।

(২৭) জ্বালানি কাঠের অধিক মূল্য। তৎপূর্ব্বে এক টাকায় ১০/ দশ মণ বিক্রীত হইত।

(২৮) ইংরেজি ভাষা শিখিবার অগ্রে বাঙ্গালী বালকগণ, যেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, এই নিমিত্ত প্রয়াস।

(ঐ অব্দ, অষ্টম সংখ্যা)।

(২৯) পক্ষী কর্ত্তৃক মানব-শিশু-অপহরণ।

(৩০) হিন্দুদের স্থপতিবিদ্যা।

(৩১) "কলিরাজার যাত্রা" নামক নূতন নাট্যাভিনয়।

(৩২) অভয়াচরণ মিত্রের নিজ গুরুদেবকে পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০৲) টাকা প্রদান।

(৩৩) কলিকাতার ধনী বাবুদের নিকটে কোন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের অসমসাহসিক কার্য্য।

(১৮২২ খৃষ্টাব্দ)।

এই বার যে অব্দের বর্ণন করিতে হইবে, সে সময়ের কোন নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কি কি প্রবন্ধ বা সমাচার, "সংবাদ-কৌমুদীর" কলেবরে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার সূচনার কিছুমাত্র গন্ধ-বাষ্পও পাই নাই।

(১৮২৩ খৃষ্টাব্দ)।

তৎপরে পর বৎসরের কথা অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের সংবাদ, আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে।

প্রবন্ধের নাম—(৩৪) "বিবাদ-ভঞ্জন"। ইহা, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত "বঙ্গীয় পাঠাবলীর" তৃতীয় ভাগে ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ইংরাজি প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা-পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

(১৮২৪ খৃষ্টাব্দ)।

ইহার পরের (১৮২৪ খৃষ্টাব্দের) তালিকা, অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ। এই বর্ষ, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা প্রবন্ধ সংখ্যায় অধিক। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের চৌদ্দটী সন্দর্ভের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া গেল। কিন্তু ১৮২১ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না।

(৩৫) কোন চর্ম্মকার-পত্নীর যুগপৎ তনয়-ত্রয়োৎপাদন। তীর্থ-ভ্রমণ, ব্রত, নিয়ম এবং উপবাসেও ধনবান্দের পুত্র হয় না। সুতরাং ধনাঢ্যেরা পোষ্যপুত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। বর্দ্ধমানের রাজ্ঞীর পুত্রোৎপাদন-সময়ে দুই জন জ্যোতির্ব্বিদের বিভিন্ন কাল-গণনা।

(৩৬) চিৎপুরের এক সন্ন্যাসিনী-কর্ত্তৃক সন্ন্যাসীর প্রণয়িনীকামিনীকে সজীব অবস্থায় তাৎকালিক সন্ন্যাসীদের প্রথানুসারে মৃত স্বামীর সহিত মৃত্তিকায় প্রোথিত করার বর্ণনা।

(৩৭) অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বালিকার সন্তরণদ্বারা নিমতলার ঘাটে গঙ্গার পর-পারে গমন।

(৩৮) ভাগ্য-গণনা-কারী গুপ্তরত্নোদ্ধারক এক ব্রাহ্মণের শ্রীরামপুরে আগমন। এক গৃহস্থের নিকট তাঁহার ২০৲ কুড়ি টাকার পুরস্কার-প্রাপ্তি। গৃহস্থ, স্থানান্তরে গমন করিল, জ্যোতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গৃহস্থের পিত্তল-নির্ম্মিত এক রেকাব, মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলেন। জ্যোতির্বেত্তার গণনা দর্শনার্থ সাহেবদেরও শুভাগমন হইয়াছিল! কার্য্যান্তর-ব্যাপৃত গৃহস্থ স্থানান্তর হইতে সমাগত হইলে, শঠ গণক, মৃত্তিকা হইতে ঐ রেকাব খুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহাই "গুপ্ত-ধন" বলিয়া পরিচয় দিলেন। দর্শকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতারণা-প্রকাশ হইল। ব্রাহ্মণ স্বয়ং, কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে মাটির ভিতর রেকাব পুঁতিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্র হইয়া গেল। হস্তপদবদ্ধ ব্রাহ্মণকে পথে নিক্ষেপ।

(৩৯) হাতপুর-পরগণায় প্রকাণ্ড সর্প ধৃত হয়। তদ্গর্জ্জনে বৃক্ষ কম্পমান হইয়াছিল।

(৪০) তারকেশ্বরে এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক জীব-বধ। পত্নীর ধর্ম্মনাশে এই ঘটনা ঘটে।

(৪১) জগন্নাথ-ঘাটে কৃচ্ছ্র-কর্ম্মকারী এক ঊর্দ্ধচরণ সন্ন্যাসী। তৎকালে ঐ ঘাট, সন্ন্যাসীদের আশ্রম-স্বরূপ ছিল।

"বঙ্গীয় পাঠাবলী" পুস্তকের তৃতীয় ভাগ এবং এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে নিম্নে ৭ সাতটী প্রবন্ধের উদ্ধার করা গিয়াছে। এখানে "পাঠাবলীর" যে ভাগের উল্লেখ করিতেছি, সেই "বঙ্গীয় পাঠাবলীর" তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। আর, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যে বাঙ্গালা-পাঠ্য-পুস্তকের বিষয় বলিতেছি, তাহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক।

(৪২) প্রতিধ্বনি।

(৪৩) অয়স্কান্ত বা চুম্বক-মণি।

(৪৪) মকর-মৎস্যের বিবরণ।

(৪৫) বেলুনের বিবরণ।

(৪৬) মিথ্যাকথন।

(৪৭) বিচার-বিজ্ঞাপক ইতিহাস।

(৪৮) ইতিহাস।

রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের সম্পাদিত "কৌমুদীর" প্রবন্ধ-পুঞ্জের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইবার ইহাই প্রকৃত অবসর। অনেক ব্যাপারই, এই সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে। একে একে তত্তাবতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) তিনি বিনা বেতনে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ করেন, অথচ আপনিই এতদ্বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি কর্ম্মোপদেশক, তিনি যদি কর্ম্মের অ-প্রবর্ত্তক হয়েন, তাহা হইলে তাহা কদাচ সুশোভন হয় না—তাঁহার বাক্য লোকের রুচিকর হয় না। সেই কারণেই তিনি কেবল কার্য্যের উপদেষ্টা ছিলেন না, স্বয়ংই তদ্ব্যাপারের প্রবর্ত্তক হইতেন। তাঁহার এক বেতনহীন বিদ্যামন্দির ছিল। ভূদেব বাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবু প্রভৃতি অধুনাতন গণ্য জনগণ, তত্রত্য ছাত্র ছিলেন।

(খ) বিনা মূল্যে দীনহীনদিগকে ডাক্তারি নিয়মে চিকিৎসিত করাইতে তিনি কি কম যত্নশীল ছিলেন?

বাঙ্গালীদের ভিতর সমাচার-পত্রের পাঠক, তখন তেমন আশানুরূপ ছিল না। তাই সংবাদ-পত্রিকায় লোকের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে, তাঁহাকে যত্নপর হইতে হইয়াছিল।

(গ) উত্তরাধিকারিত্বের বয়ঃক্রম-পরিবর্ত্তনে তাঁহার আগ্রহদৃষ্টে সিদ্ধান্ত করিতে, কাহারই কোন বাধা বা দ্বিধা ঘটিবে না। আইনে, দূরদর্শনে, প্রগাঢ় জ্ঞানে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

এই সূত্রে একটা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ বলিতেছি। তিনি কবিরাজি চিকিৎসার বিপক্ষ কি না—ইহার আলোচনা করা, মন্দ নয়। এখানে না হউক, অন্যক্ষেত্রে আমরা পরিচয় পাইয়াছি। তিনি স্বদেশীয় কবিরাজি চিকিৎসারও ভক্ত ছিলেন। ফলে, প্রকৃত বিষয়ের তিনি গুণ-পক্ষ-পাতিত্ব চিরজীবনই প্রদর্শন করিতেন। তাই বলিয়া বৈদিশিক উপকারী দ্রব্যমাত্রে তাঁহার বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষও দৃষ্ট হইত না। ডাক্তারি চিকিৎসাও, তাঁহার প্রাণের প্রিয় পদার্থ।

(ঘ) দান-শৌণ্ডতা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। তাই "কৌমুদীর" নানাস্থানে নানাভাবে তাহার অবতারণা।

(ঙ) দরিদ্রের দুঃখে হৃদয় কাঁদিত বলিয়াইতো শবদাহের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল?

(চ) কোন্ কালে রামমোহন, স্ব-দেশের প্রবল দুর্ভিক্ষের আতঙ্কে প্রমাদ গণিয়া তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করিতে বদ্ধকটী হইয়াছিলেন! এক্ষণে শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থ বৎসর পরে সেই অভাব বিদূরিত করিতে কতই গগন-ভেদিনী বাণী, রাণীর নিকট পত্রযোগে ও তার-যোগে প্রেরিত হইতেছে।

(ছ) বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ, যাদৃশ দেব-দেবী-দ্বেষী, রামমোহনের মন, তেমন অগুণে অমৌদার্য্য-দোষে পঙ্কিল ছিল না। তাহা হইলে তিনি দেবতা-প্রতিমার বিসর্জ্জনের সময় য়ুরোপীয়দিগকে, বেগে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া, মর্ম্মাহত হইতেন না। আর তদর্থে সংবাদ-পত্রের সাহায্য, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত না।

(জ) তাহার পর বৈবাহিক কৌলীন্য নিয়মের উপর খর দৃষ্টিপাত।

(ঝ) তখনও বাঙ্গালা নাট্যশালার সত্তা ছিল। তিনি ভবিষ্য ইতিহাসের অনেক বিষয়েই পথ প্রদর্শন করিতেন।

(ঞ) তত প্রাচীন সময়েও আগরাস্থিত তাজমহলের বিষয় সংবাদ-পত্রে অবতারণা।

(ট) স্বদেশের গুণ-কীর্ত্তনের অবসর, তাঁহার তীক্ষ্ণদর্শনকে কদাচিৎ অতিক্রম করিয়াছিল কি না, সন্দেহ-স্থল। সেই জন্যেই পাঁচ-বৎসরের শিশু, কোথায় ইংরেজি ও বাঙ্গালা শিখিয়া লোককে বিস্ময়ান্বিত করিতেছিল, তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণের চক্ষুর উপর ধরিলেন।

(ঠ) একটী বিষয়, আমাদের বিবেচ্য। হিন্দুর বৈধব্য-দুঃখ, তিনি দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা উন্মোচিত করিতে সচেষ্ট না হইয়া, তদুদ্দেশে কি কারণে ভিন্নপন্থার অনুসরণ করেন ?

(ড) অগ্রে স্বদেশীয়ভাষায় জ্ঞান না জন্মিলে, বিদেশীয় ভাষায়—ভিন্ন দেশীয় রীতিতে ব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা স্বল্প, এদিকে লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ।

কি কি উপাদান, রামমোহনের সংবাদ-পত্রের উপকরণ,—কি কি বস্তুতে "সংবাদ-কৌমুদীর" অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া অলঙ্কৃত থাকিত, এক্ষণে এখানে তদ্বর্ণনে ব্যাপৃত হওয়ার অবসর উপস্থিত। সমাজনীতি ও রাজনীতি, ইতিবৃত্ত ও পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদিই "কৌমুদীর" সমবায়ী কারণ। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের ইহা মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। চিকিৎসা-প্রথা, যাহাতে সমুন্নত হইয়া লোকের মহোপকার-সাধনে ব্রতী থাকিতে পারে, তৎপক্ষেও "কৌমুদীতে" আন্দোলন ও অনুশীলনের আলোচনা ও উদ্দীপনার ত্রুটি ছিল না। ফলতঃ, নানা হিতকর ব্যাপার, বিধিমতে উহাতে সমর্থিত হইত। তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থও না থাকিত, এমন নয়। সংবাদ, প্রেরিত পত্র প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের অস্থি-মজ্জা বলিলেই হয়। সেগুলিও যে উহাতে ছিল না, কে বলিবে ? প্রথম শ্রেণীর বার্ত্তাবহে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় "কৌমুদীতে" তাহার অভাব থাকিত, এ কথা-প্রচারে কাহারই সাহস কুলায় নাই।

রামমোহন রায় যে, "সংবাদ-কৌমুদীর" প্রচারের মূলীভূত হেতু—তিনিই উহার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, তাহা কাহাকেও জ্ঞাত করিতে কস্মিন্ কালেও তাঁহার স্পৃহা বা প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু তাঁহার নামের ও কার্য্যের কেমন এক কুহক ছিল, যাহাতে প্রায় সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিত। "সংবাদ-কৌমুদীর" সুসম্পাদনে সামাজিক সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—মন ভুলিল। সুতরাং কোন্ মহান্ জন, এই প্রশংসনীয় বিষয়ে লিপ্ত তাহার অবধারণে লোকের মতি হইল। লেখার ভঙ্গী, বিচার-প্রণালী, বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি দেখিয়াই মানুষের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকৃত ব্যাপার হইয়া উঠিল।

রামমোহন রায় "কৌমুদীর" জন্মদাতা। আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উহার পালক পিতা। রায় রামমোহন ও বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ, এই দুই জন "কৌমুদীর" জন্মাবধি প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এটী একটী মণি-কাঞ্চন-মিলন "কৌমুদীর" প্রথমকার এই অদৃষ্ট লিপি, বিধির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বুঝি বিরিঞ্চি বিরলে থাকিয়া নৈপুণ্য-সহকারে উহার লিপি-রচনায় মন দিয়াছিলেন। কিন্তু অতি অধিক দিন "কৌমুদীর ভাগ্যে যুগলের যুগ্ম যত্ন সান্ত্বনা-সম্ভোগ লেখেন নাই। অল্প কাল পরেই "কৌমুদীকে" এক সাঙ্ঘাতিক আঘাত সহিতে হইল।

প্রথম জনের অভিলাষ হইল, "কৌমুদী" সহমরণ-বিদ্বেষিণী হয়েন। দ্বিতীয়ের চিত্তপ্রবৃত্তি তদ্বিপরীত। সুতরাং কার্য্য-গতিকে ঘটনা-চক্রে উভয়ের মনোবাদ ঘটিল। এই বারই "কৌমুদীর" প্রমাদ-ঘটনার সম্ভাবনা হইল।

প্রথম প্রথম সহমরণ-আন্দোলনে ভবানীচরণকে তত বিচলিত করিতে পারে নাই। অথবা তিনি "কৌমুদীর" মমতায় মোহান্ধ ছিলেন, তাহার জন্যই তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। পরে যতই আন্দোলন-তরঙ্গের বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল, তখনই দুয়ে ছাড়াছাড়ি ঘটিল। বিরহ-বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম সুর উঠিল। প্রবল কোলাহল ও ক্রন্দনের কাতর রোল, গগনভেদ করিয়া অনন্তশূন্যে মিশিল।

চারি বৎসর পূর্ণ না হইতেই, পালক পিতা, অসময়ে "কৌমুদী" ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি "কৌমুদীর" অনুজাতা "চন্দ্রিকার" সৃষ্টি করিয়া, তাহারই সংবর্দ্ধনায় প্রবৃত্ত রহিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ "চন্দ্রিকার" জন্মবৎসর।

"কৌমুদী" হইতে রচনার নমুনা-স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত হইল।

সংবাদ-কৌমুদী ১৮৩২।৪ঠা ফেব্রুয়ারির পূর্ব্ব-ঘটনা।

"শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েষু—

আমারদের দেশ এবং আমরা যে পর্য্যন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীন হইয়াছি ও হইয়াছে, সেই অবধি আমরা অনেক উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়াছি। বরং বরগী হঙ্গাম এবং মারহাটার অত্যাচার আমারদের অনেকের মনেও উদয় হয় না। কিন্তু ডাকাইতের ভয়ে আমরা চিরদিনেই শশব্যস্ত রহিয়াছি। যদিও ডাকাইতি অবিরতই হইতেছে। বৎসরের মধ্যে পাঁচমাস অর্থাৎ আষাঢ়াবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ভয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। যেহেতুক ঐ কএকমাস নদী প্রভৃতি প্রায় জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং ক্ষেত্রাদিতেও ধান্য ও জল রহিয়া থাকে। সুতরাং ডাকাইতেরা সেই কএক মাস পথের দুর্গমতা হেতুক প্রায় যাতায়াত করিতে পারে না; কিন্তু অবশিষ্ট সাত মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ অবধি জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দস্যুরদের অত্যন্ত অত্যাচারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ কএক মাস বিশেষতঃ অন্ধকাররজনীতে গৃহস্থেরা রাত্রিকালে প্রায় নিদ্রাবস্থায় থাকেন না। যদিও আমরা ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ব্বাপেক্ষা ডাকাইতের অনেক মতে দমন হইয়াছে, তথাচ আমরা তাহারদের অত্যাচারের ভয়কে অত্যন্ত নিকটে দেখিয়া থাকি। এক্ষণে ডাকাইতের এবং রাত্রিরও দীর্ঘতা বিলক্ষণ আছে। সুতরাং এ সময় ডাকাইতেরদের হুসারের সীমা নাই। এমতে আমরা অধিপতিরদের

প্রার্থনা করিতে পারি যে, অন্য অন্য বিষয়ে যেরূপে আমারদের ক্লেশের শান্তি করিয়াছেন, সেই মতে আমারদের এই দুঃখেরও বিমোচন করুন। যেহেতুক ডাকাইতিকে আমরা সাধারণ জ্ঞান করি না। কারণ ডাকাইতি হইলে আমারদের বিভবেরই হানি হইবেক, এমতও নহে। বরং তাহারা জীবনেরও একবারে শেষ করিবেক। অনেক মতে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। অতএব শরণাগত প্রজারদের এরূপ দুঃখের একেবারে নিবারণচেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টকে ন্যায্য হয়। কিমধিক নিবেদনমিতি। পল্লিগ্রামনিবাসিনঃ।”

আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্দ্বারা তৎসময়ের ভাষা ও লোকের মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে। যে সময়ের রচনা প্রদর্শিত হইল, তখন “কৌমুদী” সম্পাদক রাজা রামমোহন রায়, বিলাতপ্রবাসী। পাঠকগণ মনোযোগ করিলে লক্ষ্য করিতে পারিবেন—তাঁহার রচনা অপেক্ষা এই রচনা প্রাঞ্জল।

“শ্রীযুত কৌমুদী প্রকাশকেষু।

“গত বৎসর কলোনিজেসিয়নের উপকার বিষয়ে আপনি যথেষ্ট লিখিয়াছেন, তথাচ আমি কিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাই, আপনি প্রকাশ করিবেন। কোন কোন ব্যক্তি সংশয় করিবেন যে ইঙ্গরেজ লোকেরা পল্লীগ্রামে গিয়া দীন-দরিদ্র প্রতি দৌরাত্ম্য করিবেন, এরূপ চিন্তা বৃথা; যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের কি ফল দর্শিবেক। সুতরাং অকারণে কে কাহাকে পীড়া দিয়া থাকে। গোরা লোকেই এতদ্দেশীয়দিগকে প্রহার করে, এমত নহে। এদেশীয়েরাও ঝগড়াতে ন্যূন নহেন। পোলিসের নিষ্পত্তিপত্র পুস্তক অবলোকন করুন, তাহাতে অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, কত মোকদ্দমা গোরাসংক্রান্ত থাকে, আর কত মোকদ্দমাতেই বা এদেশীয়েরা বেষ্টিত। বিশেষতঃ গোরা দেখিয়া সকলেই ইচ্ছা করেন যে, প্রতারণা করিব, সুতরাং কাহার অন্যায় অধিক, বিবেচনা করিবেন। কয়েক দিন হইল একজন জাহাজাধ্যক্ষকে গঙ্গামধ্যে এদেশীয় লোক, এমত প্রহার করিয়াছিলেন যে, সন্তরণ দ্বারা আপন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, ইহা কি সংশয়কারী অবলোকন করেন না। কলিকাতার বাঙ্গালিরা সম-সমাধি-রূপে ইঙ্গরেজদের সহিত কারবার করিতেছেন, তাহার কারণ এই যে, অনেকানেক ইঙ্গরেজ, প্রতিদিন দেখিতে পায়, পল্লীগ্রামে ইঙ্গরেজ নাই।—ইঙ্গরেজ সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে এরূপ ভয় চিত্ত হইতে বহিষ্কৃত হইবেক। তাহা অপকার জন্য নয়, গোরা আসিয়া কৃষিকর্ম্ম করিবেক; এরূপ অলীক বার্ত্তা কাহার নিকট শুনিয়াছেন। ও সকল গোরা কৃষকের প্রতিপালন ৩০।৪০ মুদ্রা ন্যূনে হইতে পারে না। আর প্রদেশীয় কৃষাণ, অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং গোরা কৃষাণ কেন আনিবেন? কোন নীলকর সাহেব, গোরা কৃষাণে কর্ম্ম করাইতেছেন। কলোনিজেসিয়ান্ দ্বারা উপকার এই যে, কৃষাণেরা অধিক মূল্য পাইবেক, অথচ শ্রমের অনেক খর্ব্বতা আছে। নানা কর্ম্মে শিক্ষিত হইবেক ও কর্ম্মের পারগতাতে পুরস্কার সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্যেই ইঙ্গরেজের কর্ম্ম করিতে সকলে ইচ্ছুক। অন্য পরে কা কথা? ইঙ্গরেজের মধ্যে চর্ম্মকারকের কর্ম্মেতেও নিযুক্ত হইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন ও তৎপ্রসাদাৎ এক্ষণে নামলব্ধ অক্লেশে হইয়াছেন॥ অধিক লিখিবার প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যৎ লেখা যাইবেক।”*

১২৩৭ সালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) “মোসলমানের শরারা† হিন্দুদের দোষের বিচার বা দণ্ড-বিধান”-নিবন্ধন এই “সংবাদ-কৌমুদীর” সম্পাদক ও কতিপয় পত্র-লেখক ইহাতে অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

* সংবাদ-প্রভাকর, (১২৪৭ সাল), ২৪এ ফাল্গুন।
† “শরা” অর্থে “কোরাণের” অধ্যায়।

বৈষ্ণব-কবি জগদানন্দ।

(তাঁহার খসড়া ও পদাবলী)।

বিগত কার্ত্তিক মাসে সাহিত্য-পরিষৎ-সভার শাখা প্রাচীন গ্রন্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড প্রভৃতি গ্রামে গমন করি। সেই প্রদেশে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার তালিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়-সমীপে প্রেরিত হইয়াছে।

এই শ্রীখণ্ড গ্রামে বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নরহরি সরকার, রায়শেখর ও জগদানন্দ প্রভৃতি বঙ্গভাষার কবি। জগদানন্দ ঠাকুরের জীবনী তাঁহার খসড়া ও পদাবলী যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, অদ্য আমরা তাহাই পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব।

বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীখণ্ড গ্রামে পাঁচজন মহাপ্রভুর প্রধান ভক্ত ছিলেন—এই ভক্ত-পঞ্চকের নাম—নরহরি, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন। নরহরি ও মুকুন্দ উভয়ে সহোদর ভ্রাতা, রঘুনন্দন মুকুন্দের পুত্র, ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য, উপাধি সরকার, বর্ত্তমান কালে রঘুনন্দনের বংশীয়গণ ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আমাদের বর্ণনীয় জগদানন্দ ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পরে (১৪৩১ শকাব্দের পরে) জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের পুত্র মদনরায় ঠাকুর। এই মদনরায়ের পাঁচ পুত্র, যথা—

"জয় জয় মুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্পমাধুরী॥
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাই। ত্রিভুবনে যাঁর বংশে তুলনা দিতে নাই॥
জয় শ্রীরায়ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুণধাম॥"

(রসকল্পবল্লী।)

এই ভ্রাতৃপঞ্চকের অন্যতমের চারি পুত্র জন্মে—প্রথম জগদানন্দ, দ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ, তৃতীয় সর্ব্বানন্দ এবং চতুর্থ কৃষ্ণানন্দ। ইঁহাদিগের পিতা কোন বৈষয়িক কার্য্যবশতঃ শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী আগরডিহি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত পৃথক্ হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোকলাই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই জোকলাই গ্রামে জগদানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। এখানে প্রতি বর্ষের ভাদ্রশুক্লা দ্বাদশীতে জগদানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে।

জগদানন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে তিনি রঘুনন্দন ঠাকুরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং বর্ত্তমান কালের তদ্বংশীয়গণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন

এইমাত্র প্রমাণ পাইয়াছি। রঘুনন্দনের জন্ম যদি ১৪৪০ শকাব্দ ধরা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ১৮২০ শকাব্দের ৩৮০ বর্ষ পূর্ব্বে রঘুনন্দনের জন্মকাল নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান কালে তদ্বংশীয় ঠাকুরসন্তানগণ রঘুনন্দন হইতে দশম পুরুষ এবং জগদানন্দ হইতে পঞ্চম পুরুষ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৩৮০ বর্ষের অর্দ্ধেক ধরিয়া লইলে ১৯০ বর্ষ পূর্ব্বে জগদানন্দের জন্মকাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১৬৩০ শকাব্দের পর তিনি জীবিত ছিলেন।

মালিহাটীনিবাসী রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্র নামক একখানি পদের সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের পদসংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী তখনও প্রচারিত হয় নাই বলিয়া ঐ গ্রন্থে জগদানন্দের একটী পদও সংগৃহীত হয় নাই। পদামৃত-সমুদ্রের অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণবদাস (নামান্তর গোকুলানন্দ সেন) পদকল্পতরু সংগ্রহ করেন। তাহাতে দেখা যায়, তিনি জগদানন্দের চারিটীমাত্র পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব রাধামোহন ও গোকুলানন্দের সময় নিরূপিত হইলেও জগদানন্দের সময় নিরূপিত হইবে।

রাধামোহন ঠাকুর মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। তিনি একবার শাস্ত্রার্থ বিচারে জয়লাভ করিয়া মীরজাফরের মোহরাঙ্কিত একখানি জয়পত্র লাভ করেন, তাহাতে বাঙ্গালা ১১২৫ সালের উল্লেখ আছে এবং রাধামোহনের জন্মস্থান মালিহাটীতে গমন করিয়া, আমরা শুনিলাম রাধামোহন মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পরেও ২।৩ বৎসর জীবিত ছিলেন।

১১২৫ সালে (১৬৪০ শকে) রাধামোহন শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া জয়পত্র লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কাল ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বা ১৬৯৭ শকাব্দ। ইহার ২।৩ বৎসর পরে যদি তাঁহার মৃত্যুকাল ধরা যায়, তবে রাধামোহন ১৭০০ শকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

পদকল্পতরুসঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ মালিহাটীর এক ক্রোশ পূর্ব্বে টেঞা নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাধামোহনের সমকালবর্ত্তী ছিলেন; সম্ভবতঃ গোকুলানন্দ রাধামোহন ঠাকুরের সহিত কীর্ত্তন গান করিতেন। পদকল্পতরুর উপসংহারে গোকুলানন্দ লিখিয়াছেন—

"শ্রীআচার্য্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন। কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস। যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার। পূর্ব্ব রাগাদিক্রমে চারি শাখা যার॥"

এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইল যে জগদানন্দ গোকুলানন্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩০ শকের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে বা পরে জীবিত ছিলেন।

জগদানন্দ পদাবলী ব্যতীত অন্য কোন মূলগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না;

তবে তাঁহার খসড়াখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি "ভাষাশব্দার্ণব" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। এই গ্রন্থের ২, ৩ ও ৪ সংখ্যক পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। কাব্যখানির যতদূর পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কবিবর জগদানন্দ ককার অনুপ্রাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি পদ নিবদ্ধ করিয়া তাহাই প্রথম কল্লোল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই কল্লোলের (অধ্যায়ের) নাম কাদি দিগ্দর্শন। এই প্রথম কল্লোলের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম দুই পংক্তি এই—

"কংস-কুঞ্জর-কেশরী করি-কুম্ভ করজে বিদার।
করভ করভুজ কোরে কুলবতী করব কেলি বিহার॥"

এই কল্লোলের শেষ দুই পংক্তি পাঠ করিলে, এরূপ গ্রন্থপ্রণয়নের কারণও জানিতে পারা যায়—

"করহ কবিকুলকণ্ঠে কবিতা করিতে মন যদি ধায়।
কৃষ্ণকৌশল কাব্য করইতে জগত-আনন্দ গায়॥"

প্রতি অধ্যায়ের শেষে—

'ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণকমলাশ্রিতেন কেনচিদ্বিরচিতে ভাষাশব্দার্ণবে
কাদি-দিগ্দর্শনোনাম প্রথমঃ কল্লোলঃ।'

ইহার দ্বিতীয় কল্লোলের নাম খাদি-দিগ্দর্শন। তাহার প্রথম দুই পংক্তি এই—

"খলখগেশ্বর খোয়লি এত দিনে খঞ্জনলোচনী রাই।
খীন খঞ্জননয়নী খনে খনে খনিক নিরখহ যাই॥"

শেষ দুই পংক্তি—

"খোভ মীটব খেদ কর চিতে সকল কবিকুলচন্দ্র। খণ্ডবাসিয়া খণ্ডকপালিয়া কহল জগদানন্দ॥"

তৃতীয় কল্লোলের নাম গাদি-দিগ্দর্শন, তাহার প্রথম দুই পংক্তি—

"গঙ্গাগরভ গভীর গহ্বরে গদাই গৌর বিরাজ। গৌরগণ মেলি গৌর গুণগণ গড়ল গান সমাজ॥"

প্রাপ্ত খসড়াখানিতে ভাষাশব্দার্ণব কাব্যের তৃতীয় কল্লোল গাদিদিগ্দর্শন সম্পূর্ণ হয় নাই, এ জন্য শেষের অংশটী দেখান হইল না।

যে খসড়াখানির কথা বলা যাইতেছে, তাহার পত্রসংখ্যা ২১, ইহা পাঠ করিলে জগদানন্দের কাব্য রচনার অনেক রহস্য অবগত হইতে পারা যায়। যেমন মালাকরগণ কতকগুলি নানা জাতীয় কুসুম চয়ন করিয়া একখানি ডালার উপরে সংস্থাপনপূর্ব্বক মালাগুম্ফনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেখানে যে ফুলটী গাঁথিলে ভাল দেখায় সেই স্থানে সেই ফুলটী গুম্ফন করে। আমাদের কবি জগদানন্দও সেই প্রকার প্রথমত কতকগুলি শব্দ সঞ্চয় করিয়া তাঁহার খসড়ায় লিখিয়া রাখিতেন, পরে কবিতারচনাকালে যেখানে যে শব্দটী প্রয়োগ করিলে পাঠকের শ্রবণ-প্রীতিকর হয়, তিনি তাহাই করিতেন। তাঁহার খসড়াখানিতে তিনি যে সকল শব্দ সংগ্রহ

করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা অনেক। তবে তাহার একখানি পত্রে যে শব্দগুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল,—

"কৃষ্ণ, বিষ্ণু, তৃষ্ণ। দীন, খীন, চীন, হীন, মীন, পীন, ভীন, লীন। কাম, ধাম, গ্রাম, জাম, ঠাম, দাম, নাম, রাম, শ্যাম। কোক, টোক, লোক, শোক। খেদ, ছেদ, বেদ, ভেদ, স্বেদ। কঞ্জ, খঞ্জ, গঞ্জ, ভঞ্জ, রঞ্জ। কুঞ্জ, গুঞ্জ, জুঞ্জ, পুঞ্জ, ভুঞ্জ, মুঞ্জ। গঞ্জি, পঞ্জি, ভঞ্জি। ওর, কোর, গোর, ঘোর, চোর, ছোর, জোর, ঝোর, ঠোর, ডোর, তোর, থোর, ভোর, মোর, নোর, সোর, হোর। কীর, খীর, গীর, চীর, তীর, থীর, ধীর, নীর, পীর, ফীর, বীর, হীর। কেশ, বেশ, ঠেশ, দেশ, রেশ, লেশ, শেষ। তোষ, দোষ, পোষ, রোষ, শোষ। আশ, ত্রাশ, দাস, নাশ, পাশ, ফাশ, বাস, ভাষ, লাস, মাস, রাস, শ্বাস, হাস। খণ্ড, গণ্ড, চণ্ড, দণ্ড, ভণ্ড। অমল, বিমল, কমল, যুগল, চপল, টলল, তরল, ঘামল, ঘূমল, চূমল, ধূমল, ধমিল, ধোয়ল, বিরল, সরল, গরল, ঘেরল, হেরল, কষিল, ঘষিল, ধসিল, পসিল, রসিল, হসিল, মিলল, খলল, গলল, চলল, ছলল, জলল, ঝলল, টলল, দলল, ফলল, বলল। কোল, গোল, চোল, ডোল, ঢোল, দোল, রোল, ভোল, মোল, লোল, বোল। কোপি, গোপি, রোপি, সোঁপি। গহন, দহন, বহন, সহন। অলক, ঝলক, তিলক, ভালক, পলক, ফলক, ললক, হলক। খুধা, সুধা, বিবুধা। কামিনী, গামিনী, জামিনী, দামিনী, ধামিনী, ভাবিনী, ভামিনী, সামিনী। অঞ্জন, খঞ্জন, গঞ্জন, ভঞ্জন, রঞ্জন। অঞ্জল, গঞ্জল, ভঞ্জল, মঞ্জুল। কুঞ্জর, গুঞ্জর। গঞ্জিত, ভঞ্জিত, রঞ্জিত, সঞ্জিত। পঞ্জর, জাঞ্জর, মঞ্জরী। গঞ্জক, ভঞ্জক, রঞ্জক। অঞ্চল, চঞ্চল, বঞ্চল, সঞ্চর, বঞ্চক, কঞ্চুক, পঞ্চক, চঞ্চুক, কাঞ্চন, বঞ্চন, সঞ্চয়, চঞ্চলা, বঞ্চিত, কুঞ্চিত, মুঞ্চিত, পিঞ্ছ। বসুধাসুধাকর। পতিতকগতি। তাপিপতিত কুমুদকুমুদপতি। গুণগণউদধি। রসিক-হৃদয়পয়োনিধি। ভকতক নয়ন-চকোর-সুধাকর। কুলবতি-নয়ন-চকোর-সুধাকর। কুলবতি-তৃষিত-নয়ন-মধুপাবলী-চুম্বিত-মুখ-অরবিন্দ। অরুণ, করুণ, তরুণ, বরুণ। প্রেম, হেম। বিগলিত, বিচলিত। মাধুরি, চাতুরী। কম্প, চম্পক, ঝম্প। অন্ত, অন্তিক, অন্তর, কান্ত, কান্তি, শ্রান্ত, শান্ত, সন্ততি, নিতান্ত। মন্ত্র, তন্ত্র। কুণ্ডল। আনন্দ, নন্দনন্দন। চন্দ্র, চন্দন, দ্বন্দ, ধন্ধ, বন্দিত, নন্দিত, নিন্দিত, মন্দমন্দ, বৃন্দ, বৃন্দাবন, সুন্দর। কুন্দ, বিন্দুবিন্দু, কন্দ, কান্দে। অন্ধ, গন্ধ, ধন্ধ, বন্ধ, রন্ধ।"

খসড়ার অন্যান্য পত্রগুলিতে কোন স্থানে কবিতার এক চরণ, কোন স্থানে দুই চরণ, বা কোন পদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি পত্রে এইরূপ পদের দুইটী করিয়া চরণ দেখা যায়—

"রুচি জিতল দামিনী, ব্রজকুলজ-কামিনী। চকিত মৃগলোচনী, নব যুবতিসঙ্গিনী॥
নিখিল দুখমোচনী, গুপত চলুঁ রঙ্গিণী। মদন মনোমোহিনী, মিলিত মধুভাষিণী॥
মদন-মনুহারিণী, মধুর মৃদুভাষিণী। নীলপটধারিণী, চরণ-মণিকিঙ্কিণী॥
চলনি গজগামিনী, মৃদুলতর ঝঙ্কিণী। মধুর মধুযামিনী, জিতল জগ-লাবণী।
বরশবদ কামিনী, রণিত মণিকিঙ্কিণী।—"

অন্যত্র কোন কোন স্থানে পদের শেষ চরণ দুই চারিটী রচনা করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়,—

"তরল গুরু কদল তরু জিতল উরুরাজে।"

বোধ করি এটী কবির মনোনীত হয় নাই বলিয়া, ইহার পরেই এই পদাংশই অন্য প্রকার লিখিয়াছেন,—

"যুগল গুরু কদল তরু জিতল উরুরাজে। সুতনু তনু অতনু মনুমথন মনুহারী।"

ইহারও অন্য প্রকার আবার এইরূপ—

"অখিল মনুমথন মনুমথনমনুহারী। তরণিকর তরুণবর অরুণকরধারী।"

আর একখানি পত্রে কতকগুলি পদের কেবল শেষ চরণ লিখিত আছে—

"ভবনতেজি আবই রে। মধুর অধরে ধরি বাওই রে। পরিমল দশদিশে ধাবই রে। আকুল সুললিত গাবই রে। আকুল কুল নাহি পাবই রে। যুবতি সঘন দরশাবই রে। জগদানন্দ চিতে ভাওই রে। মনমথ মন মুরছাবই রে। ভুরু ধনু সঘন ধুনাবইরে।"

এই প্রকার যে পত্রখানি পাঠ করা যায়, তাহাতেই জগদানন্দের নূতন নূতন পদের এক চরণ দুই চরণ বা চারি চরণই দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোন কোন পত্রে পূর্ণ পদও পাওয়া যায়। একস্থানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনের কএকটী পদ দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণই আছে; পদটী এই—

"ইন্দীবর বর, গরভ গরবহর, রুচির কলেবর কাঁতি।
চাঁচর চিকুর চূড়পরি চঞ্চল মোর শিখণ্ডক পাঁতি॥
জয় জয় জয় বিরিন্দাবন চন্দ।
কুলবতিতৃষিত-নয়ন-মধুপাবলী-চুম্বিত-মুখ-অরবিন্দ॥ ধ্রু॥
উছলিত অলিক সঝম্পিত চুম্বনে কম্পই লম্বিত মাল।
অধর সুধাকণ মিলিত সমীরণে বাওই বেণু রসাল॥
ভাবিনী সরম-ভরম-ভয়-ভঞ্জন ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ চিতে নিতি পহুঁ বিহরতু ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গ॥"

"এই পদটীর প্রথম চরণ ও অন্যান্য কোন কোন অংশ এই খসড়ার স্থান বিশেষে রূপান্তরে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় কবি প্রথম সেই রূপই বর্ণন করিয়াছিলেন, পরে পদ নিবন্ধনকালে সেই অংশই আবার প্রকারান্তর করিয়া ইহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

এই পদের প্রথম চরণটী প্রথম লিখিবার সময়ে "নব ইন্দীবর-উদর-গরবহর" এইরূপ লিখিয়াছিলেন, পরে যখন তাহা একটী পূর্ণ-পদরূপে লিখিয়া শেষ করিলেন তখন উহাতে—

"ইন্দীবর বর, গরভ-গরব-হর"

-এইরূপ লিখিত হইল। জগদানন্দের খসড়ার বিষয়ে বলিবার অনেক কথা থাকিলেও আমরা অদ্য এই স্থানেই তাহার উপসংহার করিলাম।

এক্ষণে আমরা জগদানন্দের পদাবলীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

জগদানন্দের পদাবলী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত ও সাধারণ। একই বর্ণের অনুপ্রাসযুক্ত পদগুলি বাহ্যচিত্র নামে অভিহিত, ইহা কবির নিজের লেখা দৃষ্টে অনুমিত হয়। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"অথ বাহ্যচিত্র গীতং" তিরোথা ধানসী।

কিতব কেশব কুশল কি কহব কঞ্জলোচনী রাই।
কি জনি কতি খনে কব কি হোওব কহিতে আয়লুঁ ধাই॥
কুসুম কার্ম্মুক কোপে কাতর কেলিকুঞ্জে লোটাবই।
কুলকলঙ্কিনী কি কহু কা দেই কহিতে কিছুই না ভাওই॥
কান্তকাহিনী কহিতে কান্দই কহই ঐছন তোয়।
কুলজ কামিনী কুপথগামিনী কয়লি কী ফল মোয়॥
কঞ্জনয়নীক কণ্ঠে কেবল কেলি করত পরাণ।
কোরে করইতে কাঁপে কলেবর জগত আনন্দভাণ॥

এই পদটী কেবল "ক" বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে—

"খেম কি কহব খলখগেশ্বর খোয়লি এতদিনে রাই।
খীন খঞ্জননয়নি খনে খনে খনিক নিরখহ যাই॥
খলিত দিঠিজলে খৌম ভীগল খোভ কোন মিটাবই।
খেদ কি কহব খিপত সমগতি খীর-নীর না খাবই॥
খসল কুন্তল খৌনি বিলুঠই পেখি ঐছন ভায়ই।
খসঞে খিতিতলে খীন শশি খসি পড়ি ধূলি লোটাবই॥
খোলি খরতর খরগ খঞ্জর মদন মারত ধাবই।
খণ্ডকপালিয়া খণ্ডবাসিয়া জগত-আনন্দ গাবই॥"

ইহা "খ" বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ গ ও ঘ প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা চিত্রিত পদাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্য প্রকার যথা বিভাষ—

উদিতারুণ হসিত নলিন, মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন,
হতশায়ক দুখদায়ক রতিনায়ক ভাগে।
শূতল থলজলরুহদল, তড়িত জড়িত জলধরতুল,
মুখঝামর ধনি শ্যামর নিশিপ্রাতর ভাগে॥
বিগত বসন-ভূষণ সাজ, অচেতন রহু নিলজ-রাজ,
গিরিধারিম বহুগারিম, রহু কারিম দাগে।
বদন জিতল শরদ-ইন্দু, ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু,
নিশিজাগরি রসসাগরি বরনাগরি আগে॥

ফুকরত শুকসারিক বহু, কোকিল কুল কুহরই মুহু,
দেখ ভাবিনি গজগামিনি নহি কামিনি জাগে।
কহ সহচরি শ্রবণ ওর, পরিহর ধনি হরিক কোর,
কিএ দোষব তব তোষব যব রোষব রাগে॥
কি হেরসি হসি শয়ন রঙ্গ, বর নিরমল কুলকলঙ্ক,
যশধামিনি রুচিদামিনি কুলকামিনি লাগে।
সাজি কবরি ভূষণবাস, জগদানন্দ নবীন দাস,
কুরু চেতন সুনিকেতন চলু বেতন মাগে॥

তাঁহার কোন কোন কবিতায় "জগদানন্দ নবীন দাস" এইরূপ লিখিত আছে, ইহাতে বোধ হয় যে সেই সকল কবিতাই তিনি প্রথম রচনা করেন।

তথা—

"অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন সাজে।
কিজনি সজনি রজনী ভোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গতযামিনী জিত দামিনী কামিনীকুল লাজে॥
ফুকরত হত-শোক কোক, অব জাগব সবহুঁ লোক,
শুকশারীক পিক কাকলি নিধুবন ভরিও আজে।
গলিত ললিত বসন সাজ, মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ,
উচ কোরক রুচি চোরক কুচ জোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ ভাঁতি, দুঁহু শুতি সুখে রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস-বাদর পরমাদর শেজে।
বরজ কুলজ জলজ নয়নি, যুমল বিমল কমল বয়নি,
কৃত লালিস ভুজ বালিশ, আলিশ নাহি তেজে॥
টুটল কিএ ঘুণ ধনুগুণ, কিএ রতি রণে ভেল তুণ শূন,
সমর মাঝ পড়ল সাজ রতিপতি ভয়ে ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতিবৃন্দ, গুরুগণ অতি কহই মন্দ,
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে॥"

কবিবর জগদানন্দের বাহ্যচিত্রকাব্যের নমুনা দেখান হইল। ইহার পর অন্তশ্চিত্র কাব্য দেখান যাইতেছে।

আমরা দুইটী মাত্র অন্তশ্চিত্রপদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তাহাও ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য নহে। দুই এক স্থানের অর্থও সঙ্গত হয় না। তথাপি আমরা যেরূপ পদ দুইটী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই পাঠকমহোদয়গণ সমীপে উপস্থিত করিলাম।

"নর হ রি নাম অন্ত রে অছু ভাবহ হ বে ভবসাগ রে পার।
ধর রে শ্রবণে জীব হ রিনাম সাদ রে চিন্তামণি উ হ সার॥
যদি কৃ তপাপী আদি রে কহ মন্ত্রক রা জ শ্রবণে ক রে পান।
শ্রীকৃ ষ্ণ চৈতন্য বল্যে হ য় সেহ দুর্গ ম পাপ তাপ স হ ত্রাণ॥
কর হ গৌর গুরু বৈ ষ্ণ ব আশ্রয় ব হ নরহরি না ম হার।
সংসা রে নাম লই স কৃ ত হইয়া ত রে আপামর দু রা চার॥
ইথে কৃ ত বিষয় তৃ ষ্ণ পহুঁ নাম হ রা ত্তি ধারণেশ্র ম তার।
কুতৃ ষ্ণ জগদানন্দ কৃ ত কর্ম্ম দুস্থ ম তি রহল কা রা গার॥"

এই কবিতাটীর প্রতি পঙ্‌ক্তির তৃতীয়, নবম, পঞ্চদশ এবং একবিংশ বর্ণে চিত্র আছে। ইহা অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই কলিযুগ-পাবন মন্ত্র পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় চিত্র।

বীন মি লনে ত সুধ রি তুহুঁ স পতি অ নেক কেলি।
সিক আ সয়ে ন গণি ধ রম মা নিনী গা রিমা গেলি॥
সিত ব দনে ম জাল্যে ল লনা প রব ন্দ কত করি।
রি তিঅ লি সম ন কর গ মন ন ন্দের ন ন্দন হরি॥
প্র ণত ব নিতা এ সব যু বতি তু লনা আ সিবে কিসে।
ভু লাঞ্ঝা র মণী ক মল ন য়নী আ শাহ ত কল্যে শেষে॥
তু ষিয়া আ দরে ক তপ র কারে পা সর গ রব অন্ধ।
মি নতি কি কর রি তিনা চ লহ অ সুখী জ গদা নন্দ॥

এই পদ্যের প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, ত্রয়োদশ ও ষোড়শবর্ণে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে—

"নর হরি প্রভু তুমি। কি আর বলিব আমি॥
তন মন এক করি। চরণ যুগল ধরি॥
সমাপন তুয়া পাঅ। জগত আনন্দ গাঅ॥"

এই কবিতাটী লাভ করা যায়। কবিতা দুইটীতে যে নরহরি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহরি অর্থ কবির পূর্ব্ব পুরুষ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং শ্রীগৌরাঙ্গ। নরহরি শব্দের অর্থ যে গৌরাঙ্গ, তাহা মুরারি গুপ্ত কৃত কড়চায় লিখিত আছে। ইহার পরে কবির অনুকৃত পদের কথা বলা যাইতেছে—

জগদানন্দ প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের অনুকরণ করিয়া যে সকল পদাবলী রচনা করেন, তাহাই অনুকৃত পদাবলী নামে অভিহিত। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে শ্রীরাধিকার ভাব উল্লাসের একটী পদ আছে, এই পদটী সিংহভূপতির ভণিতাযুক্ত। কবিবর ঠিক এই পদের অনুরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভাব উল্লাসের একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন, এই পদটীর ছন্দঃ, ভাষা, সুর ও বিষয় সবই একপ্রকার আদর্শপদের কিঞ্চিদংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"রে রে পরম প্রেম সজনি, নয়নগোচর কৌন দিন জনি,
নাহ নাগর গুণক আগোর কলাসাগর রে।
যবহুঁ পিয়া মঝু ভওনে আওব, দূরে রহি মুঝে কহি পাঠাওব,
সকল তুখন তেজি ভূখন সমক সাজব রে॥
লাজ নতি ভয়ে নিকট আওব, রসিক ব্রজপতি হিয়ে সান্তায়ব,
কাম কৌশল কোপ কারজ তবহুঁ রাজব রে।" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত পদের অনুরূপ জগদানন্দের পদ—

"হোত মনহুঁ হুলাস সুলছন, বাম নিজভুজ উরজ ঘন ঘন,
ফুরই দুরসঞে প্রাণ পিউ কিএ অদুর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব, আগে নি লিখন সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূখণ সবহুঁ ভাওব রে॥
ত্রিপথ গামিনী তীর পিউ যব, অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তেজি কুচ কলস জোর অগোরি সাজব রে।
তবহিঁ হিয় মাহ হারপহিরব, বেণী ফণীমণি মালে বিরচব,
চলব জলছলে কলস লেই সব কলেশ ভাজব রে॥
নদীয়াপুর জয়তুর বাওব, হৃদয় তিমির সুদূর ধাওব,
ভকত নখতর মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে।
গৌর অঁগ যব আঁগন আওব, ঘুঁঘুঁট দেই তব নিকট যাওব,
দিঠি জলছলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে॥
রঙণ শয়নক ভওন পৈঠব, পীঠ দেই হসি পালটী বৈঠব,
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ দশদোখে দোখব রে।
পীন কুচ করকমলে পরশব, খীন তনু মঝু পুলকে পূরব,
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস রাখি রোখব রে॥
বাহগহি তব নাহ সাধব, সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুধই সুধাময় অধর পিবি পিউ পুন পিয়াওব রে।
মীন কেতন সমরে চেতন' হীন হোওব নিশি নিকেতন,
অবিরোধ বিন অনরোধ পিউ পরবোধ পাওব রে॥

মিটব কি হিয় বিষাদ ছল ছল, নয়নে পহুঁ যব তবহিঁ কল কল,
নাদ সুখদ সম্বাদ এক ধনি ধাই লাওল রে।
নাহ আওল এতনি ভাখন, মৃত সঁজীবন শ্রবণে পিবি পুন,
জগত ভনজনু জীবন মৃততনু জীবন পাওল রে॥

গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণ যথা—

অভিসার।

অবিরত বাদর, বরিখত দরদর, বহই তরলতর বাত।
বিষধরনিকর ভরল পথ অরুকত অজর বজর বিনিপাত॥
হরি হরি কৈছে চলব কুহুরাতি।
না বুঝত কণ্টক শঙ্কট বাটহি মার গোঙার বররাতি॥
যোপদ শরদ-কোকনদ দলহিঁ ধূলি পরশে সীতকার।
উচ নীচ কিচ বীচ অব সোপদ কৈছনে করব সঞ্চার॥
চলইতে চঙকি নগর পুর বাহির গুরু দুরুজন দুরবার।
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত জগদানন্দ নাচার॥

সাধারণ পদাবলী।

অভিসার।

কুঞ্জ বিকচ কুসুমপুঞ্জ, মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ, কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন গঞ্জিত চিকুরপুঞ্জ, মালতি ফুলমালে রঞ্জ, অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন-গতিহারী॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ, কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ-ভ্রূ-ভুজঙ্গ, কালী দমন-দমন রঙ্গ, সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীলশাড়ী॥
দশন কুন্দ-কুসুমনিন্দু, বদন জিতল শরদ ইন্দু, বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস, দেহ দীপিত তিমির নাশ, নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভূলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতীবৃন্দ, হেরি হেরি পড়ল ধন্দ, মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-নন্দন সুখকারী।
মণিমাণিক্য নথ বিরাজ, কনকনূপুর মধুর বাজ, জগদানন্দ স্থল-জল-রুহ চরণক বলিহারী॥

আমরা যথাসাধ্য জগদানন্দ ঠাকুরের জীবনচরিত ও তৎপ্রণীত পদাবলীর সঙ্কলন করিলাম। কিন্তু যে পরিমাণে তাঁহার জীবনীর উপাদান আমরা সঙ্কলন করিতে সমর্থ হই নাই, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক পরিমাণে তাঁহার কবিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্ব বড় সাধারণ নহে। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত হিতোপদেশসঙ্কলয়িতা বিষ্ণুশর্ম্মা মহোদয়ের মতে যে কাব্যশাস্ত্র-বিনোদনে ধীমান্‌গণের কাল সুখে কাটিয়া যায়, জগদানন্দের কাব্য তজ্জাতীয় কাব্যনিচয়ের মুকুটমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

মরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

অশীতি কোটি জীবের মধ্যে নরজন্ম দুর্ল্লভ। বিদ্যার অবিদ্যমানে সেই নরজন্মও অকিঞ্চিৎকর। সহস্র সহস্র বিদ্বন্মনুষ্যের মধ্যে একটি কবি মিলে কি না সন্দেহ। আবার সহস্র সহস্র কবির মধ্যে একটি শক্তিমান্ কবি অধিকতর সুদুর্লভ। এখন যে কবিত্ব চারিদিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে। সঞ্চরমান ভুবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্ব ও শক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত ও সাধারণ এই চারি শ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন উপরিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল পদাবলীতে যে কবিকুল-দুর্ল্লভ অত্যদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোকবিজয়িনী অসামান্যশক্তির পরিচয় আছে, কাব্যসমালোচক পণ্ডিতমাত্রই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্রপদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় প্রচুরশক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হন নাই। বাহ্যচিত্রাবলী প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্যান্য অন্তশ্চিত্র কবিতার চিত্রবর্ণাবলী দ্বারা দুই একটী শব্দ অধিকতঃ কবির নামেই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দো বন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশদ্বর্ণাত্মক তারকব্রহ্ম নাম জগদানন্দের চিত্র গাথা ভিন্ন অন্যের চিত্র কবিতায় কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনা চাতুর্য্য, কি শব্দবিন্যাস, কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোক তাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর। যেমন প্রস্ফুটিত ও সৌরভময় গোলাপকে নাড়াচড়া করিতে ভয় করে, পাছে তাহার সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের হানি হয়, জগদানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাদৃশ ভয় হইতেছে, এজন্য এই স্থলেই নীরব হইলাম।

উপসংহারে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন লেখক ও সমালোচক জগদানন্দের দুই একটী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জগদানন্দের পদের সংখ্যা দুই চারিটীর অধিক নহে এবং কেহ ইহাকে মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন, কেহ বা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের পিতা জগদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার প্রথমাবস্থার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি এবং সেই পাণ্ডুলিপির "খণ্ডবাসিয়া খণ্ডকপালিয়া জগদানন্দ ভাষই" এই পদানুসারেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তিনি যে কে এবং কোন বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এখন তাহা জানিতে শুনিতে কাহারই কষ্ট হইবে না।

শ্রীকালিদাস নাথ।

বাঙ্গালা পুথির বিবরণ।

দীঘাপতিয়া-রাজবংশীয় শ্রীমৎ কুমার শরৎকুমার রায় কএকখানি বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। পুথিগুলির পাতা বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকায় মিলাইতে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। মিলাইয়া যে কএকখানি পুথি বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। দুঃখের বিষয় অনেকগুলি পুথি খণ্ডিত। যে পাতাগুলি নাই, তাহার উদ্ধারের আশাও অল্প। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা রক্ষাও উপযুক্ত বোধ করিয়া নিম্নের বিবরণ প্রকাশার্থ পাঠাইলাম।

১। রামায়ণ—কৃত্তিবাস প্রণীত আদিকাণ্ডের কিয়দংশ, প্রথম ১৫ পত্র মাত্র। শেষ পাতায় হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান চলিতেছে। তারিখ নাই। প্রচলিত কৃত্তিবাসের সহিত মিলাইবার অবকাশ ঘটে নাই। আরম্ভে বন্দনাদি পর কৃত্তিবাসের এইরূপ পরিচয় আছে—

পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে। জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর। নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী। অনেক পাত্র পড়্যা রবে শ্রীরামপাঁচালি॥
শুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাশ। ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

২। রামায়ণ—অদ্ভুত আচার্য্যের রচিত। এই রামায়ণের চারিখানি পুথির কিয়দংশ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। দুই খানিতে আদিকাণ্ডের আরম্ভ, তৃতীয় খানি উত্তরকাণ্ডের কিয়দংশ, চতুর্থ খানি উত্তরকাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ। ভণিতায় "অদ্ভুত আচার্য্যের বিরচিত মধুর ভারতী" ইত্যাদি আছে। অদ্ভুত আচার্য্যের অন্য পরিচয়াদি কোথাও নাই। কোন পুথিরই তারিখ নাই। পুথির বয়স আনুমানিক দেড় শত বৎসর। কাগজের অবস্থা দেখিয়া এইরূপ অনুমান করিলাম।

একটা বিচ্ছিন্ন পত্রে রামায়ণ আরম্ভ হইয়া যেন গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হইল। কিন্তু সেই কাণ্ডটা এই রামায়ণের অন্তর্গত কিনা এবং সেই গ্রন্থকর্ত্তা অদ্ভুত আচার্য্য কিনা স্থির করিতে পারিলাম না। নিম্নে সেই অংশ টুকু তুলিয়া দিলাম। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতম্।

ব্রহ্মার ভোগের বস্তু অমৃতের ভাণ্ড। অতি অনুপাম বাণী পোথা আইদ কাণ্ড।
দেবগণ সহ বন্দ শ্রীরামের চরণ। বামেত জানকী বন্দ দক্ষিণে লক্ষ্মণ।
কপিকুল সহ বন্দো পবননন্দন। জাহার হৃদয়ে প্রভু থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
বাল্মিক মুনি বন্দো ত্রিভুবনের সার। জাহার প্রসাদে পোথা বুঝিল সংসার॥
প্রপিতামহ গুরু বন্দো জার আইদ খণ্ড। তাহার তনয় বন্দো নামেত প্রচণ্ড॥
তাহার তনয় বন্দো নামেত শ্রীনিবাস। গুণের সাগর তেহোঁ নারায়ণের দাস॥

তার পুত্র উপজিল মাণিক জঠরে। জন্মীল চারিপুত্র চারি সহোদরে॥
চারি সহোদর তারা পণ্ডিত গুণনিধি ভারতপ্রসাদে পাই অপক্ষিত সিদ্ধি॥
আত্রাই কুলেত বাস বড়বড়িয়া গ্রাম। সুভক্ষণে জন্মিল পুত্র নিত্যানন্দ নাম॥
মহাপুরুষ জন্মিল-জদি পৃথিবি মাঝার।—

ইহার পর সহসা "আজ্ঞাকারি কস্য শ্রীরামকান্ত দাসস্য প্রণাম সত কৌটয়োকোটি নিবেদনঞ্চ মহাশয়ের" বলিয়া শেষ।

আর একটা পাতাতেও সম্ভবতঃ অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ যেন আরম্ভ হইয়াছে, সেখানটা এইরূপ—

ওঁ নমো গণেশায়॥ রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন। জে রাম স্মরণে হয় পাপ বিমোচন॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্তি হওক পাপী। অন্তকালে উদ্ধারিতে রাম বিষ্ণুরূপী॥

* * *

রাম জন্মিতে ছিল সাটি সহস্র বৎসর। অনাগত রচিল বাল্মিক মুনিবর॥
বাল্মিকে রচিল কাব্য ভবিষ্যপুরাণ। লোক বুঝাইতে হইল সুস্ম বাখান॥
অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্য মহাসয়। রচিলেন রামায়ণ শ্রীরামের জয়॥
বিষ্ণুর এক নাম চারিবেদের তুলনা। হেন সহস্র নাম রামনামের ঘোষণা॥
মহামুনি জানিয়া কহিল সকল। রাম পরমব্রহ্ম কহিলা মহেশ্বর॥ ইত্যাদি।"

উপরে যে চারি খণ্ড পুথির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার দুই খণ্ডে আদিকাণ্ডে রামবনবাসের উদ্যোগ পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয় খণ্ডে উত্তরকাণ্ডের ৪৭ পর্য্যন্ত (প্রথম পত্র নাই)। চতুর্থ খণ্ডে উত্তরকাণ্ড প্রায় সমগ্র ভাগ আছে। ইহার ৪ হইতে ১৭৬ পর্য্যন্ত পত্র বর্ত্তমান। প্রত্যেক পত্রের দুই পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোকসংখ্যা প্রতি পত্রে প্রায় পঁচিশ। শেষ পাতায় লবকুশের যুদ্ধ চলিতেছে। সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রায় ২০০ পাতা ধরিলে শ্লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হয়। অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণে অন্যান্য কাণ্ড এইরূপ বৃহৎ হইলে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাণ্ড কলেবর হইবার সম্ভব।*

---

* "অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। উহার আদিকাণ্ডে ৫৮, অযোধ্যাকাণ্ডে ৯, অরণ্যকাণ্ডে ৯, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ২৪ পাতা, মোট ৩০৭ পাতা পাইয়াছি। প্রতিপাতে গড়ে ৬৬ শ্লোক আছে। সুতরাং শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০২৬২। গ্রন্থারম্ভে অদ্ভুতাচার্য্য এইরূপ আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন—

"প্রপিতামহো বন্দো জাহার খণ্ড। তাহার পুত্র উপজিল নামেত প্রচণ্ড।
তাহার তনয় হ'ল নামে শ্রীনিবাস। গুণ মহাশয় তেঁহো নারায়ণের দাস।
তাহে উপজিল পুত্র মাণিক প্রচারে। জন্মিল চারি পুত্র চারি সহোদরে।
চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রসাদে হইল অপক্ষিত সিদ্ধি।

পুথি সমস্ত পড়িয়া দেখিবার অবকাশ ঘটে নাই, যতদূর দেখিলাম, কৃত্তিবাসের প্রণালী হইতে পৃথক্ বোধ হইল না। উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্য কর্ত্তৃক রামের নিকট রাবণের ইতিবৃত্তবর্ণনা, তাহার পর সীতার বনবাস ইত্যাদি যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে। 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে শতস্কন্ধ রাবণের উপাখ্যানমূলক যে সংস্কৃত আছে, তাহার সহিত এই অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণের কোন সম্বন্ধ আছে বোধ হইল না।

৩। মহাভারত—"কবীন্দ্র" রচিত—২ হইতে ১৮ পাতা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ১৭ পত্রে আদি পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া সভাপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। আদি পর্ব্বের শেষে ভণিতা এইরূপ—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহলোকে পরলোকে করে উপকার॥
লস্কর পরাগল অতি মহামতি। কবীন্দ্রে কহিল কথা আদিপর্ব্ব ইতি॥

"ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম দেব শর্ম্মন সন ১১৩১ সাল মাহে ভাদ্র ২ রোজ।"

"কবীন্দ্র" রচিত এই মহাভারত বা "বিজয়-পাণ্ডব কথার" আদিপর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী ৪ ও ৫ সংখ্যক বিজয়-পাণ্ডবকথার আদিপর্ব্বের কোন কোন মিলাইয়া দেখিলাম; প্রায় প্রত্যেক স্থানেই কিছু কিছু তফাত থাকিলেও মূলতঃ এক পুস্তক বলিয়াই বোধ হইল। ৪ ও ৫ সংখ্যক গ্রন্থে "পরাগল" নামের উল্লেখ দেখিলাম না।

৪। মহাভারত—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। প্রথমে কয়েকটা ও

সোণার রাজ্য নামে ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ নাম।
মহা পৌরস তবে জন্মিল সংসারে। যত যত সৎকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে।
দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার। অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি।
প্রভুর কৃপায় হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত হইল নাম স্নেই সে কারণ।
যজ্ঞপবিত্র নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর। রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর॥
জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥
পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার।
জয়, বিজয় হইল আর শিবানন্দ। একত্রে তিনেক বর দিলা রামচন্দ॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থ রচনার কাল—

"সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বি×তে। সপ্তমি রেবতি যুত বার ভৃগুসুতে॥
কর্কটাতে স্থিতি রবি পঞ্চদশমীতে। কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে॥"

উল্লিখিত ও অন্যান্য লেখা হইতে জানা যায়, গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ বা নিতাইচাঁদ, ৭ বর্ষ বয়সে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। এই অদ্ভুত কার্য্য করা হেতু তাঁহার উপাধি হয়—অদ্ভুত আচার্য্য। তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল বোধ হয় ১৭৬৪ সংবৎ।' (শ্রীরসিকচন্দ্র বসুর পত্র।)

মাঝে কয়েকটা পাতা নাই। নিম্নে বিভিন্ন পর্ব্বের বিবরণ দিলাম। প্রত্যেক পত্র উভয় পৃষ্ঠে লিখিত, প্রতি পত্রে শ্লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ

আদিপর্ব্ব—প্রথম ৭ পাতা নাই। ৮ হইতে বর্ত্তমান। আদিপর্ব্ব ২০শ পত্রে শেষ। পর্ব্ব শেষে ভণিতা—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহলোকে পরলোকে করে প্রতিকার॥
বৈশম্পায়ন কহে কথা জনমেজয় স্থানে। আদি পর্ব্বের কথা এহি সমাধানে॥

সভাপর্ব্ব—২১ হইতে ২৭ পর্য্যন্ত। পর্ব্ব শেষে—

বিজয় পাণ্ডব নাম, পুণ্য কথা অনুপাম,
অমৃত বরিষে সর্ব্বকাল।
শ্রবণে দুরিত যায়, সমরেত পায় জয়,
আয়ুর্যশ বাড়ে ঠাকুরাল॥

বনপর্ব্ব—২৮—৪১ পর্য্যন্ত। পর্ব্ব শেষ—

পুণ্য কথা ভারতের বিজয় ভারত। রাজা স্থানে মহামুনি কহেন বনপর্ব্ব॥

বিরাট পর্ব্ব—৪১—৬০ পর্য্যন্ত। পর্ব্ব শেষে—

বিজয় পাণ্ডব নাম অমৃতের ধার। ইহলোকে পরলোকে করে উপকার॥
মহামুনি কহিলেন জনমেজয় স্থানে। বিরাট পর্ব্বের কথা এহি সমাধানে॥
ই কথা শুনিতে লোক না করিহ হেলা। কলিভয় তরিতে নামের এহি ভেলা॥

উদ্যোগ পর্ব্ব—৬০—৭৭। পর্ব্ব শেষ—

ভারত্তের পুণ্যকথা অমৃত সমান। উদ্যোগ পর্ব্বের কথা এহি সমাধান॥

ভীষ্মপর্ব্ব—৭৭-৯৩। পর্ব্ব শেষ—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। শ্রবণে দুরিত হরে পরলোক তরি॥
শ্রীকৃষ্ণ বোলয়ে সভে হরিগুণ গাথা। এহি হইতে সমাধান ভীষ্মপর্ব্ব কথা॥

দ্রোণ পর্ব্ব—৯৩-১১৩। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। ইহলোকে সুখভোগ অন্তে স্বর্গপুরী॥
একথা শুনিতে কেহো নাহি করে হেলা। কলিভবসাগর তরিতে এহি ভেলা॥
মুনিবরে বোলে দ্রোণপর্ব্ব সমাধান। ইহা পরে কর্ণপর্ব্ব কর অবধান॥

কর্ণপর্ব্ব—১১৩-১২৮। পর্ব্ব শেষ—

বিজয় পাণ্ডব নাম, পুণ্য-কথা অনুপাম,
কর্ণপর্ব্ব হৈল সমাধান।

শল্য পর্ব্ব—১২৮-১৩২। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। শ্রবণে দুরিত হরে পরলোকে তরি॥
যে কথা শুনিতে ভাই না করিহ হেলা। কলিভবসাগরে তরিতে এহি ভেলা॥

গদাপর্ব্ব—১৩২—১৪০। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত সমান। গদাপর্ব্ব ইতি হৈতে হৈল সমাধান॥
মহাভারতের কথা শুন সাবধানে। সুখভোগ করি চলে দেবের সদনে॥

সৌপ্তিক পর্ব্ব—১৪০—১৪৫। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহলোকে পরলোকে করে উপকার॥
বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
জয়মুনি জৈমিনি ? বোলে জনমেজয় স্থানে। সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা এহি সমাধানে॥

আদিপর্ব্বের শেষে বৈশম্পায়ন ও সৌপ্তিক পর্ব্বের শেষে জৈমিনি মহাভারত বক্তা বলিয়া বর্ণিত।

স্ত্রীপর্ব্ব—১৪৫—১৫৪। পর্ব্ব শেষে—

পাণ্ডব-বিজয় কথা অমৃত-লহরী। ইহলোকে সুখ হয় পরলোকে তরি॥
কহে বৈশম্পায়ন জনমেজয় স্থান। স্ত্রীপর্ব্বের কথা এহি সমাধান॥

এখানে পুনশ্চ বৈশম্পায়নের নাম।

ইহার পর ১৫৫ হইতে ১৬৫ পত্র বর্ত্তমান নাই। এই কয়েক পত্রের সহিত সমগ্র শান্তি, অনুশাসন ও ঐষিক পর্ব্বের অভাব। গ্রন্থ শেষে সূচী মধ্যে শান্তি ও অনুশাসনের পর ঐষিক, তৎপরে অশ্বমেধ পর্ব্বের নাম আছে।

যজ্ঞপর্ব্ব—১৬৮—২৭৬। মধ্যে ১৮৯ হইতে ১৯৯ পত্র নাই। এই পর্ব্বটি বিজয়-পাণ্ডব গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হইলেও ইহা স্বতন্ত্র ব্যক্তি রচিত পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। অন্যান্য পর্ব্বে পর্ব্ব মধ্যে অধ্যায় ভেদ নাই; ইহার মধ্যে অধ্যায় ভেদ ও প্রত্যেক অধ্যায় শেষে ভণিতা আছে। নিম্নের উদাহরণে বুঝা যাইবে, এই বৃহৎ গ্রন্থ দ্বিজ কৃষ্ণরামপ্রণীত জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব।

পর্ব্বারম্ভে—

অনুভব পদস্বরে, জয়মুনি অনুসারে, সূত কহে শৌনকেরে।
নৈমিষারণ্যে বসি, অষ্টাশী সহস্র ঋষি, দীর্ঘ পুণ্য মহাতপ করে॥
নৈমিষারণ্য খণ্ড, পৃথিবীর ভুজদণ্ড, তরুলতা রসালে আনন্দ।

*   *   *   *   *

অশ্বমেধ যজ্ঞকথা, সূতমুনি কহে কথা, শৌনকাদি ভণে সাবধানে।
পদবন্ধ করি পরাপর, কহি কথা এহি সার, নরলোকে শুনে সাবধানে॥

সুতমুনি বোলেন শুনহ সভাখণ্ড। উপরোধে নৃপতি ধরিল ছত্রদণ্ড॥
জনমেজয় শুনেন্তি কহেন্তি জয়মুনি। সেই কথা সূতমুখে শৌনকাদি শুনে॥
কহিয়ে সে সর্ব কথা সভা বিদ্যমানে। সেই কথা কহি আমি শুন সাবধানে॥ ইত্যাদি।

বিভিন্ন অধ্যায়-শেষে—

"পুণ্যকথা অনুপাম অমৃতরসময়। বাগীশ্বরী প্রণমিয়া কৃষ্ণদাসে কয়॥"

"ত্রিপদীর ঠাম, রচে কৃষ্ণরাম, আর কহি তার পরে॥"

"কৃষ্ণরাম পণ্ডিত পদবন্ধ।"

"পুণ্যকথা জয়মুনি ভারত অনুপাম। পদবন্ধে কহন্তি পণ্ডিত কৃষ্ণরাম॥"

"জনমেজয় রাজারে কহিল জয়মুনি॥"

"ভনে অনুপাম, শর্ম্ম কৃষ্ণরাম, হরিপদগতিমতি।" ইত্যাদি।

পর্ব্ব শেষে—

জয়মুনি কহিলেন জনমেজয় তরে। অশ্বমেধ পর্ব্বে সুত কহে শৌনকেরে॥
পুরাণ ভারতকথা বিচিত্র কাহিনী। ফলশ্রুতি কেহো তার কহিতে না জানি॥
ছয়ষষ্টি অধ্যায় পুথি হইলেন পুর্ণে। কৃষ্ণরাম দ্বিজে তাহা পদবন্ধে ভনে॥

"ইতি জয়মুনি ভারথ জন্মপর্ব্ব সমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি॥ ইতি সন ১১৬৪ সাল তারিখ ৬ই জৈষ্ট রোজ সমবার দুই প্রহর বেলা হইতে তিথি ত্রয়োদসি সহস্তাক্ষর শ্রীরাম-প্রসাদ শর্ম্ম বাগ্‌ছি সাকিম চন্দ্রপুর পরগনে শোনাবাজু তপ্যে চাপৈলা সরকার বাজুহায় তালুক শ্রীযুত ৺বৃন্দাবনচন্দ্র দেবদেবস্ত গোমাস্তে শ্রীযুত কীস্নর (?) তালুকদার ইতি।"

আশ্রমপর্ব্ব—২৬৭—২৮৩। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
জয়মুনি কহেন কথা জনমেজয় স্থানে। আশ্রম পর্ব্বের কথা এহি সমাধানে॥

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—২৮৩—২৮৯। পর্ব্ব শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব নাম অমৃত সমান। মুনিবর কহে রাজা জনমেজয় স্থান॥
ইহাকে শুনিতে লোক না করিহ হেলা। কলি ভবসাগরে তরিতে এহি ভেলা॥
যে মনে শুনে যেবা করিয়া ভকতি। তাহাকে দিবেন বর দেব শ্রীপতি॥
"জৈমুনি" বোলেন রাজা জনমেজয় স্থান। স্বর্গ আরোহণ কথা এহি সমাধান॥

"ইতি স্বর্গ আরোহণ সম্পূর্ণ। ইতি জয়মুনি ভারথকথা সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিখ্যকো নাস্তিং দোসকং গণিতপাদেন॥ বিদ্যা বিচলিত সুখরি (?)॥ পুস্তক লিখিতং স্বহস্তাক্ষর শ্রীরামপ্রসাদ সর্ম্ম বাগহি সাং চন্দ্রপুর, পরগনে সোনাবাজু তপ্পে চাপৈলা সরকার বাজুহায় তালুক শ্রীযুত ৺বৃন্দাবনচন্দ্র দেবদেবস্ত শকাব্দা ১৬৭৯ সোলসত উন্‌আসি সুবেদারি নবাব সিরাজদৌলা ফৌতি বতারিখ ১৮ই আসাড় যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতি রাণি ভবানি দেব্যা গোমাস্তে দয়ারাম রায় সন ১১৬৪ এগারস চৌসষ্টি পুস্তক সমাপ্ত বতারিখ ১২ শ্রাবণ রোজ সমবার দিবা ১ এক প্রহর সদম্যাং তিথো শ্রীগুরবে নম শ্রীকৃষ্ণ সহায় শ্রীসরেস্বতি সহায় শ্রীদুর্গা সহায়॥"

৫। মহাভারত—১—২১ পত্র আদি পর্ব্ব সম্পূর্ণ আছে। সভাপর্ব্বের প্রথম কয় ছত্র মাত্র আছে। এই মহাভারত পূর্ব্বেতে ৪ সংখ্যক বিজয়-পাণ্ডব মহাভারত হইতে অভিন্ন। ৪ সংখ্যক মহাভারতের প্রথম যে কয়টা পদ নাই, তাহার অভাব এই পুথি হইতে পুরণ হইতে পারে। তারিখ নাই। পর্ব্ব শেষে ভণিতা—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোকে করে উপকার ॥
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থানে। আদি পর্ব্বের কথা এহি সমাধানে ॥

৬। মহাভারত—"বিজয়-পাণ্ডব কথা"; ৪ সংখ্যক পুথি হইতে অভিন্ন। ১ হইতে ৪৯ পত্র, উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভ হইতে কর্ণ পর্ব্ব শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। তারিখ নাই। কাগজের অবস্থায় পুথি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। মধ্যে ২২।২৩ পাতা নাই।

বিশেষ বিবরণ।

উদ্যোগ পর্ব্ব—১—১৩। শেষে—

জয়মুনি কহেন শুনে জনমেজয়। উদ্যোগ পর্ব্বের কথা সমাপ্ত এহি হয় ॥

ভীষ্মপর্ব্ব—১৩—৩০। শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃত-লহরী। শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
কবীন্দ্রে বোলয়ে ভীষ্মপর্ব্ব সমাধান ॥

দ্রোণপর্ব্ব…৩০…৪৯। শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোক করে উপকার ॥
মুনিবরে কহে দ্রোণপর্ব্ব সমাধান। তদন্তরে কর্ণপর্ব্ব কর সমাধান ॥

৭। মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্ব—কৃষ্ণরাম প্রণীত। ৪ সংখ্যক পুথির অন্তর্নিবিষ্ট অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে অভিন্ন। পুথি অসম্পূর্ণ। ১ হইতে ১২ পত্র মাত্র বর্ত্তমান।

৮। তুলসীচরিত্র। ভগীরথ প্রণীত। ৪ খানি পাতা…৯ পৃষ্ঠা। শঙ্খাসুর ঘটিত উপাখ্যান।

আরম্ভ—নমো গণেশায়। প্রণমহো নারায়ণ লক্ষ্মীপতি। তদন্তরে প্রণমহো দেবী সরস্বতী ॥
প্রণমহো নারায়ণ অনাদি নিধন। সৃষ্টি স্থিতি (প্রলয়) যাহার কারণ ॥
বণিক জনার সঙ্গে বসি নানা রঙ্গে। মন দিয়া শুন কহি বিষ্ণুর প্রসঙ্গে ॥
যেমতে তুলসী আইলা পৃথিবী ভিতর। * * কহি সব শুন এক চিত্তে ॥
কংসারিসেনের পুত্র দ্বিজ ভগীরথ। পদ্মপুরাণে কহে তুলসী মাহাত্ম্য ॥

শেষ। তুলসীমাহাত্ম্য কথা যে করে শ্রবণ। অন্তকালে পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
কংসারি সেনের পুত্র বির (?) ভগীরথ। পদ্মপুরাণে কহে তুলসীর মাহাত্ম্য ॥

"ইতি তুলসীচরিত্র সমাপ্ত। শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীরামকানু দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষর পুস্তকমিদং ॥ শকাব্দাঃ ১৬৫৬ মাহে শ্রাবণ ॥"

৯। গজেন্দ্রমোক্ষণ। ভবানীদাস প্রণীত। ১ হইতে ১৬ পত্র সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

আরম্ভে বন্দনাদির পর—

দ্বিজগণের গুরুজনের বন্দিয়া চরণ। ভবানীদাস কহে গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
পাণ্ডুয়া গ্রামে বসত সর্ব্বলোকে জানে। সৌকালীন ঘোষ তেহোঁ বিদিত ভুবনে ॥
সে স্থানে করিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম। সম্প্রতিক বন্দো বিরাট গ্রাম ॥

সভার চরণে করিয়ে বিনয়। গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে করি পঞ্চালি ॥
বাওন হইয়া মনে ধরিতে চাহে চান্দ। ভাগবত শাস্ত্র করি পাঁচালি ছন্দ ॥
হীনজনা যদি ঔষধ মনে করয়। পণ্ডিতের ব্যাধি-যন্ত্রে নাহিক মনে সংশয় ॥
তেমতে কহি আমি হরিগুণ কথা। শ্রবণে পাতক হান্যা নাহিক অন্যথা ॥

শেষ—

গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা বিদিত ভুবনে। দুখ মোক্ষ হয় যেবা জন শুনে ॥

ভবানীদাসে কহে শুনে সর্ব্বজন। সংসার তরিতে যদি ভজ নারায়ণ ॥
হরি নারায়ণ রামকৃষ্ণ গুণনিধি। ভজ রাধাকৃষ্ণ অবধি ॥

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষক। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ শ্রীরামকানু দেবশর্ম্মণঃ অক্ষরমিদং। ইতি গজেন্দ্রমোক্ষণ পাচালি সমাপ্তঃ। শকাব্দা ১৬১৫ শক ॥"

১০। **স্যমন্তকহরণকথা**—গুণরাজ খাঁ রচিত। ৮ পত্র।

আরম্ভ—সর্ব্ব ঘটে সমরূপ দেব নারায়ণ। শুন সর্ব্বজনে কহি বিচিত্র কথন ॥ ইত্যাদি।

শেষ—মণিহরণকথা শুন সর্ব্বজন। আনন্দে শুনিলে হয় স্বর্গে গমন ॥
হেন অদ্ভুত শুনিলে সর্ব্বজনে। গুণরাজ খাঁ…গোবিন্দ চরণে ॥

"ইতি স্যামন্তক মুনিহরণকথা সমাপ্তঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসক ভিমস্যাপি রণে ভক্তেক মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। দুষ্খেন লীখিতা পুস্তি যঃ শোয়…আদ্বিজ মাতা চ সুকরিতস্য পিতা তস্য চ গার্দ্ধক।…শ্রাবণ মাসের ছও মঙ্গলবার অমাবস্যা শকাব্দা ১৬৫৭ শক। শ্রীরামকালু দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং।"

১১। **বৃন্দাবনধ্যান ও বৃন্দাবনপরিক্রমণ**—কৃষ্ণদাস রচিত। ৯ পত্র।

শেষ—চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপি শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডল। তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এই স্থল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে৺কর আশ। বৃন্দাবনের ধ্যান এই কহে কৃষ্ণদাস ॥
প্রভাতে উঠিয়া করে শ্রবণ পঠন। শ্রীব্রজমণ্ডল হয় মনে জাগরণ ॥
ইহার শ্রবণে ফল মনের উল্লাস। শ্রীবৃন্দাবন বাস আশ করে কৃষ্ণদাস ॥

১২। **বিদ্যাসুন্দর**—ভারতচন্দ্র রচিত। ৫৯ পত্র, উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। পুথির তারিখ শাক ১৭৫১। ১৩ই বা ২৩শে পৌষ। লেখক রামানন্দ দেবশর্ম্মা। কালীর বন্দনার পর অন্নপূর্ণা পাটুনি সংবাদ লইয়া আরম্ভ। প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর হইতে পাঠে যথেষ্ট বিভেদ আছে বোধ হইল।

১৩। এই অসম্পূর্ণ পুস্তিকা খানির আদ্যন্ত নাই। প্রথম পত্রের অভাব। ২ হইতে ১০ সংখ্যাক পত্র বর্ত্তমান। তাহার পর অভাব। লেখকের নাম, ব্রহ্ম হরিদাস। গ্রন্থের নাম পাওয়া গেল না। গ্রন্থের তারিখও নাই। গ্রন্থের বিষয় কৃষ্ণার্জ্জুন কথোপকথনচ্ছলে বৈষ্ণব

সম্প্রদায় বিশেষে (?) সাধনসংক্রান্ত কথা। "চারি চন্দ্র ভেদ" প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া বাউল বা তদ্বিধ কোন সম্প্রদায়ের সাধনাবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান হইল। গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্যে পরিচিত কিনা আমি জানিনা। যে কয়েক পাতা আছে দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত কৌতুহলো-দ্দীপক। গ্রন্থারম্ভে সৃষ্টি বর্ণনা হইতে কিয়দংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম—

শূন্যস্থলে আছি আমি রাজ্য অভ্যন্তর।
আমি সে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। অধিষ্ঠান আছি আমি তোমার কলেবর ॥
ইন্দ্র আদি করিআ যতেক দেবগণ। সমভাবে আছি আমি সবারি গোচর ॥
এহি মতে ভাবিআ আমাকে করে সার। উত্তম ভকত সেই সেবক আমার ॥
জ্ঞানরূপে সেবা যদি করএ আমারে। যমের শক্তি তাকে কি করিতে পারে ॥
শুনহে অনাদি দেব বচন আমার। আপনে আপনা চিন জ্ঞান কর সার ॥
জ্ঞান পরিমাণে যেবা আমাকে না ভজয়। বিফলে জীবন তায় বের্থ জন্ম হয় ॥
কলিযুগে গুরু সেবিআ আমাকে ভজিব। সকল জীবন তার সর্ব্বসিদ্ধি পাইব ॥
অহঙ্কারে ভাবিলা তুমি অনাদি কুমার। বিলম্ব না হইব পিণ্ড পড়িব তোমার ॥
এহি বুলি ঈশ্বর করিলেক সমাধান। ছায়ারূপে মহামায়া হইলা অধিষ্ঠান ॥
অনাদি সাক্ষাতে আদ্যা আইলা আচম্বিত। অদ্ভুত মুরতি দেখি হইলা বিস্মিত ॥
ভুরুর ভঙ্গী দেখি কামের কামান। চন্দ্র জিনিআ শোভাঅ দীপ্তমান ॥
দেখিয়া অনাদিদেব মনেত ভাবিল। প্রভুর মায়াএ তার মন মোহিল ॥
আগ্যাক দেখিআ দেব মনেত ভাবিল। কন্দর্পের পঞ্চবাণ হৃদয়ে ভেদিল ॥
কামেত তরঙ্গ(?)হইআ দেব হইল বিভোর। আগ্যাক ধরিআ দেব চাপিয়া দিল কোল ॥
তিন গুণে তিন দেব হইল অবতার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তনয় তাহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মিল এহি মতে। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় এহি তিন দেব হইতে ॥
সংক্ষেপে কহিল তবে যে সব কথা। মন দিয়া শুন কহি অন্যের বিবরণ ॥
আগ্যাব দেখিআ দেব বুঝিল অন্তরে। কামকলা কুতূহল চাহে ভুঞ্জিবারে ॥
আগ্যা বোলে শুন প্রভু হইআ একচিত। রসযুক্ত নাহি মোর কামের চরিত ॥
এত শুনি অনাদি দেব হয়া এক মন। গুপ্তস্থল করিলেক নখে বিদারণ।

মহাদীপ্ত হইল ভোগর লক্ষণ।
আগ্যার রূপ নদখি অনাদি ঈশ্বর। কামেত আকুল চিত্ত দহে কলেবর ॥
তবে অনাদি পরম কৌতুকে। কামকলা কুতূহল ভুঞ্জিলেন সুখে ॥
হস্ত আরোপি দেব হস্ত চাপিল। জীবের আধাবর্ণ(?)সেহি ক্ষণে হইল ॥
প্রভু বলিলা যে হইল এ সব কল্পন(?)। অখিল ব্রহ্মাণ্ড হইল চতুর্দ্দশ ভুবন ॥
ব্রহ্ম হনে বীজ যেন উৎপন্ন হইল। পুন যেন বীজ হনে বৃক্ষ উপজিল ॥
রজনী দিবস হইল দিবস রজনী।

দিন হলে মাস হইল বৎসর পরিমাণ। চন্দ্রসূর্য্য উপজিল আপ হুতাশন॥
সপ্ত পৃথিবী হইল সপ্ত পাতাল। সপ্ত সমুদ্র হইল কাল বিকাল॥
সপ্ত স্বর্গ হইল তবে কে দিব তুলনা। সপ্ত বৈকুণ্ঠ হইল ব্রহ্মাণ্ড গঠনা॥
এহি মতে সৃষ্টিস্থিতি হইল একে একে। দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি পৃথক পৃথকে॥
ইন্দ্র আদি করি যতেক দেবগণে। তারা সব জন্মিল পুণ্যের কারণে॥
হেমন্ত বরিষা হইল বরিষা হেমন্ত। সপ্ত ঋতু উপজিল আর বসন্ত॥
পঞ্চদশ তিথি হইল দ্বাদশ রাইশ। যোগ করণ হইল নক্ষত্র সাতাইশ॥
স্থাবর জঙ্গম হইল কত বীরগণ। সৃষ্টে পালে সংহারে প্রভুর গঠন॥
চারি বেদ করি প্রভু জগতে স্থাপিল। ওঁ নামে একাক্ষর বেদে বিস্তারিল॥
অজপা গায়ত্রী হেন সকলে বোলয়। যং স্বং(?)স্বং যং পবনে বোলয়॥
নারদ মহামুনি এ কথা বুঝিয়া। নানা স্থানে ফেরে যোগ চিন্তিয়া॥
হরেকৃষ্ণ নাম দিয়া জগত ব্যাপিল। অনাহত ব্রহ্ম নাম গুপ্ত রহিল।
বৈষ্ণব গোসাঞি পদে সদা রহুক মন। দ্বিজ ব্রহ্মহরি বোলে এহি নিবেদন॥
কুলশীল জাতি মুঞি তিলাঞ্জলি দিনু। ব্রহ্ম নাম উপদেশ সকলি সমর্পিনু॥
এ ঘোর সংসারের মধ্যে দেখি মায়াপাশ। পদগতি ছায়া মাঙ্গে ব্রহ্মহরিদাস॥

লেখক ব্রাহ্মণ, কিন্তু কুলশীল জাতিতে তিলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিবর্ণনা বিশুদ্ধ পৌরাণিক সৃষ্টিবর্ণনা নহে। বর্ণনায় একটা রহস্যের আবরণ দিবার চেষ্টা আছে। 'অনাদি' 'আদ্য' 'জ্ঞানজনে সেবা' 'শূন্যস্থল' প্রভৃতি শব্দগুলি সংশয় উদ্দীপক। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে বেদ-পুরাণ-ছাড়া, সম্ভবতঃ বেদবিরুদ্ধ, বিজাতীয় ভাব অনেকটা প্রবেশলাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অদ্যাপি লোপ পায় নাই। এখনও বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায় সকলের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় প্রায় সপ্রমাণ করিয়াছেন প্রচলিত ধর্ম্মপূজা বুদ্ধপূজারই বিকার। অনার্য্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সহকারে বিবিধ অনার্য্য আচার অনার্য্য মত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সহিত হিন্দু-তান্ত্রিকের মৌলিক বিভেদ নাই। তন্ত্রের মধ্যে একটা বেদ-বিরোধী ভাব আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অনার্য্য শকরাজগণের অধিকারের সহিত এই বেদবিরোধী ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কোন সম্পর্ক আছে কি না পণ্ডিতগণের বিচার্য্য। অন্ততঃ শকনৃপতি কনিষ্কের সমকালে মহাযান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় দেখিয়া কেমন একটা সংশয় উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক, বাউল কর্ত্তাভজা প্রভৃতি আধুনিক বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকদিগকে প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক-মতাবলম্বী বৌদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় ঐতিহাসিক ভ্রমে পড়িতে হইবে না। উপস্থিত গ্রন্থ হইতে আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

এহি মতে সৃষ্টিস্থিতি অনাদি করিল। ভোজন করিতে তবে মনেত ভাবিল॥

আত্মাক বোলেন তবে অনাদি ঈশ্বর। খিদায়ে আকুল চিত্ত দহে কলেবর॥
এত শুনি আত্মা তবে মনেত ভাবিল। স্বর্গ হনে আত্মা রন্ধন করিল॥
হেন কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ আইল। * * *
পরা হরিষে করিল দেব জনার্দ্দন। পঞ্চদেব সংহে করি করিলা ভোজন॥

*

অথনে অনাদি দেব ভাবিআ মনে মনে। আত্মা সমর্পিল মহাদেব স্থানে॥
অনাদি * * পত্র হইআ মহেশ্বর। দয়া ছাড়িআ নৈরাকার অনাদি ঈশ্বর॥
নিরাময় হইয়া সেহি নিরঞ্জন। বিন্দুরূপ হইআ রহিল শূন্যে অধিষ্ঠান॥

'নৈরাকার' 'নিরঞ্জন' 'শূন্য' এই কয়টি শব্দের সহিত ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে ও ধর্ম্মদেবতার ধ্যানে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহার অর্থ কি?

পুনশ্চ কৃষ্ণ প্রতি অর্জ্জুনের প্রশ্ন—

নাদবিন্দু মুদ্রা কহ বুঝাইয়া। কেমতে হইল নাদ সুমেরু ভেদিয়া॥
কোন্ কল্পে বিন্দু হইল ভুবন জুড়িয়া। কোন মত মুদ্রা হইল ভুবনেত মায়া॥
* * * * * *
কোন্ নামে বেদ অজপা বলি কারে। এ সকল কথা জিজ্ঞাসি কহিবে॥
* * * কর্ম্মের সন্দর্ভ আসি জানিব কি মতে॥
গঙ্গা-যমুনার ভেদ কেমতে জানিব। ত্রিবেণীর ঘাটে আসি কেমতে ভেদিব॥
কোথা বৈসে মনরাম (?) কোথা তার স্থিতি। কোথা বৈসে রতিশচী রহে কোথা হস্তী॥
* * * * * *
তোমার বচনে নাথ অচলা ভকতি। চারিচন্দ্র ভেদ কথা কহ রঘুপতি॥
কেমন চন্দ্র জানিবেক গুরু সন্নিধানে। কেমন চন্দ্র রক্ষা করি রাখিআছে প্রাণে॥
কেমন চন্দ্র শরীরেত চন্দ্র বোলায় সাবধান। কেমন চন্দ্র আত্মনাথ করিয়াছে পান॥

ইত্যাদি।

'গঙ্গা যমুনা', ত্রিবেণীর ঘাট', 'চারি চন্দ্র ভেদ' প্রভৃতি শব্দের রহস্যাবৃত গূঢ় এমন কি বীভৎস অর্থ আছে। এই সকল অর্থের ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড পরিচ্ছেদ এই আলোচনা হইতে উদ্‌ঘাটিত হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানির—এই জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। আশা করি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে যে সকল সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার উদ্ধারের ও প্রচারের ভার শীঘ্র গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস-আবিষ্কারে সাহায্য করিবেন। স্বদেশের ইতিহাস না জানিলে স্বদেশের উদ্ধারের অন্য আশা নাই। আমরা যথেষ্ট সময় অবহেলায় কাটাইয়াছি। আর অবহেলার সময় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়।

দ্বিজ রামচন্দ্র যে সকল পুস্তক রচনা করেন, তাহার মধ্যে "গৌরী-বিলাস", "দুর্গামঙ্গল", "মাধব-মালতী", (মালতী-মাধব) প্রভৃতি কাব্য প্রধান। রামচন্দ্রের উক্ত পুস্তকাবলীর মধ্যে "মাধব-মালতী" নামক একখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এতদ্দেশে মুদ্রা-যন্ত্র (ছাপাখানা) প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। "মাধব-মালতী" কথিত গ্রন্থসূচনা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, "দুর্গামঙ্গল" রচয়িতা রামচন্দ্র আর "মাধব-মালতীর" কবি রামচন্দ্র একই ব্যক্তি।

"মাধব-মালতীর" কবি দ্বিজ রামচন্দ্র উক্ত গ্রন্থসূচনায় স্বীয় পরিচয় দিতেছেন ;—

"মহারাজ নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী। তাঁহার বর্ণনা আমি কিরূপেতে করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব। সে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম। সেই মত তাবত ইহার দেখি কর্ম্ম॥
তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ। সভাস্থলে কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ। তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর ভূদেব শঙ্কর। বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পসতুরে সাথ কৃপারাম। শান্তিপুরে বাস গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ। আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্যের কি কব যার উজিরত্ব পদ। হুকুম আছিল যার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদসাহ করিল সম্মান। গবর্ণরের ঘরে জিনি সদা চৌকি পান॥
অধিকার হাতে গড় গঙ্গমাগুলাদি। হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী॥
রূপেতে তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি। মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাঁহার সন্ততি॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ। কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট॥
পিতা তুল্য মান্যবান্ তাবৎ কর্ম্মেতে। বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে॥
দেবীবর বল্লালের যেবা ছিল ঘাটি। কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটী॥
তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম। নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্বগুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ। কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ॥

(গ্রন্থসূচনার শেষাংশ এইরূপ):—

"আছয়ে অর্থের ক্লেশ, পশ্চাতে ছাপিব শেষ, চন্দ্র কহে কর অবধান॥"

এই কএক ছত্রে পাঠক! গ্রন্থকর্ত্তার জীবিত কালের নিরূপণ হইতেছে। অর্থাৎ

কলিকাতানগরীস্থ শোভাবাজারের রাজবংশের আদিপুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আদেশে দ্বিজ রামচন্দ্র "মাধব-মালতী" গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১৮০৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অব্দে পরলোক গমন করেন; সুতরাং "মাধব-মালতীর" কবি দ্বিজ রামচন্দ্রকে রাজা বাহাদুরের সমসাময়িক বলা যায়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থে তাঁহার আরও একটু পরিচয় লউন,—

* * * * * *

আপনার পরিচয় দিতে কিছু হয়। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি নিজ পরিচয়॥
কানাইঠাকুর বংশে গোপাল মুখটী। ইষ্ট নিষ্ঠ দাতা ধীর কিবা সে গরিটী॥
ফুলিয়া বিখ্যাত কুল ভঙ্গি নিজে হন। সত্যপুত্র রামধন কুলঘাটি নন॥
তাঁহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি। ভাষায় রচিলা কত কবিত্ব সুচ্ছবি॥"

এই কয় ছত্র হইতে আমরা কবি সম্বন্ধে জানিতে পারিলাম যে গরিটীসমাজস্থ কানাই-ঠাকুরের বংশে গোপাল মুখোপাধ্যায় ফুলিয়ার মুখটী কুল ভাঙ্গিয়া "স্বকৃতভঙ্গ" হন। তাঁহার পুত্র রামধন ঔরসে কবি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সহোদরদিগের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, "দুর্গামঙ্গল" প্রণেতার সহিত "মাধব-মালতী" প্রণেতার বংশপরিচয়ের অনেকটা সাদৃশ্য হইতেছে। উভয়েই দ্বিজ, গরিটী সমাজস্থ মুখোপাধ্যায় বংশীয়। উভয়েরই নাম রামচন্দ্র, উভয়েই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, উভয়েরই পিতার নাম রামধন। প্রভেদের মধ্যে "দুর্গামঙ্গল"-প্রণেতার জন্মস্থান হরিনাভি গ্রামে; কিন্তু "মাধব-মালতীর" কবির জন্মস্থানের কোন নির্দ্দেশ নাই। হয়ত শেষ দশায় আর্থিক অসচ্ছলতার কারণ বিদ্যোৎসাহী রাজা বাহাদুরের কৃপায় কলিকাতায় কালাতিপাত করিতেন এবং সেই অবস্থায় "মাধব-মালতী" রচনা করেন। এই কারণে "দুর্গামঙ্গল"-প্রণেতা দ্বিজ রামচন্দ্র কবি ও মাধব-মালতীর কবি দ্বিজ রামচন্দ্র যে একই ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়।

গত বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় 'কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর, আমাদের কোন কোন সুহৃদ্ কবি জয়ানন্দ ও তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন মাসিক পত্রের লেখকও জয়ানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগের প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষও করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিচারবৈঠকে আমাদের দণ্ডবিধান করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সদুদ্দেশ্যেই নানাকথা বলিয়াছেন, নহিলে হয়ত কবি জয়ানন্দ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন কথা লিখিতে প্রবৃত্তিই হইত না।

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির অনুসন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিনই আমরা কত প্রাচীন বঙ্গীয় কবি ও কতশত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের সন্ধান পাইতেছি। পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ সকল পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। তাহা হইতেই আমরা কবি জয়ানন্দ রচিত আরও কএকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি আরও কএকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্য-মঙ্গল কেবল যে আমরাই পাইযাছি, তাহা নহে, তাহা অপর স্থানেও আছে, তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিষ্ণুপুর অঞ্চল হইতে জয়ানন্দ-রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের আরও কএক-খানি অসম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়াছি এবং আমাদের কবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যে বিশেষ মান্যগণ্য ও পরিচিত ছিলেন, তাহারও কতক পরিচয় পাইয়াছি। অদ্য এই সম্বন্ধেই অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতে হইতেছে।

জয়ানন্দ আপনার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থানেই পরিচয় দিয়াছেন—

"গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচরি॥"

এখন আমরা অপরাপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি, যে তিনি গদাধর পণ্ডিতেরই শাখাভুক্ত ছিলেন। যথা—শ্রীযদুনাথদাস কৃত শাখানির্ণয়ামৃতে—

"বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দমহাশয়ম্।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকঃ॥৫৭

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব-চমৎকার-গৌরভাব-কলেবরম্ ॥”৫৮*

পরম বৈষ্ণব যদুনাথ, জয়ানন্দ ও তাঁহার বিরচিত “শ্রীচৈতন্যবিলাস” নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্যবিলাস-রচয়িতা জয়ানন্দ ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ উভয়ে যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই।

প্রসিদ্ধ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের দুইখানি পুথিতে চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্ত্তে “চৈতন্য-প্রেমবিলাস” বা “চৈতন্যবিলাস” নামই লেখা আছে। এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতও আমাদের সংগৃহীত একখানি আড়াই শত বর্ষের প্রাচীন পুথিতে ‘গোবিন্দবিলাস’ নামেই পরিচিত হইয়াছে†। এরূপ স্থলে শ্রীচৈতন্যবিলাস ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এই উভয় গ্রন্থই যেমন একই গ্রন্থ, সেইরূপ যদুনাথ দাস বর্ণিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত জয়ানন্দ ও আমাদের প্রকাশিত চৈতন্যমঙ্গলবিবৃত গদাধর-আদিষ্ট জয়ানন্দ উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে, আর বিশেষ আপত্তি নাই।

ইতিপূর্ব্বে আমরা জয়ানন্দের এক আত্মীয় ইন্দ্রিয়ানন্দ-কবীন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছি‡। এখন বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত আর একখানি প্রাচীন শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পুথিতে ‘ইন্দ্রিয়ানন্দ’ স্থানে ‘হৃদয়ানন্দ’ পাঠ দেখিতেছি। এই হৃদয়ানন্দ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়; কারণ রাঢ়াঞ্চল হইতে সংগৃহীত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকার মধ্যেও জয়ানন্দের পরমাত্মীয় বাণীনাথের কুলপরিচয়ের পরে হৃদয়ানন্দ নামে বন্দ্যঘটীয় এক ব্যক্তির কুলপরিচয় আছে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে আমরা জানিয়াছি, এই বাণীনাথ ও জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধিমিশ্র একবংশজাত§। বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে মূলশাখাবর্ণনার মধ্যে সুবুদ্ধি মিশ্র ও হৃদয়ানন্দের একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক মধ্যে শ্রীযদুনাথ জয়ানন্দের পরেই যে হৃদয়ানন্দের পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস তিনিই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও

* শ্রীযদুনাথ দাসের শাখানির্ণয়ামৃতের প্রায় শতাধিক বর্ষের একখানি প্রাচীন পুথি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। নিত্যানন্দদায়িনী মাসিকপত্রিকার ২য় খণ্ডে (১২৮০ সালে) ২৷৵০ পৃষ্ঠাতেও উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৪ সাল, ৩১১ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

§ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ইঁহার বিস্তৃত বংশ-তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণদাসের স্বরূপ-বর্ণন মধ্যেও জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি-মিশ্রের উল্লেখ আছে—

"চিক্কণ সুবলদেহ নামে সুবলিতা।
তাঁর স্বরূপ সুবুদ্ধিমিশ্র সুবিখ্যাতা॥"
(স্বরূপবর্ণন)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

১৩০৫ সালের

প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৬শে বৈশাখ (১৮৯৮।৮ই মে) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত হরনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক)। অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি-নিয়োগ জন্য শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের পত্র।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত—ইতিহাস-রচনার প্রণালী।

(খ) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তি পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম লিখিত হইল।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল্।	শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব চক্রবর্ত্তী।

৩। সম্পাদক প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি-নিয়োগ জন্য শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ উক্ত সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন

দাস মহাজন, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ (সম্পাদক)।

৪। (ক) অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের "ইতিহাস-রচনার প্রণালী" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইতিহাস-রচনা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাসের অভাব নাই। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ইতিহাস-স্থানীয়। রাজতরঙ্গিণী প্রকৃত ইতিহাস। ইতিহাস-রচনার প্রণালী অতি পুরাকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। তবে অবশ্য বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রণালীতে উহা লিখিত হইত না। ভবিষ্য-পুরাণে ভিন্ন দেশীয় ম্লেচ্ছরাজগণের উল্লেখ দেখা যায়। আদম ও হব্যবতীরও উল্লেখ আছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পঠিত প্রস্তাব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বকার প্রণালীর কোন কোন অংশে ক্রটী ছিল। বর্ত্তমান প্রণালীতে ঐরূপ ইতিহাস রচনায় ঘটনাস্তূপের মধ্যে যোগসূত্র থাকা চাই। প্রতিভাবলে প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ চরিত্রের গুরুত্ব ও মনুষ্যত্বের যাহা উপকরণ মহত্ব বীরত্ব তাহা সংগৃহীত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইতিহাস-রচনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিনিয়োগ দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ইতিহাস-স্থানীয় গ্রন্থ পদ্যে রচিত হইত। চরিত্রের আদর্শ সমাজের রীতি নীতি ঐ সকল গ্রন্থে চিত্রিত হইত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাস পূর্ব্বে ছিল না। য়ুরোপে ইহা নূতন জিনিষ। পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকেরা নিজ মনোমত আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী মতে ঐতিহাসিক সত্য সকল আবিষ্কার করেন। তাঁহারা পাঠককে আপন আদর্শ খুঁজিয়া লইতে বলেন। রজনী বাবু বিশদভাবে পূর্ব্বতন ও অধুনাতন ইতিহাস-রচনা-প্রণালীর ভেদ দেখাইয়াছেন। প্রস্তাবটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন। তাঁহার প্রস্তাবে স্থির হইল যে, পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

(খ) অতঃপর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তিনপ্রস্থ অদ্ভুত রামায়ণ তাঁহার নিকট আছে--তন্মধ্যে একখানি ১৫৫ বৎসরের প্রাচীন। কবি মূলের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন; গ্রন্থে বিশেষ কবিত্ব লক্ষিত হয় না। রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যান কৃত্তিবাস বা অদ্ভুতাচার্য্য-কল্পিত বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, অদ্ভুতাচার্য্যের গ্রন্থের কাব্যাংশে কোন মূল্যই নাই। এরূপ গ্রন্থের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ ছাই, পাঁশ

সংগ্রহেই বা লাভ কি? শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, সমস্ত গ্রন্থই সংগৃহীত হওয়া উচিত। এতটা অধৈর্য্য হইলে পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সমস্ত বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইলে ভাষার অনেক লাভ হইবে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন প্রাচীনকালে ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার বিশেষত্ব ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে জানিতে পারা যায়। ভাষাতত্ত্ব-অনুসন্ধানকারীর পক্ষে আমাদের এই সংগ্রহ বিশেষ উপযোগী। কোন বিষয় অবজ্ঞা করা উচিত নহে। নানারূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে ভবিষ্যতে ভাষার অনেক উপকারে আসিবে।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবমতে সভা গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। নিম্নে গ্রন্থোপহারদাতা ও উপহার গ্রন্থের নাম লিখিত হইল।

১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল—১ Report of the twelfth Indian National congress, ২ Illumination of flowery Life, ৩ অঞ্জলি, ৪ প্রেমাশ্রু।

২। রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর—Twelfth Account Report of the Bengal Branch.

৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ—আত্মতত্ত্বপ্রকাশ।

৪। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী—সঙ্গীতামৃত-লহরী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৫ সাল—৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন ১৮৯৮) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ছয় ঘটিকার সময় বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায়, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, ডাক্তার চুনিলাল বসু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্যনির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশিষ্ট-সভ্য নিয়োগ প্রস্তাবের ফল।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবনচরিত রচনার প্রণালী।

(খ) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু—সঞ্জয়কৃত মহাভারত।

৫। বিবিধ বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সাহা মহাশয় নূতন সভ্যনির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। সম্পাদক সভার গোচর করিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথারীতি পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "জীবনচরিত রচনার প্রণালী" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন। য়ুরোপে যাহাকে জীবনচরিত বলে সেরূপ গ্রন্থ এদেশে বড় কম। আমাদের দেশে আবহমানকাল জীবনচরিত আছে। কিন্তু য়ুরোপীয় প্রণালীর নহে। নাই বলিয়া যে সংস্কার আছে, সেটা ভুল। য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় জীবনচরিতের আকারগত বিভিন্নতা আছে। জীবনচরিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিলে আকারগত বিভিন্নতায় বড় আসে যায় না। য়ুরোপীয় জীবনচরিতে ঐরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যেও ঐ প্রণালী সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেন য়ুরোপীয় প্রণালীর দোষ না আসে, সে বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক হওয়া উচিত। ব্যক্তি বিশেষের জীবনী জানিয়া কোন ফল নাই। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবানকে জানা। মানুষকে জানা নহে। রামায়ণ যখন পাঠ করি, তখন মনে হয়, যে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি। জীবনচরিত পাঠে কি সেরূপ হয়? যে জীবনচরিতে নায়কের জীবনগত সামান্য সামান্য ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহা পাঠে কেবল যে রুচি বিকৃত হয়, তাহা নহে, সমাজেরও অনিষ্ট আছে। চণ্ডীবাবু প্রধান প্রধান ঘটনারই সমাবেশ করিয়াছেন। দুই একটী ক্ষুদ্র কথাও আছে, তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু ইহা মার্জ্জনীয়। অপ্রয়োজনীয় ঘটনা (anecdote) বাঙ্গালা জীবনচরিতে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিলেই ভাল হয়। ব্যক্তি বিশেষকে অধ্যয়ন করা নিষ্ফল। তবে যাহার অধ্যয়নে জীবনের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, তাহাই অধ্যয়ন করা উচিত। য়ুরোপে যার তার জীবনী লেখা হয়, তাহা দ্বারা সমাজের অনিষ্টই সাধিত হয়। যাঁহারা সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবনচরিত লেখা উচিত। পুরাণে ঐ প্রণালীর জীবনচরিত লিখিত দেখি, ক্ষুদ্র ব্যক্তির নহে—দৃষ্টান্ত

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও বিশ্বামিত্র। জীবনী লেখা বড় কঠিন কার্য্য। চণ্ডীবাবু যেরূপ একাগ্রতা ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইরূপ করিয়া জীবনী রচনা করা উচিত। বক্তা চণ্ডী বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, জীবনচরিত না বলিয়া চরিত বলিলেই যথেষ্ট হয়। যথা—উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত, জীবনচরিত শব্দটা অভিধানে পাওয়া যায় না। কি রূপ ধরণে জীবনচরিত রচিত হওয়া উচিত চণ্ডীবাবু প্রবন্ধে সে বিষয় ততটা বলেন নাই। কে রচনার অধিকারী তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। রচিত নায়কের সময়ের সামাজিক রীতি নীতি শিক্ষা প্রণালী প্রভৃতি দেখান আবশ্যক। জীবনচরিতে নায়কের কার্য্যাকার্য্য দোষগুণ সকলই দেখান উচিত। দোষগুণ সমালোচনা করা চণ্ডী-বাবুর মতে চরিতাখ্যায়কের উচিত নহে। উহা সমালোচকের কার্য্য। বক্তার মতে এটা ঠিক নহে। সমালোচনাও চরিতাখ্যায়কের কার্য্য হওয়া উচিত। মহাপুরুষদিগের প্রত্যেক কার্য্যে অতি সামান্য কার্য্যেও তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব কিছুই বাদ দেওয়া উচিত নহে। বক্তা বিদ্যাসাগরের জীবনী হইতে ২।৩টী দৃষ্টান্ত দিলেন। রামায়ণে রামচরিত্রেরও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লিখিত আছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় চণ্ডীবাবুকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। জীবনচরিত পাঠে দেখা যায় যে, চরিতাখ্যায়ক আখ্যায়িকা লেখকও বটেন এবং সমালোচকও বটেন। বাদক যেমন—সঙ্গতের সঙ্গে রঙ্গ্ বাজনা যোগ করেন। চরিতা-খ্যায়কেরও সেইরূপ করা উচিত। বক্তা বিহারীবাবুর মতের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীবাবুর প্রবন্ধে যতটা আশা করিয়া-ছিলেন, ততটা পান নাই। চণ্ডীবাবু অনেক স্থলে "Boswell"কে বরাত দিয়াছেন। য়ুরোপের মত এদেশেও যার তার জীবনী লেখা আরম্ভ হইয়াছে। চণ্ডীবাবু বলিয়াছেন—বাজে কথা বাদ দেওয়া উচিত। কথা ঠিক বটে, কিন্তু বাজে কথা ঠিক করা দায়। যাঁহারা চরিতনায়কের আত্মীয়, প্রথমে তাঁহারা যে যাহা জানেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। পরে চরিতলেখক তাহা বাছিয়া লইয়া জীবনী লিখিবেন। জীবনচরিতে রচনার এইরূপ প্রণালী হওয়া উচিত। যাহাদের জীবন জাতীয় জীবনের বা সমাজের উপর প্রভুত্ব করি-য়াছে—তাহাদেরই জীবনী লেখা উচিত।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন—চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থই এদেশে প্রথম জীবনচরিত। সে কথা ঠিক নহে। বরং চৈতন্যভাগবতেরই ঐ আসন লভ্য। প্রকৃত প্রণালীতে জীবনচরিতের দৃষ্টান্ত—ভক্তিরত্নাকর। একজনের মুখে সম্পূর্ণ জীবনচরিত পাওয়া যায় না। যিনি যে গুণের গ্রাহক, তাঁহারই মুখে আমরা সেইটী জানিতে পারি। পাঁচজনের বিবরণ মিলাইলে তবে আমরা সম্পূর্ণ জানিতে পারিব।

প্রবন্ধলেখক মহাশয়—বলিলেন, অনবসরবশতঃ তিনি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

জীবনচরিত বলিলে একজনের ধারাবাহিক জীবনের ঘটনা বুঝায়। চন্দ্রবাবু যাহাকে বাজে কথা বলিয়াছেন, রামায়ণে ও মহাভারতে ঐরূপ বাজে কথা আছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বক্তৃতালেখককে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। চন্দ্রবাবু কেবল সর টুকু চান। একালে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। একালে যাঁহার যেরূপ মনে হইবে, তিনি সেইরূপই লিখিবেন। পাঠক বুঝিয়া লইবেন। জীবনচরিতের প্রণালী বাঁধাবাঁধি রকমের হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা হয়ত প্রকৃষ্টতর নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারে।

৫। (ক) পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর মহাশয় রাজকীয় উপাধিতে সম্মানিত হওয়ায় সভা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, সম্পাদক সভাকৃত আনন্দপ্রকাশ তাঁহার গোচর করিবেন।

(খ) সম্পাদকের প্রস্তাবমতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন কাব্যসমিতির নূতন সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ।

(গ) সম্পাদকের প্রস্তাবমতে সভা নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ—ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সভাপতি।

১৩০৫ সাল—২০শে আষাঢ়।

১৩০৫ সালের

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২০এ আষাঢ় (১৮৯৮। ৩রা জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়া ছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, (সভাপতি), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, ডাক্তার চুনীলাল বসু শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, (সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক "উপসর্গ বিচার" ২য় প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সম্পাদকের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় (১১ নং মধু রায়ের লেন সিমলা) পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "উপসর্গ বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ তাঁহাকে এরূপ ভাল লাগিয়াছে যে, তিনি বিশেষ কার্য্য অবহেলা করিয়াও শুনিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় যেরূপ গুরুতর তাহাতে বৈয়াকরণ ভিন্ন কেহ তাহার আলোচনা করিতে পারে না। প্রবন্ধে যে চিন্তা, পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। প্রবন্ধ অতি চমৎকার হইয়াছে। বক্তা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, তিনি প্রাণ খুলিয়া প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রবন্ধ-লেখক আদর্শ দার্শনিক। প্রবন্ধও দার্শনিক ভাবে পূর্ণ। হঠাৎ আলোচনা করিতে সাহস হয় না। উপসর্গের বিচার সুবিচারই হইয়াছে। এরূপ ভাবের বিচার সংস্কৃতেও নাই। ভরত কর্তৃক উপসর্গ তত্ত্ব গ্রন্থে কতকটা নূতন ভাবের উপসর্গের আলোচনা আছে। কিন্তু বোধ হয়, এরূপ ভাবে নহে। প্রবন্ধ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। উপসর্গ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, এক উপসর্গের যেমন বিভিন্ন অর্থ, সেইরূপ দুই উপসর্গেরও এক অর্থ আছে। সেইজন্য সকল স্থলে অর্থ ঠিক করা দায় এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। যেরূপ প্রবন্ধ অদ্য পঠিত হইল, পরিষদে সেইরূপ প্রবন্ধেরই পাঠ হওয়া উচিত। উপসর্গের যেরূপ ভাবে বিচার হইল, অন্যান্য বিষয়েরও এইরূপ বিচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধের বিষয় অতি গুরুতর এ বিষয় হঠাৎ আলোচনা করা যায় না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধটী বড়ই মনোহর হইয়াছে, ইহাতে প্রসঙ্গতঃ অনেক দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, হঠাৎ সে সকলের সমালোচনা করা অসম্ভব। প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তথাপি এরূপ বিষয়ে সর্ব্বাংশে মতের ঐক্য হওয়া অসম্ভব, সুতরাং যে যে স্থলে প্রবন্ধের মতের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য আছে বলিয়া বোধ হইল, সেই সেই স্থলের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিবেন। প্রবন্ধপাঠকালে বিচার্য্য বিষয়গুলি যথাক্রমে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন নাই বলিয়া সমালোচনাতেও কোন ক্রম লক্ষিত হইবে না। প্রবন্ধের শেষভাগে লেখক মহাশয় উপসর্গদিগের এককালে স্বতন্ত্র সত্তা ছিল, অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে অর্থ বোধকতা ছিল, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই মতটী সন্দিগ্ধভাবে উপন্যস্ত হইলেও উহাতে সন্দেহ বা অনুমানের অবসর নাই। উপসর্গগুলি যে এক সময় ধাতু হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হইত ও ধাতুর নিরপেক্ষ হইয়া স্ব স্ব অর্থ প্রকাশ করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ সাহিত্যেই ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। বেদে

উপসর্গগুলি অনেক সময় ধাতু হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই ব্যবহৃত হইত। যেমন 'প্র' 'ণ,' আয়ুংষিঃ তারিষতা এখানে প্রতারিষত না হইয়া "প্র ও তারিষতের মধ্যে অনেকগুলি বর্ণের ব্যবধান, লৌকিক সাহিত্যে এরূপ ব্যবহার বিরল বা একেবারেই নাই বলিলেই হয়। উপসর্গগুলি ধাতুনিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইলে উহাদিগের নামান্তর হয়, তখন তাহাদিগকে কর্ম্মপ্রবচনীয় কহে। কর্ম্মপ্রবচনীয়ের উদাহরণ সংস্কৃত লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সমস্ত উপসর্গেরই সে এক সময় স্বতন্ত্র অর্থবোধকতা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপসর্গের অর্থ লইয়া প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, উপসর্গদিগের অর্থ বাচকতা নাই, কিন্তু দ্যোতকতা আছে, অর্থাৎ উপসর্গগণ কোন বিশেষ অর্থের বাচক নহে। তবে ধাতুযোগে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে মাত্র। এ বিষয়ে প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে শাকটায়ন ও গার্গের মতভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—"ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নো নামাখ্যাতয়োস্ত কর্ম্মোপসংযোগ-দ্যোতকা ভবন্ত্যচ্চাবচাঃ পদার্থ ভবন্তীতিতি গার্গ্যঃ" (যাস্ক নিরুক্ত নিঘণ্টু কাণ্ড ৩৭ পৃঃ সোসাইটীর সংস্করণ) অর্থাৎ শাকটায়নের মতে উপসর্গদিগের সাক্ষাৎ অর্থাভিধানশক্তি নাই, গার্গ্য কিন্তু সেই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে উপসর্গের স্বতন্ত্র অর্থাভিধান শক্তি আছে ও তাহাদিগের অর্থ ক্রিয়া বিশেষ। 'তস্মাৎ উপসর্গস্ত ক্রিয়াবিশেষোঽর্থঃ' নিরুক্তকার যাস্ক এই শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টোজীদীক্ষিতও তাঁহার বহুবিস্তৃত শব্দকৌস্তুভ গ্রন্থের প্রারম্ভে এ বিষয়ে বিচাব করিয়াছেন ও শাকটায়নের ন্যায় উপসর্গদিগের অর্থবাচকতা নাই, এই কল্পই আশ্রয় করিযাছেন। আমরা কিন্তু প্রাচীনতম গ্রন্থকারদিগের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বাচকতা-কল্পকেও একেবারে পরিহার করিতে পারিলাম না। এ স্থলে প্রসঙ্গত একটী কথার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। নিরুক্তে সকল শব্দ ধাতু হইতে উৎপন্ন, 'নামান্যাখ্যাত-জানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ ন সর্ব্বানীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে' নিঘণ্টু কাণ্ড (চতুর্থপদের প্রারম্ভে) গার্গ্য ও বৈয়াকরণদিগের কেহ কেহ বলেন, সকল শব্দ ধাতুজ নহে। এই বিচারে শব্দের ব্যুৎপত্তিঘটিত অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া স্থূলতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত (শক্যতাবচ্ছেদক) সর্ব্বস্থলে ব্যুৎপত্তি নিমিত্তের সহিত অভিন্ন নহে, 'অন্যচ্চ প্রবৃত্তি-নিমিত্তং শব্দনাম অন্যচ্চ ব্যুৎপত্তিনিমিত্তং' অর্থাৎ সরল ভাষায় বলিতে গেলে শব্দ ব্যবহার সর্ব্বত্র ব্যুৎপত্তির অনুযায়ী নহে, এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। প্রস্তুত সমালোচনায় এই কথাটীর বিশেষ অনুযোগ দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই যে প্রযুক্ত পদের অর্থ, ধাতু ও উপসর্গের অর্থের সমষ্টি হইবে এরূপ নহে, সুতরাং সকল স্থলেই ঐরূপ অর্থনিষ্কাসনের চেষ্টা যে সফল হইবে বা হইয়াছে এরূপবলা যায় না। প্রবন্ধকার অপি, সু ও দুর্ এই কয়টী উপসর্গের অর্থ সুগম বলিয়া উহাদিগের বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করে নাই। এক্ষণে বক্তব্য

এই যে, "অপি" এই উপসর্গের অর্থ নানাবিধ ও স্থলবিশেষে উহার অর্থনিরূপণও দুরূহ। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা উহার আহরণ, অন্বয়, সংসর্গ, পদার্থ, সম্ভাব্য, গর্হা, অনুজ্ঞা, সমুচ্চয় প্রভৃতি অনেক অর্থ স্বীকার করেন। তবে শেষোক্ত পাঁচটী অর্থে ব্যবহৃত হইলে উহা উপসর্গ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যখন প্রবন্ধকার উপসর্গদিগের অর্থ মাত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার ঐ সকল অর্থের অনুল্লেখের কারণ বুঝিতে পারা যায় না। তবে "অপি" এই উপসর্গটী প্রায়ই সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই বোধ হয় উপেক্ষিত হইবে। নিরুক্তকারের মতে অপির অর্থ সংসর্গ ("সর্পিষোপি স্যাৎ) সু ও দুর্ এই দুইটীর অর্থগত একটু বিশেষ আছে। যেমন সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ এই দুইটী প্রয়োগে উহারা যথাক্রমে সমৃদ্ধি ও অভাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ দুইটীর অর্থ উৎকর্ষ ও অপকর্ষের প্রকার স্বরূপ হইলেও বৈচিত্র্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। "অধি" উপসর্গের বিচার প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার মহাশয় অধি ও ধি এই দুইটী শব্দের মধ্যে ব্যুৎপত্তিগত সাদৃশ্যের আভাস দিয়াছেন। ঐ আভাস কতদূর যুক্তি-যুক্ত তাহা বুঝা যায় না, কারণ 'ধি' এই পদটী 'ধা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহা উপসর্গ নহে। প্রতি উপসর্গের "প্রতিকূলতা" অর্থের স্থলবিশেষ যেমন প্রতিগৃহ, প্রতিগ্রাম ইত্যাদি স্থলে) ব্যভিচার লক্ষিত হয়। প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ গৌতমসূত্র ও ন্যায়ভাষ্য হইতে গৃহীত কএকটী শব্দের অর্থ বিচার করা হইয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে প্রবন্ধকারের মতে অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের অর্থ Hypothesis, কিন্তু বোধ হয় উহা (Hypothesis) নহে। যাহা হউক অদ্য সময়াভাব বশতঃ এরূপ বিস্তীর্ণ দুরূহ ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের যথোচিত সমালোচনা অসম্ভব! প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইলে উহার একটী যথোচিত সমালোচনা করিয়া পুনর্ব্বার এই পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধটী পরিষৎপত্রিকায় মুদ্রিত হইবার যে সর্ব্বাংশে যোগ্য সে বিষয়ে আর বক্তব্য নাই।

৪। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও মতিলাল মল্লিক এম, এ, মহাশয়দ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করিলেন।

সম্পাদকের প্রস্তাব মতে পরিষদ্ নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	(ক) প্রেমাশ্রু
" নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ	(ক) ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৫ সাল ৩ শে শ্রাবণ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ৩০শে শ্রাবণ (১৮৯৮। ১৪ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, (সহ-সভাপতি) রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার শরৎকুমার রায়, ডাক্তার চন্দ্রশিখর কালী এল, এম, এস, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্তগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল, শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধপাঠ—

(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ধোয়ী কবির পবন-দূত।

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু গৌড়াধিপ মদনপাল ও মহীপাল দেবের তাম্রশাসন প্রদর্শন।

(গ) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—ভরতকৃত উপসর্গ বৃত্তির আলোচনা।

৪। বিবিধ বিষয়।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পরে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	" নগেন্দ্রনাথ বসু	" যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	" ঐ	" কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
" ঐ	" ঐ	" প্রবোধচন্দ্র সরকার।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,	" মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩। (ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "ধোয়ী কবির পবন-দূত" কাব্যের আলোচনা করিলেন।

তৎপরে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, প্রস্তাবটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইতিহাসবিৎ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উপস্থিত করিয়া পরিষদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রস্তাবটী বিস্তৃতভাবে লিখিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় যে বিজয়পুরের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সম্ভবতঃ বল্লালসেনের পিতা বিজয় সেনের স্থাপিত। নদীয়ার কিছু দূরে জয়পুর ও বিজয়পুর নামে দুইটী গ্রামের তিনি অনুসন্ধান পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় সুহ্মদেশকে বঙ্গদেশের নামান্তর বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস পূর্ব্বে ত্রিপুরার অংশবিশেষকে সুহ্ম দেশ বলিত। উত্তরে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, যে "সুহ্মে চ তাম্রলিপ্তে চ" এই প্রমাণানুসারে তমলুকের নিকট 'সুহ্ম' হইতেছে।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় যে "কবিরাজ" উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন, নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও উহার উল্লেখ আছে। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস ও তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র দাস ঐ সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় যখন প্রস্তাবটী বিস্তৃতভাবে লিখিবেন, তখন বঙ্গদেশের আচার ব্যবহারের বিষয় কাব্যের যে স্থলে উল্লেখ আছে, সে অংশ যেন আমাদিগকে দেন।

সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি দেশীয় কবির গুপ্ত সমাচার দূতরূপে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সাহিত্য সম্বন্ধে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

(খ) অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গৌড়াধিপ মহীপাল ও মদনপালের তাম্র-শাসন প্রদর্শন করিলেন এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাম্রশাসনের বিবরণ শ্রবণে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় যিনি ঐ তাম্রশাসন উদ্ধার করিয়াছেন। তিনিও পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাম্রশাসনের প্রতিলিপি পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, পালরাজগণের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অথচ কিছুকাল পূর্ব্বেও আমরা তাঁহাদের বিষয় কিছুই জানিতাম না। এখন য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচনার ফলে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। পালরাজাদিগের রাজধানী ছিল ওদন্তপুরে, পরে গৌড়ে ঐ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ পালবংশের শাখাবংশ অনেক প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশীয় এক রাজা নয়পালের সভাসদ্ বজ্রপাণি গয়াকে অমরাবতী তুল্য করিয়াছিলেন। নেপাল হইতে সংগৃহীত অনেক পুথিতে পালরাজগণের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। রামপালদেবের বোধ হয়, স্বহস্তলিখিত একখানি পুঁথি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু যেরূপ ইতিহাস চর্চ্চা করিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইল। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধদিগের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের সম্পর্ক উল্লেখ করাতে তাঁহার অভিমত তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিবিষয়ের মত দৃঢ়ীকৃত হইল।

(গ) অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় "ভরত কৃত উপসর্গবৃত্তি" গ্রন্থের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু উপসর্গবৃত্তি গ্রন্থকে ভবতমল্লিক কৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। কারণ ভরত মল্লিক অন্যান্য গ্রন্থে মুগ্ধবোধের সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন। এ গ্রন্থে সে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় নাই। উপসর্গ বিষয়ে পাণিনি ও মুগ্ধবোধের মধ্যে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। মুগ্ধবোধ কেবল উপসর্গেরই বিচার করিয়াছেন। পাণিনি উপসর্গকে ভাঙ্গিয়া চারি পাঁচটী ভেদ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়েও মতভেদ আছে।

সম্পাদক বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে উপসর্গতত্ত্ববিচার করিয়াছিলেন। ভরত একটী একটী উপসর্গের ভিন্নার্থ সংগৃহীত করিয়া তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, সংশয় অপনোদন জন্য বিহারী বাবু বর্ত্তমান প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় রচিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। বিহারী বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন যে, প্রতিবাদ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। সংশয়নির্ণয়মাত্র উদ্দেশ্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু ভরতকৃত উপসর্গবৃত্তি গ্রন্থ সভার গোচন

করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রবন্ধরচনার পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের সন্ধান পাইলে হয়ত, তিনি আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতেন। তিনি উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়া আদি অর্থ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদিম অর্থ জানিলে প্রয়োগকালে বিশেষ সুবিধা হয়, হয়ত স্থানে স্থানে তাঁহার ভ্রম প্রমাদ আছে। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় থাকিবার সম্ভাবনা।

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় কবিরাজ ৺মনোমোহন সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন।

সভা সম্পাদককে ঐ শোকপ্রকাশ কার্য্যবিবরণে লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন।

সম্পাদকের প্রস্তাবে সভা নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—

(ক) Thirteenth annual report of the Countess of Dufferin's Fund, 1897.

(খ) The Annual report of the Indian Association 1892-93 to 1895-96.

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাণ্ডেল (ক) The Tilak Trial.

„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (ক) দুর্গামঙ্গল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

১৩০৫ সাল ২৭শে ভাদ্র।

পঞ্চমমাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৭শে ভাদ্র (১৮৯৮। ১১ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০ সাড়েপাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত পণ্ডিত ও সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম বি, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি এল, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনগুপ্ত কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল, (সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। মানবতত্ত্ব ও উপকথা সম্বন্ধে মাননীয় রিসলে সাহেবের বিজ্ঞাপন বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব।

৪। প্রবন্ধ পাঠ (ক) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—উপসর্গ বিচারের সমালোচনা।

(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি—মহাভারতের গঠন।

৫। বিবিধ বিষয়।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবক,	সমর্থক,	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ অমরকৃষ্ণ মিত্র,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	„ কৃষ্ণচন্দ্র দে এম এ।
„ „ কুমার শরৎকুমার রায়	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	„ অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
„ „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
„ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	„ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপকথা ও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে মাননীয় রিসলে সাহেবের বিজ্ঞাপন উপস্থিত করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, রিসলি সাহেব যে প্রস্তাব প্রকাশিত করিতেছেন। তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

(ক) Folklore. (খ) Anthropology (গ) Ethnology অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য ইনি প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। দেশীয় লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিন্ন এবিষয়ে চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ে পরিষদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে রিসলি সাহেব যে বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন, সে বিষয়গুলি অতি গুরুতর, আর বোধ হয় পরিষদের এলাকার অন্তর্ভূত নহে। পরিষদ্ পরিষদ্‌রূপে ভারগ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে না।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা পরিষদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নহে। উপকথা ও মানবতত্ত্ব বিজ্ঞাপন আলোচনার অন্তর্ভূত। ঐ সম্বন্ধে এসিয়াটীক্ সোসাইটী সাধারণের সাহায্য চাহিয়াছেন। এবিষয়ে পরিষদের সাহায্য করা উচিত।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে তিনি Asiatic Society-র পক্ষে সাহায্য চাহিয়াছেন; সে সাহায্য পরিষদের সভ্যের ব্যষ্টিরূপে বা সমষ্টিরূপে দিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, যে কার্য্যে Asiatic Society-র ন্যায় শক্তিশালিনী সভা সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, সে বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপে সঙ্কোচ বোধ হয়, তবে রিসলি সাহেবের বিজ্ঞাপন পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপাইয়া সভ্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করার পক্ষে কোন আপত্তি নাই।

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে আমাদের রীতি নীতি সাহেবেরা ঠিক বুঝেন না। ঐ সকল বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইলে হয়ত, তাঁহারা উহার বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করিবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতের পোষকতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পরিষদ এবিষয়ে স্পষ্টতঃ ভারগ্রহণ না করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, রিসলি সাহেবের বিজ্ঞাপন বঙ্গানুবাদ-সহ পত্রিকায় মুদ্রিত করা হউক এবং এবিষয়ের সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের সভ্যগণকে আহ্বান করা হউক, তাঁহারা স্ব স্ব বক্তব্য লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদককে প্রেরণ করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদক ঐ সকল মন্তব্য শাস্ত্রীমহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয় উপসর্গবিচারবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে ভাবে উপসর্গের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, শাস্ত্রীমহাশয় সেই ভাবে উপসর্গতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, উপসর্গের কোনই অর্থ নাই। অতএব তাহার আবার অর্থ বিচার কি? এবিষয়ের আলোচনা তাঁহার মতে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মতে বাঙ্গালায় উপসর্গ নাই। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উপসর্গের অর্থ বিচার করিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় এবিষয়ে দেশীয় প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন।

সম্পাদক বলিলেন যে শাস্ত্রীমহাশয় স্বরচিত প্রবন্ধে যথেষ্ট গবেষণা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন, বোধ হইল। দ্বিজেন্দ্রবাবু উপসর্গের মৌলিক অর্থ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় সে অর্থ আধুনিক প্রয়োগস্থলে সমীচীন হয় না, দেখাইয়া তাঁহার ভ্রান্তিখ্যাপণ করিয়াছেন। জগতে সর্ব্বত্রই এক হইতে বহুর উৎপত্তি হইয়াছে। অবিশেষ হইতেই বিশেষের আরম্ভ হইয়াছে। উপসর্গের বিষয়েও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্র, প্রভৃতি উপসর্গ এখন নানা অর্থ বিশিষ্ট, কিন্তু পুরাকালে এক একটী উপসর্গের এক একটী স্বতন্ত্র অর্থ ছিল। পরে এক হইতে বহু অর্থ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ঐ আদিম অর্থ নিষ্কাশন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার বোধ হয় যে, দ্বিজেন্দ্র বাবু সকল স্থলে Baconian Induction প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। স্থানে স্থানে Scholostic প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক উপসর্গের যত প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে, তাহা সমস্ত সংগৃহীত করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে আদিম অর্থ নিষ্কাশন করা উচিত এবং সেই সঙ্গে

প্রাচীন বৈয়াকরণেরা যে সকল অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা করা উচিত। তবে আদিম অর্থ নিষ্কাশন করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে হয়ত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে। তিনি জ্ঞানমতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতি অবিচার করেন নাই। শব্দশাস্ত্রের আলোচনায় নানাভাষার সাহিত্য আলোচনা করিয়া অনুগম করিতে হয়। প্রাচীন আর্য্যগণও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য উপসর্গের আদিম অর্থ নিষ্কাশন করা নহে। তিনি লৌকিক আধুনিক প্রয়োগ দেখিয়া উপসর্গের অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। এ বিষয়ে তিনি ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই, আদিম অর্থ নিষ্কাশন জন্য বৈদিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহা করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার রচিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়া তাহার মৌলিক অর্থ নিষ্কাশন করা, ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতদূর হইতে পারে, তিনি তাহাই করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীসঙ্গত উপায়ে সভ্যগণ উপসর্গের প্রকৃষ্টতর অর্থ আবিষ্কার করিলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন।

স্থির হইল যে রাজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় কর্ত্তৃক মহাভারতের গঠন বিষয়ের প্রবন্ধ সময়াভাবে স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ডাক্তার ৺অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভাস্থলে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়দ্বয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভাশোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয়দ্বয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ৺হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভার শোক প্রকাশ করিলেন।

স্থির হইল যে সভার শোকপ্রকাশ কার্য্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হউক এবং মৃত মহাশয়গণের আত্মীয়গণকে বিজ্ঞাপিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় সভার গোচর করিলেন যে, পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় University Institute সভার আবৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সম্পাদকের প্রস্তাবে সভা নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত বোধচন্দ্র সরকার (ক) শালফুল।

২। „ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) স্ত্রী-শিক্ষা।

৩। „ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (ক) বিনোদ-মালা।

৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(ক) সুর সঙ্গীত।

৫। „ কিরণচন্দ্র দত্ত—(ক) আল্লিবাবা (খ) কথোপকথন রহস্য (গ) প্রেমরহস্য (ঘ) চিন্তারহস্য।

৬। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(ক) সচিত্র সমাজরহস্য (খ) সোহাগোচ্ছ্বাস বা আদর্শ—দম্পতি (গ) আহ্নিককৃত্যম্ (ঘ) অমিয়পদাবলী (ঙ) সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-শিক্ষাপদ্ধতি (চ) সাকার-নিরাকারতত্ত্ববিচার (ছ) The Report of the Calcutta Orphanage.

৭। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—(ক) Speeches by Hon'ble Surendra Nath Banerje 1889—84. Vol. I. 1891—94. Vol. II অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

১৩০৫ সাল, ২৪শে আশ্বিন।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৪শে আশ্বিন (১৮৯৮। ৯ই অক্টোবর) রবিবার অপরাহ্ণ ৫।।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ (ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র। (খ) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী স্ত্রী-কবি মাধবী। (গ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাভারতের গঠন।

৪। বিবিধ বিষয়।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক,	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ,	শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র নিয়োগী।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	,, হরিদেব শাস্ত্রী।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় অনেক উপদেশ লাভ হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে মতের অনৈক্য হয়। তিনি বুদ্ধত্ব ও অর্হত্ব বিষয়ে যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধগ্রন্থে কোথায়ও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান ও মহাযান এই তিনযানের উল্লেখ দেখিতে পাই। বৌদ্ধগ্রন্থে হীনযান শব্দ পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা আপনাদিগকে হীনযান বলিয়া পরিচিত করেন নাই।

রাজতরঙ্গিণীকার নাগার্জ্জুনকে বুদ্ধদেবের ১৫০ বৎসর পরে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সার্দ্ধপর ২য় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে দেখিয়াছেন। তাঁহার সময় যে বৌদ্ধধর্ম্মে দেবদেবী প্রথম প্রবেশ লাভ করেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

তথাগতগুহ্যক সূত্র প্রথম বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ। ইহাতে তান্ত্রিক কথা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যায় না। চন্দ্রকীর্ত্তির গ্রন্থে (৭ম শতাব্দীতে লিখিত) ঐ গ্রন্থ হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম চীন জাপানদেশে প্রথম প্রচারিত হয়, তখনই বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্র প্রথম প্রবেশ করে। ঐ ঐ দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ঐ ঐ দেশের সহিত সংস্রব ঘটিলে তান্ত্রিক আচার বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে।

১০ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রচলিত হয়। ১১শ শতাব্দীতে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার জন্য দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যান। শাস্ত্রীমহাশয় মঞ্জুশ্রী ও মঞ্জুঘোষের উল্লেখ করিয়াছেন। মঞ্জুঘোষের নাম অনেক বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন যে শাস্ত্রীমহাশয় অতিসারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার এবিষয়ে একটী অনুরোধ। শাস্ত্রীমহাশয় যখন বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে লিখিবেন, তখন যেন হিন্দুতন্ত্র পূর্ব্বে কিম্বা বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ব্বে এ কথার আলোচনা করেন। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব বঙ্গদেশেই অধিক। বোধ হয় হিন্দুতন্ত্রই পূর্ব্ববর্ত্তী। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া আধুনিককালে তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে বিষয়টী অতি গুরুতর। এবিষয়ে মত প্রকাশ

বড়ই কঠিন। শাস্ত্রীমহাশয় অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। জৈন ধর্ম্মের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নিকট নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর স্বামীর পূর্ব্বে ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথ নামে জৈন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হয়েন। জৈনেরাই প্রথম অর্হৎনাম প্রয়োগ করিয়াছেন, সিদ্ধ পুরুষই অর্হৎ।

কোন কোন হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী, আবার কোন কোন বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্রের নিকট ঋণী। বারাহীতন্ত্রে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধের নিকটই তন্ত্রের আদর অধিক। অনেক তন্ত্র আধুনিক। প্রাচীন তন্ত্রেরও অভাব নাই।

যে সময় আধিপত্যের জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে ছিল, সেই সময় সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। দেখা যায়, যে দেশে যখন তান্ত্রিকের আবশ্যক হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতেই তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালাই তন্ত্রের আদি স্থান। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন। কেহ কেহ হিন্দুও ছিলেন। বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা হিন্দু আচার পালন করিতেন। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেন। মহাভারত পাঠ দিতেন। পালবংশীয়দিগের সময় কোন কোন পণ্ডিত তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধটী অতিশয় গবেষণাপূর্ণ। তন্ত্র বেদমূলক নহে। তন্ত্রের তিনটী বিভাগ সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। রাজসিক ও তামসিক তন্ত্র বেদমূলক নহে। তন্ত্রের ভাব ও আর্য্য ধর্ম্মের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদেশ হইতে আনিত মতই তন্ত্রশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আবার বলিলেন যে, বুদ্ধকে প্রত্যেক গ্রন্থে অর্হৎ বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে মহাযানপন্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব উহা নাগার্জ্জুনের অপেক্ষা প্রাচীন। বৌদ্ধদর্শন হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তি।

বক্তা শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন যে তাহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত দেখান।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় আশাতীত শিক্ষালাভ হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল গিয়া স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। পরের উপর নির্ভর করেন নাই। সকল বিষয়ের মীমাংসা একবার হওয়া সম্ভব নহে। শাস্ত্রীমহাশয় বিশেষ নির্দ্ধারিত কএকটী মত আমাদিগকে দিয়া বাধিত করিয়াছেন। তাহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে। অপর দুইটী প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

বিবিধ বিষয় আলোচনায়—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গবর্মেণ্টপ্রস্তাবিত পাঠ্য রচনা বিষয়ে স্ব লিখিত পত্রপাঠ করিলেন।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে এরূপ গুরুতর বিষয় রীতিমত বিজ্ঞাপিত করিয়া উপস্থিত করা উচিত।

সম্পাদকের প্রস্তাবে সভা নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) সংস্কৃত প্রবেশ, (খ) সন্ন্যাস।

২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বি এ, (ক) সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব বিচার।

৩। পরিষৎ কর্তৃক কৃত—(ক) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ও ২য় ভাগ (খ) সাহিত্য-চিন্তা (গ) ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ও ৩য় ভাগ (ঘ) A note on the ancient Geography of Asia.

৪। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) A criticism on Sir Alexander Mackenzie's Spreech. (খ) A note on Sir Alexander Mackenzie's Speech, (ঘ) An annalisis of Plague cases in Calcutta

অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সভাপতি।

১৩০৫ সাল।

সপ্তমমাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৯৮।১১ই ডিসেম্বর) রবিবার অপরাহ্ন ৪ চারি ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম এন বি এল (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেন গুপ্ত কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। গ্রন্থ রচনা বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব।

৪। প্রাচীন সংবাদপত্র বিষয়ে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ (সমাচার-দর্পণের প্রাচীন সংখ্যা প্রদর্শিত হইবে।)

৫। বিবিধ বিষয়।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম.
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফি,	„ পূর্ণচন্দ্র দে বি এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ ডাক্তার শশীভূষণ মিত্র,M.B.B.SC.
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	„ মোহিনীমোহন দত্ত বি এল।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	„ অতুলচন্দ্র নন্দী বি এল।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি,	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি,	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল,	„ মণীন্দ্ররায় চৌধুরী জমীদার।

(৩) অতঃপর সম্পাদক গ্রন্থসমিতি নিয়োগবিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, প্রস্তাবটী সাধু ও গুরুতর। ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। অতএব ঐ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই। অশোক সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় এক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। আবশ্যক হইলে, তিনি তাহা উপস্থিত করিতে পারেন। বাঙ্গালা ভাষার অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি নব্যভারতে আলোচনা করিতেছেন। আবশ্যক হইলে তাহাও পরিষদে উপস্থিত করিতে পারেন। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গালাভাষার উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে ইদানীং পরিষদে কোন কোন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, যাহা পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত নহে। তাঁহার বিশ্বাস পরিষদ্, কিছু বিপথগামী হইতেছেন। পরিষদের উদ্দেশ্য যেন আমরা কিছু বিস্মৃত হইয়াছি। দৃষ্টান্ত—শিলালিপির আলোচনা। শিলালিপির বর্ণ ও কালনির্ণয় প্রভৃতির আলোচনা, তাঁহার মতে পরিষদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এ সকলের আলোচনা Asiatic societyর ন্যায় সভার উদ্দেশ্য। রজনী বাবুর প্রস্তাবিত কার্য্য গুলি যে সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, রজনী বাবুর প্রস্তাবটী বিচার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কেবল সমিতিগঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি যাহাতে হয়, তাহাই করা উচিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকলের বাঙ্গালায় অনুবাদ হওয়া উচিত। কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিলেন যে, চন্দ্রনাথ বাবু পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বক্তার একমত। তিনি চন্দ্রনাথ বাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাব হইল যে, এ বিষয়ে সভ্যগণের মতামত আহ্বান করা হউক।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রজনী বাবুর প্রস্তাব অতি সমীচীন। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান রচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গালায় রচিত অভিধানের মধ্যে বক্তা বিশ্বকোষের উল্লেখ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ও ইংরাজির অনুবাদ কার্য্য বিশেষ আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে রজনী বাবুর প্রবন্ধের সহ তাঁহার একমত আছে। তবে যে চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন যে শিলালিপি ইত্যাদি প্রকাশ দ্বারা পরিষৎ বিপথগামী হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। শিলালিপি প্রকাশ দ্বারা ভাবী ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, রজনী বাবুর উদ্দেশ্য এই যে ইংরাজি Men of Letters প্রভৃতির প্রণালীতে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হউক। এইরূপ সমিতি গঠিত হইলে ভাষার অনেক উপকার হইবে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যটা বড় কঠিন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঐ বিষয় স্থির করা উচিত। ইহার বিচার জন্য একটী সমিতি হইলেই ভাল হয়।

স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত হউক। সমিতি আপন সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং তিন মাসের মধ্যে মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সহকারী সভাপতিত্রয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত মনোমোহন্ বসু, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার); শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক)।

(৪) অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রাচীন সংবাদপত্র বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ ও প্রথম কয়েক বৎসরের "সমাচার দর্পণ" প্রদর্শিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয় বহু দিন পরিশ্রম করিয়া যে প্রবন্ধ উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, "সমাচার দর্পণ" হইতে প্রধান প্রধান প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হউক। চন্দ্রনাথ বাবু এ প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। Calcutta Review হইতেও ঐরূপ সারসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয় যেরূপ অনুরাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। পরে নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বিদ্যানিধি মহাশয় এ গ্রন্থের সম্পাদকতা গ্রহণ করিবেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ব্যোমকেশ বাবুর সমর্থনে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার হেমচন্দ্র চৌধুরী L M S. ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়দিগকে "সমাচার দর্পণ" সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

রাও সাহেব দীননাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করিলেন।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে যাঁহারা গ্রন্থোপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। নিম্নে গ্রন্থোপহারদাতা ও প্রাপ্ত গ্রন্থের সংখ্যা লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—বিদ্যাপতি পদাবলী। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার ১০০ একশত খান বিবিধ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ২৩ খানি বিবিধ গ্রন্থ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ,
সভাপতি।

১৩০৫ সাল, ২৪এ পৌষ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৪এ পৌষ (১৮৯৯।৭ই জানুয়ারী) শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক।)

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

সভ্য নির্ব্বাচন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "ভবভূতি" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন [illegible]ণ করিলেন।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত ডাক্তার রজনীকান্ত সেন এম ডি।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ মনোমোহন বসু,	„ সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ মনোমোহন বসু,	„ বনমালী দত্ত।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	„ হরিদেব শাস্ত্রী,	„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	„ হরিদেব শাস্ত্রী,	„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ।

(৩) অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভবভূতি"বিষয়ক প্রবন্ধপাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, সতীশচন্দ্র বাবু "ভবভূতি" সম্বন্ধে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছেন, দেখিয়া তিনি হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয়, অধুনা স্বর্গগত আনন্দরাম বড়ুয়ার "Bhavabhuti and his place in the history of Sanskrit Literature", বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর ভবভূতি প্রবন্ধ, "নব্যভারত" "ভারতী" "পুরোহিত ও অনুশীলনে"র ভবভূতিবিষয়ক প্রস্তাব এবং তৈলাঙের সন্দর্ভ ইত্যাদি এতদ্দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় নানা সুধীগণের লিপির প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, আমাদের বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে ইহাও বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত সকল মতামতের সহিত তাঁহার মতৈক্য নাই। যদি প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে বা মার্জ্জিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে মতামত ব্যক্ত করা সুবিধাজনক হইবে। পুরাতত্ত্ব এ প্রবন্ধে যথেষ্ট আছে, সাহিত্যবিষয়ক তত্ত্বও না আছে, এমন নয়। এই কারণেও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তবে স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আরও অধিক বিবরণ সংগৃহীত হইলে ভাল হইত। প্রবন্ধ প্রকাশ কালে গ্রন্থসমূহের কাল নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। তাঁহার বিবেচনায় প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যে, কবিবর ভবভূতি সদর্পে আশা করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহার কবিতা অমর হইবে। তাঁহার সে আশাপূর্ণ হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় নানাস্থানে তাঁহার আদর বাড়িতেছে, ইহাই আনন্দের কথা। ভবভূতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কিন্তু কবির আদর কমে নাই, ইহাই আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার ধন্যবাদের যোগ্য। প্রবন্ধকার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, ভবভূতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কি প্রণালীতে নাটক রচনা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে কি উত্তর করেন, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, মনোমোহন বাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সমালোচকগণের তিনি পরোক্ষভাবে আর্য্য ও বৌদ্ধচিত্র অঙ্কিত করিয়া জনগণকে সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার অদ্যকার প্রবন্ধে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। ভব-

ভূতির কালনির্ণয়ে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভবভূতির কাব্য ভারতে কেন সমগ্র পৃথিবীর আদরের জিনিষ। তুলনায় কাব্যাংশের আলোচনা অল্পই হইয়াছে। প্রকাশকালে যেন সে বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কালিদাসের এক শকুন্তলা যেমন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, ভবভূতির অন্য গ্রন্থ না থাকিলেও এক উত্তররামচরিতই তাঁহাকে অমর করিত।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ভাগটা যেমন বেশী বেশী, কাব্যাংশ সেরূপ না হইয়া সংক্ষেপে হইলেও শেষ ভাগে আলোচিত হইয়াছে। রামচরিত্রে রাজ্যাদর্শ উচ্চ। গুরুজনের আজ্ঞা ও তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্য পালন একদিকে, প্রজা-রঞ্জন ও রাজ্যপালন আর একদিকে। রাজ্যপালন কর্ত্তব্যজ্ঞানের উচ্চতর মিলন। ভবভূতির আলোচনায় এক অঙ্কের মধ্যে নিবন্ধ করা অসাধারণ গুণপণার পরিচয় এখনও বর্ত্তমান।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। উহা পরিষদ্ পত্রিকায় মুদ্রিত হউক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় ৺বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলা গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়া-ছিল, ভবভূতির সময় সংস্কৃত সাহিত্য জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আর বৌদ্ধ ভাবাধিক্যের মধ্যে আর্য্যভাব প্রচার লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, এরূপ মীমাংসা করা বড়ই কঠিন, আর সেরূপ করাও ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ধর্ম্মপালের সভায় বপ্পভট্ট স্বরি ও ভবভূতি উপস্থিত ছিলেন। সাতদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক হয়। ভবভূতিকে পরাজয় ও বৌদ্ধধর্ম্মে আনয়ন করা বপ্পভট্টের উদ্দেশ্য ছিল। এক অজ্ঞাত কৌশলে বপ্পভট্ট ভবভূতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং একত্র কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই বোধ হয় যে, ধর্ম্মপালের সময় ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীযুক্ত আর, সেন মহাশয় সভার গোচর করিলেন যে, তিনি যতদূর আলোচনা করিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হয়, শ্রীহর্ষ ও শিলাদিত্য একব্যক্তি নহেন। এ বিষয়ে তিনি সভার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন। সেন মহাশয় রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়া নানা ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিলেন।

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ভবভূতির কাব্যের ঐতি-হাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এবং শব্দরহস্যের বিবৃতিই তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। ভবভূতির সময়ে যে সংস্কৃত ভাষা জরাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাঁহার কাব্য হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, তজ্জন্য তাঁহার কাব্যে পালিভাষার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত ঝ ঞ্চ গুণগুণ ঝাঁঝাঁ ইত্যাদি শব্দ এ কথার প্রমাণ। ভবভূতির পরবর্ত্তীকালে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বভাব কবি নহেন। বিবর্ত্তমত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

রামানুজ স্বামী বৌধায়নের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়াই যে বৌধায়ন বিবর্ত্তবাদ জানিতেন না, ইহা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধ পাঠক মহাশয় ভবভূতির ভাবে বিভোর হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ডাক্তার আর সেন মহাশয় নানা ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তজ্জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন ও অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি ভবিষ্যতে ঐ প্রকার প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করেন।

(৪) সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "কবি জগদানন্দের" স্বহস্ত লিখিত পুঁথিখানি সভায় প্রদর্শন করিলেন। প্রাচীন সাহিত্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথকে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহের জন্য রাঢ়দেশে প্রেরণ করেন। কালিদাস বাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া জগদানন্দের পদাবলী ও খসড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই কবির বিষয় পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সাহিত্য-সমিতিতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়দ্বয়কে নূতন সভ্য নিয়োজিত করা হইল।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে যাঁহারা গ্রন্থোপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন ও ক্রীত গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন।

পুস্তকের তালিকা ও প্রদাতাগণের নাম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধনবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক।

শ্রীমনোমোহন বসু, সভাপতি।

১৩০৫ সাল ১লা ফাল্গুন।

নবম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ১লা ফাল্গুন (১৮৯৮।১২ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (সভাপতি), শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস্, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, সি এস্, শ্রীযুক্ত যাদবকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক,) শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখো-

পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত শশী-ভূষণ মিত্র এম বি বি এস্ সি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। মোক্তারী পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব।

৪। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় কর্ত্তৃক "রাজকবি জয়নারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহোদয়গণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম ও ধাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,	শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সান্ন্যাল।
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী,	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ কিশোরীমোহন চৌধুরী এমএ,বিএল
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল,	„ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল,	„ ডাক্তার ব্লচ।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ ললিতমোহন ঘোষাল।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএবিএল,	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি,	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিএ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ কুমারনরেন্দ্রনাথ মিত্র।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ মহিমাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

৩। মোক্তারী পরীক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পাদক সভার গোচর করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা শিখিয়া লোক "Campbell" স্কুলে Surveying প্রভৃতিতে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারিত। তাহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া শেষ মোক্তারী পরীক্ষা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও রুদ্ধ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর মতের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় বলিলেন যে, যখন পরিষদ শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষতি নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, যাহাতে মোক্তারী পদের উন্নতি হয়। তাঁহার মতে এ বিষয়ে পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

অধিকাংশ সভ্যের মতে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৪) অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় "রাজকবি জয়নারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী উত্তম হইয়াছে। ধরণ পুরাণ হইলেও ব্যোমকেশ বাবুর গবেষণা ও রচনা কৌশলে বেশ মনোহর হইয়াছে। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় এখন ঘৃণাভাজন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সম্প্রাদায়ের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট ভাব আছে। কবি কর্ত্তাভজা ছিলেন। কাব্যের সেখানে সেখানে ঐ বিষয়ের পরিচয় আছে। তাহা উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত। কবি তাঁহার কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে অনেক নিজ সাময়িক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। এ প্রণালী তাঁহার মতে সমীচীন নহে। কাব্যখানি পরিষদ হইতে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক ও পৌরাণিক কালের নায়ক নায়িকার বর্ণনায় কবির সাময়িক ঘটনার সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। কাব্যাংশের আলোচনা অল্প হইলেও প্রবন্ধকার মূল গ্রন্থপাঠ করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত না করিয়া উৎকৃষ্ট অংশগুলি সংগৃহীত করা উচিত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, কবির গ্রন্থ কাশীখণ্ডের পুঁথিখানি তাঁহার নিকট আছে। আবশ্যক হইলে তিনি প্রবন্ধকার মহাশয়কে দিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিলেন। কবি সাময়িক ঘটনা নিজ কাব্যে সন্নিবেশিত করিবেন, কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকিবে। কাব্যখানি যদি প্রকাশিত করা হয়, তবে সমগ্রই হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, রাজনারায়ণ ভক্ত কবি। বক্তা অমু-

সন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, রাজকবি কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ছিলেন না। তিনি খৃষ্টান কলেজ স্থাপনা করিয়াছিলেন। মুসলমানের পীরের জন্য ত্রাণ করিয়াছিলেন। অথচ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন দেব মূর্ত্তির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। কবি এক-ধারে বিষয়ী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বক্তা প্রবন্ধকার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সভায় প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, কবি কাব্য সাময়িক বিষয়ের সমাবেশ করিবেন কিনা। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। কাব্যের উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন। সাময়িক ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থ উপাদেয় হয়। সেইজন্য কবিরা ঐরূপ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইবে কিনা, এ বিষয়ের বিচার গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি কর্ত্তৃক হওয়া উচিত। প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রবন্ধ যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, তখন প্রবন্ধকার মহাশয় যেন শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গ্রন্থ রক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য পরিষদের গ্রন্থালয়ে গ্রন্থোপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

গ্রন্থোপহারদাতার নাম ও প্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

১৩০৫ সাল ২৯শে ফাল্গুন।

দশম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন (১৮৯৯।১২ই মার্চ্চ) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, সি এস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্যাল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক "ন্যায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৪। বিবিধ বিষয়।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

(২) পরিষদের অন্যতম সদস্য ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করিলেন।

(৩) উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক "ভারতীয় ন্যায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতৃবর্গ সভাস্থলে উপস্থিত না থাকাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের অনুমোদনে ঐ দিন প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রাখিয়া পরবর্ত্তী রবিবারে প্রবন্ধ পাঠের দিন নির্দ্ধারিত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

দশম মাসিক স্থগিত অধিবেশন।

বিগত ৬ই চৈত্র (১৮১৯। ১৯শে মার্চ্চ) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত দশম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত

ভবানীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর-মণ্ডল বি এল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক), শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু (সহকারী সম্পাদক)।

তদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয়গণ ন্যায়বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত দধিভূষণ ভট্টাচার্য্য ।

যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রস্তাবকের নাম।	সমর্থকের নাম।	নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ,	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এমএ,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ।
„ দুর্গানারায়ণ সেন গুপ্ত,	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ,	„ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "ভারতীয় ন্যায়দর্শনের ইতিহাস" বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে তাঁহাকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিবাদ স্বরূপ দু-এক কথা বলিতে হইতেছে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার লিখিত ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের মতামত খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহাকে "অন্ধ" বলিয়াছেন। তিনি যে সকল প্রমাণাদি দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করেন বলিয়াই দিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু যেমন তাঁহার নিজ বিশ্বাসকর প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাতে আর অন্ধতা কি ? ন্যায়ের দুইটি মত আছে, তাহার স্বরচিত ভবভূতি প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। যে "ন্যায়" ও "ন্যায়বিৎ" শব্দাদি দ্বারা নগেন্দ্র বাবু ন্যায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। মীমাংসা অর্থে প্রাচীন শাস্ত্র মধ্যে উক্ত ন্যায় ও ন্যায়বিদাদি শব্দ লিখিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। মনু ও পাণিনিতে "ন্যায়" শব্দের উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্র প্রাচীন দর্শন নহে, তাহার কারণ ষোড়শ পদার্থ অতীব জটিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের প্রথম অবস্থায় অত জটিল বিষয়ের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর উক্ত মত ঠিক নহে। তাঁহার মতে সরল সাংখ্যজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে সাংখ্যজ্ঞানের কথা পাওয়া যায়, তদনুসারে কোন প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থের বর্ত্তমানতা এখনও জানা যায় নাই। বর্ত্তমান সাংখ্যসূত্র বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থ রচিত হইবার পর তাহা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

বিভিন্ন দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য, তত্তৎশাস্ত্রের জটিলতা ও সরলতা বিচার করিয়াই গণনা করা উচিত। নগেন্দ্র বাবু হেমচন্দ্রের যে বচনের সাহায্যে চাণক্য ও বাৎস্যায়নকে এক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, বিদ্বৎসমাজে ঐ বচনের আদর নাই। নন্দবংশ-ধ্বংসকারী চাণক্য নীতি-শাস্ত্রবিৎ ছিলেন, তাঁহার নৈয়ায়িকতার প্রমাণ বা প্রবাদ কিছুই নাই। বাৎস্যায়ন গোত্রনাম, ব্যক্তিনাম বলিয়া মনে হয় না।

দিঙ্নাগের সময় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীই ঠিক কারণ ধর্ম্মরুচি ও দিঙ্নাগ সমকালবর্ত্তী। ধর্ম্মরুচির অনুরোধে দিঙ্নাগ "প্রজ্ঞামূলশাস্ত্রসূত্র" রচনা করেন এবং ঐ গ্রন্থ ধর্ম্মরুচি চীনদেশে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পাঠাইয়া দিয়া তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করান। এতদ্ভিন্ন লা থথোরি নামে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে এক রাজা ছিলেন। শাস্ত্রে আছে, ইঁহারই সময়ে দিঙ্নাগ দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীনগরে সিংহবক্ত্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে নাগদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই নাগদত্তও খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

নগেন্দ্র বাবু যে তারানাথের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ তারানাথ নহে,—তারনাথ। তারনাথের গ্রন্থেই দিঙ্নাগের পূর্ব্বোক্ত জন্ম কথা আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতাদির অনেকেই এখন কালিদাসকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলেন। যদিও এমতে বক্তার ততটা আস্থা নাই, তথাপি এমত যখন এমনও উৎখাত হয় নাই, তখন তন্মতবাদিগণের অনুসরণে চলিতে পারি। কালিদাস ও দিঙ্নাগ সমকালবর্ত্তী, তাঁহার মেঘদূতে দিঙ্নাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং মল্লিনাথ টীকায় দিঙ্নাগ তৎসমকালিক পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দিঙ্নাগ উড়িষ্যায় গিয়া তর্কপুঙ্গব উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার উড়িষ্যাগমনের যে বিবরণ আছে, তদ্দ্বারাও তাঁহাকে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াই স্থির করিতে হয়। উদ্যোতকরাচার্য্য ৭ম শতাব্দীর লোক ইহা একবারে স্থির হইয়াছে। আর বাসবদত্তাকার সুবন্ধু খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। উদ্যোতকরাচার্য্য দিঙ্নাগের মত খণ্ডন করিয়াই ন্যায়বার্ত্তিক লেখেন, এজন্য দিঙ্নাগ সুবন্ধু ও উদ্যোতকরাচার্য্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীবর্ত্তী।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সময় নির্দ্দেশ বিষয়েও নগেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার মতভেদ। তিব্বতরাজ স্রন্‌শন গম্পো ৬২৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার সময়ে ধর্ম্মকীর্ত্তি তিব্বতে ছিলেন, সুতরাং তিনি খৃঃ ৭ম শতাব্দীর লোক।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নূতন আর তর্ক কেন? উহাত ঠিকই হইয়া গিয়াছে যে, তিনি ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভবভূতি কুমারিল্ল ভট্টের শিষ্য বলিয়া খ্যাত। ভবভূতি ৮ম শতাব্দীর লোক। অকলঙ্কদেব, প্রভাচন্দ্র সূরি ও সমন্তভদ্রও ঐরূপে ৭ম।৮ম শতাব্দীর লোকই বটেন।

শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী বলিলেন, সতীশবাবু নগেন্দ্র বাবুর কথায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়, ইহাতে দুঃখের কিছুই নাই, কারণ নগেন্দ্র বাবু উহা সমালোচনার স্বরূপই

বলিয়াছেন। প্রবন্ধ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে অনেক নূতন নৈয়ায়িক ও ন্যায় গ্রন্থের নাম এবং তাহাদের হেতু জানা গেল। ইংরাজ অধ্যাপকেরা এতটা সংবাদ রাখেন কিনা সন্দেহ। এদেশীয় অধ্যাপকেরা নব্য ন্যায়েরই আলোচনা বেশী করেন, প্রাচীন ন্যায়ের এই গ্রন্থ রাশির পরিচয় দূরে থাক, নামও বোধ হয় জানেন না। নব্য ন্যায় ইংরাজ অধ্যাপকদিগের প্রিয় নহে। ইংরাজ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই প্রাচ্যদর্শনের আলোচনায় এ পর্য্যন্ত নব্য ন্যায় সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। নগেন্দ্র বাবু নব্য ন্যায় সম্বন্ধে আজকার মত অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিবেন তাহাতেই বোধ হয় আমাদের কৌতূহল মিটিবে। ন্যায় শব্দে শাস্ত্রে যখন ন্যায় ও মীমাংসা উভয় অর্থই পাওয়া যায় এবং সতীশ বাবু যখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন, তখন আগামী বারে নব্য ন্যায় প্রবন্ধে ন্যায় শব্দের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অর্থের উৎপত্তির এবং তৎশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অর্থের বিষয় আলোচনা করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বলিলেন, স্বয়ং রঘুনাথ শিরোমণি যে শাস্ত্রের পার পান নাই, সে শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি বাদানুবাদ করিতে চাহেন না। বক্তা প্রবন্ধপাঠককে অজস্র আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, যে বিজ্ঞাপনে বুঝিয়াছিলাম ন্যায়শাস্ত্রের (প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের) দার্শনিক তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ লইয়াই আলোচনা হইবে, কিন্তু প্রবন্ধলেখক কোন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার কবে কাহার পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন, এই তর্ক লইয়াই সমস্ত প্রবন্ধটা লিখিয়াছেন, তাহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারেন না, তবে ন্যায়গ্রন্থ ও নৈয়ায়িক গ্রন্থকর্ত্তার সময় নিরূপণই যে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস নহে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কর্ম্মবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের জন্ম। নগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকের নাম গোতম। পুরাণে পাওয়া যায় বৃহস্পতির অভিশাপে গৌতম অন্ধ হইয়া দীর্ঘতমা বা দীর্ঘতপা নামে খ্যাত হন, পরে সুরভির বরে তাঁহার দৃষ্টিলাভ হইলে তিনি গৌতম নামে খ্যাত হন। এই গৌতম ও গোতম এক কিনা ?

তাঁহার ইচ্ছা এই যে ন্যায়শাস্ত্রের আবার আলোচনা হয়। নব্য ন্যায়ের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য বাঙ্গালা চিরবিখ্যাত। ন্যায় লইয়া আমরা চিরদিন গৌরব করি। সে গৌরবের বিষয়ের যত আলোচনা হয় ততই ভাল। দ্বারভাঙ্গা রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ ঠাকুর আকবরের সভায় ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় জয়ী হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ যে ভূসম্পত্তি পান, তাহাই তদ্বংশীয়গণের বহু বিস্তৃত রাজ্যের বীজস্বরূপ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুনরায় বলিলেন, গোতম ও গৌতমে প্রভেদ নাই।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদেও পদার্থতত্ত্বের দার্শনিক ভাবে আলোচনা আছে। নাগার্জ্জুনদ্বারা সুশ্রুত ২য় বার সংস্কৃত হয়, তাহাতে ত্রিবিধ প্রমাণ ও ৩২টি তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই পদার্থ বিচার করা হইয়াছে। নাগার্জ্জুন ঈশ্বরবাদী নহেন, প্রায় সাংখ্য মতের সহিত একমত। চরক ষট্পদার্থবাদী, অভাব পদার্থ স্বীকার করেন

নাই। চরকেও ৩২ তত্ত্বের কথা আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই দুই প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে যখন ন্যায়ের পদার্থ তত্ত্বের অনুসরণ দেখা যায় না, তখন ন্যায়কে আমরা বেশী প্রাচীন বলিতে পারি না, অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের সাহায্যে তাহা বলা যাইতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কালনির্ণয় করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা সহস্র সাধুবাদ দিতেছি এবং চির আশীর্ব্বাদক আমরা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তিনি এ প্রসঙ্গে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা কখন শুনি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রাচীন ন্যায় বিস্তার সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ অমুক দর্শনের পর অমুক দর্শনের উৎপত্তি, ঐরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য যেন দর্শনশাস্ত্রের ঠিক ভিত্তি নহে। মহর্ষিরা লোকহিতার্থ যাবদীয় দর্শন রচনা করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়ের লক্ষ্য পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভের পর শ্রেয় লাভ। পদার্থ অনন্ত তাহাকে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সাংখ্যে প্রধানতঃ ২৪টি পদার্থে বিভক্ত করিলেন, ক্রমে তাহাকে কমাইয়া গৌতম ১৬টি করিলেন, কণাদ তাহাও কমাইয়া ৬টি করিলেন, শেষে বেদব্যাস একমাত্র সৎপদার্থের স্বীকার করিয়া সমস্ত মীমাংসা করিলেন। পদার্থতত্ত্ব নিরূপিত হইলে আমি কি নির্ণীত হইবে, এই আমি নির্ণয় শাস্ত্রাবতারের লক্ষ্য ছিল। নব্য ন্যায়ের উৎপত্তির মূলে যেমন জিগীষা বা বাদী নিরস্ত করিবার ভাব বর্ত্তমান দেখা যায়, বৌদ্ধ ও জৈন এবং তৎসাময়িক হিন্দু ন্যায়ের যাবদীয় গ্রন্থের উৎপত্তি ও বিস্তার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত গ্রন্থগুলির নামমালা শুনিলেই তাহা কতকটা বুঝা যায়। এরূপ বাদী নিরসন চেষ্টা বা জিগীষা প্রবল হওয়াতে ন্যায়শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য প্রাচীন বৌদ্ধাদিযুগের গ্রন্থ এবং নব্য ন্যায়ের গ্রন্থের অধিকাংশে বহুদূরে চলিয়াছে। বাদী নিরসনের চেষ্টায় পদার্থনির্ণয়ের চেষ্টা অন্তর্হিত হইয়াছে। আজকাল ইংরাজী পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক তত্ত্ব দ্বারা যে সকল পদার্থ নির্ণয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই হইত। তবে সে নিয়মে এখন আর উহার পঠন পাঠন হয় না।

ইহার পর বক্তা সংক্ষেপে ন্যায়ের পদাথতত্ত্বের বিচারের অবতারণা করাতে সভা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু যেরূপ চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তাঁহার প্রবন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা এরূপ ভাবে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ করা যায় না। দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা বড় কঠিন। এখন ষড়্‌দর্শন বলিলে আমরা যে ছয় দর্শন বুঝি, প্রাচীনকালে ষড়্‌দর্শন বলিলে তাহা বুঝাইত না। এখন সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ ও পূর্ব্বোত্তর মীমাংসা বুঝায়, আর সেকালে লোকায়তিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, সাংখ্য ও মীমাংসা এই ছয়টি বুঝাইত, বিবেকবিলাস নামক গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে। বৌদ্ধ জন্মের পূর্ব্বে ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের একটি দলের নাম আজীবক, কেহ কেহ বলেন শেষে ইহারাই ভাগবত নামে পরিচিত হয়, আর এক দলের

নাম পাশুপত। এই পাশুপত বা শৈব দর্শনের একসেট গ্রন্থ কাশ্মীরে বাহির হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যেরূপ অনুসন্ধানে আজকার প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন, এরূপ অনুসন্ধানের গুরু ইংরাজ। ইংরাজ অনুসন্ধান করিয়া যে মত স্থির করে তাহা একবারে অভ্রান্ত বলিয়া লওয়া উচিত নহে, নিজের অনুসন্ধানে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া তবে লইতে হয়, ইংরাজেরা যে সকল প্রমাণ বলে কোন বিষয় মীমাংসা করেন তাহার উপর নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান বলে কিছু বেশী প্রমাণ না দিলে সেই মত ঠিক বলিয়া সকলে গ্রাহ্য করিতে পারে না। যেমন চিরকাল জানা ছিল, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উজ্জয়নীবাসী, কিন্তু এখন পৃথুযশাশাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে, বরাহমিহির কান্যকুব্জবাসী ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি বলিলেন, নগেন্দ্র বাবু অশেষ প্রশংসার পাত্র, তাঁহার অনেক বিষয় বেশ বিশদ হইয়াছে। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় করাই ন্যায় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সকল সন্দেহ নিরসনের জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি।

প্রবন্ধপাঠক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—সতীশ বাবুকে "অন্ধ" বলায় বাস্তবিকই তাঁহার বিদ্বেষ বা কুভাব নাই।* যাহাহউক যখন সতীশ বাবু তজ্জন্য কষ্ট বোধ করিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন। সতীশ বাবু ন্যায় ও ন্যায়বিৎ শব্দের উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থ কর্ত্তৃ-গণের সময়াদি সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার পোষকতায় তিনি আর কোন নূতন প্রমাণ দেন নাই, তাঁহার প্রদত্ত ঐ সকল যুক্তির প্রতিবাদ বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছি এবং তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কালিদাস, দিঙ্নাগ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সুবন্ধুকে ৫ম শতাব্দীর লোক বলিতেছেন, সেই সুবন্ধুই ধর্ম্মকীর্ত্তি ও উদ্যোতকর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† ন্যায়শাস্ত্র বলিতে যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাইত, তাহার যথেষ্ট প্রাচীন প্রমাণ আছে। অবশেষে তিনি প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের পরিচয় স্থলে কপিল কৃত ন্যায়ভাষা নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই স্থলে শ্রীযুক্ত বিহারী বাবু বলিলেন, হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে মুসলমান আলবীরুণির কথা সমীচীন প্রমাণ নহে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, যে তিনি এখনকার আদর্শের মুসলমান নহেন, তিনি ৮ শতবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং মামুদের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা তাহা ঠিক ফলিয়াছে। প্রবন্ধ পঠিত হইল এক বিষয়ে, আর সভায় তর্কস্রোত ছুটিল অন্য দিকে। অন্ধ শব্দের ব্যবহারে নগেন্দ্র বাবু বা সতীশ বাবু কাহারও কিছু মনে করিবার নাই, কারণ যে বিষয়ের উল্লেখে অন্ধ-

* বিদ্যাভূষণ মহাশয় Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Vol. XIX pp. 305-347)-প্রকাশিত মহাদেব রাজারামের মতই (নিজ মত বলিয়া) অবিকল গ্রহণ করাতেই অতি দুঃখের এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সাং পং সং।

† পঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবন্ধ বিশ্বকোষের 'ন্যায়'শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল না।

ওার কথাটা উঠিয়াছে সে দিক্‌টা বাস্তবিক অন্ধকারে ভরা। সেখানে সকলেই অন্ধ, বহুকষ্টে সেখানে আলো ফুটাইতে হয়। আমাদের রাজপুরুষেরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মালোচনা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ তাহার কিছুই জানিতে পারিতাম না। বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হইয়া গিয়াছেন। অবতারত্বের অন্ধকারে পড়িয়া বুদ্ধতত্ত্ব চির অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। বৌদ্ধ বলিলে বুদ্ধের পরবর্ত্তীকালের কথাই যে বুঝা যায় এমন নহে, বুদ্ধের পূর্ব্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু না কিছু বীজ জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। অনুসন্ধান সন্দেহ না হইলে হয় না। ভক্তিতে সন্দেহ আসে না, সুতরাং ভক্তি গেলে সন্দেহ হয়, তাহার পর কোন বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি হয়। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভক্তি সহজে টলে না, সুতরাং তাঁহারা এরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। নগেন্দ্র বাবুর আলোচনা গভীর গবেষণাপূর্ণ এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাতেও সত্য থাকিতে পারে। এস্থলে হঠাৎ সত্য নির্ণয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা নিজের আলোচনা সাপেক্ষ। কোন পক্ষের মীমাংসা সহসা গ্রহণ করা উচিত নহে। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় একদিনে একজন দ্বারা সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশা করিতে পারা যায় না। এই অনুসন্ধানস্পৃহাই শুভ লক্ষণ। আমাদেরও আহ্লাদের বিষয় যে এখন স্বাধীনভাবে আমাদের আলোচনা প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। নিজে দেখিয়া শুনিয়া কোন কার্য্য করিলে সত্য সহজে নিষ্কাশিত হয়। অবশেষে প্রবন্ধলেখকের পরিশ্রম, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং ধীরভাবে সুপ্রণালীতে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে যে সকল সভ্য মহাশয় পরিষদের গ্রন্থালয়ে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর সহকারী সভাপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮॥০ টার সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

১৩০৬ সাল ৪ঠা বৈশাখ।

পরিশিষ্ট।

নিম্নোক্ত তালিকা পূর্ব্বে মাসিক কার্য্য বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থ রক্ষক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তালিকা ভ্রমশূন্য হয় নাই। সেইজন্য নির্ভুল করিয়া পুনরায় মুদ্রিত হইল।

১৩০৪ সাল। চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

ভ্রম—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রাকৃতি বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম।

শুদ্ধ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বি এ—১২; প্রবাসের পত্র।

একাদশ মাসিক অধিবেশন। ৫ই বৈশাখ ১৩০৫ সাল।

১। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, (ক) ভীষ্মচরিত, (খ) ভারতকাহিনী, (গ) প্রতিভা, (ঙ) সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস ৪র্থ ভাগ।

২। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

৩। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ক) উপাসক।

৪। চুনীলাল বসু এম, বি, এফ্, সি, এস, (ক) ফলিত রসায়ন, (খ) রসায়নসূত্র, ১ম ও ২য় ভাগ।

৫। শ্রীচৈতন্য নামসমাজ (ক) Life of Srichaitanya.

৬। শ্রীকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) হেমচন্দ্রগ্রন্থাবলী।

৭। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু (গ্রন্থ রক্ষক) (ক) ঋণ পরিশোধ।

১৩০৫ সাল। প্রথম মাসিক অধিবেশন। ২৬শে বৈশাখ।

১। শ্রীজগবন্ধু মোদক (ক) বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (খ) সরল পাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ। (গ) ব্যাকরণ প্রবেশিকা।

২। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, (ক) Essays on Indian affairs. (খ) Report of the 12th Indian National Congress 1896. (গ) অঞ্জলী (ঘ) Illumination of flowery life.

৩। শ্রীমতিলাল ঘোষ (ক) শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ (খ) অনুরাগবল্লী (গ) পদকল্পতরু ১ম. ২য়. ৩য়।

৪। শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী (ক) সঙ্গীতামৃতলহরী।

৫। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Twelfth annual report of the Countess of Dufferin's fund, Bengal Branch.

৬। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) প্রভাসখণ্ড, (খ) গোবিন্দমঙ্গল, (গ) দাশরথী রায়ের পাঁচালী,

(ঘ) বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ, (ঙ) Collection of Bengali Petitions ইং ১৮৬৯।

১৩০৫ সাল। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ২০শে আষাঢ়।

১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক) প্রেমাশ্রু।

২। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১৩০৫ সাল। চতুর্থ অধিবেশন। ৩০শে শ্রাবণ।

১। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Thirteenth annual report of the Countess of Dufferin's fund 1897. (খ) The annual report of the Indian Association 1892-93 & 1896-96 (গ) বাঙ্গালী বৈশ্য।

২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সান্যাল (ক) The Tilak trial.

৩। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (ক) দুর্গামঙ্গল।

১৩০৫ সাল। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২৭শে ভাদ্র।

১। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার (ক) শালফুল।

২। শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা) (ক) স্ত্রীশিক্ষা।

৩। শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী (ক) বিনোদমালা।

৪। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক) সুরসঙ্গীত।

৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) আলিবাবা, (খ) কথোপকথনরহস্য, (গ) প্রেমরহস্য, (ঘ) চিন্তারহস্য।

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(ক) সচিত্র সমাজরহস্য (খ) সোহাগোচ্ছ্বাস বা আদর্শ দম্পতী, (গ) আহ্নিককৃত্যম্, (ঘ) অমিয়পদাবলী, (ঙ) সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশিক্ষাপদ্ধতি, (চ) সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার, (ছ) The report of the Calcutta orphanage.

৭। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Speeches by hon'ble Surendra Nath Banerjee 1880-84. (খ) 1891-94 Vol. IV.

১৩০৫ সাল। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৪শে আশ্বিন।

১। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) সংস্কৃত প্রবেশ (খ) সন্ন্যাস।

২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ (ক) সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার।

৩। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (ক) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ও ২য় ভাগ, (খ) সাহিত্য-চিন্তা, (গ) ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ও ৩য় ভাগ, (ঘ) A note on the ancient geography of Asia.

৪। শ্রীরাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব (ক) A criticism on Sir Alexander Mackenzie's

Speech, (খ) A note on Sir Alexander Mackenzie's Speech. (গ) An Analysis of plague cases in Calcutta.

৫। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) সাবিত্রী, (খ) তত্ত্বকুসুম, (গ) চিকিৎসা ১ম খণ্ড, (ঘ) নির্ব্বাণপদাবলী, (ঙ) ৺রামচন্দ্রদত্তের বক্তৃতা (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব কথিত "বর্ণাশ্রম" "আত্মা বিষয়ে" "সাধনের অধিকারী বিষয়ে" "সাধনের স্থাননির্ণয়বিষয়ে" "ঈশ্বর-সাধনবিষয়ে" "বিবেক ও বৈরাগ্যবিষয়ে" "জ্ঞান ও ভক্তিবিষয়ে" "ব্রহ্মশক্তিবিষয়ে" "পর-কাল বিষয়ে" "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব" আর "সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এই ১১ খানি গ্রন্থ, (চ) গীতামৃতসাগর।

৬। শ্রীনকুলেশ্বর দেব শর্ম্মা (ক) মীমাংসাতত্ত্ব ১ম ভাগ।

সপ্তম্ মাসিক অধিবেশন।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর The united world or a glimps of Paradise.

২। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (ক) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১০৮ হইতে ১১৩ সংখ্যা) ৬ খানি। (খ) সংস্কৃত চন্দ্রিকা মাসিক পত্রিকা ৪ দফা।

৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার (১) ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার কার্য্যবিবরণ ১ম হইতে ১০ বৎসর। (২) যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভার ১১শ বার্ষিক বিবরণী। (৩) বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত। (৪) মার্টিন লুথারের জীবনচরিত। (৫) ডেভিড হেয়ারের জীবনী। (৬) হেন্‌রি উইলিয়ামস্ জীবনচরিত। (৭) দৈবরত্নম্। (৮) প্রকৃতিতত্ত্ব। (৯) ব্রহ্মসংগীত। (১০) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ (আদি মধ্য অন্ত)। (১১) বেণীসংহার নাটকম্। (১২) বিশ্বচিকিৎসক। (১৩) শ্রীদারুব্রহ্ম। (১৪) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। (১৫) সাহিত্যকল্পদ্রুম ২য় বর্ষ (মাসিক পত্র)। (১৬) আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ। (১৭) অপথ্যাল্‌মিক সার্জ্জারি (অক্ষিতত্ত্ব)। (১৮) ঘোষযাত্রা নাটকম্। (১৯) তত্ত্ববিদ্যা। (২০) পরিমিতি (ক্ষেত্রব্যবহার)। (২১) লুপ্ত আর্য্যপুরাণ (সৃষ্টি বিবরণখণ্ড)। (২২) সহচরী (মাসিকপত্র)। (২৩) চন্দ্রবংশম্। (২৪) ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম খণ্ড। (২৫) স্তবাবলী। (২৬) বিধান ভারত (দ্বিতীয়োল্লাস)। (২৭) সটীক শান্তিশতকম্। (২৮) নীতিমালা ১ম ভাগ। (২৯) চিকিৎসক ১ম খণ্ড, ২,৩য় সংখ্যা (মাসিকপত্র)। (৩০) শিক্ষা। (৩১) চিকিৎসাকল্পতরু ১ম ভাগ। (৩২) রামচন্দ্র দাসের জীবনচরিত। (৩৩) আর্য্য-শাস্ত্রের মুক্তদ্বার। (৩৪) ভৈষজ্যনাড়ীবিজ্ঞানচন্দ্রিকা। (৩৫) প্রমেয় রত্নাবলী। (৩৬) সূর্য্যমণ্ডল। (৩৭) সুবোধিনী ১ম বর্ষ (মাসিকপত্র)। (৩৮) ভারতীয় প্রশ্নাবলী। (৩৯) আলালের ঘরে দুলাল (উপন্যাস) প্রশ্নাকারে। (৪০) সরল জ্বরচিকিৎসা (৩য় ভাগ)। (৪১) দাশরথি। (৪২) রত্নাগর্ভা (দৃশ্যকাব্য)। (৪৩) রাবণবধ কাব্য ১ম খণ্ড। (৪৪) হিন্দুজাতি। (৪৫) শ্রীমদ্ভাগবত। (৪৬) শ্রাদ্ধমন্ত্রার্থপ্রকাশিকা। (৪৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দক্ষিণ বিভাগঃ)। (৪৮) ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব। (৪৯) Bengali Course, Entrance Examination, 1890. (৫০)

সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান। (৫১) ধন্বন্তরী ১ম উপদেশ। (৫২) সামুদ্রিকম্। (৫৩) ব্রহ্মাণ্ড দর্শন। (৫৪) মাধবসাধনম্ (দৃশ্যকাব্য)। (৫৫) দৈনিক প্রার্থনা। (৫৬) হস্তামলকম্। (৫৭) ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। (৫৮) যোগ ও দর্শনশাস্ত্র। (৫৯) সাগর-শোকোচ্ছ্বাস (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে)। (৬০) মায়াজাল মোহিনীমন্ত্র। (৬১) সারকৌমুদী (বৈদ্যশাস্ত্র)। (৬২) ছন্দোমঞ্জরী। (৬৩) মেঘদূতম্ (মূল ও অনুবাদ)। (৬৪) ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্য। (৬৫) জ্যোতিষ। (৬৬) সরল চিকিৎসা। (৬৭) ব্যায়াম। (৬৮) সিদ্ধতন্ত্রমন্ত্র। (৬৯) আদর্শ কৃষক। (৭০) যোগতত্ত্ব। (৭১) বেদান্তসার। (৭২) আর্য্যজীবন ১ম খণ্ড। (৭৩) বিজ্ঞান-দর্পণ (মাসিকপত্র) ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা। (৭৪) পঞ্চামৃত। (৭৫) বাল্যজীবন। (৭৬) বীণার ভারতী। (৭৭) গীতাঙ্কুর। (৭৮) চিন্তালহরী ১ম ভাগ। (৭৯) Speeches on Technical Education. (৮০) সংসারকোষ (বন্ধনপ্রণালী)। (৮১) ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত) ১ম ও ২য় খণ্ড। (৮২) শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন (২৫ খণ্ড)। (৮৩) মোক্তার সুহৃদ। (৮৪) কামরত্নম্। (৮৫) মনুসংহিতা (মনুরহস্য)। (৮৬) ইন্দ্রজালকল্পতরু। (৮৭) The Essay on Meghanada Badha. (৮৮) জমীদারী, মহাজনী, বাজারহিসাব (সারসংগ্রহ)। (৮৯) রামবিলাপম্। (৯০) ভোজবিদ্যা (ইংরাজী ম্যাজিক)। (৯১) একমেবাদ্বিতীয়ম্। (৯২) শাণ্ডিল্যসূত্রম্। (৯৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (৯৪) শুক্রনীতিঃ। (৯৫) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। (৯৬) A hand-book of Medicine. (৯৭) চিকিৎসাদর্পণ (৯৮) কালীকৈবল্যদায়িনী ৯৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড) (১০০) ঐতিহাসিক পাঠ (১০১) হর্ষচরিতের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ। (১০২) নাড়ীপ্রকাশম্। (১০৩) মহাভারত (বটতলা সংস্করণ)।

৪। Sovabazar Benevolent Society, 14th Annual Report of the Same.

১৩০৫ সাল। অষ্টম মাসিক অধিবেশন। ২৪শে পৌষ।

১। শ্রীরাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমীদার, উত্তরপাড়া (ক) First French Lessons.

২। শ্রীগোবিন্দানন্দ পারিব্রাজক (ক) সিদ্ধান্তদর্শন।

৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎপত্রিকা সম্পাদক (ক) ব্যবহারিক ভূগোল (খ) ভূগোল (গ) বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঘ) History of Bengal. (ঙ) Outlines of the History of Bengal ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (চ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (ছ) Essay on History of India. (জ) ভারতনীতি ২য় ভাগ (ঝ) পাণ্ডবচরিত (ঞ) মহাশোক (ট) ভিক্টোরিয়া চরিত (ঠ) ...নামঞ্জরী (ড) সৌভ্রাত্র (ঢ) সন্দর্ভহার (ণ) চারুপ্রবন্ধ (ত) রামবনবাস উপন্যাস (থ) সংসারপরিচয় ২য় ভাগ পদ্য (দ) কবিতাকলাপ (ধ) চারুপ্রবন্ধ (ন) সাহিত্যকুসুম (প) কবিতা ২য় ভাগ (ফ) ভূগোল।

৪। পরিষৎ কর্ত্তৃক ক্রীত (১) রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (২) কেশবচরিত (৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত ৺শ্রীরায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত

(৪) লোক রহস্য (৫) গদ্য পদ্য (৬) দেবীচৌধুরাণী (৭) কপালকুণ্ডলা (৮) আনন্দমঠ (৯) ধর্ম্ম-তত্ত্ব (১০) কমলাকান্ত (১১) রজনী (১২) ইন্দিরা (১৩) বিষবৃক্ষ (১৪) (ক) বিবিধ প্রবন্ধ (১৫) (খ) বিবিধ প্রবন্ধ (১৬) চন্দ্রশেখর (১৭) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮) রাধারাণী, (১৯) সীতারাম (২০) রাজসিংহ (২১) মৃণালিনী (২২) কৃষ্ণচরিত (২৩) কৃষ্ণকান্তের উইল (২৪) সঞ্জীবনী সুধা।

৫। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম এ (ক) নলিনী গাথা।

নবম মাসিক অধিবেশন। ১লা ফাল্গুন।

১। শ্রীগোবিন্দলাল মল্লিক (ক) India (Monthly Magazine 1895).

২। Municipal Bill agitation Committee started 1898. (ক) The proposed Municipal Laws by N. N. Ghose Esqr. Bar-at-law.

৩। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ক) Origin of Caste.

৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় (ক) সিদ্ধান্তদর্পণ।

৫। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত (ক) সেক্সপিয়র ১ম ভাগ] (খ) History of England by Lord Macaulay Vol. III. (গ) ভারতসাম্রাজ্য (মানচিত্র)।

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ক) আচার।

৭। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত (ক) কুলবালিকা (খ) ভক্তিময়ী।

৮। শ্রীদীননাথ সেন (ক) মোহমুদ্গর ৫ খানি।

৯। পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত (ক) সমর্থকোষ ২ দফা, প্রদাতা শ্রীঅনুপকৃষ্ণ মিত্র।

১৩০৫ সাল। দশম মাসিক অধিবেশন। ৬ই চৈত্র।

১। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত (ক) English and Hindee Dictionary. (খ) Buddhist Text series. (১) করুণাপুণ্ডরীকম্, (২) সুবর্ণ প্রভা (গ) Phonography in Bengali. (রেখাশব্দাভিজ্ঞান) (ঘ) Key to the phongraphy in Bengali short hand reporting.

২। শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম এ বি এল (ক) Religion of Love.

৩। Municipal Bill agitation committee started 1898., (ক) A few observation on the Calcutta Municipal Bill, by Manamatha Nath Dutta.

৪। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ক) পাতঞ্জলদর্শন।

৫। শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক (ক) কমলাকরুণা বিলাসো নাম শুভাঙ্কঃ।

৬। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (ক) ৺কবিঠাকুর দাস দত্তের জীবনী (খ) হিন্দুধর্ম্ম (গ) নারী (ঘ) প্রমোদরঞ্জন।

৭। সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী—শ্রীবিজয়পণ্ডিত বিরচিত "মহাভারত"।

৮। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ক) আকবর।

৯। শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন (ক) অযোধ্যাকাণ্ড (কৃত্তিবাসের রামায়ণ) ১২৬০ সালে মুদ্রিত।

১০। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র (ক) রাজকুমার আলবার্টের জীবনী, জনরড্রেনী এফ, আর, এস, কর্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

১৩০৫। একাদশ মাসিক অধিবেশন। ৪ঠা বৈশাখ।

১। পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত—(ক) Encyclopedia Britannica 25 VOLS. (মূল্য ৩০০৲) (খ) দুর্গেশনন্দিনী, (গ) জন্মভূমি ২য় ভাগ ১২৯৯ সাল।

২। শ্রীমনোমোহন রায় বি এ (ক) রিজিয়া।

৩। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ (ক) প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

৪। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত (ক) কলগনী (খ) শাক্তোৎসব।

৫। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত (ক) আর্য্যকীর্ত্তি (কানাড়ী ভাষায় অনুবাদ, মহীশূর শিক্ষা সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের অনুবাদ।) ·

৬। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ক) রেখাক্ষরবর্ণমালা (Manscript of Shorthand Phonography in Bengali)

৭। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর (ক) National Magazine Vol. XII 1898. (খ) The Dawn, ইংরাজী মাসিক পত্র ইং ১৮৯৭।

৮। ১৩০৩ সালে পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত (ক) শ্রীরামমোহনের রামায়ণের প্রতিলিপি ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত (খ) কাশীদাসী মহাভারতের প্রতিলিপি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত।

৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—১৫ খানি পুঁথি।

১০। শ্রীবিজয়কেশব মিত্র—মহাভারত সঞ্জয় কবীন্দ্র লিখিত নকলের তাং সাল ১২২৩ ২৮শে ফাল্গুন, ত্রিপুরা।

১১। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—গোবিন্দদাসের পদাবলী (পুঁথি)।